ভারতীয় ভাস্কর্যে
মিথুন

নারায়ণ সান্যাল

সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বব ২০০২

প্রকাশক · নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যালোক । ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা - ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকব নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭/এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলিকাতা - ৭০০০০৬

কম্পিউটার টাইপসেটিং মা দুর্গা লেজার
৩৭ জি. সি. ঘোষ রোড। কলিকাতা - ৭০০০৪৮

কৈফিয়ৎ-উৎসর্গ

মন্দিরে মিথুনমূর্তির স্কেচ আঁকতে দেখে কতলোক যে আমাকে মনে মনে ধিক্কার দিয়েছে তার আর লেখাজোখা নেই। আবার অনেক কৌতূহলী সহযাত্রী—ভক্ত, ছাত্র, টুরিস্ট বা সন্ন্যাসী এগিয়ে এসে আমাকে প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্নটা বিভিন্ন ভাষায়, কিন্তু একমুখী .

--কেন? Why ? ক্যিঁও? কিমর্থম্?

আমি ক্রমাগত জবাব দিয়ে গেছি · জানি না! I don't know. ম্যায় নেহি জান্‌তা। নাহং বেদ!

দীর্ঘ পঞ্চাশ-ষাট বছব ধরে বুঝবার চেষ্টা করেছি। পারিনি।

মিথুন-ভাস্কর্যে একটা ধাবাবাহিক বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাদের যৌনতা এবং তথাকথিত 'অশ্লীলতা' ক্রমবর্ধমান। তারপর হঠাৎ তা থেমে যায়। মন্দির-ভাস্কর্যে মিথুনাচারে স্পষ্টত তিনটি স্তর। প্রথম স্তর সহস্রাব্দব্যাপী। যে শিল্পস্ফুরণ দৃষ্টিনন্দন, অনাবিল ও রসোত্তীর্ণ। বৃকোদরভাগ অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি। দ্বিতীয় স্তরের শেষদিকের মিথুন বিতর্কমূলক। দর্শকরা দ্বিমত। তৃতীয় স্তরের উগ্র যৌনাচার—যাব ভগীরথ খাজুরাহো—তা রীতিমতো আপত্তিকর। শিল্পসৃষ্টির অপেক্ষা যৌনতার বিজ্ঞপ্তিই যেন সেক্ষেত্রে ভাস্করদের মূল উদ্দেশ্য; একমাত্র প্রেরণা। আমরা সেই বিবর্তনধারাটি ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিকায় বুঝে নেবার চেষ্টা করেছি। তার নান্দনিক বিচারে মনোনিবেশ করেছি। সেইসঙ্গে বহির্বিশ্বের—বিশেষ করে প্রতীচ্য শিল্পস্ফুরণের—সমান্তরাল ভাবধারার সঙ্গে তৌল করতে চেয়েছি।

দেখা যায়, বর্তমান যুগের আদিসূরীবা 'মিথুনাচার'-এর নিরঙ্কুশ প্রশংসাই করে গেছেন। তাদের অশ্লীলতার বিষয়ে আলোচনা করেননি। তাঁরা এই উগ্র যৌনাচারী তৃতীয় স্তরের ভাস্কর্য আদৌ দেখেছিলেন কি না আমাদের সন্দেহ। খাজুরাহো তখনো অনাবিষ্কৃত। রাজেন্দ্রলাল বা ফার্গুসন কোনার্ক মন্দির দর্শন করেছিলেন—ইতিহাসে পাচ্ছি—কিন্তু বিশাল সঙ্গমরত মূর্তিগুলির বিষয়ে কোনো উল্লেখ করেননি। ঠিক তার পরের যুগে—হরপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রামেন্দ্রসুন্দব বা ব্রজেন্দ্রনাথ প্রভৃতিও ওই তৃতীয় স্তরের বিরংসা-জর্জরিত মূর্তিগুলি সম্ভবত দেখে যাননি। তাঁরা মিথুনাচারের সামূহিক প্রশংসাই করে গেছেন। মাঝে মাঝে ভুবনেশ্বর ও পুরী মন্দিরের মিথুনমূর্তির বিষয়ে কিছু বিস্ময় প্রকাশও করেছেন। তৃতীয় স্তরের মিথুনমূর্তিগুলি—যৌথযৌনাচাব, পায়ুমৈথুন, পশুমৈথুন, কানিলিঙ্গাস, ফেলাশিও প্রভৃতি বিজ্ঞাপিত করা মূর্তিগুলি তাঁরা যে দেখেছিলেন তাব প্রমাণ নেই। সে আমলে সেগুলির আলোকচিত্রও সুলভ ছিল না। অর্ধেন্দুশেখর গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *রূপম্* পত্রিকায় (1925) অর্ধশতাধিক মিথুন মূর্তির আলোকচিত্রসহ এ বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লেখেন। তার ভিতর ব্যতিক্রম হিসাবেও তৃতীয় স্তরের কোনো আলোকচিত্র ছিল না। আমাদের ধারণা, পরবর্তী শিল্পাচার্যরা—অবনীন্দ্রনাথ, কুমারস্বামী, নন্দলাল প্রভৃতি ওই মূর্তিগুলি দেখেননি। কোনো শিল্পাচার্যই এই তৃতীয় স্তরের মূর্তির আলোকচিত্র/স্কেচ সহযোগে অথবা তাদের সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ করে কিছু জানিয়ে যাননি। না সমর্থন, না নিন্দা।

বিংশ শতাব্দির প্রায় ষাটের দশক থেকে এই তৃতীয় স্তরের মিথুনাচার সম্বন্ধে সমালোচকরা স্পষ্টভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন। ততদিনে খাজুরাহো প্রচারলাভ করেছে। কোনার্ক ও খাজুরাহো যাত্রী টানতে শুরু করেছে। মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা সরকারের পর্যটন বিভাগ এগুলি বিজ্ঞাপিত করে টুরিস্ট আকর্ষণ করতে থাকে। নাচের আয়োজনও করা হয়। উচ্চহারে টিকিট বিক্রয় করে। প্রাচীনপন্থী কিছু শিল্পসমালোচক ইতিপূর্বেই ওই তৃতীয় স্তরের মিথুনমূর্তিগুলিকে 'অশ্লীল' ও অবাঞ্ছনীয় বলে মত প্রকাশ করেন। আচার্য বিনোবা ভাবে ইতিপূর্বেই একটা আন্দোলনের আয়োজন করেছিলেন—ওই মূর্তিগুলি আবরিত অথবা অপসারিত করার। গান্ধীজি ও নন্দলালের হস্তক্ষেপে তা বাস্তবায়িত হয়নি।

বিশ্বশিল্প-ইতিহাসে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ হতে দেখেছি বারে বারে। 186 খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রীক সেনেট 'মদনোৎসব'কে অশ্লীলতাদুষ্ট বলে চিহ্নিত করেন। সে উৎসব চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতাব্দিতে কনস্টান্টাইন দ্য গ্রেট হেলিয়োপোলিস-এ (প্রাচীন ফোনিশিয়া, অর্থাৎ বর্তমান সিরিয়া) রতিমন্দিরটি ধ্বংস করে দেন। গড়ে তোলেন একটি গির্জা। সাভোনারোলাও রেনেসাঁ-যুগে আগুন জ্বালিয়েছিলেন। ধর্মান্ধ কালাপাহাড় ভেঙেছে হিন্দুমন্দিরের মূর্তি। অতি সাম্প্রতিক কালে তালিবান বর্বরেরা ভেঙেছে বামিহানের বুদ্ধমূর্তি এবং বর্বর করসেবকেরা—প্রাদেশিক সরকারের মদতে বাব্‌রি-মসজিদ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—সাভোনারালা ব্যতিরেকে—আক্রমণকারীরা সকলেই বিধর্মী। এক্ষেত্রে হিন্দুনেতারাই কিন্তু হিন্দুমন্দিরের 'অশ্লীল'মূর্তি অপসারিত করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু প্রায় সমকালে, সমান্তরালে, একশ্রেণির শিল্পবিশারদ অগ্রসর হয়ে এলেন ওই তৃতীয় স্তরের মিথুনমূর্তিগুলির সমর্থনে। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য—মার্গস্কুল এবং তার প্রধান কর্মকর্তা মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্‌। তাঁরা ওই যৌথযৌনাচারী শিল্পে—কানিলিঙ্গাস, ফেলাশিয়ো ভাস্কর্যে—নান্দনিক ঔৎকর্যের সন্ধান পেলেন। শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার অপপ্রয়োগে কখনো বা ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে তাঁরা মুক্তকচ্ছ-উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করেছেন।

দুর্ভাগ্য ভারত শিল্পচর্চার : এই তৃতীয় স্তরের মিথুনমূর্তিগুলির নান্দনিক মূল্যায়ন আদৌ করা হল না। বর্তমান গ্রন্থে আমরা সে-চেষ্টাই করেছি। মিথুনাচারের ধারাবাহিক আলোচনার শেষ পর্যায়ে।

আমার জনৈকা স্নেহভাজন নিকটআত্মীয়া আমাকে বলেছিল : এত স্পষ্টভাষায় লেখা এবং তার চিত্র পরিবেশন করা সাহিত্যরীতির বিরুদ্ধে। আমি সে মত গ্রহণ করতে পারিনি। আমি তো এই বইতে কথাসাহিত্য রচনা করতে বসিনি। আমার ফুলের বাগান জবরদখল করে কেউ যদি কাঠগুদাম বানায়, তাহলে আমি ফুলবাগানী-ভাষায় বলতে পারব না : 'নীরসস্তরুবরঃ পুরতো ভাতি'! বলব : 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্টত্যগ্রে'। কারণ কোদালকে আমরা কোদাল বলতেই অভ্যস্ত। আমরা বুঝতে চেয়েছি, বোঝাতে চেয়েছি—কীভাবে ভারতীয় শিল্পমার্গে পুঞ্জীভূত হল এত কদর্যতা, এত আবর্জনা, এত পুরীষ! কারা, কেন, কীভাবে জবরদখল করল সেই ফুলবাগান।

মিস্‌ মেয়োর শিল্পের গাউনে কর্দমের ছিটেফোঁটাও লাগেনি। কিন্তু বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর রচনাটি কর্দমলিপ্ত। অপরপক্ষে নফর কুণ্ডুর সর্বাঙ্গে লেগেছিল কর্দম-পুরীষ। কারণ তিনি বাঁচাতে চেয়েছিলেন একটি হতভাগ্যকে। 'পঙ্কে সে মানেনি অগৌরব/সে শুধু মানসচক্ষে দেখেছিল বিপন্ন মানব।' আর সেজন্যই—"নফর নফর নয়, একমাত্র সেই তো মনিব, নফরের দুনিয়ায়!" উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিটাই বড় কথা।

জানি, এ-গ্রন্থে বেশ কিছু অপূর্ণতা রয়ে গেল। আরও নিষ্ঠাভরে পরিমার্জনা করার প্রয়োজন ছিল। দীর্ঘ সময় নিয়ে—কয়েক দশক ধরে রচনা করায়— দু-এক স্থলে পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি। হয়তো পুনরুক্তি দোষও ঘটেছে। যৌবনকালে জাতীয় গ্রন্থাগারে গিয়ে বহু আকরগ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। তখন সেসব গ্রন্থের প্রকাশকের নাম/পৃষ্ঠাসংখ্যা লিখে রাখিনি। তাই প্রতিটি পরিচ্ছেদে তথ্যনির্দেশ পূর্ণতা পায়নি। বার্ধক্যজনিত হেতুতে এখন জাতীয় গ্রন্থাগারে গিয়ে সে-তথ্য সংগ্রহ করা লেখকের পক্ষে অসম্ভব। দোষ কি একা লেখকের? এ কথাটার জবাব কে দেবে : 'জীবন এত ছোট কেন?'

এ গ্রন্থ প্রকাশে যারা আমাকে সাহায্য করেছে তাদের ঋণ অপরিশোধ্য। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ—যেমন ইন্দ্র দুগার—ছিলেন আমার বন্ধুস্থানীয়; বাকিরা অত্যন্ত স্নেহভাজন—সুবাস মৈত্র, সুচিত্রা সান্যাল, শেখর মুখার্জি, চিত্ত বিশ্বাস, প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, দিলীপ ভট্টাচার্য, সুধাংশু দে ও তার সুযোগ্য পুত্র শুভঙ্কর, অনুপম ঘোষ অথবা কার্তিক জানা। ধন্যবাদ জানালে তারা লজ্জা পাবে। কিন্তু ওদের সাহায্য ও নিরন্তর তাগাদা না থাকলে এ গ্রন্থটি—দোষত্রুটি সত্ত্বেও—আমার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হতো না। সুকুমার রায়কে তাঁর সৃষ্টিকর্তা মাত্র ছত্রিশটি বছর দিয়েছিলেন, তাই তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী *আবোলতাবোল* পুস্তকাকারে দেখে যেতে পারেননি। আমাকে করুণাময় ইতিমধ্যেই দিয়েছেন বিরাট। আর কত দেবেন? আবোলতাবোল লেখার জন্য?

'মামা' ছিলেনই না এতদিন। কানামামার এই পিটুলিগোলায় যদি আপনাদের কিছুটা সন্তুষ্টি হয় তাহলেই আমার শ্রম সার্থক।

গ্রন্থটি তাই উৎসর্গ করে যেতে চাই আমার অপরিচিত অসংখ্য সহযাত্রী বন্ধুদের। সেই যাঁরা পাঁচ-ছয় দশক ধরে আমাকে নিরন্তর প্রশ্ন করে গেছেন : কেন? Why ? ক্যোঁও? কিমর্থম্?

নারায়ণ সান্যাল

ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন



প্রথম পরিচ্ছেদ

মিথুনাচারের উৎস সন্ধানে



মিশরসভ্যতা ও সংস্কৃতির গবেষণা-সড়কে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে স্ফিংস। চিররহস্যাবৃত এক অর্ধনরসিংহ। গিজার তিনটি বৃহৎ পিরামিডের সামনে। স্ফিংসের রহস্যজাল ভেদ করতে না পারলে মিশর-বিষয়ক গবেষণা চলবে না। অনুরূপ ঘটনা দেখতে পাই ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও। স্ফিংসপ্রতিম সমস্যাটি এক্ষেত্রে মন্দির ভাস্কর্যের মিথুনাচার।

স্ফিংস একটি বিশ্রামরত সিংহ (চিত্র 1.1)। শুধু মুখখানি নরের। বিশ্বশিল্প-ইতিহাসে এই নায়কের উপযুক্ত



চিত্র 1.1 মিশরীয় স্ফিংস, গিজা

নায়িকার সন্ধান পাওয়া গেল দুই সহস্রাব্দ পরে এবং এক সমুদ্রের ওপারে। গ্রিসের থিব্‌স্ নগরীর প্রবেশপথে।



চিত্র 1.2 শ্রীমতী স্ফিংস, থিব্‌স্

প্রতীক্ষারতা শ্রীমতী স্ফিংসকে। তিনি সিংহী, যদিচ তাঁর একজোড়া ডানা আছে; অথচ মুখ-বুক নারীর আদলে (চিত্র 1.2)। লোকগাথা বলে, শ্রীমতীর হেপাজতে নাকি ছিল এক 'ফুটানিকা-বটুয়া' ভর্তি ধাঁধা, যার সমাধান হয় না। থিব্‌স্ নগরীতে প্রবেশার্থী নরনারীকে তিনি ওই প্রশ্নগুলি দাখিল করতেন। তাঁর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে, সমস্যার সমাধান না করে, কেউ নগরে প্রবেশ করতে পারত না। সেই অনুত্তীর্ণ আগন্তুকদের মাংসেই ছিল শ্রীমতী স্ফিংসের উদরপূর্তির আয়োজন।

শোনা যায়, গ্রিক বীর অদিপাউস এই ছলনাময়ীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান দাখিল করে শ্রীমতীর শিরশ্ছেদ করেন। এরপর থিব্‌স্ প্রবেশার্থীর নগর-প্রবেশ ছিল অবাধ।

নায়ক ও নায়িকার মধ্যে কালের ব্যবধান এক্ষেত্রে দুই সহস্রাব্দের (2500–500 খ্রিঃ পূঃ), ভৌগোলিক দূরত্ব এক সমুদ্রের। তাছাড়া দুজনেই স্থাবর। ফলে, নায়ক আর নায়িকার মধ্যে আদৌ দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। হয়তো সেই কারণেই বিশ্বশিল্প থেকে 'স্ফিংস প্রজাতি' বিলুপ্ত হয়ে গেছে!

সে তুলনায় ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে নায়ক-নায়িকার প্রতি ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন। তারা মন্দিরগাত্রে আবির্ভূত হয়েছে একই কালে, একই মন্দিরে। আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী মন্দিরে উৎকীর্ণ ভারতের আদিমতম মিথুনটি আছে ভুবনেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায়। সপ্তম শতাব্দিতে নির্মিত এটি একটি যক্ষমিথুন (চিত্র 1.3)। পৌরাণিক কল্পনায় যক্ষের দেহাকৃতি নরের, শুধু তার মুণ্ডটি বলীবর্দের। অপরপক্ষে শ্রীমতী যক্ষী পুরোপুরি নারী, তবে তাঁর শ্রীমুখে আছে শ্বদন্ত, মাথার দু'পাশে দুটি 'ট্যাঁশগরু'-প্রতিম তিনবাঁকা পাকানো সিং আর গুরুনিতম্বে তাঁর নামানুষী পরিচয়—একটি গাভীসুলভ লাঙ্গুল। ভুবনেশ্বর সংগ্রহশালায় ওদের যদি খুঁজে পান তবে আপনার মনে হবে ওরা সুখী দম্পতি। ওদের সন্তানাদি নিশ্চয় হয়েছে। এন-এথ্‌তম নাতিপ্রনাতিরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ভারতের অন্যান্য মন্দিরে। আসমুদ্রহিমাচলে।

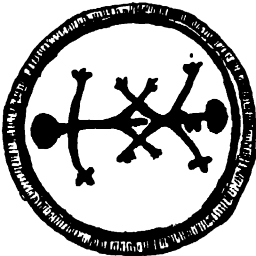
জীবসৃষ্টিব মৌল তত্ত্বটি– পুরুষ ও স্ত্রীজাতীযার গোপনতম ক্রিয়া-প্রকরণটি- -শিল্পে কীভাবে প্রতিফলিত হতে পাবে এই সমস্যাটি নিয়ে আদিমতম যুগ থেকে বিশ্বশিল্পী নানান চিন্তাভাবনা কবেছেন। মিশরীয় স্ফিংসের আবির্ভাবের পূর্বযুগে অথবা সমকালে ভারতে সিন্ধু নদ



চিত্র 1.3 আদিমতম যক্ষমিথুন, ভুবনেশ্বর সংগ্রহশালা

উপত্যকায় কিছু শিল্পী তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন—দুই বিপরীত লিঙ্গের যৌনাঙ্গের নানাবকম প্রতীক-চিহ্নের মাধ্যমে। জীবসৃষ্টির ধারাটিকে নিরবচ্ছিন্ন রাখার প্রয়োজনে নরনারীর যৌনাঙ্গের আবশ্যিকতাকে তাঁরা অস্বীকার করেননি। সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

ওই সব গুহ্য প্রতীক-চিহ্নের কথা বাদ দিলে বলা যায়, আদিমতম মিথুনমূর্তিটি পাওয়া গেছে আমেদাবাদের কাছে ধৈমাবাদে। প্রত্নতাত্ত্বিকদেব পরিভাষায় সময়টা 'কালকোলিথিক পিরিয়ড'-এর তৃতীয় স্তর। সাদা বাঙলায় : তাম্রপ্রস্তর যুগের (2000 খ্রিঃ পূঃ)। এটি একটি



চিত্র 1.4 আদিমতম মিথুনমূর্তি, ধৈমাবাদ (আমেদাবাদের কাছে)

গোলাকার ব্রোঞ্জের থালা। মাঝখানে সংগমরত এক দম্পতির রেখচিত্র। আর্ভিং ওয়ালেসের মতে এই ক্রীড়ার সময়ের ব্যাপ্তি নাকি সাত মিনিট : 'সেভেন মিনিট্‌স'। তাম্রপ্রস্তর যুগের এই দম্পতি ওয়ালেসের সেই মত নস্যাৎ করে ওই ব্রোঞ্জশয্যায় কয়েক সহস্রাব্দকাল আলিঙ্গনাবদ্ধ (চিত্র 1.4)।

ব্রোঞ্জ থালার একটি মাত্র সমতলে দুই স্তরে—ওপরে-নিচে—দুটি মূর্তি কীভাবে রূপায়িত করা সম্ভব সেটা সেই আদিমশিল্পী বুঝে উঠতে পারেননি। তাই মিলনরত মূর্তি দুটিকে গড়েছেন বিপরীতমুখী করে। কে পুরুষ, কে নারী বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু। গবেষক ড. দেবাঙ্গনা দেশাই এটির সম্বন্ধে বলছেন : "আলোচ্য উদাহরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে এটাই প্রতীয়মান যে, এটি কোনো শিল্পবস্তু বা 'সৌন্দর্য-বিকশনে'র জন্য নির্মিত হয়নি। পরন্তু এর মৌল আবেদন ধর্মীয় গুহ্য পূজাপদ্ধতির"।[1]

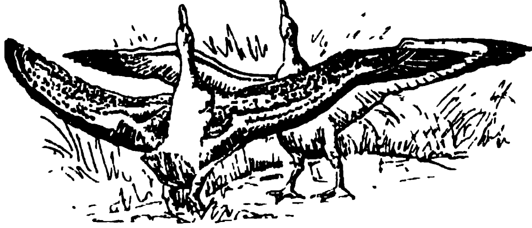
সম্ভবত শিল্পনিদর্শনটির অপরিপক্ক ব্যঞ্জনাতেই গবেষক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। আমরা তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারছি না। যতক্ষণ না ওই ব্রোঞ্জযুগের কোনো একটি 'সৌন্দর্য-বিকশনেব উদ্দেশ্যে সৃষ্ট শিল্পবস্তুর' নমুনা আমাদের হস্তগত হচ্ছে ততক্ষণ আমরা এটিকে একটি নান্দনিক শিল্পবস্তু হিসাবেই বা কেন গ্রহণ করতে পারব না? আমাদের বক্তব্যের সপক্ষে দাখিল করতে পারি কিছু প্রাচীন চিত্র, যা আবিষ্কৃত হয়েছে কুপাগুলু গুহায়—মহীশূর রাজ্যে। তার সময়কাল অবশ্য কিছু পরবর্তী যুগের। গবেষেক ডি. এইচ. গর্ডন-এর অভিমত এই গুহাচিত্রগুলি অন্তত 700 খ্রিঃ পূর্বাব্দের পরে আঁকা নয়।

এগুলি কোনো পূজাপদ্ধতির (cultic) অথবা ইন্দ্রজালমিশ্রিত ধর্মীয় (magico-religious) প্রেরণায় অঙ্কিত হয়নি। একটি প্রাচীরচিত্রে দেখছি, একজন মিলনতৃষিত যুবক একটি পলায়নপরা রমণীর পশ্চাদ্ধাবন করছে। ছবিটি দেখলেই মনে পড়ে যায় কীট্‌স্‌-এর সেই অনবদ্য উদ্ধৃতি :

Bold Lover, never, never canst thou kiss
Though winning near the goal—yet do not grieve
She cannot fade, though thou hast not thy bliss,
For ever wilt thou love, and she be fair!

মিথুনাচারের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করতে হলে শিল্প ও বিজ্ঞানের নানান শাখাপ্রশাখার বিষয়ে আমাদের সজাগ থাকতে হবে—নৃবিদ্যা, তুলনামূলক ধর্মবিশ্বাস,

সামাজিক ইতিহাস, এবং তার সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের নানান শাখাপ্রশাখা। আনুক্রমিক ধর্মীয় নির্দেশ এবং নন্দনতত্ত্বের বিকাশের মধ্যে যে আপাতবিরোধ তার মর্মোদ্ঘাটন



চিত্র 1.5 অ্যালব্যাট্রস-দম্পতির প্রাক-মিলন যৌথনৃত্য

শিল্পবিশারদদের সম্মুখে একটা চিরন্তন প্রশ্ন। সংক্ষেপে প্রশ্নটির মূল কথা :

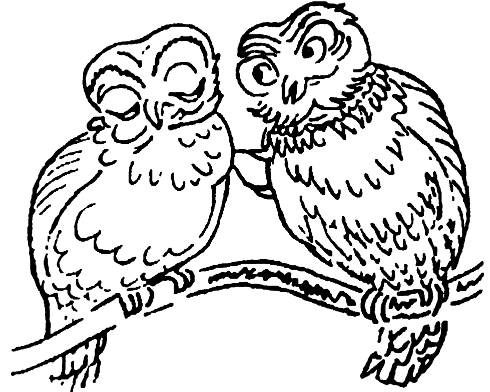
> আমাদের সংস্কৃতিতে এবং মহাজ্ঞানীদের উপদেশে আমরা দেখি যে, যৌনক্রিয়া আত্ম-উপলব্ধির পথে একটি অন্তরায়। সেক্ষেত্রে মন্দিরগাত্রে এই যৌনক্রীড়া কেন এমন নির্লজ্জভাবে বিচিত্রিত হল? মন্দির ভাস্কর্যে উপনিষদ এবং গীতার বাণীকে কেন এভাবে কলুষিত করা হলো? [2]

এই প্রশ্নটির সমাধান অন্বেষণ আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

মন্দির-ভাস্কর্যে মিথুনাচারের দুটি পর্যায়। প্রথমত, যৌনতা-বিজ্ঞাপক কিছু ইঙ্গিতময় গুহ্য উপাদান। দ্বিতীয়ত, 'মিথুন'—যা নাকি ভারতীয় ভাস্কর্যে এক অনবদ্য এবং অদ্বিতীয় উপাচার। এই শব্দটির—'মিথুন'-এর—অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। বাল্মীকির ক্রৌঞ্চমিথুন, কালিদাসের হংসমিথুন, উপনিষদের বাক-প্রাণ মিথুনের প্রসঙ্গ না হয় নাই তুললাম, তবু সাধারণভাবে মিথুন বলতে আমরা অনেককিছু বুঝি। পাশাপাশি দণ্ডায়মান নর ও নারী—যারা পরস্পরের গাত্রস্পর্শ করেনি—থেকে মৈথুনরত নায়ক-নায়িকা; কিংবা একদল পুরুষ ও নারী যারা যৌথভাবে নানান যৌনক্রীড়ায় রত। এই 'মিথুনাচার' ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে বিস্তৃত—কাল ও ভৌগোলিক বিচারে। কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ অঞ্চলে, দেশ-কালের বিশেষ গণ্ডিবদ্ধ অনুভাবনায়, এই মিথুনাচার অত্যন্ত প্রকটভাবে সোচ্চার।

আগেই বলা হয়েছে, 'মিথুন' শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আর তা থেকেই নানান বিভ্রান্তির সৃষ্টি। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দিতে শিল্পসমালোচকরা এর সপক্ষে ও বিপক্ষে নানাভাবে সোচ্চার। কিন্তু তাঁরা যে ঠিক কোন্ জাতের মিথুনমূর্তির বিষয়ে প্রশংসা অথবা নিন্দা করেছেন তা প্রণিধান করা দুষ্কর। উদাহরণস্বরূপ ড. মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্-এর একটি বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

> ভুবনেশ্বর প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালার কর্ণধার শ্রী এস. কে. দে-র মতে আদিমতম প্রণয়ী মিথুনমূর্তিটি (amorous couple) পাওয়া গেছে লক্ষ্ণৌ-এর একটি জৈনমন্দিরের স্তম্ভে। নিশ্চিতভাবে বলা যায় না এটি বুদ্ধগয়া, তক্ষশীলা, মথুরা অথবা কার্লের প্রণয়ী মিথুনমূর্তির (amorous couples) পূর্বসূরি কি না; কিন্তু এই সব স্থানের মিথুনমূর্তিগুলি প্রমাণ দেয় যে, ভারতীয় ভাস্কর্যের ঊষাযুগ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে



চিত্র 1.6 পেচক-মিথুন
['প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি খাসা তোর চ্যাঁচানি !']

> সঙ্গমরত মিথুনমূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে, যতদিন না ব্রিটিশ সরকার আইন করে এজাতীয় মিথুন গড়ার কাজ বন্ধ করে দেন।
>
> [It is not quite certain whether this anticipates the carving of *amorous couples* in Bodh-Gaya, Taxila, Mathura and Karla, but the extant remains are certainly part of a continuous tradition for the representation of *couples in sexual poses,* which began with the beginning of the sculpture in India and until the British put a legal ban on secular obscene art.] [3]

অনুবাদের ত্রুটিতে ভুল-বোঝাবুঝি যাতে না হয়, তাই

ড. আনন্দ্-এর মূল উদ্ধৃতিটা ইংরেজিতে দাখিল করা গেছে। ওই উদ্ধৃতির ভেতর বিশেষভাবে-চিহ্নিত (ইটালিক্সে) শব্দগুলির অর্থ আমাদের কাছে বোধগম্য হলো না। গবেষকেরা বারে বারে মিথুন মূর্তি বিষয়ে নানান ধরনের বিশেষণ আরোপ করেছেন : amorous, lewd, depraved, erotic and orgiastic [আমরা অনুবাদে এই পরিভাষা যথাক্রমে ব্যবহার করছি : প্রগল্‌ভ, কামোদ্দীপক, লাম্পট্যময়, রত্যাতুর এবং রতিরঙ্গোন্মত্ত] কিন্তু কোনো পূর্বাচার্যই ব্যবহৃত শব্দগুলির নির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ বিজ্ঞাপিত করেননি। কোন্ শব্দটি যৌনতা অথবা অশ্লীলতার কতখানি প্রকাশ করছে তার নির্দেশ নেই। ফলে স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে : লক্ষ্ণৌ সংগ্রহশালায় রক্ষিত সেই আদিমতম মিথুনটিতে যৌনতাপ্রকাশের মাপ কী ছিল?

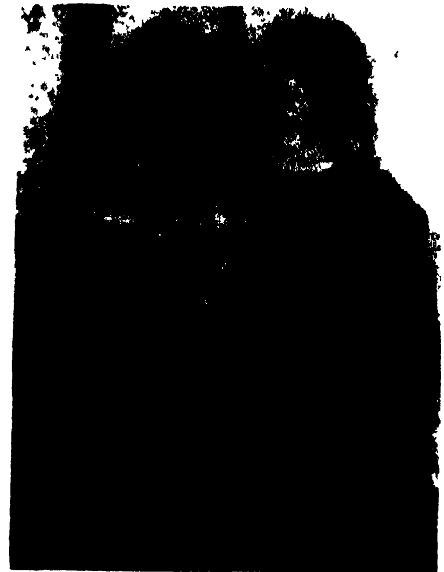


চিত্র 1.7 লক্ষ্ণৌ সংগ্রহশালায় রক্ষিত একটি প্রাচীন প্রণয়ী মিথুন

ড. আনন্দ্ তার কোনো আলোকচিত্র না দেওয়ায় প্রশ্নটা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। তবু পাঠক নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, প্রথম যুগ থেকেই—অর্থাৎ বুদ্ধগয়া, তক্ষশীলা, মথুরা প্রভৃতির যুগ থেকেই—মৈথুনরত মিথুন মূর্তি নির্মিত হতো, যতদিন না 'সদাশয়' ব্রিটিশ শাসকের দল আইন প্রণয়ন করে এই 'ধর্মসম্পর্কবর্জিত অশ্লীল শিল্প'র অবসান ঘটান।

কিন্তু ড. আনন্দ্-এর এই সিদ্ধান্তটি হিমালয়ান্তিক ভ্রান্তি। আদ্যন্ত ভুল! বাস্তবে ওই সব শিল্পনগরীতে—বুদ্ধগয়া, ভারহুত, সাঁচি, তক্ষশীলা, মথুরা বা কার্লে চৈত্যে—হাজার হাজার মিথুনমূর্তি পাওয়া গেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে একটিও, ব্যতিক্রম হিসাবেও, কামোদ্দীপক, লাম্পট্যময় অথবা সঙ্গমরত নয়। এবং বিদেশী শাসকেরা যৌনতা-প্রদর্শিত মূর্তি গড়ার বিরুদ্ধে যে আইন গড়েছিল, এই শত সহস্র শিল্পনিদর্শনের ভিতর একটি মাত্র ব্যতিক্রম-নমুনাও সে আইন লঙ্ঘন করেনি। বলাবাহুল্য, ডঃ আনন্দ্ নির্দেশিত লক্ষ্ণৌ সংগ্রহশালায় প্রাপ্ত মিথুনটিও কোনো ব্যতিক্রম নয়।

আমাদের প্রথম প্রশ্ন : 'যৌনতা-বিজ্ঞাপিত' মিথুন কাকে বলি? লক্ষ্ণৌ সংগ্রহশালার যে মিথুন মূর্তিটি নিয়ে ড. আনন্দ্ এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন তার একটি আলোকচিত্র সৌভাগ্যক্রমে আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। সেই আলোকচিত্রটি পাঠকের কৌতূহল নিরসনের জন্য এখানে মুদ্রিত করা হলো (চিত্র 1.7); আর একই সঙ্গে পাব্‌লো পিকাসোর আঁকা আর একটি জগদ্বিখ্যাত ছবি (চিত্র 1.8) আমরা পরিবেশন করেছি। দুটি শিল্পকর্মের মধ্যে কালের ব্যবধান দুই সহস্রাব্দের, ভৌগোলিক ব্যবধান কয়েক সহস্র কিলোমিটার। এবার

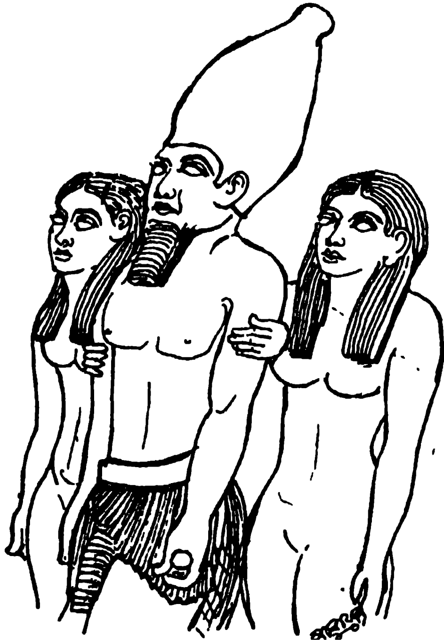


চিত্র 1.8 চেস্টারডেল সংগ্রহশালায় রক্ষিত পাব্‌লো পিকাসোর আঁকা : প্রণয়ীযুগল

আপনারা তুলনামুলক বিচার করে বলুন, কোন্ মিথুনে কতটা যৌনতা বিজ্ঞাপিত হয়েছে? দুটি শিল্পকর্মেই দেখছি, নায়ক এক হাত রেখেছে নায়িকার স্কন্ধে এবং অপর হাতে সে তাকে আকর্ষণ করছে। দুটি ক্ষেত্রেই মনে হচ্ছে ছেলেটি তার প্রেমাস্পদাকে নিজের দিকে টানছে এবং নায়িকা "নহি নহি বোলবি, মোড়য়িবি গীম!"

কিন্তু দর্শক অনুমান করে এই আপাত-প্রত্যাখ্যান শেষ কথা হতে পারে না! উভয়ক্ষেত্রেই সলজ্জা নায়িকা প্রেমবিহ্বলা। কম্পোজিশনের যেটুকু পার্থক্য নজরে পড়ছে তা হলো এই যে, ভারতীয় নায়ক তার নায়িকার নীবিবন্ধটি ধরেছে, অপরপক্ষে পিকাসো-অঙ্কিত নায়ক তার প্রেমাস্পদার বামকরমুষ্টি গ্রহণ করেছে।

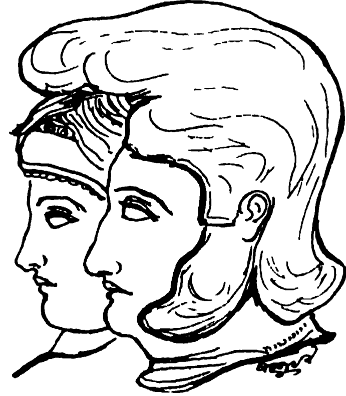
লক্ষ্ণৌ সংগ্রহশালার মিথুনমূর্তির আলোকচিত্রটি *রূপম* (এপ্রিল 1925) মাসিকপত্র থেকে সংগৃহীত। এটি ছিল রূপম সম্পাদক অর্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলীর একটি শিল্পরচনার *(ভারতশিল্পে মিথুন)* অনুষঙ্গ। সেই প্রবন্ধে ও. সি. গাঙ্গুলী তেত্রিশটি আর্ট প্লেটে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন এলাকার মিথুনের নমুনা মুদ্রিত করেছিলেন—বুদ্ধগয়া-ভারহুত যুগ থেকে মধ্যযুগ অতিক্রম করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত। তার



চিত্র 1.9 গিজা পিরামিডে মিশরের ফারাও এবং দুই রানি (আঃ 2500 খ্রিঃ পূঃ)

ভিতর একটিও 'মৈথুনরত মিথুন' ছিল না এবং তারা 'অশ্লীল' নয়। তারা কেউই ব্রিটিশ সরকারের সেই আইনের ধারাকে অতিক্রম করেনি।

আমরা মনে করি, পূর্বাচার্যরা,—যাঁরা এ বিষয়ে শিল্পসমালোচনা করে গেছেন—তাঁরা তাঁদের ব্যবহৃত শব্দগুলির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ নির্দেশ না করায় আমরা তাঁদের বক্তব্য ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারি না। ভিন্ন ভিন্ন



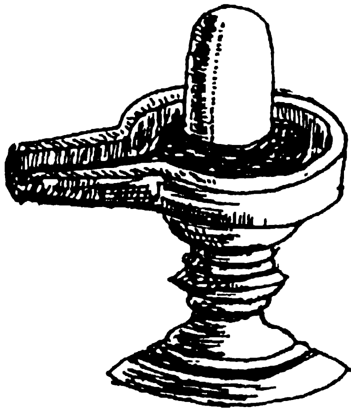
চিত্র 1.10 দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শাহ্ এবং তাঁর ধর্মপত্নী রোক্সানা (পারস্য রাজকন্যা)—অকীক-মণির ওপর খোদাই করা (Onyx cameo)—তৃতীয় খ্রিঃ পূঃ

সমালোচক হয়তো একই শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। পুরুষ ও নারীর সহাবস্থান—নেহাৎ 'জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম' নাহলে—নিশ্চয় 'মিথুন মূর্তি'; কিন্তু সেই জাতের যুগল মূর্তি তো দেশ-কালভেদে বিশ্বশিল্পে সর্বত্রই রসোত্তীর্ণরূপে বিরাজিত। চিত্র 1.9-এ দেখছি মিশরের ফারাও তাঁর দুয়ো ও সুয়ো রানির সঙ্গে মন্দিরপ্রাচীরে দণ্ডায়মান; আবার চিত্র 1.10-এ দেখছি দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার ও তাঁর রানি রোক্সানাকে (Roxane)। দুটি শিল্পকর্মের কালীক ব্যবধান দুই সহস্রাব্দের, কিন্তু দুই সম্রাটের উদ্দেশ্য একই : মহাকালের পটে শাশ্বতকাল সস্ত্রীক উপস্থিত থাকা।

ফলে মুলক্‌রাজ আনন্দ্-এর ওই অযৌক্তিক শিল্পসমালোচনাকে গ্রহণ করা যাচ্ছে না। আমরা কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নই যে, ভারতে ভারহুত-বুদ্ধগয়া যুগ থেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় মৈথুনরত মিথুনের মিছিল চলে এসেছে, যতদিন না 'সদাশয়' ব্রিটিশ শাসক আইন প্রণয়ন করে এই ধর্মসম্পর্ক-বিযুক্ত 'কদর্য' শিল্পপ্রচেষ্টার অবসান ঘটান।

ড. এ. এল. ব্যাশামের মূল্যায়নেও রয়েছে আমাদের ওই বক্তব্যের স্বীকৃতি। প্রাচীন ভারতের শিল্পকৃতি সম্বন্ধে, ভারতশিল্পীদের সম্বন্ধে, তিনি বলছেন :

> তাঁরা প্রণয় বিষয়ে নিরাববণ বর্ণনায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু বিধিনিষেধের সীমারেখা তাঁরা মেনে চলতেন। যৌনমিলনের ইঙ্গিতময় আলোচনা করা হতো, কিন্তু সঙ্গমকার্যের নিরাবরণ বর্ণনা তাঁরা দিতেন না। একেবারে শেষযুগে এই সংযম কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছিল, সন্দেহ নেই; কিন্তু প্রাচীন ভারতের শিল্পস্রষ্টারা সব সময়েই শেষ কথাটি অনুক্ত রেখে দিতেন।[4]

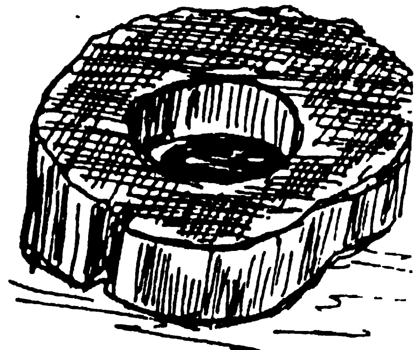


চিত্র 1.11A গৌরীপটবেষ্টিত শিবলিঙ্গ

স্বীকার্য, মন্দির-ভাস্কর্যের যে মূল্যায়ন এখানে করা হচ্ছে তা আমাদের ব্যক্তিবিশেষের বিচারের মাপকাঠিতে। ঠিক যেমনভাবে তা করেছেন ড. মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্। শিল্পবস্তুর অন্তর্নিহিত আবেদন সার্বিক—তবু ব্যক্তিবিশেষের একদেশদর্শিতায় তার অবমূল্যায়ন হওয়া সম্ভব। অথচ সাধারণ দর্শকের আনন্দলাভের মাপকাঠিতেই শিল্পবস্তুর সার্থকতা। এ সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে একাধিক দর্শকের মতামতের একটি 'গড়' নির্ণয় করা যেতে পারে। কিন্তু তার পূর্বে 'যৌনতা' এবং 'অশ্লীলতা'র মান নির্ণয়ের জন্য কিছু শব্দকে নির্দিষ্ট অর্থবহরূপে চিহ্নিত করাটা আবশ্যিক। সেভাবেই একাধিক দর্শকের মতামতের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব। সুতরাং আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে—'যৌনতা' (eroticism) এবং 'অশ্লীলতা' (obscenity) বিষয়ে বিভিন্ন মাপের বিভিন্ন স্তরের জন্য কিছু শব্দকে সুচিহ্নিত করা—যা হবে বিজ্ঞানের বা দর্শনের 'টারমিনোলজি'র মতো দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট অর্থবহ। তাহলে দর্শক কোনো একটি শব্দের ব্যবহারে ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন তা আমরা প্রণিধান করতে পারব।

'যৌনতা' এবং 'অশ্লীলতা' যে সমার্থক নয়, একথা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া ওই শব্দদ্বয় সর্বদা একে অপরের ওপর নির্ভরশীলও নয়। কোনো একটি শিল্পবস্তু নিরাবরণ যৌনতামণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তিলমাত্র অশ্লীল না হতে পারে। অপরপক্ষে, অন্য একটি শিল্পনিদর্শন অশ্লীলতা-দোষে দর্শকের মনে কামভাবের পরিবর্তে বিবমিষা জাগাতে পারে। ইংরেজি erotic (কামোদ্দীপক) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে Eros (কামদেব) শব্দ থেকে। Eros ছিলেন গ্রীক পুরাণে ও লোকগাথায় কামের দেবতা-—আমাদের যেমন মদন বা কামদেব। এই দেবতার কাজ নরনারীর মনে প্রেম, কাম, সঙ্গমেচ্ছার উদ্রেক করা। জীবসৃষ্টিতে এঁর অবদান অনস্বীকার্য। কামদেবের অবর্তমানে জীবজগতের অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। জীবজগতের স্বার্থেই মহাদেব ভস্মীভূত মদনকে পুনরুজ্জীবিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অপরপক্ষে 'অশ্লীলতা' সচরাচর যৌনকর্মকে যে ভাবে, ভাষায়, বা রেখায় তুলে ধরে তা দেশকালের নির্দিষ্ট শালীনতার নীতিনির্ভর। প্রতিটি সুসভ্য দেশে, বিভিন্ন যুগে, শ্লীলতা ও অশ্লীলতার সীমা নির্দিষ্ট করা থাকে। এটা সমকালীন দর্শক, শ্রোতা বা গ্রহীতার বোধের নিরিখে সুচিহ্নিত। ফলে মন্দিরে মিথুন-ভাস্কর্যগুলির মূল্যায়নে আমাদের দুই-দুই বার বিচার করতে হবে। যৌনতার বিচার করবেন দর্শক তাঁর ব্যক্তিগত মূল্যায়নে; অপরপক্ষে অশ্লীলতার বিচার করতে হবে দেশকালের সর্বসম্মত ধ্যানধারণার নিরিখে।



চিত্র 1.11B অঙ্গুরীয়সদৃশ্য স্ত্রীলিঙ্গ—হরপ্পা

এখানে আমরা তাই প্রথমেই কতকগুলি প্রচলিত বিশেষণ পদের নির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ আরোপ করতে চাই সেগুলিকে 'যৌনতা-বিজ্ঞানের' 'টারমিনোলজি'রূপে সুনির্দিষ্ট করতে :

(ক) **একক অলঙ্করণ (Single motifs)**

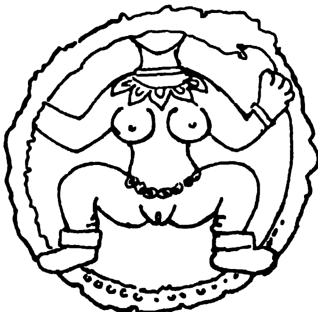
I. প্রতীকী (Symbolics) : এদের মূল সচরাচর ধর্মীয় রহস্যময় গুহ্যাচারে (esoteric cults) নিহিত, যেমন গৌরীপট্টবিধৃত শিবলিঙ্গ (চিত্র : 1.11A) অথবা হরপ্পা সভ্যতায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির অঙ্গুরীয়সদৃশ স্ত্রীলিঙ্গ-প্রতীকী (চিত্র : 1.11B)। তান্ত্রিকদের ব্যবহৃত 'ক্যাপিটাল গ্রীক ডেল্‌টা' (∇) সদৃশ শিল্পচিহ্নগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত।

II. গুহ্য সাঙ্কেতিক নিদর্শন (Cryptics) : এইসব শিল্প-নিদর্শনের মূলে আছে ঐন্দ্রজালিক-ধর্মীয় সূত্র (magico-religious sources)। উর্বরতা বিষয়ে ধর্মীয় আচার থেকে এদের উৎপত্তি। উদাহরণস্বরূপ নির্দেশ করা যেতে পারে 'ধনদেবী' (Opulent goddess), 'কবন্ধ বিবসনা দেবী' (Headless nude goddess) অথবা 'মূর্তিময়ী যোনি' (Personified Yoni)। ঐন্দ্রজালিক ধর্মীয় গূঢ়াচার থেকে জন্ম নিলেও এগুলি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। একজাতের মূর্তি ক্রমে যৌনবিকৃতির প্রতীকে পরিণত হয়েছে, বিকৃতকামী যৌনাচারীদের প্রভাবে। অপরদল সুন্দরের পূজারী শিল্পীদলের প্রয়াসে নান্দনিক সার্থকতা লাভ করেছে।

(খ) **মিথুন (পুরুষ ও স্ত্রীর সহাবস্থান)**

I. প্রথম শ্রেণি : যুগলমূর্তি (Chaste Couples) : পুরুষ ও স্ত্রীমূর্তি—পাশাপাশি বসে অথবা দাঁড়িয়ে, যেখানে একে অপরের দেহ ঘনিষ্ঠভাবে স্পর্শ করেনি।

II. দ্বিতীয় শ্রেণি : উত্তেজিত মিথুন (Amorous Couples) : আলিঙ্গনাবদ্ধ, চুম্বনোদ্যত, চুম্বনরত অথবা শৃঙ্গারের পরবর্তী পর্যায়গুলিতে প্রবেশেচ্ছু মিথুন, যাদের মূল যৌনাঙ্গ অপ্রকট।



চিত্র 1.12 কবন্ধ-বিবসনা মাতৃমূর্তি- -প্রাগৈতিহাসিক



চিত্র 1.13 প্রদর্শনবাদিতা
[খাজুরাহো দশম-একাদশ শতাব্দী]

III. তৃতীয় শ্রেণি : শৃঙ্গাররত মিথুন (Orgiastic Couples) : শৃঙ্গারের পরবর্তী পর্যায়ে প্রবিষ্ট নরনারী, যখন তাদের নিম্নযৌনাঙ্গ আংশিকভাবে অথবা ইঙ্গিত-ময়রূপে পরিদৃশ্যমান, কিন্তু নায়ক সেই পর্যায়ে উপনীত হয়নি, যে-পর্যায়ে এলে বলাৎকারে অভিযুক্ত আসামীকে ভারতীয় আইনে দোষীরূপে চিহ্নিত করা হয়—'Penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse necessary to the offence of rape.' (INDIAN PENAL CODE, Section 375)।

IV. চতুর্থ শ্রেণি : সমকামী (Invert Couples) : বিপরীত লিঙ্গের প্রতি অনীহাগ্রস্ত সমকামী (Homo-sexual) পুরুষ অথবা 'সমকামিনী' (Lesbian) নারী।

V. পঞ্চম শ্রেণি : আত্মকামী (Auto-Eroticism) : সাধারণত একক মূর্তি—পুরুষ অথবা নারীর, যেখানে তার আত্মরতিমূলক আচরণ বিকশিত—পুরুষ অথবা স্ত্রীর হস্তমৈথুন, প্রদর্শনবাদিতা (exhibitionism) কিংবা দর্শনকামিতা (voyeurism) প্রভৃতি।

VI. ষষ্ঠ শ্রেণি : মৈথুনরত মিথুন (Couples-in-Coitus) : উপবিষ্ট, দণ্ডায়মান অথবা শায়িত অবস্থায় স্বাভাবিক অথবা বিপরীত বিহার—'বুঝ লোক যে জান সন্ধান'।

VII. সপ্তম শ্রেণি:সঙ্গমানুষঙ্গ (Complementary to Coitus) : উভয়বিধ মুখরতি (fellatio and cunnilingus) এবং 'কাকালি' বা যুগপৎ মুখমেহন।

VIII. অষ্টম শ্রেণি : অশাস্ত্রীয় বা অবাস্তব মিথুন (Abnormals) : পশুমৈথুন, বহুগামী পুরুষ (polygamous males) অথবা বহুগামিনী নারী *(polyandrous females) কিংবা একদল কামোন্মাদ নরনারীর যৌথ যৌনক্রীড়ার নির্লজ্জ শিল্পকার্য।*

* * *



চিত্র 1.14 শৃঙ্গাররত মিথুন, লিঙ্গরাজ/কলিঙ্গ
[শিল্পী : ইন্দ্র দুগার]

আমাদের প্রত্যাশা, মন্দিরের প্রতিটি মিথুন-ভাস্কর্যকে দর্শক এই আটটি শ্রেণির মধ্যে সুচিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন। হয়তো কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রেণিভুক্ত করার কাজে দর্শকেরা দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। বলাৎকারে অভিযুক্ত আসামীর ক্ষেত্রে কামাচরণের সামান্যতম হেরফের তার ভাগ্যে প্রচণ্ড রকম প্রভাব ফেলতে পারে; এক্ষেত্রে তেমন হবার আশঙ্কা নেই। এখানে মনে রাখতে হবে, কোনো একটি বিশেষ মিথুন মূর্তিকে আমরা কোন্ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করব, তা শুধু তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রূপায়ণের ওপরেই নির্ভর করবে না, করবে শিল্পীর পরিবেশিত নান্দনিক তত্ত্বের বিচারে, তাঁর পরিবেশিত রসে এবং নায়ক-নায়িকার ভাবব্যঞ্জনায়।

বক্তব্যটা একটা উদাহরণের মাধ্যমে সহজ ব্যাখ্যা দিতে হলে আমরা বলব, *পিকাসোর নায়ক তার প্রেমাস্পদের করমুষ্টি ধরেছে অনেক আলতো করে,* যদি আমরা তাদের তুলনা করি মস্কৌ-পার্কের সেই বৃহত্তম কৃষকদম্পতির আচরণের সঙ্গে। হাতুড়ি ও কাস্তে ধৃত দুটি বাহু শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে তারা পরস্পরের হাত অনেক জোরের সঙ্গে, অনেক বেশি আন্তর-আবেগে জড়িয়ে ধরেছে; কিন্তু সেই দৈহিক বলপ্রয়োগের অজুহাত দেখিয়ে সিদ্ধান্তে আসা যাবে না যে, মস্কৌ উদ্যানের সেই পাশাপাশি-পা-ফেলে এগিয়ে চলা স্টেনলেস্ স্টিলের অতিবিশাল দম্পতির রতিরঙ্গরস পিকাসোর মিথুনের অপেক্ষা বেশি। পিকাসোর যুগলমূর্তি প্রেমিক, মস্কৌর চাষীদম্পতি শুধু মুক্তির আনন্দে বিভোর।

* * *

ভারতীয় মন্দিরগুলির ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক শ্রেণিবিচার

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের গভীরে প্রবেশের পূর্বে ভারতে অবস্থিত মন্দিরগুলির—বিশেষ করে যেখানে মিথুনাচার প্রকট—একটা সার্বিক আলোচনা করা প্রয়োজন। কীভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, কোন্ সময়ে, কোন্ রাজানুকূল্যে, কী জাতের মিথুন ভাস্কর্য খোদাই করা হয়েছে তার একটা বিবর্তন-তালিকা আমাদের সর্বপ্রথমে দাখিল করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, ভৌগোলিক বিচারে আমরা বৃহত্তর ভারতবর্ষ—অর্থাৎ প্রাক-দেশবিভাগের সামগ্রিক ভারতবর্ষের কথা এখানে আলোচনা করছি। কারণ যুগযুগান্ত ধরে এই মহান উপদ্বীপ সমান্তরাল ভাবনায় আন্দোলিত হয়েছে।

তালিকায় কোথায় কোন্ শ্রেণির মিথুনমূর্তি দেখা যায় তা এখানে বন্ধনীচিহ্নের ভেতর I, II, III... প্রভৃতি সাঙ্কেতিক ভাবে বলা হয়েছে :

আঃ 3000-2000 খ্রিঃ পূঃ—সিন্ধুসভ্যতা : মহেন-জো-দরো ও হরপ্পা :
গৌরীপট্ট বিধৃত শিবলিঙ্গ, অঙ্গুরীয়প্রতিম মাতৃদেবীর প্রতীক এবং পোড়ামাটির নিরাবরণ ছোট একক মূর্তি।

আঃ 2000-500 খ্রিঃ পূঃ—উত্তরভারতের আর্য-উপনিবেশ :
বৈদিক সভ্যতা ও উপনিষদের যুগ।

আঃ 500-320 খ্রিঃ পূঃ—থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের উত্থান, বৌদ্ধ ও জৈনশিল্পের আদিযুগ।
325 খ্রিঃ পূঃ—আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ।



চিত্র 1.15 সাঁচিবৃক্ষিকা / খ্রিঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী /

আঃ 321-269 খ্রিঃ পূঃ—মৌর্য যুগ :
অশোক (আঃ 269-237 খ্রিঃ পূঃ) মৌর্যসম্রাট। ধৌলি হস্তিমূর্তি, অশোক স্তম্ভ, আদিম স্তূপ, কর্ণকৌপর ও লোমশ ঋষি পর্বতগুহা।

আঃ 185-72 খ্রিঃ পূঃ—সুঙ্গ যুগ :
সাঁচি স্তূপ (I), ভারহুত রেলিং (I), বুদ্ধগয়া মন্দির প্রাচীর (I)।

আঃ 72-25 খ্রিঃ পূঃ—সুঙ্গ যুগাবসান :
কাহ্নযুগের অভ্যুত্থান : ভারহুত (I), বুদ্ধগয়া (I), যজ্ঞয়্যপেত (I), কন্ডেন গুহা (I), কার্লে (I), অজন্তা গুহা নবম ও দশম চৈত্য (I), উদয়গিরি (I), খণ্ডগিরি (I)।

আঃ 25 খ্রিঃ পূঃ—তৃতীয় শতাব্দি :
অন্ধ্র রাজবংশের উত্থান : অমরাবতী (I/II) নাগার্জুনকোণ্ডা (I/II)।

প্রথম খ্রিঃ পূঃ—শক্ অভ্যুত্থান :
(স্কিথিয়ান) : গান্ধার (I/II), তক্ষশিলা (I/II)।

প্রথম খ্রিস্টাব্দ—কুশান অভ্যুত্থান (য়ু-চি) :
মথুরা (I/II)।

আঃ 420-630 খ্রিস্টাব্দ—গুপ্তযুগ এবং তাদের বংশাবতংস :
পাটলিপুত্র (I/II), রাজগৃহ (I/II), সারনাথ মৃগদাব (I/II), উত্তরাপথ থেকে উপর্যুপরি হূন অভিযান।

আঃ 550-750 খ্রিঃ—কৃষ্ণানদীর অববাহিকায় চালুক্য রাজ্য :
বাতাপী (I/II), আইহোল (I-III), পাট্টাদকল (I-III), অজন্তা গুহা 15, 16, 1, 2, (I/II), ইলোরা (I-III)।

আঃ 600-850 খ্রিঃ—মাদ্রাজ (চেন্নাই) অঞ্চলে পল্লববংশের কাল :
মহাবলীপুরম (I/II)।

আঃ 625-825 খ্রিঃ—কলিঙ্গে ভৌমকর অভ্যুত্থান :
পরশুরামেশ্বর (I-III), বৈতাল (I-III)।

আঃ 790-975 খ্রিঃ—পশ্চিম উপকূলে রাষ্ট্রকূট বংশের অভ্যুত্থান :
ইলোরা (I-IV), এলিফেন্টা (I/II)।

আঃ 729-1250 খ্রিঃ—পূর্বভারতে পাল ও সেন বংশ :
গৌড় (I/II), নালন্দা (I-III), পাহাড়পুর (I/II)।

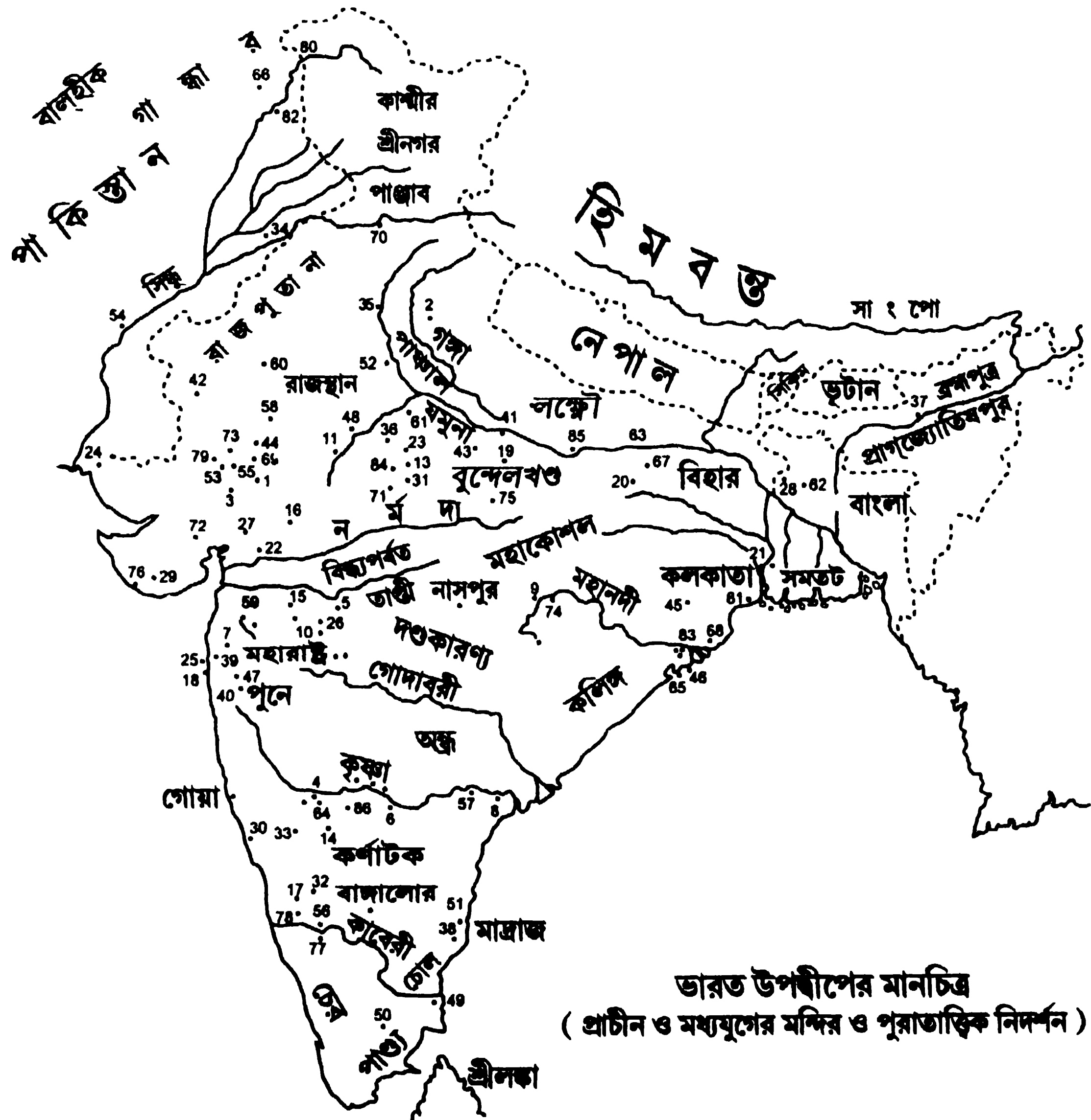


চিত্র 1.16 পঞ্চিক (মহাযান দেবতা), গান্ধার শিল্প / দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দ /

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মিথুনাচারী মন্দিরের অবস্থান

[নামগুলি ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমে সজ্জিত। পাশে বাঙলা হরফে তাদের নামোল্লেখ করা হয়েছে। চিত্র 1.17-এ দ্রষ্টব্য স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত]

1. Abu—আবু
2. Ahichhatra—অহিচ্ছত্র
3. Ahmedabad—আমেদাবাদ
4. Aihole—আইহোল
5. Ajanta—অজন্তা
6. Alampur—আলামপুর
7. Ambernath—অম্বরনাথ
8. Amravati—অমরাবতী
9. Arang—আরঙ
10. Aurangabad—ঔরঙ্গাবাদ
11. Awra—আউরা
12. Badami—বাতাপী
13. Bado—বাদো
14. Bagali—বাগালী
15. Balasan—বালাসন
16. Bavka—বাভ্‌কা
17. Belur—বেলুর (দ্বারসমুদ্র)
18. Bhaja—ভাজা
19. Bharhut—ভারহুত
20. Bodhgaya—বুদ্ধগয়া
21. Chandraketugarh—চন্দ্রকেতুগড়
22. Dabhoi—দাভোই
23. Deogarh—দেওগড়
24. Dwarka—দ্বারকা
25. Elephanta—এলিফান্টা
26. Ellora—ইলোরা (ইল্লাপুরম্)
27. Galteswar—গলতেশ্বর
28. Gaud—গৌড়
29. Girnar—গিরনার (গিরিনগর)
30. Gokarna—গোকর্ণ
31. Gyraspura—গ্যারাসপুরম্
32. Halebid—হালেবিদ
33. Hangal—হাঙ্গল
34. Harappa—হরপ্পা
35. Indraprastha [illegible]
36. Kadava—কদভা
37. Kamaksya—কামাক্ষ্যা
38. Kanchi—কাঞ্চীপুরম্
39. Kanheri—কাহ্নেরী
40. Karla—কার্লা (কার্লে)
41. Kousambi—কৌশাম্বী
42. Kiradu—কীরাদু
43. Khajuraho—খাজুরাহো (খর্জুরবাহ)
44. Khed Brahma—খেদব্রহ্মা
45. Khiching—খিচিঙ
46. Konarak—কোনার্ক
47. Kondane—কন্ডেন
48. Kota—কোটা
49. Kumbhokonam—কুম্ভকোনম্
50. Madurai—মাদুরা
51. Mamallapuram—মহাবলীপুরম্
52. Mathura—মথুরা
53. Modhera—মোদেরা
54. Mohenjodaro—মহেঞ্জোদারো
55. Motap—মোহ্‌তাপ
56. Mysore—মহীশূর
57. Nagarjunakunda—নাগার্জুনকোন্ডা
58. Nagda—নাগদা
59. Nasik—নাসিক
60. Osia—ওসিয়া
61. Padalvi—পাদলভলী
62. Paharpur—পাহাড়পুরম্
63. Patna—পাটলীপুত্রম্
64. Pattadakal—পাট্টাদকল
65. Puri—পুরী
66. Purushpur—পুরুষপুর
67. Rajgir—রাজগৃহ
68. Ratnagiri—রত্নগিরি
69. Roda—রোডা
70. Rupar—রূপার
71. Sanchi—সাঁচি
72. Sejakpur—সেজাকপুরম্
73. Siddhapur—সিদ্ধপুরম্
74. Sirpur—শিরপুরম্
75. Sohagpur—সোহাগপুরম্
76. Somnath—সোমনাথ
77. Somnathpuram—সোমনাথপুরম্
78. Sravanbelgola—শ্রবণবেলগোলা
79. Sunak—শূণক
80. Swat—স্বাত
81. Tamluk—তাম্রলিপ্তি
82. Taxila—তক্ষশীলা
83. Udaigiri—উদয়গিরি
84. Udaipur—উদয়পুরম্
85. Varanasi—বারাণসী
86. Vijayanagar—বিজয়নগর



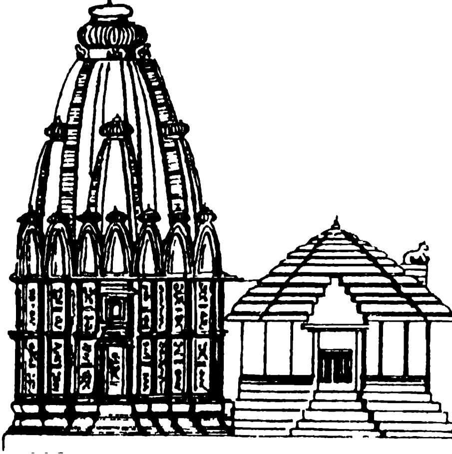
চিত্র 1.17 প্রাচীন বৃহত্তর ভারতবর্ষের মানচিত্র
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মিথুনাচারী মন্দিরের অবস্থানসূচক

আঃ 850-1150 খ্রিঃ—দক্ষিণতম ভারতে চোল বংশ :
তাঞ্জোর (I/II)।

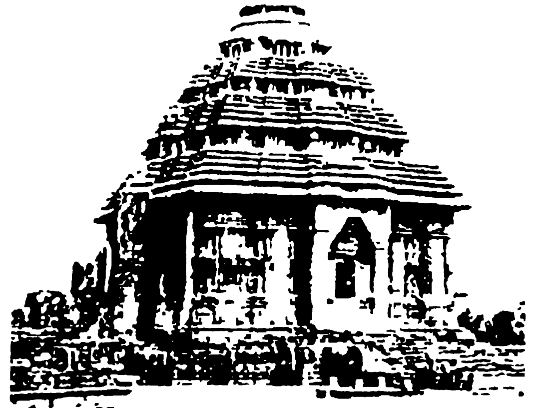
আঃ 950-1050 খ্রিঃ—কলিঙ্গে সোমবংশী (কেশরী) রাজবংশ :
মুক্তেশ্বর (I-II), রাজারানী (I-IV), ব্রহ্মেশ্বর (I-IV), লিঙ্গরাজ (I-III)।

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী—বিভিন্ন দাতার দানে বিচ্ছিন্ন সমকালীন দেউল :
গলতেশ্বর (আমেদাবাদের কাছে, I-VIII), ভাব্‌কা (আমেদাবাদের কাছে), (I-IV), বাগালী (বিজয়নগরের কাছে, I-VI)।

ত্রয়োদশ শতাব্দী—বিভিন্ন দাতার দানে নির্মিত :
দারব (নর্মদা মোহনায়, I-V), সোমনাথপুর (সৌরাষ্ট্রর বন্দর) (I-IV)।



চিত্র 1.18 রাজারানী মন্দির (কলিঙ্গ)
/ আঃ একাদশ শতাব্দী /



চিত্র 1.19 কোনার্ক (কলিঙ্গ)
/ ত্রয়োদশ শতাব্দী /

আঃ 950-1100 খ্রিঃ—খাজুরাহোতে চাণ্ডিল্য বংশের কাল :
হনুমান (I), লক্ষ্মণ (I-VI), বিশ্বনাথ (I-VIII), জগদম্বা (I-VIII), কাণ্ডারীয় মহাদেব (I-VIII), বামন (I/II), আদিনাথ (I/II), দুলাদেও (I/II)।

আঃ 1100-1300 খ্রিঃ—কাবেরী উপত্যকায় হয়শোল বংশ :
হালেবিদ (I-VI), বেলুড় (I-VI)।

খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দী—বিভিন্ন আঞ্চলিক ভূম্যধিকারীর অর্থানুকূল্যে :
অম্বরনাথ (মুম্বাই সন্নিকটে, I-VII), মোতাপ (আমেদাবাদ সন্নিকটে) (I-VIII), মোদেরা (আমেদাবাদের নিকট, I-VII),।

আঃ 1100-1350 খ্রিঃ—কলিঙ্গে গঙ্গ বংশ :
অনন্ত বাসুদেব (I-V), কোনার্ক (I-VIII), পুরী (I-VII)।

আঃ 1350-1565 খ্রিঃ—বিজয়নগরে রায়-বংশ
হাম্পি (বিজয়নগর, I-II)।

* * *

ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে মিথুনাচারের সামগ্রিক রূপরেখা

চিত্র 1.17-এর মানচিত্র ও প্রকাশিত তালিকাটির প্রাথমিক বিচারে এটা স্বতই প্রতীয়মান যে, দু-একটি ব্যতিক্রমকে স্বীকার করে নিলে মন্দিরগাত্রে মিথুনাচারের বিবর্তন একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতাকে মেনে চলেছে। কবি, দার্শনিক, নন্দনতত্ত্ব ও যৌনবিশেষজ্ঞের নির্দেশমতো দেশ-কালভেদে মন্দির-উৎকীর্ণ প্রেমক্রীড়া স্বতই একটি ক্রমান্বয়িক পর্যায়ের অনুসারী।

এ তথ্য ও তত্ত্বটির বিষয়ে প্রাচীন ভারতের ঋষিরাও সম্যক অবগত ছিলেন। *কামসূত্র*-প্রণেতা মহাপণ্ডিত বাৎস্যায়ন-মুনি তাই নববিবাহিতকে নির্দেশ দিচ্ছেন :

বিবাহের পর প্রথম তিনরাত্রি স্বামী-স্ত্রী ভূশয্যায় শয়ন করবে এবং মৈথুনকার্যের দিকে অগ্রসর হবে না...পরবর্তী সপ্তদিবস তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো ব্যবহার করবে—একত্রে আহার, ভ্রমণ, সঙ্গীতরস উপভোগ এবং ভাইবোনদের সঙ্গে গল্পগুজব। ওই সপ্তাহে তারা যৌথভাবে বয়স্ক আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে গিয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করবে। দশমরাত্রে স্বামী তার স্ত্রীকে একান্তে সম্ভাষণ করবে, তাকে বাল্যকৈশোরের স্মৃতিচারণে উদ্বুদ্ধ করবে।...

বাৎস্যায়নের অনুশাসন : জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে প্রথমে সখ্যভাব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। স্বামীর ওপর যতক্ষণ নবপরিণীতা বধূ সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে না পারছে, তাকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলে স্বীকার করে না নিতে পারছে, ততক্ষণ স্বামী সঙ্গমেচ্ছার কোনোরকম উদ্যোগ নেবে না। হেতুটি সহজবোধ্য : যৌনতা বিষয়ে অনভিজ্ঞা যদি প্রায়-অচেনা একটি পুরুষের পরুষ হস্তক্ষেপের শিকার হয়, তাহলে সে সারাজীবনের জন্য দৈহিক মিলনের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করবে; অথবা হয়তো স্বামী ব্যতিরেকে অন্য কোনও পুরুষ—যে, সহানুভূতির সঙ্গে তার নারীত্বকে মর্যাদা দিতে চাইছে—তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে।[১]

দুই হাজার বছর অতীতে যৌনাচার বিষয়ে ভারতীয় ঋষির এই নির্দেশপাঠে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়। আধুনিকতম যৌনবিজ্ঞানসম্মত নির্দেশ (দ্রষ্টব্য : Desmond Moris)!

অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে মিথুনাচারের ক্রমবিবর্তন বাৎস্যায়ন ঋষির উপরিউক্ত নির্দেশ যেন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছে!

অপ্রগলভ নরনারী যুগলমূর্তিরূপে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল ভারহুত, বুদ্ধগয়া এবং সাঁচিতে। দু-হাজার বছর আগে। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে অব্যতিক্রমে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে—কেউ কারও অঙ্গস্পর্শ করেনি, এমনকি পিকাসোর যুগলমূর্তির মতো হাতে হাতও রাখেনি। তারা স্বতই অপ্রগলভ, শান্ত ও সলজ্জ। তারপর যেন তারা মধুচন্দ্রিমায় বেরিয়ে পড়ল দূরদেশে,—ভাজা, কন্হেন, কার্লে, কাহ্নেরি, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি ভ্রমণে। গেল অজন্তার নবম ও দশম চৈত্য দেখতে। কিন্তু তখনো তারা অপ্রমত্ত। ধীরস্থির। কালীকক্রমে তারপর দেখছি : তারা পরস্পরের কাছাকাছি ঘনিযে এসেছে, হাত ধরাধরি করেছে, পিঠে হাত রেখেছে কয়েক শতাব্দি পরে—মথুরা, তক্ষশীলা, অমরাবতী, রাজগৃহ, সারনাথ অথবা নাগার্জুনকোণ্ডায়। তারা তখনো যেন শুধু একত্রে গল্পগুজব করছে, গান শুনছে, পরস্পরের বাল্যকৈশোরের কাহিনি আহরণ করছে! আরও কয়েক শতাব্দী পরে তাদের কিছুটা প্রগল্‌ভতা নজরে পড়তে শুরু করল। কিছুটা সঙ্কোচ যেন



চিত্র 1 20 আলতোমিরা গুহাচিত্র
(10,000 খ্রিঃ পূঃ)
"ভবিষ্যৎ-কাল কি তোমার এ ছবির
মর্ম বুঝতে পারবে?"
[শিল্পী : শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী]

মেয়েটি জয় করেছে। তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল ষষ্ঠ শতাব্দীতে : চালুক্যরাজাদের নির্মিত বাতাপী ও আইহোলে।

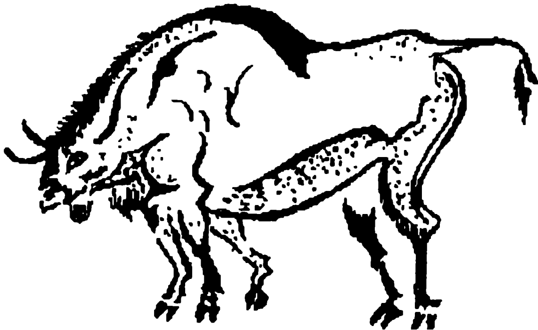
লক্ষ্য করে দেখছি, ষষ্ঠ শ্রেণির মৈথুনরত মিথুনকে প্রথম দেখা গেল পাট্টাদকলে—ভারহুত বা বুদ্ধগয়ায় যদি তাদের বিবাহ হয়ে থাকে তবে প্রায় এক হাজার বছর পরে।

তার পরের কয়েকটি শতাব্দীতে—কী আশ্চর্যের কথা—পাট্টাদকলের সেই মৈথুনরত মিথুনের দ্বিতীয় উদাহরণ আমরা খুঁজে পাই না গোটা ভারতবর্ষে—কলিঙ্গ ও খাজুরাহোর মন্দিরগুলিকে যদি ব্যতিক্রম হিসাবে ধরা হয়।

আমাদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাই শিল্পবিশারদ ডি. এইচ. গর্ডনের গবেষণায় :

> মৈথুনরত নরনারীর ভাস্কর্য প্রথম কয়েক শতাব্দিতে শুধু সুদুর্লভ নয়; বাস্তবে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত—গুহাপ্রাচীরের ম্যুরালে এবং অর্ধোৎকীর্ণ ভাস্কর্য সম্বন্ধেও সেই এক কথা।[6]

অন্যান্য শ্রেণির মিথুন—আত্মকামী, সঙ্গমানুষঙ্গ, অবাস্তব বা অশাস্ত্রীয় মিথুন—সারা ভারতবর্ষে কোথাও উৎকীর্ণ করা হয়নি—প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে। এগুলি শিল্পোদ্যোগীরা প্রথম গড়ে তুললেন খাজুরাহোতে। এবং কলিঙ্গে—দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। তার পূর্বেও কাবেরী উপত্যকায় অথবা আহ্‌মেদাবাদের কাছে-পিঠে দু-একটি



চিত্র 1.21 আলতামিরার গুহাচিত্রে বাইসন
[স্পেন/প্যালিওলিথিক যুগ]
[লক্ষণীয় বাইসনটির পাঁচটি পদ। গতির ব্যঞ্জনা দিতে এমন পরিকল্পনা প্রাগৈতিহাসিক যুগে নিতান্ত অকল্পনীয়।]

বিচ্ছিন্ন উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবত স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের বিকৃত কামেচ্ছার প্রতিফলনে।

তা সত্ত্বেও একথা মানতে হবে যে, মিথুনাচারের শেষ তিন-চার শ্রেণির প্রগাঢ় প্রগল্‌ভতামণ্ডিত নির্লজ্জ মিথুন মূর্তিগুলি—সমকামী, আত্মরতিকামী, সঙ্গমানুষঙ্গ, অশাস্ত্রীয় বা অবাস্তব মিথুন মূর্তিগুলি—শেষ-মধ্যযুগে ব্যাপকভাবে নির্মিত হয়েছিল—ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, দুই-তিন শতাব্দী ধরে—যেভাবে পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে আমরা দেখতে অভ্যস্ত নই। একই সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, একেবারে প্রথম যুগ থেকেই কিছু বিচিত্র উদাহরণ—'ধনদেবী', 'কবন্ধ বিবসনা' অথবা 'মূর্তিময়ী যোনি'-র মূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে—বিভিন্ন ধর্মাচরণের প্রভাবে। সে কথায় পরে আসব।

* * *

আপাতত বলি, এই তথাকথিত অশ্লীল মূর্তিগুলি গড়ার অপরাধে ভারতীয় ভাস্করকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আগে আমাদের দেখা উচিত—বিশ্বের অন্যান্য আদিম সভ্যতায় শিল্পীরা নন্দনতত্ত্বের প্রাগুষাযুগ থেকে এ বিষয়ে কী ভেবেছেন। প্রজননের প্রক্রিয়াটি প্রাক্-মানবসভ্যতার যুগ থেকেই জানা ছিল। তারপর যখন যাযাবর মানুষ মৃগয়া এবং ফলাহরণকে ত্যাগ করে কৃষিকার্য শিখল, গৃহপালিত পশুর সাহায্য নিতে শিখল, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে তার উত্তরণ হলো পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়, তখনই নরনারী তার নিম্ন যৌনাঙ্গ লোকচক্ষুর আড়ালে আনতে শিখল এবং প্রজননের



চিত্র 1.22 বন্যজন্তু শিকার, হাসনাবাদ (মীর্জাপুর)
[পলিওলিথিক যুগ]
[লক্ষণীয় : অশ্বের গ্রীবাভঙ্গিমা, মৃত শীকারদের দীর্ঘায়ত দেহ, দলপতির উপরে পদাতিক শিকারীর হস্তপদের গতিময় ব্যঞ্জনা]

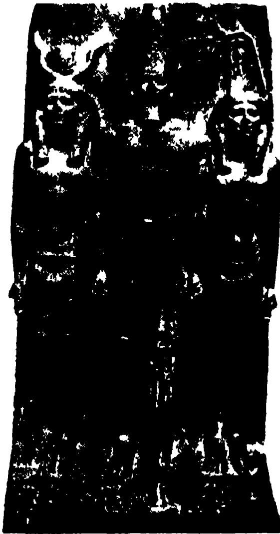
আবশ্যিক ক্রিয়াটির গোপনতা স্বীকৃত হলো। ক্রমে শিল্পে ওই আবশ্যিক ক্রিয়াটির কতখানি প্রতিফলন সৌজন্যসম্মত এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হলো। এ বিষয়ে কিছু তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

* * *

বহু পথশ্রম স্বীকার করে জনৈক খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক প্রায় দুশ' বছর আগে ভারতে এসে 'নেটিভ্ হীদেন'দের এই সব মন্দির-ভাস্কর্য দর্শনে মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি লিখে গেছেন :

হিন্দুমন্দিরের এইসব ভ্রান্ত দেবদেবীর মূর্তিগুলি ভেঙে ফেলা দরকার। এদের নির্লজ্জ প্রদর্শনবাদে ভদ্র-মানুষের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। প্রতিটি মন্দিরের বাহিরে ওই অশ্লীল মূর্তিগুলিই শুধু নয়, মন্দিরের ভিতরে অবস্থিত শিবলিঙ্গগুলিকেও গুঁড়িয়ে দেওয়া দরকার। এভাবেই পবিত্র বাইবেলের বাণী এই অসভ্য ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।[7]

আদিম খ্রিস্টধর্ম প্রচারকের এ জাতীয় উষ্মাপ্রকাশে আমাদের বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ সাধারণ একজন য়ুরোপীয় দর্শকের দৃষ্টিতে ঈশ্বরোপাসনার সঙ্গে যৌনতা সম্পূর্ণ সম্পর্কবিযুক্ত। বিদেশী দর্শক উদার হলে বলবেন, এগুলি ঈশ্বরারাধনার পরিপন্থী। তালিবানদের মতো মৌলবাদী হলে বলবেন, এগুলি জঘন্য, অশ্লীল। তার হেতু



চিত্র 1.23 মিশরের রাজারানী—ফারাও ও পত্নী
[খ্রিঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দী]

খ্রিস্টধর্মের বনিয়াদেই আছে মৌল তত্ত্বকথা : 'আদিপাপবিবর্জিত জন্ম' (Immaculate Conception), বা 'অযোনিসম্ভব আবির্ভাব' (Virgin Birth)। ভারতীয় পুরাণ ও উপকথাতেও এমন বিচিত্র কাণ্ডের উল্লেখ আছে—সীতার জন্ম লাঙলের ফলায়, উর্বশীর জন্ম জহ্নুমুনির জঙ্ঘা থেকে, বৌদ্ধশাস্ত্রেও মাতা আম্রপালী পূর্ণযৌবনা স্বয়ম্ভুরূপে আম্রকাননে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু এগুলি উপকথামাত্র—হিন্দু বা বৌদ্ধধর্মের মর্মমূলের তত্ত্বকথা নয়। অপরপক্ষে খ্রিস্টানধর্ম গড়ে উঠেছে নরনারীর জৈব সম্পর্কের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে, জীববিজ্ঞানের প্রতি ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে। খ্রিস্টধর্মপ্রচারক এবং সন্ন্যাসিনীদের বারে বারে আদম-ঈভের সেই আদিমতম 'পাপের' বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে :

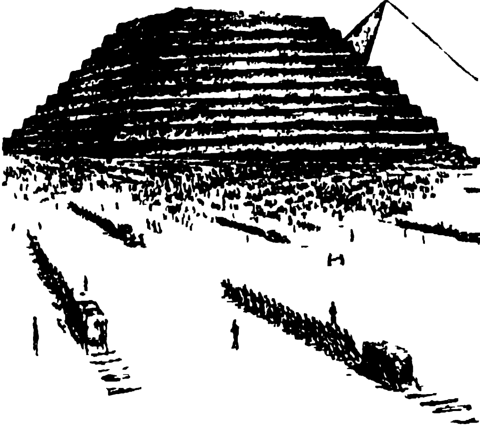
An ocean of carnality within us is continually lashing against the shores of our spiritual nature, the soul; and these mighty waves of carnality and sexuality drown the voice of the Divine within us. The deliverance of the soul from the error of the senses, the lust of the flesh, is salvation.[8]

[দেহজ-কামের সমুদ্রতরঙ্গভঙ্গ ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তার তটভূমিতে, আমাদের আত্মার ওপর। এই দুর্মদ দেহজ ও রতিজ বীচিবিক্ষোভে পরমপ্রভুর কণ্ঠস্বর নিমজ্জিত হতে থাকে। ইন্দ্রিয়ের এইসব প্রলোভন ও ভ্রান্তি থেকে আত্মার উত্তরণই হচ্ছে মুক্তি।]

[ধর্মযাজক সেন্ট অগাস্টিন তাঁর শিষ্যদের সাবধান করে বলেছেন : ''What does it matter whether it be in person of mother or sister: we have to be beware of Eve in every woman.'' (নারীব মূল্য—শরৎচন্দ্র)]

মুশকিল হলো এই যে, মৌলবাদী খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের আনন লজ্জায় লাল হয়ে উঠুক আর নাই উঠুক এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রকৃতি-পুরুষের আবশ্যিক মিলনের মাধ্যমেই সূর্যের এই তৃতীয় গ্রহে জীবের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। এই ধ্রুব সত্যটা শুধু ভারতীয় ঋষিরাই নয়, প্রায় প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতা মেনে নিয়েছে খ্রিস্টের জন্মগ্রহণের কয়েক সহস্রাব্দি পূর্বকাল থেকেই। সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বনের পর অনেক প্রাচীন ধর্মগুরুই ইন্দ্রিয়-সংযমের বিধান দিয়েছেন—হিন্দু, পারসিক, ইহুদি, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি; কিন্তু কোনো ধর্মই গৃহীদের ক্ষেত্রে 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তির' কথা বলেননি। জীব-বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটির বিষয়ে জনসাধারণকে কতখানি জানাতে হবে, কীভাবে জানাতে হবে, তা অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্ন প্রকারে নির্ধারিত হয়েছিল; কিন্তু প্রজনন-প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা কোনো সভ্যতাই সার্বিকভাবে অস্বীকার করেনি। আগেই বলেছি, যেদিন থেকে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হলো, যৌনাঙ্গের জন্য আবরণের ব্যবস্থা করতে

হলো, সেদিন থেকে নরনারীর যৌনক্রীড়ার জন্যও প্রয়োজন হয়ে পড়ল অন্তরালের, গোপনীয়তাব। অনেক সভ্যতায় এই জৈব তত্ত্বটাকে আনন্দ-উৎসবের মাধ্যমে—সঙ্গীত, নৃত্য, মদ্যপানের আসরে—জনমানসে তুলে ধরাব আয়োজন করা হলো। মিশব, সুমেরসভ্যতা, গ্রীস, রোম—বস্তুতপক্ষে ভূমধ্যসাগরের দুই পাবে, এশিয়া মাইনর অথবা পশ্চিম আফ্রিকার—বহু প্রাচীন জনপদে এমন মদনোৎসবের আয়োজন করা হতো, প্রেম ও কামেব বিভিন্ন দেবদেবীকে নানাভাবে তুষ্ট করার প্রয়াসে।



চিত্র 1.24 নির্মীয়মান গির্জা পিরামিড আঃ 3000 খ্রিস্টপূর্বাব্দ

[লক্ষণীয় : ওরা চাকার ব্যবহার জানতো না। শালবল্লার ওপর ভারি-ভারি পাথর গড়িয়ে নিয়ে যেত।]

এইসব মদনোৎসবের ব্যবস্থাপনায় একটা সমভাবনা আমাদের বিস্মিত করে : প্রতিটি ক্ষেত্রেই মদনোৎসবের আয়োজন করা হতো দেবতার মন্দিরে, দেশশাসকের প্রাসাদাভ্যন্তরে নয়। বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে এই একই ধরনের লৌকিক আচারের মূলের বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত হতে পারেননি—বিশেষত এই লৌকিক উৎসবগুলি পালিত হতো যেসব সভ্যতায় তাদের ভৌগোলিক দূরত্ব সেকালীন ভ্রমণের বিচারে অপরিসীম। তবু বেশ বোঝা যায়, এইসব লৌকিক উৎসবের পশ্চাদপটে ছিল ধর্মীয় নির্দেশ—প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে।

এই মদনোৎসবে বিভিন্ন সভ্যতায় যেসব রমণীকুল অংশগ্রহণ করত তাদের কোনোভাবেই বারবনিতা বলা যাবে না। একাধিক হেতুতে। প্রথম কথা, অক্সফোর্ড ইংরাজি অভিধানমতে বেশ্যাবৃত্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : 'নির্বিচারে অপরের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য নিজের দেহকে ভাড়া খাটানো।' হ্যাভলক এলিস সেই সংক্ষিপ্ত ধারণাটিকে এইভাবে বিস্তার করলেন :

> A prostitute is a person who makes it a profession to gratify the lust of various persons of the opposite or the same sex. [বেশ্যা হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে, বিপরীত লিঙ্গের অথবা সমলিঙ্গের যে কোনও মানুষের কামতৃপ্তিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে।]

আমরা এখানে মদনোৎসবে যোগদানকারী যে মহিলাবৃন্দের কথা বলছি, তাদের এটা আদৌ উপজীবিকা ছিল না। দ্বিতীয় কথা, মেয়েরা স্বেচ্ছায় কিছু করছে না, সামাজিক আইনের আওতায়, সর্বজনস্বীকৃত উৎসবে যোগ দিচ্ছে মাত্র। শেষ কথা, পরপুরুষভজনার পর সেই একদিনের উৎসবান্তে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করলে—কুমাবী, বিবাহিতা অথবা বিধবার পক্ষে—তার স্বাভাবিক গার্হস্থ্যজীবন অতিবাহনে কোনো অসুবিধা হতো না। বলাবাহুল্য এই আদিম লোকসংস্কৃতিই পরে জন্ম দিয়েছিল মন্দিরাভ্যন্তরে স্থায়ী দেবদাসী প্রথার।

বিভিন্ন সভ্যতায় মদনোৎসবের যে তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তাদের প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় :

প্রথমত, আদেশটি শুধু কুমারী কন্যাদের প্রতি প্রযোজ্য। কিশোরী বয়সে অক্ষতযোনি মেয়েটিকে কোনো একজন অজ্ঞাত পুরুষের কাছে আত্মদান করতে হবে। কিন্তু একবাবের জন্যই। তারপর নতমস্তকে সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে সামাজিক বিবাহের জন্য প্রতীক্ষা করত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মেয়েটিকে বেশ কয়েকমাস—হয়তো পুরো একবছর—এভাবে মন্দিরে দেহদানের মাধ্যমে মদনদেবকে সন্তুষ্ট করতে হতো। এক্ষেত্রেও তার সামাজিক বিবাহে এবং প্রত্যাশিত গার্হস্থ্যজীবন অতিবাহনে কোনও অসুবিধা হতো না, যেহেতু সমাজের প্রতিটি পুরুষ জানত যে, তাদের মা-ঠাকুমাকেও একইভাবে প্রথা মেনে সংসারে প্রবেশ করতে হয়েছে। তাই সহধর্মিণীর প্রতি এই কারণে তাদের কোনো বিরূপতা ছিল না। তৃতীয় প্রথায় মেয়েটি মন্দির থেকে আদৌ প্রত্যাবর্তন করত না—যা থেকে উদ্ভূত হয়েছে ভারতের দেবদাসীপ্রথা।

প্রথমোক্ত কুমারীকন্যার তথ্যটা প্রথম পাওয়া যাচ্ছে হেরোডোটাসের রচনায়—মিতিল্লা-মন্দিরের বর্ণনায়। গ্রীক ঐতিহাসিক বলছেন :

ব্যাবিলোনীয়দের মধ্যে একটি অত্যন্ত লজ্জাজনক প্রথার প্রচলন আছে। নগরের প্রতিটি রমণীকে অব্যতিক্রমভাবে জীবনে একবার রতিমন্দিরের চাতালে এসে বসতে হবে। বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েরা সেখানে বারান্দায় সার দিয়ে বসে থাকে। সামনে দিয়ে অজ্ঞাত তীর্থযাত্রীরা হেঁটে যায় এবং যেকোনো একটি মেয়েকে পছন্দ করে তার কোলে একটা রৌপ্যমুদ্রা ফেলে দেয়। মেয়েটির তরফে পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নই ওঠে না। যে তার ক্রোড়ে রৌপ্যমুদ্রাটি নিক্ষেপ করেছে তার হাত ধরে তাকে উঠে যেতে হয়। একটি রাত্রি মন্দির চত্বরের গৃহাভ্যন্তরে তার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে প্রত্যুষে সে বাড়ি ফিরে আসে। জীবনে দ্বিতীয়বার এ দুর্ভাগ্য মেয়েটিকে সইতে হয় না। এমনকি সেই একরাতের নাগর যদি মেয়েটির ভদ্রাসনে এসে তাকে বিবাহ করতে চায় তাহলে তাকে প্রত্যাখ্যান করাই রীতি।[৭]

হেরোডোটাস বলেছেন প্রতিটি মেয়েকে জীবনে একবার এভাবে মদন-রতির মর্যাদা মিটিয়ে দিতে হয়। তিনি বলেননি, মেয়েটি কুমারী অথবা বিবাহিতা। অর্থাৎ প্রাক্‌বিবাহযুগে এই শর্ত পালন না করলে মেয়েটির বিবাহ হতে পারে কি না।

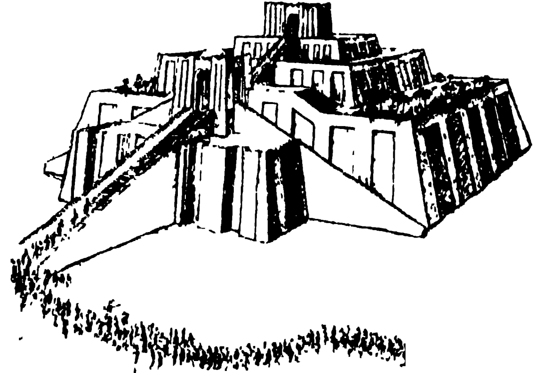
অপরপক্ষে দেখছি 'হেলিয়োপোলিস' অথবা 'বাল্‌বেক'-এ (প্রাচীন ফোনেশিয়া—বর্তমান সিরিয়া) নগরবাসিনী কুমারী মেয়েদের মন্দিরে এসে দান করে যেতে হতো তাদের কৌমার্য (virginity)।[10]

এই যৌনাচার সে অঞ্চলে শতাব্দীর পর শতাব্দী অব্যাহত ছিল। অনেক পরে কনস্টান্টাইন দ্য গ্রেট (274–338 খ্রিঃ) আইন প্রণয়ন করে এই প্রথাটির অবসান ঘটান। সেই সঙ্গে রতি-মদনের মন্দিরটি ধ্বংস করে তিনি একটি গির্জা নির্মাণ করেন।[11]

লিডিয়াতেও ইতিপূর্বে-বর্ণিত দুটি প্রথার অনুকরণে মেয়েদের মাত্র একরাত্রের জন্য অজানা পরপুরুষের অত্যাচার সহ্য করতে হতো। তারপর তাদের জন্য ব্যবস্থা ছিল কঠোর সতীত্বপ্রথার।

কিন্তু আর্মেনিয়া অথবা পারস্যে ব্যাপারটা একরাত্রেই মিটে যেত না। প্রতিটি নারীকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেবদাসীত্ব করতে হতো। সম্ভবত মুক্তিকালটা ছিল সেই দুর্ভাগা নারীর সৌন্দর্য ও বিকশিত যৌবনের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক, অর্থাৎ, সাদাবাঙলায় : ইন্‌ভার্সলি প্রপোর্শানল। যে যত রূপবতী এবং যৌবনবতী তার সেবাদানকালের দৈর্ঘ্য তত বেশি :

> The most illustrious men of the tribe actually consecrate to her (Mother Goddess) their daughters, while maidens, and it is the custom for those first to be prostituted in the temple of the goddess for a long time, and after this to be given in marriage and no one disdains to live in wedlock with such a woman.[12]



চিত্র 1.25 ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান
উর নগরে নির্মিত রাজপ্রাসাদ
[আঃ 2100 খ্রিঃ পূঃ]

[উপজাতির গোষ্ঠী-প্রধানেরা তাদের আত্মজাদের মাতৃদেবীর মন্দিরে কুমারী অবস্থায় প্রেরণ করত। প্রথানুযায়ী দীর্ঘদিন তাদের ওই মন্দিরে নারীদেহের অর্ঘ্যে দেবীকে তুষ্ট করতে হতো। তারপর তারা ফিরে আসত পিতৃগৃহে। তাদের বিবাহ হতো। এই ধরনের স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করতে কারো কোনো আপত্তি হতো না।]

সিরিয়ার বাইব্লস্‌-এ (Bybles) এই প্রথার একটা তির্যক প্রকাশ খুব কৌতূহলোদ্দীপক। অনুষ্ঠানটা হতো ব্যাবিলোনীয় দেবতা তাম্মুজের উদ্দেশ্যে। সেটা ছিল একটা বাৎসরিক সামাজিক অনুষ্ঠান। লোকসঙ্গীত ও কাব্যকাহিনির অনবদ্য আবেদনমণ্ডিত। লোকগাথার মূলকাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে প্রণয়দেবতার মৃত্যু ('মদনভস্মের পূর্বে') এবং ভালবাসার মাধ্যমে তাঁর পুনরুজ্জীবন ('মদনভস্মের পরে')। অনেকটা বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের মতো।

ফিনিশিওদের মধ্যেও প্রেম ও কামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজার্ঘ্য দিতে হতো কৌমার্যদান করে :

> To her (Venus) also the Phoenicians offered a gift by prostituting their daughters before they united them to husbands.[13]
>
> [ফিনিশিওরা তাদের আত্মজাদের রতিদেবীর মন্দিরে দান করত। মন্দিরে তাদের কৌমার্যহরণ হবার পর তাদের উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দেওয়া হতো।]

সম্ভবত সার্থবাহ, পরিব্রাজক বা সাম্রাজ্য বিস্তারে পাবদর্শী বাজপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে এই ধ্যান-ধারণা এবং প্রথাগুলি এক সভ্যতা থেকে অন্য জনপদে সংক্রামিত হয়েছে। আবার এমনও হতে পারে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একে অপরের প্রভাবমুক্ত হয়েই আদিরসের মূল উৎসের প্রতি তারা পৃথক পৃথকভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। নিজ নিজ গোষ্ঠীর চিন্তায় তারা কামদেবকে পরিতুষ্ট করতে চেয়েছে। দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতায় প্রেম বা কামের অধিষ্ঠাত্রী এক-এক দেব ও দেবীমূর্তির পরিকল্পনা করা হয়েছে। ব্যাবিলোনে ছিলেন দেব তাম্মুজ এবং তাঁর নায়িকা ইস্তার। গ্রীসে কামের দেবতা ছিলেন ডায়োনিসাস এবং তাঁর প্রেমিকা সুন্দরী আফ্রোদিতে। অবাক করা খবর হচ্ছে ওই অপূর্ব সুন্দর ডায়োনিসাস ও অপরূপা আফ্রোদিতের মিলনে যে পুত্রসন্তান জন্মেছিল সে কুৎসিতদর্শন। তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সেই প্রায়াপাসের পুরুষাঙ্গটি ছিল অতি বৃহৎ এবং সর্বদা উত্থিত। আফ্রোদিতে ব্যতীত গ্রীকদের আরও একজন দেবী ছিলেন—উর্বরতা ও প্রজননের জন্য যিনি পূজিতা হতেন। তিনি নিকষ কৃষ্ণবর্ণা : দিমিতার। হিন্দুদের দেবী মা-কালীর যেন গ্রিক প্রতিরূপা। রোমানরা সেই ট্র্যাডিশন মেনে আফ্রোদিতেকে রূপান্তরিতা করল ভেনাস-এ, আর ডায়োনিসাস পরিবর্তিত হলেন বাক্কাস-এ।



① জেরুসালেম ② জুডা ③ ইজরেইল ④ জেরিকো ⑤ সিডন
⑥ টায়ার ⑦ নিনিভ ⑧ ব্যাবিলন ⑨ গিজা ⑩ মেমফিস

চিত্র 1.26 প্রাচীন নিকট-প্রাচ্য

* * *

সাধারণভাবে বলা চলে যে, এইসব সামাজিক উৎসব ও লৌকিক অনুষ্ঠানের মূল অনুসন্ধান করে পণ্ডিতেরা নয়টি ব্যাখ্যাসূত্র লিপিবদ্ধ করেছেন।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে 'মানুষ' *(homo sapiens)* নামক জন্তুটি কবে সিদ্ধান্ত নিল যে, যৌনাঙ্গ আবরিত করা আবশ্যিক এবং প্রজননতত্ত্বের ক্রিয়াকাণ্ড জনান্তিকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়? তার উত্তরে সাল-শতাব্দীর উল্লেখ করতে না পারলেও আগেই বলেছি, সময়কালটা মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে যখন মানবসভ্যতার উত্তরণ ঘটল পিতৃতান্ত্রিক সমাজে। যে যুগে নর ও নারী রূপায়িত হলো স্বামী আর স্ত্রীতে।

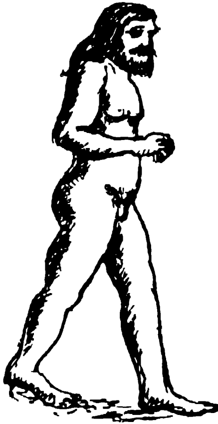
পূর্বে উল্লেখিত নয়টি থিয়োরিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে আছে চারটি ব্যাখ্যাসূত্র যার উৎসমূলে অবস্থিত ধর্মীয় প্রেরণা; দ্বিতীয় ভাগে পড়ছে পাঁচটি

ব্যাখ্যাসূত্র, যা নাকি সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমে রূপায়িত :

I. ধর্মীয় প্রেরণার পশ্চাদপটে উদ্ভূত :

(1) উর্বরতাচারী পূজারীতি (Fertility cults)
(2) বিনিময় প্রথায় আত্মদান (Sacrificial rites)
(3) অক্ষতযোনিসম্পৃক্ত লোকরীতি (Virginity cults)
(4) যৌনতাকে জীবনের আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে মেনে নিয়ে তাকে ধর্মের আওতায় আনা (Accepting sex-acts as part of life and, therefore, of religion)

প্রজনন-তন্ত্রের আদি স্বরূপের পূজারীতি লক্ষ্য করা যায়—লিঙ্গপূজা ও জননেন্দ্রিয়পূজা। পুরুষ ও নারী জননেন্দ্রিয়ের প্রতীকী পোড়ামাটি ও পাথরের ভাস্কর্যের অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া গেছে—কুল্লি, মোয়াব এবং হরপ্পায়—তৃতীয় খ্রিস্টপূর্ব সহস্রাব্দের যুগ থেকে। প্রায় একই সময়ে পাওয়া যাচ্ছে মৈথুনরত মিথুন মূর্তির কিছু ভাস্কর্য। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে চিত্র 1.30 পেশ করছি। কালীক বিচারে এটি মহেন-জো-দরোর সমকালীন। ভাস্কর সন্দেহাতীতভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর শিল্পবস্তুর প্রতিপাদ্য বিষয়টি। আদিম শিল্পী বুঝে উঠতে পারেননি—কীভাবে একটি মানুষের উপরে আর একটি মানুষকে



চিত্র 1.27 দণ্ডায়মান প্রায় মানব
[হোমো ইরেক্টাস্]



চিত্র 1.28 আদিমতম মানব
[হোমো স্যাপিয়েন্স]



চিত্র 1.29 শাশ্বত জননী

II. সামাজিক বিবর্তনের অনুষঙ্গ হিসাবে উদ্ভূত :

(1) যৌথবিবাহব্যবস্থার উত্তরাধিকার (Legacy of earlier group-marriage)
(2) সামাজিক ভাঙনের প্রতিবন্ধক (A safety-valve for the society)
(3) অতিথিপরায়ণতা (Sense of hospitality)
(4) মন্দির পুরোহিতদের চক্রান্ত (Organised vice of priests)
(5) ক্ষমতাশীল রাজন্যবর্গের ব্যভিচার (Bacchanalia of potentates)

* * *

I. ধর্মীয় প্রেরণা

প্যালিওলিথিক যুগ

(1) উর্বরতাচারী পূজারীতি (Fertility cults) : মানবসভ্যতার প্রাগুষাযুগ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে

খোদাই করা যাবে। যেভাবে ধৈমাবাদের শিল্পী (চিত্র 1.4) নর ও নারীর মাথা বিপরীতমুখে গড়েছিলেন, এখানেও সেভাবেই খোদাই করা হয়েছে।

মাতৃদেবীর ধারণাটাও একই ভাবে বিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন সভ্যতায়। কালীক ও ভৌগোলিক দূরত্বে তারা একে অপরের কথা জানত না, কিন্তু চিন্তাধারায় অদ্ভুত সাদৃশ্য তাদের মধ্যে দেখা যায়।

সদ্যোজাত শিশু নারীর পরিচয় পায় তার স্তন্যদায়িনী জননীর স্বরূপে। মানবচেতনার সেই প্রাগুষা লগ্নে মাতৃত্বের ধারণায় প্রতিটি মানব চিরকালই অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ। মাতাই তার ক্ষুদ্র জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। ক্রমশ সে বাল্য-কৈশোর অতিক্রমণে নারীত্বের অপর একটি স্বরূপের বিষয়ে আকৃষ্ট হতে থাকে। নারী তার দৃষ্টিতে এক নতুন মহিমায় প্রতিভাত হয়। মাতৃপ্রেম নয়, নতুন এক জাতের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে নারীর উত্তরণ ঘটে বালক ও

কিশোর মনে। মাদোনার এই ভেনাসে রূপান্তরণ প্রক্রিয়াটি প্রত্যেক মানবশিশুর জীবনে অব্যতিক্রম উত্তরণ।

জননীর আশীর্বাদে জন্মগ্রহণ করে নবজন্মদান প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হওয়ার এই প্রেরণাটি বিশ্বমানবের মতো গ্রহণ করতে হয়েছে বিশ্বশিল্পীকেও। সূর্যের এই জৈবরসে উচ্ছল তৃতীয়



চিত্র 1.30 মৈথুনরত মিথুন
প্রাগৈতিহাসিক অর্ধোৎকীর্ণ ভাস্কর্য

গ্রহের আদিমতম শিল্পী বিশ/ত্রিশ হাজার বছর পূর্বেই এর প্রভাবে শিল্পসৃষ্টির উন্মাদনায় মেতেছিলেন। শিল্পীর মানসিকতায় সেই শিল্পাচার্যের দল মাতৃত্বের এই অনুভাবনা —যা বিশ্বমানবের প্রভাতকালে সবিতারূপে কিরণদান করেছে, সেই বরেণ্য মাতৃভাবনাকে—আদিম শিল্পী অন্যান্য তথাকথিত জড় বস্তুর ওপর আরোপ করেছিলেন। মা-টি হয়ে গেলেন মাটি, যে জমি শস্যভারনম্র আশীর্বাদ দেয়। ক্রমে হিন্দুরা মাতৃত্ব-ধারণা সংস্থাপিত করল গো-মাতার ওপরও— যে গাভীজননী মায়ের পরিপূরকরূপে আমাদের পুষ্টিসাধন করেন। তারপর শিল্পী তার সন্তানের জননীর সন্ধানে ইতিউতি চাইতে থাকে। মাদোনার পরিবর্তে শিল্পী ভেনাসের মূর্তি গড়তে শুরু করে।

* * *

আদিম শিল্পীর সেই অনুভাবনার বিবর্তনটি প্রকাশ করতে আমরা এখানে পরপর কয়েকটি শিল্পকর্ম, কালের পর্যায়ক্রমে, দাখিল করছি। মধ্য য়ুরোপের অস্ট্রিয়া অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এই মাতৃমূর্তিটি (চিত্র 1.31) সম্ভবত পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাস্কর্য। এর বয়স আনুমানিক 30,000 বছর। অর্থাৎ আজ থেকে মহেন-জো-দরোর যে কালীক দূরত্ব তার পাঁচ-ছগুণ প্রাচীন। চিত্র 1.31 চুনাপাথরের — মূর্তিটি দশ সেমি (চার ইঞ্চি) উচ্চতার। ছোট্ট পুতুলটি। এ মূর্তির কারিগর কৃষিকার্য জানতেন না, এঁর গোয়ালে গৃহপালিত গাভী ছিল না। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বাসিন্দা শিকার এবং ফলমূল আহরণের অবকাশে এই 'আদিমতমা জননী' মূর্তিটি রূপায়িত করেছিলেন। শিল্পী লোহা বা ব্রোঞ্জের কোনো খনিজ অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেননি। কারণ ব্রোঞ্জ বা লৌহ তখনো অনাবিষ্কৃত। কঠিনতর 'নিস্' বা গ্র্যানাইটের সূচ্যগ্র পাথরে এই চুনাপাথরের মূর্তিটি তিনি খোদাই করেছিলেন। বিশেষজ্ঞরা এর নাম দিয়েছেন 'ভেনাস অব উইলেনডর্ফ'। আমাদের মতে নামকরণে একটা হিমালয়ান্তিক ভ্রান্তি হয়েছে। এ মূর্তি আদৌ 'ভেনাস'-এর নয়, 'মাদোনার'। বত্তিচেলির আঁকা 'লেডি ইন অ্যানানসেশন'-এর কথা মনে পড়ে। শিল্পী মায়ের মুখখানি নিখুঁতভাবে গড়ার চেষ্টাই করেননি। অমৃতরস ভারনম্র স্তনদ্বয়ে স্ফীতোদরা এই গুরুনিতম্বিনীর মূর্তিটা দেখলে মনে পড়ে যায় নীৎসের সেই অনবদ্য তত্ত্বের যাথার্থ্য :

> Der Mannist fur das Weils cin Mittted :
> Der Zweek ist immer das kind.

[নারীর দৃষ্টিতে পুরুষ হচ্ছে একটি আবশ্যিক পথবন্ধু : পথের শেষ তীর্থপ্রান্তে উপস্থিত তার সন্তান— অনিবার্যভাবে।]

প্রাচীন প্রস্তরযুগের পোড়ামাটির দ্বিতীয় মূর্তিটিতে (চিত্র 1.32) একটা বিশ্বজনীন আবেদন লক্ষ্য করা যায়। এটিকে যে কোনো আধুনিক শিল্পীর গড়া ভাস্কর্য বলে দর্শক সহজেই মেনে নেয়। এবারও মূর্তির মুখাবয়ব গড়ার চেষ্টা করা হয়নি। দেহবঙ্কিমতার রূপায়ণে আসন্ন জননীর স্নেহধারায় মাতৃত্বরসের আবেদনটাই মুখ্য।

পরবর্তী উদাহরণটিও প্যালিওলিথিক যুগের (চিত্র 1.33)। এটিও মধ্য-য়ুরোপ থেকে সংগৃহীত। ফলভারনম্র দ্রাক্ষাগুচ্ছের মতো মাতৃত্বরস এই আদিম শিল্পের আবেদন। সম্মুখদৃশ্যে কেন্দ্রীয় আলম্বরেখার দুপাশে ভারসাম্যের দিকটাও লক্ষ্য করার।

পরবর্তী উদাহরণটি (চিত্র 1.34) নীলনদ থেকে



চিত্র 1.31 পৃথিবীর প্রাচীনতম মাতৃমূর্তি
—Venus of Willendorf, Austria
আঃ 30,000 বৎসর পূর্বের, প্যালিওলিথিক যুগ

আহরিত। এবার দেখছি মিশরীয় শিল্পী মায়ের উদরে অসংখ্য ছেদ-চিহ্ন এঁকে তাঁকে বহুসন্তানের জননীস্বরূপা মাতা গান্ধারী করে তুলেছেন।

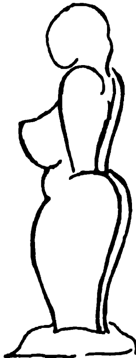
সহস্রাব্দকাল পরের উদাহরণটি (চিত্র 1.39) মেসোপটেমিয়া থেকে সংগৃহীত। এই প্রথম দেখছি, মূর্তির মুখচোখ রূপায়ণের একটা প্রচেষ্টা হয়েছে। অঙ্গে কিছু আভরণও দেখা যাচ্ছে। এ ভাস্কর্যে জননীর সন্তানধারণের প্রসঙ্গটা বেশি প্রাধান্য পায়নি। বরং তাকে একটি নতুন সৌন্দর্য-সৌকুমার্যে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। মাদোনা কি ধীরপদে ভেনাস-তীর্থে যাত্রা শুরু করেছেন?

পূর্ববর্তী উদাহরণের অর্ধসহস্রাব্দ অতিক্রমণে দেখছি সিরিয়ান-শিল্পী নারীমূর্তিকে এতদিনে বস্ত্রাবৃতা করেছেন, মস্তকে ও গ্রীবায় পরিয়ে দিয়েছেন অলঙ্কার (চিত্র 1.40)। 'মা' ক্রমে 'শস্যজননী' হয়ে উঠেছেন। আরও লক্ষণীয়, এতাবৎকালের সমভঙ্গঠাম থেকে আভঙ্গঠামের মনোরম কম্পোজিশনে শিল্পীমানসের উত্তরণ ঘটেছে।

(2) বিনিময়প্রথায় আত্মদান (Sequel to Barter System) :

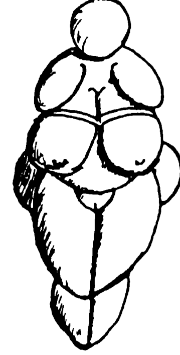
প্রত্নপ্রস্তরযুগীয় (Paleolithic)

মানুষ যখন নব্যপ্রস্তর যুগে বিবর্তিত হচ্ছে, মৃগয়া ও ফলসংগ্রহ করা থেকে কৃষিকার্যে অথবা পশুপালনের স্নাতকপর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে, তখনই সে প্রকৃতিজয়ের উৎসবে মেতে উঠেছিল। গর্ডন চাইল্ডের (Gordon Childe) ভাষায় যা নাকি "An aggressive attitude to his environments"। সমসময়েই তাদের মনে দেবতাকে পরিতুষ্ট করার একটা প্রবণতা আসে। পশু বলিদান সে যুগেই প্রথম দেখা যায়। শস্যদেবী বা কৃষিক্ষেত্রের উপাস্য দেবীকে প্রীত করার বাসনায় কর্ষণের



চিত্র 1.32 পোড়ামাটির মাতৃমূর্তি
অস্ট্রিয়া, আঃ 15,000 খ্রিঃ পূঃ, প্যালিওলিথিক যুগ

পূর্বে সেই বলিদত্ত পশুর রক্ত মাটিতে ছিটিয়ে দেওয়া হতো। এই অনুভাবনটির উৎসমূলে অজানার প্রতি আতঙ্কমিশ্রিত সম্ভ্রমই শুধু ছিল না, ছিল দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত বিনিময়-প্রথার ফলশ্রুতি।



চিত্র 1.33 পোড়ামাটির মাতৃমূর্তি
আঃ 10,000 বৎসর পুরাতন, শেষ তুষারযুগ

প্রস্তরযুগের কোনো ব্যক্তি যদি অপরের শিকার-করা পশুমাংসের অংশীদার হতে চায় তবে সেই প্রতিবেশী শিকারীকে কোনো-না-কোনো ভাবে তুষ্ট করতে হতো, বিনিময় প্রথার মাধ্যমে। অর্থাৎ পরিবর্তে তাকে দিতে হতো কোনো কিছু। হয়তো একটি পশুচর্ম অথবা শান-দেওয়া তীরের ফলা। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে উপহারটি হয়তো হতো একটি কড়ির মালা, দুর্লভ শঙ্খ অথবা চকচকে পাথর। বিনিময়টা বিপরীতমুখী হলে, অর্থাৎ যখন কোনো স্ত্রীলোক পুরুষের শিকার-করা পশুমাংসের ভাগ প্রার্থনা করত, তখন সেই নিঃসম্বলাকে হয়তো বিনিময়ে দিতে হতো নিজের দেহটা। পাঠিকা : রুষ্ট হবেন না—স্বীকার্য, এ ব্যাপারে আমার নিজের অভিজ্ঞতা নেই। দশ-বিশ সহস্রাব্দ অতীতের এ ঘটনা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতেও নয়, তবে একাধিক পণ্ডিতের রচনায় জেনেছি এই তথ্যটা :

> Some primates use sexual behaviour for non-sexual purposes : female chimpanzees and baboons will sometimes present themselves sexually to a male in order to...distract the male while the female purloins his food. It is a small step from such primate behaviour to accepting coitus in exchange of food. Consequently, it seems likely that, the exchange of food for coitus began in the transition period between man and ape.[14]

যৌথ যৌনজীবনের পরিবর্তে যেদিন আদিম মানব 'বিবাহ' প্রথার প্রবর্তন করল সেদিন থেকে স্বামী হয়ে গেল তার স্ত্রী এবং সন্তানের অভিভাবক। আর সেই সময়কাল থেকে খাদ্যসন্ধানে 'স্বেচ্ছায়' দেহদানের 'প্রথাটি' বন্ধ করে দিতে হলো মেয়েদের তরফে। 'স্বেচ্ছাটা' বন্ধ হলো, কিন্তু প্রথাটা বন্ধ হলো না। ওই একই সময়কাল থেকে পুরুষ মনে করতে শুরু করল তার পত্নীর এবং বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার দেহের ওপর তারই জিম্মাদারী। পুরুষ সেই বিনিময় প্রথাটিরই রূপান্তর ঘটালো। স্ত্রী ও কন্যার দেহ সে বিনিময়



চিত্র 1.34 নীলনদ উপত্যকার মাতৃমূর্তি আঃ 3000 খ্রিঃ পূঃ

করতে শুরু করল দেবতাকে তুষ্ট করতে। হয়তো এই অতি প্রাচীন চিন্তাধারা থেকে ব্যাবিলন, সুমার অথবা মিশরের রতিমন্দিরে স্ত্রী ও কন্যাদের দেহদান প্রথার জন্ম।

(3) অক্ষতযোনিসম্পৃক্ত লোকরীতি (Virginity Cult) :

কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এই প্রথাটির মূলে নিহিত আছে—গোষ্ঠী-সচেতনতা; অর্থাৎ শত্রুভাবাপন্ন গোষ্ঠীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রেরণা। নিজ গোষ্ঠীর কোনো মানুষের রক্তপাতের বিরুদ্ধে দলপতিরা অতি আদিমকাল থেকে—বলা যায় 'প্রাইমেট যুগ' থেকেই—কঠিন বিধান দিয়ে রেখেছিলেন। কোনো কারণেই নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি বা রক্তপাত করা চলবে না। তাই কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে কুমারী কন্যাকে মন্দিরে প্রেরণ করার প্রথাটি এই চিন্তা থেকেই উদ্ভূত :[15]

> The initial sexual union involves a shedding of blood; that is forbidden, when blood is that of a girl of the same clan.
>
> [যৌনমিলনের প্রথম পর্যায়ে কিছুটা রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী, মেয়েটি স্বগোষ্ঠীর হলে সেই কাজটা নিষিদ্ধ পর্যায়ের।]

মার্কোপোলো তাঁর ভ্রমণ কাহিনিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিব্বতের ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করার সময় তিনি যখন পথপার্শ্বের সরাইখানায় আশ্রয় নিতেন তখন তাঁকে বারে বারে বিব্রত হতে হতো। গাঁও-বুড়োদের আবেদনে তাঁকে সে গ্রামের একাধিক বিবাহযোগ্যা কন্যার কৌমার্যহরণ করতে হতো। একরাতে একাধিক কুমারী কন্যাকে এভাবে সামাজিক বিবাহে সক্ষমা করে তোলা দৈহিকভাবে অসম্ভব হয়ে পড়ত তাঁর পক্ষে। ফলে তাঁকে পর পর কয়েক দিন গ্রামের বহু অনূঢ়ার সঙ্গে রাত্রিবাস করতে হতো। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে এই জাতীয় অনুভাবনা থেকেই ব্যাবিলন সভ্যতায় অজ্ঞাত বিদেশী ভ্রমণকারীদের মাধ্যমে গ্রাম্যতরুণীদের বিবাহযোগ্যা করে তোলার লোকায়ত আচারের সৃষ্টি।

এই লৌকিক আচারটি ক্রমে নানান বিকৃতরূপ পরিগ্রহ করে। কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে কিছু বীভৎস প্রথার প্রচলন শুরু হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে বিবাহরাত্রে বর ব্যতিরেকে বরযাত্রীদলের কোনো শক্তসমর্থ যুবকের মাধ্যমে নববধূর কৌমার্যহরণের ব্যবস্থা করা হতো। পশ্চিম



চিত্র 1.35 মার্কোপোলোর বিড়ম্বনা! "আর মাত্র দু-ডজন, স্যার"

আফ্রিকার কিছু আদিবাসী অঞ্চলে এরই এক কদর্য প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। সেখানে নববধূকে তার স্বামীর হস্তে সমর্পণের পূর্বে বরযাত্রীদলের প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক যুবক পর্যায়ক্রমে কুমারীটিতে উপগত হতো :

> On a signal from the husband all the men present join together to form a file singing and dancing and each in turn copulates with the stripped bride, who lies supine, with her head held tightly by the husband between his knees...last of all, the husband.''
>
> [বরের ইঙ্গিতে বরযাত্রীদের সক্ষম পুরুষেরা সার দিয়ে দাঁড়াতো। শুরু হতো নাচ আর গান। কনেকে বিবস্ত্রা অবস্থায় চিৎ করে শুইয়ে দেওয়া হতো। জামাতাবাবাজি দুই হাঁটু দিয়ে নববধূর মাথাটা চেপে ধরে থাকতেন। আর বরযাত্রীদের শক্তসমর্থ পুরুষেরা পর্যায়ক্রমে নববধূর সঙ্গে সঙ্গমে রত হতো...(বধূ সজ্ঞানে থাক-না-থাক) সবশেষে সুযোগ আসত বরবাবাজির।]

এই জাতীয় 'টাবু'-র সুযোগ নিয়েই পরবর্তীকালে প্রচলিত হয়েছিল আর একটি ন্যক্কারজনক প্রথা—শরৎচন্দ্র *'নারীর মূল্যে'* তার উল্লেখ করেছেন। প্রথাটির নাম *'প্রথম রাত্রির অধিকার'*। কোনো অঞ্চলে এ অধিকার অধিগ্রহণ করেছিল পুরোহিতের দল, কোথাও বা উপজাতির দলপতি। বহু তথাকথিত সুসভ্য জনপদে মধ্যযুগেও এই বীভৎস প্রথা প্রচলিত ছিল। যেমন ধরুন আরাগনে। সেখানে দাসপ্রথা অতি কুৎসিত আকারে প্রচলিত ছিল। অবশেষে 1486 খ্রিস্টাব্দে ফার্ডিনান্ড দ্য ক্যাথলিক আইন প্রণয়ন করে এই ব্যভিচার রোধ করেন। আইনে বলা হয় :

> "এই আইনের বলে অতঃপর লর্ডরা (সেনর, ব্যারন বা ভূম্যধিকারীর দল) তাঁদের *'প্রথম রাত্রির অধিকার'* থেকে বঞ্চিত হলেন...অতঃপর গ্রামের কোনো সদ্যবিবাহিতা বধূকে তার মধুযামিনী যাপনের পূর্বে ভূম্যধিকারীর প্রাসাদে প্রথম রাত্রি যাপন করতে হবে না।" প্রথম রাত্রিতে নববধূর কৌমার্য আস্বাদন করার এই অধিকার প্রচলিত ছিল অতি বিস্তৃত অঞ্চলে। দলপতি অথবা রাজা গ্রামের যে কোনো নর-নারীর বিবাহশেষে সদ্যবিবাহিতাকে নিজ প্রাসাদে তুলে নিয়ে যেতেন। তার কৌমার্য হরণ করে, পরদিন মেয়েটিকে ফিরিয়ে দেওয়া হতো তার সদ্যবিবাহিত স্বামীর সম্পুটে। এ প্রথা প্রচলিত ছিল ব্রেজিল থেকে গ্রীনল্যান্ডে।[17]

(4) ধর্মীয় নির্দেশে মিথুনাচার :

এই তত্ত্বটি অত্যন্ত গভীর এবং বিতর্কমূলক। আমরা এটি সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। পরিচ্ছেদটির নাম 'শাক্ততন্ত্র, বজ্রযান, চীনাচার এবং মিথুনাচার'।

II. সামাজিক বিবর্তনের অনুষঙ্গরূপে—

(1) **যৌথবিবাহব্যবস্থার উত্তরাধিকার (Legacy of earlier Group Marriage System) :**

সাম্যবাদের অন্যতম জনক মহাপণ্ডিত এঙ্গেল্‌স্ (Friedrich Engels)-এর মতানুসারে সমগ্র মানবেতিহাসকে প্রধানত তিনটি কল্পে বিভক্ত করা যায়। এই কল্পবিভাগ ভৌগোলিক সীমারেখাকে অস্বীকার করে সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রযোজ্য। সেই তিনটি কল্পের নাম : হিংস্র (Savage), বর্বর (Barbaric) এবং সভ্য (Civilized)।

হোমো স্যাপিয়্যান্স স্যাপিয়্যান্স

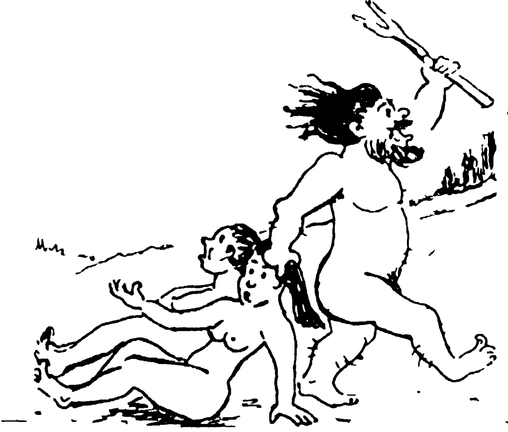
হিংস্র কল্প	**বর্বর কল্প**	**সভ্য কল্প**
(Savage)	(Barbaric)	(Civilized)
আঃ 40,000 খ্রিঃ পূঃ থেকে আঃ 15,000 খ্রিঃ পূঃ	তীরধনুক ব্যবহার থেকে পোড়া-মাটির কাজ 15,000 খ্রিঃ পূঃ —7,000 খ্রিঃ পূঃ	পোড়ামাটির শৌখিন পাত্র থেকে লৌহ আবিষ্কার ও পরবর্তী

প্রথমটির জন্ম যেদিন নিয়েন্ডার্থাল পূর্বপুরুষের (Homo sapiens-এর) সমান্তরালে প্রাগ্বর্তী Homo erectus থেকে মানুষ নামক জীব (Homo sapiens sapiens) বিবর্তিত হলো। প্রায় 40,000 বছর আগে। আর সেই হিংস্র কল্পের অবসান ঘটল মানুষ যখন তীর-ধনুক আবিষ্কার করল।

দ্বিতীয় কল্পের সূত্রপাত পোড়ামাটির তৈজস বানানোর যুগ থেকে, এবং তার অবসান লৌহ আবিষ্কারে। এই দুইটি প্রাগ্বর্তী কল্পে মনুষ্যসমাজ বহুপত্নীক (polygamous) বা বহুবল্লভা (polyandrous) ছিল না আদৌ। তারা ছিল কন্‌স্যাঙ্গুইন (consanguine) অথবা পুনালুয়ান (punaluan)। এই শব্দদ্বয়ের পরিভাষা আদৌ করা হয়েছে কি না জানি না; হলেও তা অত্যন্ত অপ্রচলিত। আমরা তাই বাংলা হরফে এঙ্গেল্‌স্-সৃষ্ট শব্দ দুটিকে ব্যবহার করছি।

তাদের মধ্যে নানান ধরনের বিবাহ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাক্‌বিবাহ প্রথার যুগে পিতার সনাক্তিকরণ যেহেতু

ছিল অসম্ভব, তাই সন্তানদের লালনপালনের যাবতীয় দায়িত্ব ছিল গর্ভধারিণীর। যতদিন ওরা যাযাবর ছিল, পশুশিকার আর ফলমূল আহরণেই উদরপূর্তির আয়োজন, ততদিন দলপতি লক্ষ্য রাখত যাতে সংগৃহীত খাদ্যের একটি উপযুক্ত ভাগ জননী এবং তাদের সন্তানদের জন্য



চিত্র 1.36 হিংস্রকল্পে 'নারীর মূল্য'—
"এক রাতের জন্য জোড়া মুরগিই যথেষ্ট"

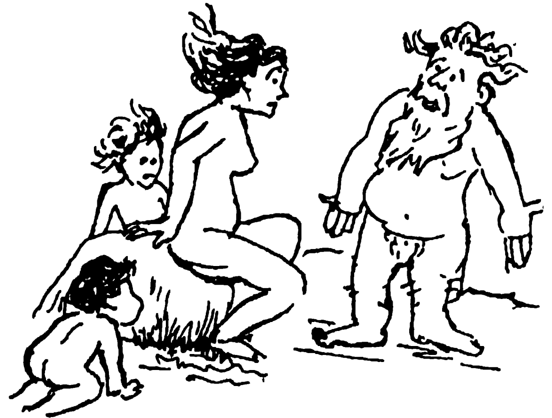
সুরক্ষিত হয়। সে-জাতীয় সমাজে নারীর অবস্থান ও অধিকার ছিল অনেক ভাল। অন্তত পুরুষের চেয়ে ভাল :

> That woman was the slave of man at the commencement of society is one of the most absurd notions that have come down to us from the period of Enlightenment of the eighteenth century. Woman occupied not only a free but also a highly respected position among all Savages and all Barbarians.[18]
> ['সমাজসৃষ্টির উষাযুগে নারী ছিল পুরুষের দাস'—এটি একটি চরম ভ্রান্ত ধারণা। অথচ এই অনুসিদ্ধান্তটি অষ্টাদশ শতাব্দীর জাগরণযুগ থেকে আমাদের ধারণায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবে হিংস্র ও বর্বর কল্পে যাবতীয় নারীর অধিকার ছিল স্বাধীন, শুধু তাই নয়, সমাজে তার আসন ছিল সশ্রদ্ধ সম্মানের।]

কিন্তু মানুষ যখন কৃষিকার্য রপ্ত করল, সৃষ্টি করল ঘনবসতির জনপদ—যার ফলে ধনসম্পত্তি ও বীজধানের সঞ্চয় অনিবার্য হয়ে পড়ল, তখন সব ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেল পুরুষ। নারী একটা চরম সমস্যার সম্মুখীন হলো ক্রমে। সন্তান পালনের দায়িত্ব মায়ের—পিতৃপরিচয়হীন নাবালকদের দুবেলা দুটি খেতে দিতে হবেই, কিন্তু খাদ্য বা জীবনধারণের অন্যান্য উপাদান ততদিনে চলে গেছে পুরুষের কব্জায়। সুতরাং, পুরুষ নয়, নারীই উদ্যোগ নিল বিবাহ-ব্যবস্থার। শুধু উদ্যোগ নয়, বাধ্য করল পুরুষদের ছোট ছোট দাম্পত্যাবাস গড়ে তুলতে।

> ঐ ব্যবস্থার উদ্যোগ পুরুষ নিতে পারে না, নেয়নি। কারণ পুরুষ কোনোদিনই চায়নি—আজও চায় না—দায়িত্বগ্রহণ না করে যৌথবিবাহের ব্যবস্থাপনায় বহুনারীগমনের সুযোগ ত্যাগ করতে। নারীর উদ্যোগে যখন যৌথবিবাহ ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের উচ্ছেদ হলো তখনই পুরুষ আরোপ করল নারীর সতীত্বরক্ষার আইন।[19]

পাঠিকা হয়তো বিস্মিত হবেন, হয়তো মানতে চাইবেন না—কিন্তু সমাজকর্তৃক দাম্পত্যজীবনের ধারণাটা—স্বামী-স্ত্রীর একান্ত সংসার প্রচলনের প্রয়োজনে নারী বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে এই সতীত্ববন্ধনের শৃঙ্খল। পুরুষ বহুবিবাহ করতে চায় তো করুক;—আজও যদি সে আক্ষেপ করে বলতে চায়, 'হায় রে কবে কেটে গেছে মার্কোপোলোর কাল', তো বলুক! কিন্তু নারীর বহুবিবাহে বাধা দিয়েছে



চিত্র 1.37 বর্বর কল্পে 'নারীর নবমূল্যায়ন'
"ওরা তো কেউ তোমাকে চিনতেই পারছে না। তোমার বাচ্চা হয় কী করে?"

নারী নিজেই, কারণ সে পুরুষকে সুনির্দিষ্ট করতে চায় তার সন্তানের পিতা হিসাবে। তাকে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করার প্রয়োজনে সতীত্বের স্বখাত-সলিলে নারী ডুবে মরতেও সম্মত।

(2) সামাজিক ভাঙনের প্রতিবন্ধকতা :

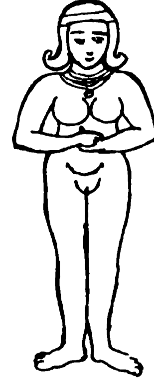
বহুবিবাহ প্রথা রদ হলো। বহুপত্নীক হোক বা না হোক, পুরুষ বাধ্য হলো সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণে। নারী কল্প-কল্পান্তরের অধিকার ও অভ্যাস ত্যাগ করে সতীত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হলো। কোথাও তার মাথায় উঠল সিঁদুর, কোথাও হাতে নোয়া, কোথাও বাঁ-হাতের অনামিকায় আংটি, কোথাও বা বোরখা। কিন্তু সমাজপতিরা স্থির করলেন এই শৃঙ্খল মাঝে-মাঝে শিথিল না করলে নারীমন পোষ মানবে না। তাই ব্যবস্থা করা হলো বহুদিন পর—হয়তো বছরে একদিন—এই সামাজিক শৃঙ্খলটিকে শিথিল করা হবে। সেই আনন্দ-উদ্বেল মদনোৎসবে একদিনের জন্য সামাজিক বন্ধন উপেক্ষা করার ব্যবস্থাপনা হলো। বত্তিচেল্লি তাঁর বিশ্ববন্দিত '*প্রিমাভেরা*' চিত্রে এমন এক বসন্ত উৎসবের কথাই বলেছেন।

এ জাতীয় উৎসব য়ুরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকাব অনেক অনেক অঞ্চলে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হতো। তরুণ-তরুণীর দল—কুমারী, বিবাহিতা এবং বিগতভর্তারা—সমবেত হতেন সেই উৎসব-মণ্ডপে। রতিমন্দির প্রাঙ্গণে বা



চিত্র 1.38 সভ্য কল্পে 'মার্কোপোলোর' নবমূল্যায়ন "শোন! রাতে আমি আর ফিরছি না। মাঝে মাঝে ওদের ডায়াপার বদলে দিও। কথাটা কানে গেল?"

সংলগ্ন বনবীথিকায়। একদিনের জন্য—সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত— উপেক্ষিত হতো যাবতীয় সামাজিক অনুশাসন। সম্ভ্রান্ত ও ঘরানা ঘরের বিবাহিতা পুরললনার দল তাদের প্রাক্‌বিবাহযুগের অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাহুবন্ধনে ধরা দিত। স্বামীরা আপত্তি করত না, কারণ তারাও যে তাদের বিবাহপূর্বযুগের প্রিয় বান্ধবীকে—বর্তমানে পরস্ত্রীকে—তখন কণ্ঠলগ্না করেছে। কিন্তু এই অবাধমিলন, প্রেমের আদান-প্রদান, অনিবার্যভাবে সমাপ্ত হতো উৎসবদিবসের সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে। সুখস্মৃতিটি মনের মণিকোঠায় সুসজ্জিত করে যে-যার ঘরে ফিরে যেত। শরদিন্দুর রচনায় এমন একাধিক মদনোৎসবের বর্ণনা পেয়েছি। *দান্তে-বিয়াত্রিচে* গ্রন্থে আমিও আঁকবার চেষ্টা করেছি।



চিত্র 1.39 ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস বিধৌত উর্বর ভূখণ্ডের মাতৃমূর্তি আঃ 2000 খ্রিঃ পূঃ

আমার প্রগলভতা মার্জনা করবেন। আমার মনে হচ্ছে এই মদনোৎসবের সঙ্গে একটি অত্যাধুনিক ব্যবস্থা সুন্দরভাবে তুলনীয় : আমি আপনার রান্নাঘরের প্রেশার-কুকারের মাথায় ওই সেফ্‌টি-ভ্যাল্‌ভটার কথা বলছি, পাঠিকা! প্রেশার কুকারটা যাতে আন্তর-চাপে ফেটে না পড়ে তাই তার নির্মাণকর্তা পাত্রটার মাথায় একটা মদনোৎসবের মুকুট পরিয়েছেন। মানসিক চাপ অসহ্য হলে ওই ক্যাপের ফাঁক দিয়ে কিছুটা বাষ্প বেরিয়ে যায়। পাত্রটা, অর্থাৎ পাত্রী, নিশ্বাস ফেলে বাঁচে—ফেটে পড়ে না।

(3) অতিথিপরায়ণতা :

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে রতিমন্দিরে কন্যা উৎসর্গের ওই কদর্য-প্রথা—কৌমার্যহরণ-মানসেই হোক, অথবা বৎসরাধিক কাল সেবাদাসীত্ব করানোর ব্যবস্থাপনাই হোক—সৃষ্টি হয়েছিল আদিম অতিথিপরায়ণতা থেকে। মন্দিরে ধনী ভক্তসমাগম হলে তাঁদের খাদ্য, পানীয় এবং মাথার ওপর একটি আচ্ছাদনমাত্র দিলেই মন্দির কর্তৃপক্ষের আতিথেয়তা সম্পূর্ণ হতো না। শুধু শয্যা নয়, শয্যাসঙ্গিনীর আয়োজন না থাকলে মন্দিরের বদনাম হবার আশঙ্কা।

আমাদের মনে হয়েছে এই ব্যাখ্যার প্রবক্তারা মনগড়া যুক্তি খাড়া করেছেন। সেটাই যদি মূল হেতু হতো তাহলে অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা, রাজা-রাজরারা, অতিথির সেবার জন্য অর্থমূল্যে সেবাদাসী প্রেরণ করতেন। বারাঙ্গনার অভাব কোনো সভ্যতায় এবং কোনো যুগেই হয়নি। অতিথিসেবায় মুর্গি জবাই করা যায়, তাই বলে স্ত্রী-জবাই অথবা দুহিতা-জবাই?



চিত্র 1.40 সিরিয়ার শস্যদেবী আঃ 1500 খ্রিঃ পূঃ / আবরণ ও আভরণের আবির্ভাব। সমভঙ্গের পরিবর্তে আভঙ্গ শৈলী /

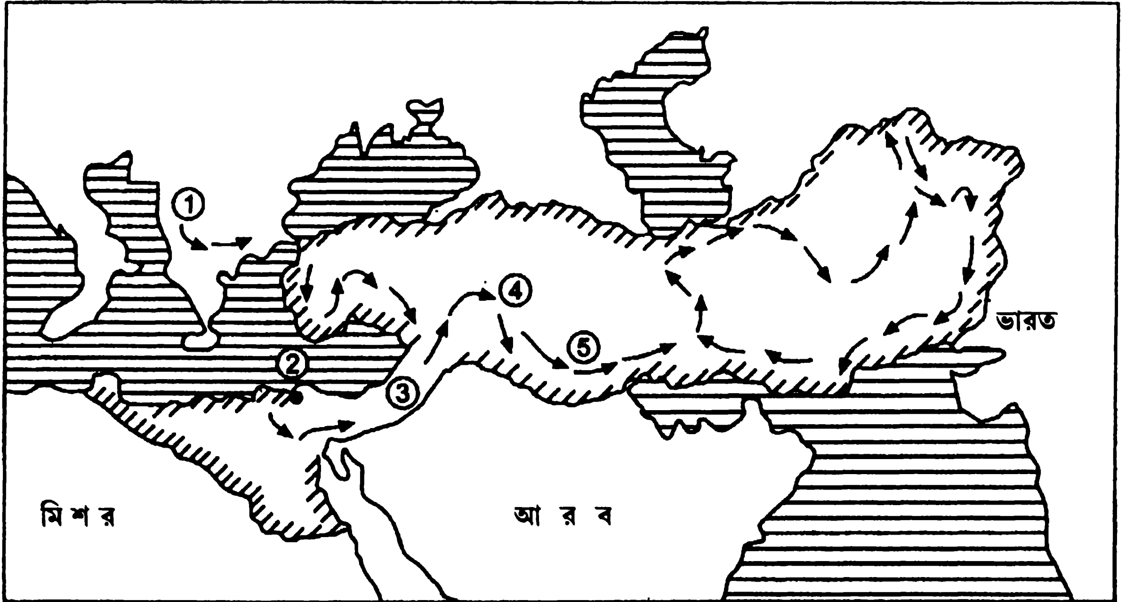
(4) পুরোহিততন্ত্রের ব্যভিচার :

আর একদল পণ্ডিত অনুমান করছেন যে, এই প্রথার উৎসমূলে আছে ক্ষমতাশালী পুরোহিততন্ত্রের রিরংসা ও ব্যভিচার। এ যুক্তিটিকেও একই কারণে মেনে নেওয়া চলে না। ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়ে গেছে যে, মন্দিরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক—সে অঞ্চলের রাজা বা সম্রাটও—এই সামাজিক রীতি মেনে রাজকন্যাদেরও মন্দিরে পাঠাতেন। তাই পুরোহিততন্ত্রের ব্যভিচার এর মূল হেতু হতে পারে না।

উপসংহারে আমরা সবগুলি মতের পুনরালোচনা করে সংক্ষেপে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, উপরিবর্ণিত দু-একটি ব্যাখ্যা ক্ষেত্রবিশেষে কার্যকরী হতে পারে কিন্তু বিভিন্ন সভ্যতায় এই ব্যবস্থার ব্যাপক প্রয়োগের মূল হেতু হিসাবে এঙ্গেল্স্-এর বিশ্লেষণটিই গ্রাহ্য। তার সঙ্গে হয়তো যোগ দিয়েছিল প্রাচীনতর যুগের উর্বরতা-সংক্রান্ত আচার।

বিশ্বসভ্যতার এই পটভূমিকায় আমরা যদি ভারতীয় শিল্পের বিচার করতে বসি, তাহলে আমাদের মন্দির-ভাস্কর্যে মিথুনাচারের কিছুটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাব।

* * *



① ম্যাসিডোনিয়া ② আলেকজান্দ্রিয়া ③ জেরুসালেম ④ নিনিভ ⑤ ব্যাবিলন

চিত্র 1.41 আলেকজান্ডারের আগমন (325 খ্রিঃ পূঃ)

সৌভাগ্যক্রমে বিদেশী বেনিয়াদের পদরেখা ধরে মৌলবাদী খ্রিস্টান প্রচারধর্মী পুরোহিত ব্যতিরেকেও বেশ কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি ভারতে এসেছিলেন— স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্‌, ফার্গুসন, হ্যাভেল এবং আরও অনেকে। সেই সব য়ুরোপীয়ান মনীষীবৃন্দ—যদিও তাঁরা সবাই খ্রিস্টধর্মাবলম্বী—ফতোয়া জারি করেননি যে, মন্দিরের বাহির গাত্রে তথাকথিত অশ্লীল মূর্তিগুলিকে ভেঙে ফেলা হোক, অথবা মন্দিরের গর্ভগৃহে গৌরীপট্ট বিধৃত শিবলিঙ্গকে। এঁদের মধ্যে অনেকে ভারতীয় শিল্পের—মিথুনমূর্তিগুলিসহ—ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং তাদের সংরক্ষণ, সংস্কার ও সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন সমকালীন ভারতীয় মনীষীরা : রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আনন্দ কুমারস্বামী, অবনীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ। এঁদের সম্মিলিত সাধনায় আমরা সমস্যা সমাধানের কিছু ইঙ্গিত পাই।

গ্রীক পুরাণকথায় বলা হয়েছে যে, তাদের মদনদেব ডায়োনিশাস ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করে দামাস্কাসের পরাক্রমশালী মহারাজার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হন। ডায়োনিশাস সেই বাধাদানকারী রাজাকে স্বহস্তে বধ করে তার রাজ্যের মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। সিন্ধুনদ তিনি অতিক্রম করেন একটি ব্যাঘ্রের পিঠে সওয়ার হয়ে। এবং অন্তিমে

> He reached India, having met opposition by the way, and conquered the whole country, which he taught the art of viniculture, also giving laws and founding great cities.[20]

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, উপকথার নায়কটি ঐতিহাসিক ব্যক্তি : আলেকজান্ডার বা সেকেন্দার শাহ। আর সময়টা 325 খ্রিঃ পূঃ। কিন্তু আলেকজান্ডারের পদরেখা ধরে আমাদের দেশে আলোচ্য লোকাচার আদৌ আসেনি। প্রাক্‌-আলেকজান্ডার যুগে ইরান-তুরান-সিরিয়া-ভারতে ছিল বর্ধিষ্ণু জনপদ, সভ্যতা এবং অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির। সেকেন্দার শাহ যে ভারতীয় সভ্যতার মুখোমুখি হয়েছিলেন সেই আর্যসভ্যতা এক বিচিত্র সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লাভ করেছিল এক প্রাগ্বর্তী সভ্যতার কাছ থেকে—সিন্ধুনদের তীরে সে সভ্যতা সহস্রাব্দকাল সগৌরবে বর্তমান ছিল।

মিশর, মেসোপটেমিয়া, ইরান, গ্রীস প্রভৃতির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটা বিরাট পার্থক্য আছে। ওইসব দেশের অতীত গরিমার সঙ্গে বর্তমান মানসিকতার কোনো যোগসূত্র নেই। অথচ ভারতীয় সভ্যতা আর সংস্কৃতির একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা আছে। ইতিহাসে মাঝে মাঝে পাই অন্ধ অজানা যুগ—'ডার্ক এজ'—কিন্তু ভারতবর্ষে ফল্গুধারার মতো লোকচক্ষুর আড়ালে সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলে এসেছে। প্রথম যুগের য়ুরোপীয়ানরা ভারতে এসে যাঁদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁরা খুঁজে পেলেন সেই প্রাচীন সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিছু মানুষকে। যদিও সেই বিলুপ্ত অতীত ইতিহাসকে তারা হারিয়ে বসে আছে। এ জিনিস কিন্তু মিশর, ইরাক, ইরানে ঘটেনি। সেসব দেশে উনবিংশ শতাব্দীতেও কেউ জানত না যে, তাদের একটা গৌরবময় অতীত আছে। গ্রীস এবং রোম সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত গ্রিক বা ইতালির কোনো সাধারণ মানুষ খবর রাখত না তাদের গৌরবান্বিত অতীত বিষয়ে। এ বিষয়ে গোটা বিশ্বে দুটি ব্যতিক্রম : চীন ও ভারত। সূর্যের এই তৃতীয় গ্রহের উপবৃত্তাকার ভূমিতে এই দুই সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে, ধর্মাচরণের ধারাবাহিকতায় কোনো ছেদ কখনো পড়েনি। এ দুটি দেশের সাধারণ মানুষ নিজ নিজ অতীত সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল ছিল।

* * *

মহামান্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (1600-1874) এসেছিল লুণ্ঠনের ব্রত নিয়ে। ফলে, এদেশের অতীত ঐতিহ্য বা ইতিহাস নিয়ে তাদের কোনও কৌতূহল ছিল না—'অতীত সে ক্যা হোগা ভাইয়া? রোপেয়া মিলেগা কুছ?' কিন্তু ব্যতিক্রমই নিয়মের পরিচায়ক। স্যার উইলিয়াম জোন্স (1746-94) ছিলেন তেমনই এক দুর্লভ ব্যতিক্রম।



চিত্র 1.42 স্যার উইলিয়াম জোন্‌ [1746-94]

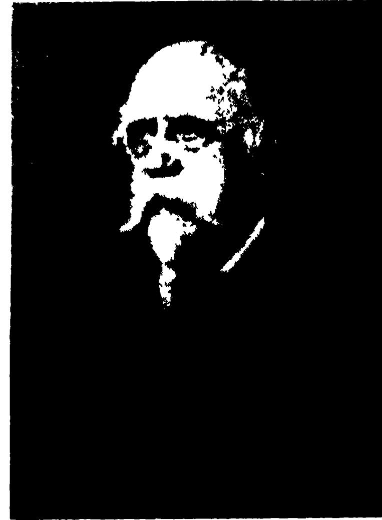
জোন্স ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভাষাজ্ঞানের এক বিরল প্রতিভা। য়ুরোপের প্রায় সবকয়টি প্রধান ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল। এ ছাড়া তিনি জানতেন : হিব্রু, আরবি, পার্শিয়ান এবং তুর্কি ভাষা, ভারতে পদার্পণেরও পূর্বযুগে। তাঁর পূর্বকালে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল য়ুরোপের প্রধান ভাষাগুলি হিব্রু থেকে জন্মলাভ করেছে। জোন্স দৃঢ়ভাবে এই মতের বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করেন। তিনি এটুকু মানতে রাজি ছিলেন যে, পারস্যদেশের ভাষা এবং য়ুরোপের অন্যান্য ভাষার একজন জননী ('mother language') আছেন—যাঁকে তখনো পর্যন্ত চিহ্নিত করা যায়নি। কিন্তু তা কোনোক্রমেই হিব্রু নয়।

স্যার জোন্স সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছান 1783 সালে। তাঁর পূর্বেই এসেছিলেন কোম্পানির আর এক ইংরাজ অফিসার, চার্লস উইলকিন্স (1749-1836)। জোন্স ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। তিনি ভারতে উপনীত হবার পূর্বেই সংস্কৃত ভাষাটা আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। আগেই বলেছি, ভাষার বিষয়ে জোন্স-এর ছিল বকরাক্ষসের খিদে। উইলকিন্সের কাছ থেকে তিনি সংস্কৃত ভাষাটা মোটামুটি শিখে ফেললেন। তারপর তার গভীরে প্রবেশ করলেন কিছু স্থানীয় পণ্ডিতের সাহায্যে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের (1698-1807) নাম।

কলকাতায় পদার্পণের এক বছরের ভেতরেই (1784) জোন্স এখানে প্রতিষ্ঠা করলেন এশিয়াটিক সোসাইটি। এই সোসাইটির মুখপত্রে—*এশিয়াটিক রিসার্চেস*—বর্তমান যুগে অতীত ভারতের প্রথম মূল্যায়নের সূচনা হলো। প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত হলো সংস্কৃত থেকে অনূদিত তিনখানি গ্রন্থ : *ভগবদ্‌গীতা, হিতোপদেশ* এবং কালিদাসের *শকুন্তলা*। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে এগুলি সাড়া জাগাল। মাত্র দুই দশকের ভিতরে *শকুন্তলা* গ্রন্থটি পাঁচবার পুনর্মুদ্রণ করতে হলো :

> 1816 সালে একজন জার্মান ভাষাবিদ পণ্ডিত ফ্রান্‌জ বপ (Franz Bopp, 1794-1867) স্যার জোন্স নির্দেশিত পথে গবেষণা চালিয়ে প্রমাণ করলেন যে, য়ুরোপের প্রধান ভাষাগুলির সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক সহোদরের। এদের একজন জননী ছিলেন। ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হলো প্যারীতে *Societe Asiatique* এবং লন্ডনে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি। তারপর থেকে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি চর্চা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবহমান।[21]

বিংশ শতাব্দীর আদিপর্বে ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এবং খনন কার্য শুরু হয়ে গেল। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন (1898-1905) একটা বড় কাজ করলেন : 'আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া' (স্থাপিত 1861) ঢেলে সাজালেন এবং তার সম্প্রসারণও করলেন। প্রসঙ্গত পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে এই লর্ড কার্জনই বাংলাকে দু-টুকরো করতে চেয়েছিলেন, যার পরিণাম : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। কার্জনের প্রচেষ্টা—শাসকদলের বিরুদ্ধে মূল প্রতিবাদী 'বাংলাকে' দু-টুকরো করার প্রচেষ্টা—হিন্দু বাংলা ও মুস্‌লিম বাংলা গড়ার প্রচেষ্টা—ব্যর্থ হয়ে গেল। কার্জন তাঁর 'সেট্‌ল্‌ড ফ্যাক্ট'কে 'আনসেট্‌লড্‌' করতে বাধ্য হবার ফলে পদত্যাগ করে বিলাতে ফিরে যান। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টায় নবগঠিত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগটি সার্থক হয়ে ওঠে। তখন সেই প্রতিষ্ঠানে



চিত্র 1.43 আলেকজান্ডার কানিংহ্যাম [1814-93]

ডাইরেক্টর-জেনারেল অব্ আর্কিওলজি পদে যোগদান করেন এক তরুণ প্রত্নতাত্ত্বিক জন (পরে 'স্যার' জন) মার্শাল (1876-1958)। তাঁর আমলেই (1902-1931) সিন্ধুনদের উপত্যকায় আবিষ্কৃত হলো এক অতি প্রাচীন সভ্যতা।

প্রফেসর এ. এল. ব্যাশাম লিখছেন :

> সিন্ধুনদ উপত্যকায় ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জনপদের সন্ধান পান রয়্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর একজন অল্পবয়সী অফিসার আলেকজান্ডার কানিংহ্যাম। তিনি পঞ্জাবে হরপ্পার কাছেপিঠে কিছু পোড়ামাটির সীল খুঁজে পান যার হরফ পড়তে পারা যায় না। 1922 সালে আর্কিওলজিকাল সার্ভের জনৈক ভারতীয় অফিসার আর. ডি. ব্যানার্জি সিন্ধু অঞ্চলে মহেন-জো-দরো নামের একটি স্থানে অনুরূপ কিছু সীল আবিষ্কার করেন। তাঁর মনে হয় এগুলি এক অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। স্যার জন মার্শাল-এর নির্দেশে 1924 খ্রিস্টাব্দ থেকে সুশৃঙ্খলভাবে খননকার্য শুরু হয় এবং তাঁর অবসর গ্রহণের বছর—অর্থাৎ 1931 পর্যন্ত—খননকার্য অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।[22]

অধ্যাপক ব্যাশামের অমূল্য গ্রন্থে যে নামটি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত সেই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই এ বিষয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করেন, প্রত্নতত্ত্বের সংগ্রহগুলি পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে প্রাগার্যযুগের সিন্ধুসভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সমসাময়িক এবং পরবর্তী কয়েকজন পণ্ডিত তথা উৎকীর্ণ-লিপি-বিশারদ এ বিষয়ে আরও নানান গবেষণা করে এ সভ্যতার ওপর আলোকপাত করেন। এ প্রসঙ্গে ড. ভাউ দাজী, ভগবন্তলাল ইন্দ্রজী এবং স্যার রামকৃষ্ণরাও ভাণ্ডারকারের নাম স্মর্তব্য। পরবর্তীকালে আরও অনেকে সিন্ধু সভ্যতায় খননকার্য চালিয়ে গবেষণা করেন। যেমন : স্যার অরেল স্টেইন, হার্গ্রিভ্স্ এবং বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য নাম অধ্যাপক ননীগোপাল মজুমদার (1897-1938), পি. আর. এস.। তিনি একাই একুশটি জনপদের সন্ধান পান সিন্ধুনদের অববাহিকায়। নিদারুণ দুঃখের কথা, মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে এই প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারটি সিন্ধু অঞ্চলের ডাকাতের গুলিতে ঘটনাস্থলে নিহত হন।



চিত্র 1.44 রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় [1885-1930]



চিত্র 1.45 স্যার আর. সি. ভাণ্ডারকর [1837-1925]

ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসে এই বিস্মৃত বাঙালি পণ্ডিতের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার কথা। দেশবিভাগের (1947) পরে ওই অঞ্চলের কিছুটা পড়ে পাকিস্তানে, কিছুটা ভারতে। এদিকের অংশে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে অনেক নতুন জনপদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। ওপারে পাকিস্তান অংশে অবশ্য তেমন কোনো গবেষণা হয়নি। চিত্র 1.46-তে স্যাটিলাইট ক্যামেরায় সংগৃহীত একটি ম্যাপে গোটা সিন্ধুনদ উপত্যকার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই আলোকচিত্রে ধরা পড়েছে অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদীর মরা খাত। এ নদীর নাম একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছে বেদ-এ এবং মনুসংহিতায়। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে লুপ্ত সরস্বতীর নাম এতদিন আমরা শুধু শুনেই এসেছি; এখন আকাশপথে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তোলা আলোকচিত্রে দেখা যাচ্ছে সরস্বতীর মৃত খাত—রাজপুতানার থর মরুভূমির একান্তে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কয়েক সহস্রাব্দ পূর্বে এই মৃত সরস্বতীর দুই পাড়ে ছিল বহুসংখ্যক সমৃদ্ধ জনপদ। কয়েকজন প্রত্নতাত্ত্বিকের মত : 'সিন্ধু সভ্যতা'র পরিবর্তে এর নতুন নামকরণ করা যেতে পারে 'সারস্বত সভ্যতা' (চিত্র 1.46)।

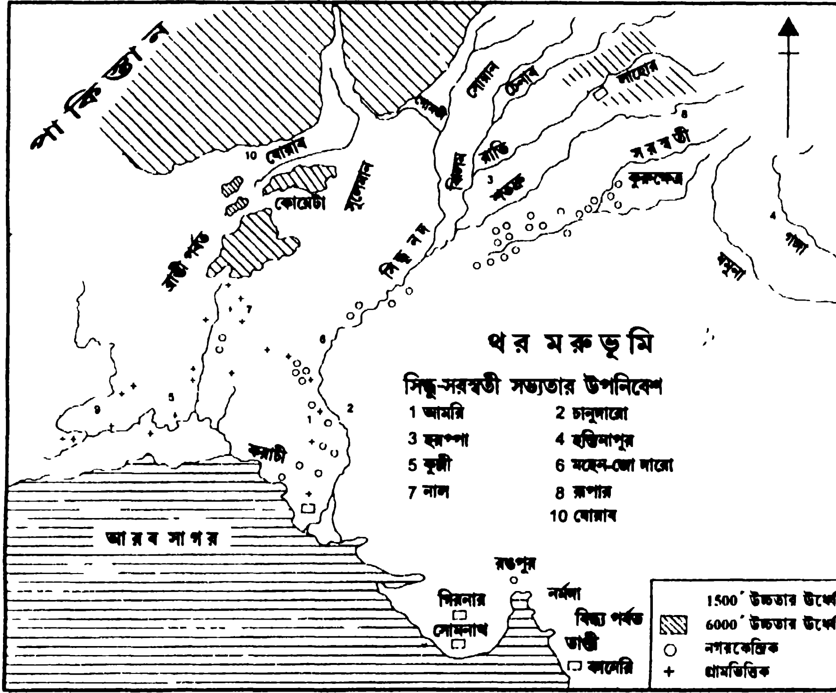
উত্তর বেলুচিস্তানে অনেকগুলি জনপদ দেখা যাচ্ছে যারা সমৃদ্ধ ছিল 2900-2800 খ্রিঃ পূর্বে—তারা গড়ে

উঠেছিল যোয়াব (Zoab) নদের দুই তীরে। সিন্ধু সভ্যতা বলতে স্কুল পাঠ্যপুস্তক থেকে আমরা বুঝি শুধু মহেন-জো-দরো এবং হরপ্পাকে। বর্তমানে আরও অনেকগুলি জনপদের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেখান থেকে প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। যথা :

(i) রানাঘুন্টি : কোয়েটা শহরের সন্নিকটে—2500/2200 খিঃ পূঃ

(ii) আমরি, নান্দারা, নাল : বেলুচিস্তান, 3000-2500 খ্রিঃ পূঃ

আমাদের প্রথম উদাহরণটি (চিত্র 1·47) একটি জখম হওয়া পাথরের মূর্তি, তার ওপর চুনা-পলেস্তারায় নাকমুখ গড়া হয়েছে। উচ্চতায় মূর্তিটি আঠারো সেমি (সাত ইঞ্চি)। প্রাপ্তিস্থান মহেন-জো-দরো। শ্মশ্রুমণ্ডিত গম্ভীর আনন, ললাটে মণিখচিত সুবর্ণ টায়রা। দক্ষিণ বাহুমূলেও একটি অনুরূপ অলঙ্কার। বামস্কন্ধে বিচিত্রিত একটি অঙ্গাবরণ, তাতে তিন পাপড়িওয়ালা একটি অদ্ভুত নকশা। এই অলঙ্করণ সমকালীন বা পরবর্তী যুগে আর কখনো দেখতে পাইনি। প্রসঙ্গত, ব্যাবিলোন এবং মিশরে আমরা



চিত্র 1.46 সিন্ধু-সারস্বত সভ্যতা

(iii) কুল্লী : দক্ষিণ বেলুচিস্তান, আঃ 2400 খ্রিঃ পূঃ

(iv) শাহীতাম্প : কুল্লীর পশ্চিমে আঃ 2000 খ্রিঃ পূঃ

(v) যোয়াব : উত্তর বেলুচিস্তান, আঃ 3000-2200 খ্রিঃ পূঃ

(vi) চানুদারো : মহেন-জো-দরোর দক্ষিণে, সিন্ধুর পূর্বতীরে।

(vii) লোথাল :

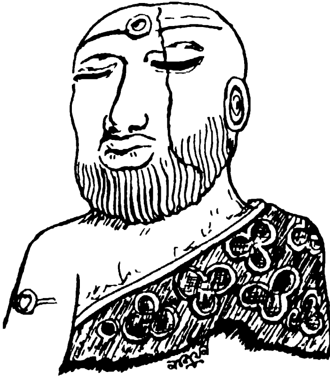
এবার বরং এই 'সারস্বত সভ্যতা' থেকে সংগৃহীত নানান প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনাগুলিকে দেখি—

অনেক পুরুষমূর্তি দেখেছি, কিন্তু এই নকশাটির পুনরাবৃত্তি কখনোই লক্ষিত হয়নি। এই পুরুষমূর্তিটি সম্ভবত কোনো সম্ভ্রান্ত পুরোহিতের। অর্ধনিমীলিত নয়নদ্বয় ব্যতীত এ মূর্তির অন্যান্য আঙ্গিক—শ্মশ্রুর রূপারোপ, স্থূল ওষ্ঠাধর, উপবৃত্তাকার অভিনব প্রতীকী কর্ণদ্বয় ইত্যাদি পরবর্তী ভারতশিল্পে আদৌ পুনরুজ্জীবিত হয়নি। সে হিসাবে মূর্তিটির রচনাশৈলী অনন্য।

আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণটি (চিত্র 1·48) একটি পুরুষের দেহকাণ্ড। এটি হরপ্পায় প্রাপ্ত, মাত্র নয় সেমি (সাড়ে তিন ইঞ্চি) উচ্চতায় নির্মিত। দুটি বাহুমূল, গ্রীবা

এবং যৌনাঙ্গের ছিদ্রগুলি লক্ষণীয়। সেই প্রত্যঙ্গগুলি পৃথক ভাবে তৈরি করে স্বস্থানে বসিয়ে দেওয়া হতো। এ মুর্তিটির বৈশিষ্ট্য দেহের পরিপুষ্টতা বা স্থূলতা। পরবর্তী যুগে ভারতশিল্পে মুর্তি স্বতই স্থূলতাবর্জিত হতো। অধিকাংশই পরিপুষ্ট, কিন্তু কৃশাঙ্গ। অবশ্য ব্যতিক্রমও ছিল—কুবের, গণেশ, জম্ভল, যক্ষ প্রভৃতি।

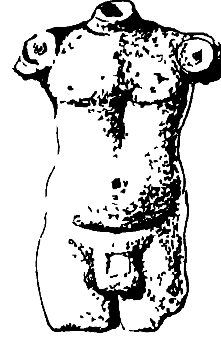
চিত্র 1·48-এ ছিদ্রগুলি যে সঞ্চরণশীল প্রত্যঙ্গের জন্য নির্মিত হয়েছিল এ কথা আমরা আন্দাজে বলছি না, কারণ ঘটনাচক্রে ওই একই অঞ্চল থেকে একটি পুতুল অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে, যাতে দেখা যায় গাভীর মস্তকটি ছিল সঞ্চবণশীল। সেই গাভীমূর্তির আলেখ্য দেওয়া হয়েছে চিত্র 1·49-এ। আর তার লম্বালম্বি ছেদ-চিত্রও সেই সঙ্গে এঁকে দেওয়া হয়েছে। গরুর মুণ্ডটি পৃথকভাবে



চিত্র 1.47 পুরোহিত মূর্তি, মহেন-জো-দরো আঃ 2500 খ্রিঃ পূঃ

নির্মিত, একটি কীলকের মাধ্যমে গাভীদেহের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত যে, লাঙ্গুল ধরে আকর্ষণ করলে একটি মাথা উঁচুনিচু করবে। আদিমতম শিল্পীর কৃতিত্বে বিস্মিত হতে হয়।

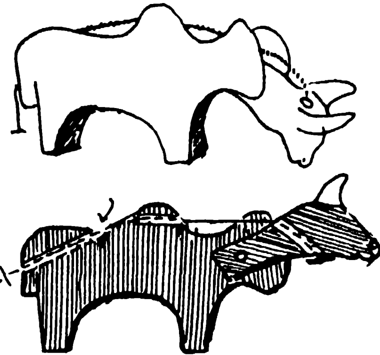
এবার মহেন-জো-দরো থেকে আর একটি নমুনা (চিত্র 1·50) দাখিল করি। এটি একটি পোড়ামাটির সীল। একজন ধ্যানরত যোগীর অর্ধোৎকীর্ণ মূর্তি (আঃ 1000-1500 খ্রিঃ পূঃ)। যোগীর মস্তকে একটি ত্রিশীর্ষ শিরস্ত্রাণ। দু-পাশে দুটি শিং, মহিষের শিঙের মতো বাঁকানো, কিন্তু কেন্দ্রস্থ ফলকটি প্রস্ফুটিত চম্পকাকার। মনে হয়, যোগীবর কোনো গহন অরণ্যে ধ্যানস্থ, কারণ তাঁর চতুষ্পার্শ্বে নানান বন্য জীবজন্তু—হাতি, গণ্ডার, বাঘ, ষাঁড়, সাপ, কিছু প্রতীকী নভশ্চর, একটি মাছ এবং একজন মানুষ। যোগী পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন। বিশেষজ্ঞদের মতে এ মূর্তি 'পশুপতি'র। লক্ষণীয়, এই অভিধা পরবর্তীকালে হিন্দুযুগে



চিত্র 1.48 লাল পাথরের কবন্ধমূর্তি, হরপ্পা 2000 খ্রিঃ পূঃ

আরোপিত হয়েছিল শিবের ওপর। আরও লক্ষণীয়, যোগীর শিরোভূষণটি ত্রিশূলাকার। এ থেকেই বিজ্ঞজনের অনুমান যে, ধ্যানস্থ পশুপতির ধারণাটি প্রাগার্য সভ্যতা থেকে হিন্দুধর্মে অনুপ্রবেশ করেছে। ভাষান্তরে শিব আদিতে ছিলেন অনার্য দেবতা।

ওই মহেন-জো-দরো থেকেই পাওয়া গেছে আর একটি পোড়ামাটির সীল (চিত্র 1·51) যেখানে পশুপতির শিরস্ত্রাণের সেই ত্রিশূলাকৃতি অলঙ্করণটি রূপায়িত। এখানে কেন্দ্রীয় ফলাটি সপ্তপর্ণীর, আর দু'পাশের দুটি ফলায় কোনো পশুর মুখাকৃতি। এই ত্রিশূলচিহ্নটি বোধ করি



চিত্র 1.49 মাথা-নাড়া গাভী হরপ্পা (আঃ 3000 খ্রিঃ পূঃ)

প্রাগার্য সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে পরবর্তী হিন্দু ভারতের একটি যোগসূত্র।



চিত্র 1.50 পশুপতি মহেন-জো দরো



চিত্র 1.51 ত্রিশূল প্রতীকী সীল

এবার আমরা উপস্থিত করছি দশ সেমি (চার ইঞ্চি) দৈর্ঘ্যের সবুজ চুনাপাথরে তৈরি একটি নৃত্যরত পুরুষের দেহকাণ্ড (চিত্র 1.52)। এক্ষেত্রেও মাথা এবং যৌনাঙ্গের জন্য দুটি ছিদ্র রাখা হয়েছে। এটি হরপ্পায় প্রাপ্ত, আনুমানিক 3000 খ্রিস্টপূর্বাব্দের শিল্পকর্ম। নয়াদিল্লীর 'সেন্ট্রাল এশিয়াটিক অ্যান্টিকুইটিজ' সংগ্রহশালায় রক্ষিত। এই পুরুষমূর্তির নৃত্যরত ভঙ্গিটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার। পণ্ডিতদের অনুমান এটি মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্যের আদিমতম পরিকল্পনা। কারণ এই ভঙ্গিতেই তাণ্ডবনৃত্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে চার সহস্রাব্দের (3000 খ্রিঃ পূঃ-1000 খ্রিঃ) ব্যবধানে দক্ষিণ ভারতের চোল শিল্পে। দুটি শিল্পবস্তুর মধ্যে কালীক এবং ভৌগোলিক বিশাল ব্যবধানের কথা বিচার করে এই শিল্পদ্বয়ের মূল অনুপ্রেরণার সাযুজ্য স্বীকার করতে স্বতই সঙ্কোচ হয়; কিন্তু প্রখ্যাত শিল্পবিশারদ ড. বি. রোন্যাল্ড স্পষ্টভাষে জানাচ্ছেন :

> Even in its fragmentary state, the figure (চিত্র 1.52) is imbued with a vital, dynamic quality and a suggestion of movement imparted by the violent axis dislocation of the head, thorax and the hips, exactly the same device employed to suggest the violence of Shiva's dance in the great Hindu bronzes of the Chola period.[23]

বস্তুত লিঙ্গপ্রতীকীর সূত্রে শিল্পবিশারদেরা একমত হয়েছেন যে, হরপ্পার শিল্পভাবনা হিন্দু আর্যদের চিন্তায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। দুটির যোগসূত্র আদৌ কাল্পনিক নয়। ড. এ. এল. ব্যাশামের মতে —

> হরপ্পার ধর্মাচরণের সঙ্গে লিঙ্গপূজার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। মোচাকৃতি (চিত্র 1.53) বহু শিল্পনিদর্শন সেখানে পাওয়া গেছে যেগুলিকে প্রায় অসঙ্কোচে লিঙ্গপ্রতীকীরূপে চিহ্নিত করা চলে। পরবর্তী যুগের হিন্দুদেবতা শিবলিঙ্গকে পুরুষ জননেন্দ্রিয় প্রতীক হিসাবে ব্যাপকহারে গ্রহণ করা হয়েছে। অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, এই শিবলিঙ্গের সঙ্গে হরপ্পার 'প্রোটোশিব' সীলগুলির পরিকল্পনা সমান্তরাল ধারায়। এছাড়া কিছু কিছু অঙ্গুরীয়প্রতিম শিল্প নিদর্শনও সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া গেছে (চিত্র 1.54), যেগুলিকে অনেকে বলেন স্ত্রীজননেন্দ্রিয়র প্রতীক। আমরা সেকথা নির্বিচারে মেনে নিতে রাজি নই।[24]

অধ্যাপক ব্যাশামের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত। সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি লিঙ্গপ্রতীকী হোক-না-হোক এ-কথা অনস্বীকার্য যে, বিশ্বসভ্যতার প্রাচীনতম অধ্যায়ের সমকালেই ভারতে আবির্ভূতা হয়েছিলেন মাতৃদেবী (Mother Goddess)। প্রথম যুগে তাঁর মূল প্রেরণা হয়তো ছিল মিথুনাচার, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা থেকেই



চিত্র 1.52 নৃত্যরত পুরুষের দেহকাণ্ড, হরপ্পা

নন্দনতত্ত্বের বিবর্তন হলো। স্থূল যৌনাঙ্গ-বিকশিত নারীমূর্তি বিবর্তিত হয়েছে সৌন্দর্যের প্রতীকে।

আমাদের আলোচ্য গবেষণার নিরিখে এই মূর্তিগুলিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়। আমরা দেখব মিথুনাচার-সম্পৃক্ত গুহ্য ধর্মাচরণের অন্ধ গুহা থেকে কীভাবে বিবর্তিত হলো সত্য-শিব-সুন্দরের ব্যঞ্জনা।

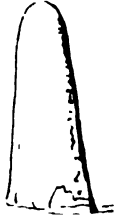
সিন্ধু সভ্যতায় এবং পরবর্তী আর্য-সভ্যতায় প্রাপ্ত মূর্তিগুলিকে আমরা এভাবে ভাগ করছি :

(i) মূর্তিধারী যোনিদেবী (Personified Yoni-goddess)
(ii) ধনদেবী (Opulent Mother-goddess)
(iii) পঞ্চচূড় এবং ত্রিচূড় দেবী (Panchachuda goddess)
(iv) মিথুনাচারবর্জিত পুত্তলিকা (Sexless terracotta toys)
(v) গজলক্ষ্মী, শ্রী বা কমলেকামিনী (Gajalaxmi)

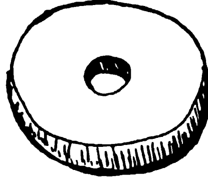
* * *

(i) মূর্তিধারী যোনিদেবী (Personified Yoni-goddess) :

সচরাচর এই দেবীমূর্তি মুণ্ডহীনা। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে খ্রিস্টজন্মের পরেও বিভিন্ন অঞ্চলে এ মূর্তি নির্মিত ও পূজিত হয়েছে। ভেক ভঙ্গিতে উপবিষ্টা এই দ্বিভুজা দেবীর পরিকল্পনা অদ্ভুত। কখনো বা এঁর দু-হাতে দুটি পদ্ম। সেক্ষেত্রে স্কন্ধের ওপর একটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। এগ্রন্থে দুটি নমুনা উপস্থিত করা গেছে। প্রথমটি (চিত্র 1·55) মহারাষ্ট্রের পুনে শহরের সত্তর কি.মি. দূরে ঘোড় নদীর উপত্যকায় প্রাপ্ত। নির্মাণকাল আনুমানিক 1200 খ্রিস্টপূর্বাব্দ। মূর্তিটি পোড়ামাটির বাক্সে ভূগর্ভে পাওয়া যায়। সম্ভবত মূর্তিটি গৃহদেবতা হিসাবে পূজিত হতো।[25]



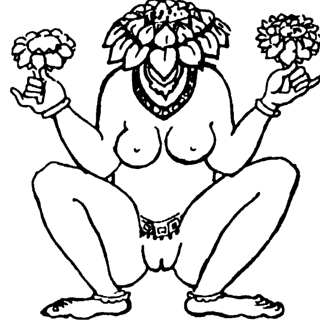
চিত্র 1.53
মোচাকৃতি পুরুষলিঙ্গ



চিত্র 1.54
অঙ্গুরীয়প্রতিম স্ত্রীলিঙ্গ

এই ধরনের মূর্তি ধারাবাহিকভাবে পাওয়া গেছে : ঝুশিভো বা কৌশাম্বীতে (উত্তর প্রদেশ), তের, নাভাসা (মহারাষ্ট্র) এবং নাগার্জুনকোণ্ডায় (অন্ধ্র)। গবেষক এইচ. ডি. শাঙ্কালিয়ার মতে এ মূর্তির আদি পরিকল্পনা মিশর অথবা রোমের। মূর্তিগুলির কালীক ব্যবধান সহস্র বৎসর, ভৌগোলিক ব্যবধান কয়েক সহস্র কিমি। ফলে এর ধারাবাহিকতা ও ব্যাপ্তি অনস্বীকার্য। ড. দেবাঙ্গনা দেশাই এই মূর্তিটির প্রসঙ্গে (চিত্র 1.55) বলছেন :

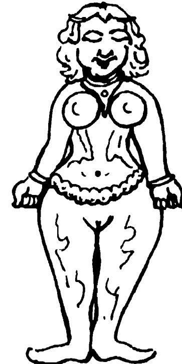
"আজও স্থানীয় সীমন্তিনীর দল এই দেবীর পূজা করেন। সন্তানলাভের কামনায় দেবীর স্ত্রী-অঙ্গে মধু-চন্দন-সিন্দূর প্রভৃতি লেপন করেন।[26]



চিত্র 1.55 মূর্তিধারী স্ত্রীচিত্র, নাগার্জুনকোণ্ডা
আঃ 1200 খ্রিঃ পূঃ

(ii) ধনদেবী (Opulent Mother-goddess) :

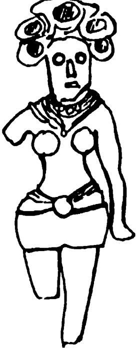
প্রাচীনতম 'অপুলেন্ট' মাতৃদেবীর মূর্তিটি পাওয়া গেছে বিহারের চম্পারণ জেলায়, লাউরিয়া গ্রামে। সম্রাট অশোক নির্মিত সিংহস্তম্ভের কিছু দূরে। এটি একটি সুবর্ণ থালায় (plaque) অর্ধোৎকীর্ণ ছোট্ট মূর্তি। সালঙ্কারা, দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্তি। মৌর্যযুগের। এ জাতীয় মূর্তি বৃহত্তর ভারতে অনেক অঞ্চলে পাওয়া গেছে—তক্ষশীলা, রূপার, পুরানা কিল্‌লা (ইন্দ্রপ্রস্থ), কৌশাম্বী, মথুরা, বৈশালী এবং পাটলিপুত্রে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীমূর্তি একক। কখনো বা তাঁর নায়ক উপস্থিত। অনুমান করা হয়, এই দেবী ধনবান গৃহস্থের দ্বারাই পূজিতা হতেন; হয়তো তাই এঁর নাম 'ধনদেবী' (Opulent Mother-goddess) (চিত্র 1.56)।



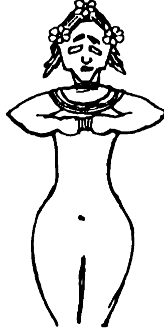
চিত্র 1.56 ধনদেবী—লাউরিয়াগ্রাম

(iii) পঞ্চচূড়/ত্রিচূড় দেবীমূর্তি (Panchachuda goddess) :

এই মূর্তিগুলি বহু যুগের প্রাচীন। সিন্ধু সভ্যতায় একাধিক পঞ্চচূড় ও ত্রিচূড় রমণীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। চিত্র 1.57 এবং চিত্র 1.58-এ দুটি উদাহরণ দেওয়া গেছে।



চিত্র 1.57 পঞ্চচূড়



চিত্র 1.58 ত্রিচূড়

সিন্ধু সভ্যতার অবলুপ্তির পরেও এই মূর্তিগুলিকে নির্মিত হতে দেখি গাঙ্গেয় উপত্যকার অনেক অনেক সমৃদ্ধ নগরীতে : রূপার, ঐচ্ছত্র, মথুরা, কৌশাম্বী, তাম্রলিপ্তি, চন্দ্রকেতুগড়, হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানে। অধিকাংশ মূর্তিই সুঙ্গ ও কুষাণযুগের। এদের মাথায় তিনটি বা পাঁচটি চূড়া—যাতে দর্পণ বা কঙ্কতিকাপ্রতিম কিছু আয়ুধ দেখতে পাওয়া যায়। এদের মিথুনাচার-উদ্ভূত বলতে বাধে, কারণ অধিকাংশ রমণীর যৌনাঙ্গ হয় অনুৎকীর্ণ অথবা আবৃত। প্রখ্যাত শিল্পবিশারদ স্টেলা ক্রামরিশের মতে পঞ্চচূড়/ত্রিচূড় মূর্তি অপ্সরার; অথচ জনস্টোন বলেন এগুলি মায়াদেবীর রূপান্তর। দণ্ডকারণ্যে বাস্তবে পঞ্চচূড়/ত্রিচূড় রমণীদের দেখেছি।

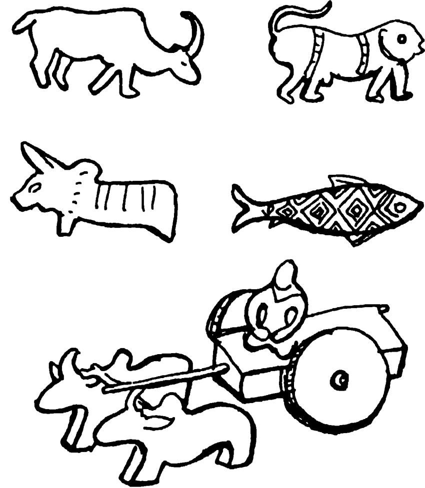
(iv) যৌনাচারবহির্ভূত পুত্তলি (Sexless toys) :

পোড়ামাটির অসংখ্য পুতুল সিন্ধুনদ সভ্যতার বিভিন্ন প্রান্তে পাওয়া গেছে। তার ভেতর নারী-পুতুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেগুলি আকারে স্বতই ছোট—5 থেকে 12 সে.মি. (2-5 ইঞ্চি)। রমণীমূর্তি হওয়া সত্ত্বেও এর সঙ্গে মিথুনাচারের যে কোনো সম্পর্ক নেই সেকথা সহজেই বোঝা যায়। ঘর-সাজানোর উপাদান অথবা শিশুদের খেলনা হিসাবেই মনে হয় এই মূর্তিগুলি নির্মিত। পুতুল মাপের গোযান, মাছ, পাখি, জীবজন্তুও যথেষ্ট পাওয়া গেছে (চিত্র 1.59)।

একটা বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করেছি : পুতুলমূর্তিগুলি—কী নরের, কী নারীর—স্পষ্টই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল সুদর্শন এবং সহাস্য (চিত্র 1.60, 1.61, 1.62)। অপর দল (চিত্র 1.64, 1.65, 1.66) কুদর্শন কিম্ভূতাকৃতি অথবা ভয়ঙ্কর। এই দ্বিতীয় দলের পুতুল রামগরুড়ের পূর্বপুরুষ কি না জানি না, কিন্তু তারা হাসতে জানে না। সম্ভবত এই মূর্তিগুলি বাচ্চাদের ভয় দেখানোর জন্যেই নির্মিত হতো। রামগরুড় নয়, তারা 'একানড়ে' 'বেহ্মদত্যি' বা পেত্নির পূর্বপুরুষ অথবা পূর্বনারী।

অবশ্য সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত নর-নারীর মূর্তিকে এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করার কথা পূর্বাচার্যরা কেউ বলেননি। এটা আমাদের বিচারে। অধ্যাপক ব্যাশাম সবগুলি নারীমূর্তিকেই 'টেরাকোটা গডেস্' নামে অভিহিত করেছেন, খেলার অনুষঙ্গ বলে স্বীকার করেননি।

আরাধ্য দেবীই হোন অথবা খেলার পুতুল, এদের কারও যৌনাঙ্গ প্রকটিত নয় এবং মিথুনাচারের সঙ্গে এরা সম্পূর্ণ সম্পর্কবর্জিত।



চিত্র 1.59 পোড়ামাটির পুতুল

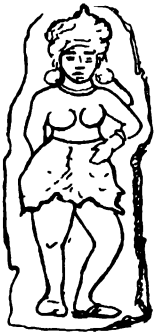
মহেন জো-দরোতে প্রাপ্ত নারীমূর্তিটি অর্ধোৎকীর্ণ। আভঙ্গ-ঠামে দণ্ডায়মানা মূর্তিটির কটিদেশে একটি বস্ত্রখণ্ড। মস্তকে শিরস্ত্রাণ বা মুকুট ছাড়াও পায়ে পাদুকার আভাস পাওয়া যাচ্ছে (চিত্র 1·60)।

হরপ্পা, মহেন-জো-দরো, চানুদারো, কুল্লী, যোয়াব প্রভৃতি স্থান থেকে সংগৃহীত মূর্তিগুলির অধিকাংশই

ত্রিমাত্রিক। অর্থাৎ অলটো-রিলিভো (অর্ধোৎকীর্ণ) মূর্তি নয়। দ্বিতীয়ত, এরা প্রায় অধিকাংশই আবক্ষ-আলেখ্য। বক্ষদেশ যেহেতু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অনাবৃত তাই পুরুষ এবং রমণীমূর্তিগুলিকে শনাক্ত করা কঠিন নয়। আমরা এখানে পাঁচটি নমুনা দাখিল করলাম (চিত্র 1·62-1·66)।

(v) শ্রী, গজলক্ষ্মী, শ্রীদেবী, বা কমলাসনা (Gajalaxmi) :

শ্রী, গজলক্ষ্মী বা কমলাসনা মূর্তি সহস্রাব্দের অধিক ধারাবাহিকতা মণ্ডিত। তিনি দেবী, বরদা, কল্যাণকামী এবং সৌন্দর্যের দেবী। শুধু হিন্দু-দেবী নন, বৌদ্ধ-দেবী। এমনকি প্রাক্-মহাযানীযুগে স্থবিরবাদী বৌদ্ধদের ভাস্কর্যেও গজলক্ষ্মী বা শ্রীর অস্তিত্ব লক্ষণীয়। 'শ্রী' মূর্তির গভীরে যে রহস্যমণ্ডিত কোনো গুহ্যধর্মাচার নেই এ কথাও জোর করে বলা যাচ্ছে না। হীনযান যুগে নির্মিত ভারহুত, বুদ্ধগয়া, সাঁচি, কৌশাম্বীতে—যখন স্বয়ং বুদ্ধদেবের মূর্তি নির্মাণে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল—তখনও গজলক্ষ্মীর মূর্তি উৎকীর্ণ হতে দেখি। বৌদ্ধধর্মে শিরিকলন্নী (শ্রীকল্যাণী) জাতকে গজলক্ষ্মীর উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের শ্রী-সূক্তে এই দেবীর নাম পাওয়া যায়। আবার কলিঙ্গে উদয়গিরি, খণ্ডগিরি জৈন গুহাতেও দেখা যায় গজলক্ষ্মীর



চিত্র 1.60
মহেন জো দরো



চিত্র 1.61
কৌশাম্বী

পূজাবিধির লক্ষণ। আজও ভারতে—শুধু গাঙ্গেয় উত্তর ভারতেই নয়, বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণেও—'কমলেকামিনী' মূর্তি যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। মহাশক্তির দশমহাবিদ্যার ইনিই হয়তো শেষ মহাবিদ্যা।

শ্রী বা গজলক্ষ্মীর মূর্তি দণ্ডায়মানা বা উপবিষ্ট দুই রকমই হয়। দ্বিভুজা। কখনো অঞ্জলি মুদ্রায়, কখনো বা বরাভয় মুদ্রায়। আবশ্যিকভাবে তিনি একটি প্রস্ফুটিত পদ্মে উপবিষ্টা। তাঁর দুই পার্শ্বে দুটি—কখনো বা চারটি—হস্তী তাঁর দেহে জলসিঞ্চন করছে। এ মূর্তির আদি উৎসে আছে ধনসম্পদ বা সন্তান কামনা। হয়তো আদিম মিথুনাচারও আছে এঁর পরিকল্পনায়—এ কথা কেন বলছি তা ব্যাখ্যা



চিত্র 1.62 কুল্লী



চিত্র 1.63 হরপ্পা

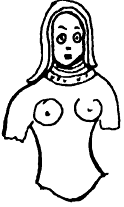
করে জানাতে পারব না; কিন্তু কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ একথা বলেছেন।

আমরা এখানে তিনটি গজলক্ষ্মী মূর্তি নমুনা হিসেবে দাখিল করছি। চিত্র 1·67-এ দৃষ্ট দণ্ডায়মানা দেবীমূর্তি আছে সাঁচি তোরণে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সাঁচিতে ভ্রমণকালে আমি অন্তত পাঁচটি গজলক্ষ্মীর মূর্তি দেখেছি। সবগুলি খ্রিস্টজন্মের দুশ'বছর আগে-পরে উৎকীর্ণ করা। সাঁচির প্রধান স্তূপের পূর্ব তোরণে সম্মুখভাগে আছে দুটি। এক-একটি এক-এক পাশের স্তম্ভে। দুটি মূর্তিই কিন্তু হুবহু একরকম।

এই পরিকল্পনায় সহস্রাব্দের ধারাবাহিকতা বর্তমান। কোনার্ক জগমোহনে যে গজলক্ষ্মী মূর্তিটি পেয়েছি তার আলেখ্য চিত্র (1.68) বিধৃত। কোনার্ক সংগ্রহশালাতেও আছে আর একটি মূর্তি (চিত্র 1.69)। দুটি মূর্তিই ললিতাসনে, তবে একটির দক্ষিণ ও অপরটির বামপদ প্রলম্বিত।

* * *

আমরা এতক্ষণ মাতৃমূর্তিগুলিকে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করছিলাম—উর্বরতাচার অথবা ধর্মীয় কৌলিক গুহ্যাচারের নিরিখে। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে ধর্মীয় নির্দেশ থেকে তির্যকপথে শিল্পী



চিত্র 1.64
যোয়াব



চিত্র 1.65
কুল্লী



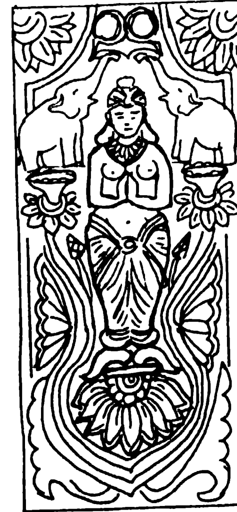
চিত্র 1.66
যোয়াব

নান্দনিক বিচারে সুন্দরের পূজারী হয়ে উঠেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকরা মন্দির-ভাস্কর্যগুলির মূল্যায়ন করেন না। দেশবিভাগের পরে, স্বাধীনতা-উত্তর কালে, ওই সব অঞ্চল থেকে বহু শিল্পনিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। সেগুলি আনন্দ কুমারস্বামী, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, হ্যাভেল, ও. সি. গাঙ্গুলী বা স্টেলা ক্রামরিশ দেখে যাননি। যদিও আধুনিক গবেষকেরা এইসব শিল্পনিদর্শনের প্রত্নতাত্ত্বিক চুলচেরা বিচার করে দেখাতে চেয়েছেন যে, কোনোটির উৎসমূলে গুহ্যধর্মীয় নির্দেশনা আছে, এবং কোনোটিতে ইন্দ্রজালসম্পৃক্ত কৌলিক প্রত্যাদেশ, কিন্তু তাদের নান্দনিক বিচার অল্প ক্ষেত্রেই করা হয়েছে।

আমরা যে পাঁচজাতের মাতৃমূর্তির কথা বলেছি, তাদের আদি উৎসমূলে হয়তো ছিল উর্বরতাচার তথা মিথুনাচার; কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা শিল্পসৌকর্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। এই বিবর্তনের জন্য প্রায় আড়াই সহস্রাব্দ সময় লেগেছে—বলা যায় 2500 খ্রিঃ পূঃ থেকে খ্রিস্টজন্ম-সময় পর্যন্ত।

তাই যদি হয়, তবে বলতে হবে যে, আদিম কলাকৌশলহীন স্থূলতা থেকে মূর্তিগুলি নান্দনিক মূল্যায়নে অপূর্ব সার্থকতা লাভ করেছে। আদিম 'মূর্তিধারী যোনিদেবী'র (চিত্র 1.55) আবেদন নিঃসন্দেহে স্থূল। কিন্তু তার পরবর্তী ধনদেবীর (চিত্র 1.56) মধ্যে সেই স্থূলতা নেই। তার পরবর্তী পরিকল্পনা পঞ্চচূড় (চিত্র 1.57) বা ত্রিচূড় (চিত্র 1.58) রমণীমূর্তি স্থূলতা থেকে আরও দূরে সরে গেছে। অলঙ্কারে, বিশেষ করে কেশবিন্যাসে, তাদের সৌন্দর্যকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যৌনতাকে নয়। আমরা যাদের পুতুলমূর্তি বলেছি, অর্থাৎ অধ্যাপক ব্যাশামের মতে যা পোড়ামাটির দেবীমূর্তি (Terracotta goddess), সেগুলি সম্পূর্ণ যৌনাচারবর্জিত। সবশেষে এলেন গজলক্ষ্মী বা শ্রীদেবী। হয়তো আদিম মিথুনাচারেই তাঁর গঙ্গোত্রী, কিন্তু আমাদের কাছে তিনি উপস্থিত হয়েছেন ফেনোচ্ছল স্নিগ্ধ পূত সলিলবাহিনী গঙ্গায়, লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিতারূপে। কাব্যময় নান্দনিক আবেদন নিয়ে (চিত্র 1.67-1.69)।

স্থাপত্যের পরিমণ্ডলে সিন্ধুনদ-সভ্যতার সঙ্গে আদিমতম হিন্দুযুগের কোনও সাদৃশ্য নেই। যেমন মহেন-জো-দরোর রৌদ্রতাপিত ইটের দেওয়াল আর কড়িবরগা-বিধৃত সমতল টালিছাদের বাড়ির সঙ্গে মৌর্যযুগের প্রস্তর নির্মিত করবেলিং-করা প্রাসাদের কোনো মিল নেই। কিন্তু



চিত্র 1.67 গজলক্ষ্মী
সাঁচি তোরণ

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে একটা বিচিত্র নান্দনিক সাদৃশ্য নজরে পড়ে।

প্রাগার্যসভ্যতা থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পচর্চায় আমরা দেখেছি, শিল্পশাস্ত্র নারীকে তিনটি ভূমিকায় বিচার করেছে। সেভাবেই রূপায়িত হয়েছে নারীমূর্তি। প্রথমত মাতৃভাব, দ্বিতীয়ত হ্লাদিনীভাব, তৃতীয়ত কন্যাভাব। প্রথমটির ক্ষেত্রে বিস্তৃত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

ভারতের লক্ষ লক্ষ দেবীমূর্তিতে তা প্রকট। দ্বিতীয়ত, হ্লাদিনীভাবের সঙ্গে সখীত্বভাব সংপৃক্ত। আমাদের আলোচ্য বিষয় মিথুনাচারের সঙ্গে এটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তৃতীয়ত, কন্যাভাব। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে পরপর চারটি

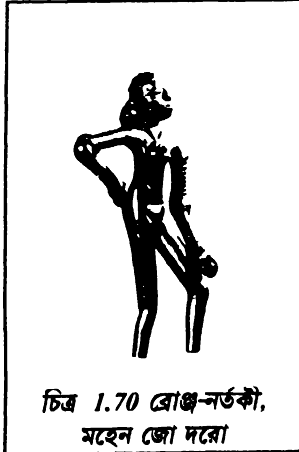


চিত্র 1.68 গজলক্ষ্মী, কোনার্ক মন্দিরগাত্রে



চিত্র 1.69 গজলক্ষ্মী, কোনার্ক সংগ্রহশালা

মূর্তি সাজিয়েছি (চিত্র 1.70-1.73)। প্রথম তিনটির হ্লাদিনী বা সখীভাব, চতুর্থটির কন্যাভাব। প্রথম তিনটি উদাহরণেই নারীত্ব বিকশিত। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উদাহরণে কটিদেশে মেখলা এবং বস্ত্রের আভাস থাকা সত্ত্বেও তাদের লজ্জানিবারণের কোনো প্রচেষ্টাই নজরে পড়ে না। চতুর্থ কন্যাভাবের মূর্তিতে দেখছি সুজাতা বুদ্ধদেবের জন্য পরমান্ন-পাত্র নিয়ে এসেছেন। সুজাতার কটিদেশ শোভন ভাবে বস্ত্রাচ্ছাদিত। প্রথম ও দ্বিতীয় নারীমূর্তি দুটির কালীক দূরত্ব দুই সহস্রাব্দের এবং ভৌগোলিক দূরত্ব সহস্র কি.মি-র ওপর। দুটি মূর্তির নির্মাণশৈলীও পৃথক, গঠনের উপাদানও এক নয়—প্রথমটি ঢালাই করা ব্রোঞ্জ, দ্বিতীয়টি চুনাপাথর। তবু নান্দনিক বিচারে দুটি নারীর আবেদনে যথেষ্ট সাযুজ্য। সম্পূর্ণ বিবসনা মথুরাযক্ষীর (চিত্র 1.71) অলঙ্কৃত মেখলা এবং অলংকারের প্রাচুর্য দৃষ্টিআকর্ষণকারী।



চিত্র 1.70 ব্রোঞ্জ-নর্তকী, মহেন জো দরো

মহেন-জো-দরোর নর্তকী (চিত্র 1.70) ও মথুরাযক্ষী (চিত্র 1.71) দুজনেই কোমরে হাত রেখে বিচিত্র আভঙ্গ ঠামে দর্শকের দিকে কৌতুকময় রহস্যাবৃত হাস্যে কী যেন বলতে চায়। কী তাদের ব্যঞ্জনা? মথুরাযক্ষীর পদতলে মৃত্যু-অসুর পরাজিত ভঙ্গিতে আত্মসমর্পণ করেছে—যক্ষী মৃত্যুঞ্জয়ী : না, ব্যক্তিগত জীবনে নয়, তবু দার্শনিক বার্গসঁ যাকে বলেছেন বিবর্তনপথে 'জীবন-অমৃত', সেই 'ইলান ভাইটাল' যেন মেয়েটির করায়ত্ত। ব্যক্তিগত জীবনে সে নিশ্চয় অমর নয়, কিন্তু মানবপ্রজাতির মৃত্যু-অতিক্রমী যাত্রাপথে সেও এক অভিযাত্রিণী। যৌবনের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে সে নন্দনতত্ত্বের মূলকথা—প্রজনন-তত্ত্বকে—জানতে পেরেছে, দর্শককে এবার জানাতে চায়; মৃত্যু যদি হয় মরজীবনের অন্ত-রস, তবে ওই রসিকা সন্ধান পেয়েছে প্রজনন-তত্ত্বের মাধ্যমে আদিরসের! আর সেজন্যই সে দর্শককে সহাস্য আহ্বান জানাচ্ছে। তার যৌবনকে সার্থক করে তুলতে। মধুমিলনের মাধ্যমে প্রজাতিগতভাবে অমর হয়ে নবজীবন সৃষ্টি করতে! আরও লক্ষণীয়, মেয়েটির দক্ষিণহস্তে একটি পিঞ্জর। সে কিন্তু তার প্রেমিককে বন্দি করেনি। প্রেমিক বসে আছে তার বাম স্কন্ধে—কর্ণকুহরে প্রেমের কূজন করছে। ও জানে, পিঞ্জরের বন্ধন

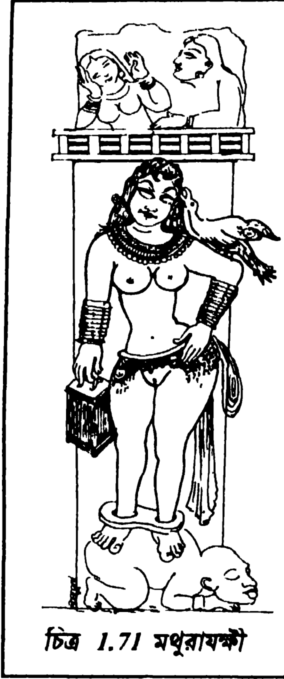
নিষ্প্রয়োজন। প্রেমের অদৃশ্য বন্ধনেই তার প্রেমাস্পদ ওকে ছেড়ে যেতে পারবে না।

সাঁচির পূর্বতোরণে শালভঞ্জিকা বনদেবীরও একই ব্যঞ্জনা। অলঙ্কারের বাহুল্য ওকে পীড়িত করেনি। প্রতি অঙ্গে তার প্রাণপ্রাচুর্য প্রস্ফুটিত। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়—

> The art was hardly religious at all, far less Buddhist. It does not speak .or aim at suggesting the Buddhist ideal of renunciation or Nirvana or of the discipline or strict ethical virtues including avoidance of women. Rather it is frankly naturalistic and even sensuous.''[27]

সাঁচিবৃক্ষিকা (চিত্র 1·72) তার যৌবনভারনম্র আবেদনে সেই কাব্যময় অতীতকালের কথাই বলতে চায়, যখন তরুণ-তরুণীরা মদনোৎসবে রতিরঙ্গে মেতে উঠত—সমবেত হতো নৃত্যে, সঙ্গীতে, রতিরঙ্গের নানান অনুষ্ঠানে।

কালের বিচারে সাঁচিবৃক্ষিকা আছে মহেন-জো-দরোর কিশোরী আর মথুরাযক্ষীর অন্তর্বর্তী অবস্থানে। কিন্তু তিনটি নায়িকারই মৌন, তথা যৌন আবেদন সমান্তরালিক। আনন্দ কুমারস্বামী এই সাঁচিবৃক্ষিকা সম্বন্ধে বলছেন :



চিত্র 1.71 মথুরাযক্ষী

দেহদেহলীর তোরণদ্বারে এই যৌবনবতীর ইন্দ্রিয়জ আবেদনের পূর্ণকুম্ভে যদি ধর্মীয় অনুভূতি কিছু থেকেই থাকে, তবে সে ধর্মাচরণ উপনিষদ ও বৌদ্ধধর্মের জীবনের প্রতি ঋণাত্মক নির্দেশের বিপরীত-মেরুস্থিত। এ ধর্ম প্রাচীন প্রাচী-র মাতৃপূজার এবং উর্বরতাচারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত—'জ্যোতির্গময়'র দিশারী আদৌ নয় (not in the sense of the Great Enlightenment)।[28]

উল্লিখিত তিনটি রমণী মূর্তিই সেই অতি-অতীত মাতৃপূজার ধারাবাহী; কিন্তু জননী-স্বরূপা এই কয়েক সহস্রাব্দের ব্যাপ্তিতে সম্পূর্ণ নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছেন। মন্দির-ভাস্কর্যে মিথুনাচারে রমণীর যে রমণীয় রূপ—যা পরবর্তী দুই সহস্রাব্দ ধরে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বিকশিত হয়ে উঠবে—এরা তারই সূচনা মাত্র।

মাতৃদুগ্ধপানরত ভারতীয় ভাস্কর এতদিনে নারীর দ্বিতীয় স্বরূপের সন্ধান পেয়েছেন বলা চলে।

অর্থাৎ শিল্পীদল বাল্য-কৈশোর অতিক্রমণে এতদিনে যৌবরাজ্যের সিংহদ্বারে উপনীত হয়েছেন। ❑



চিত্র 1.72 সাঁচিবৃক্ষিকা



চিত্র 1.73 সুজাতা
(বরবুদর-মন্দির গাত্রে অর্বোৎকীর্ণ)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পোড়ামাটির আদিম শিল্পে মিথুনাচার



প্রথমেই আমার রচিত একটি ইংরেজি বই থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিই, এই পরিচ্ছেদটির কৈফিয়ত হিসাবে। সে গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা হয়েছিল 'It may be mentioned that before compiling this book in English [EROTICA IN INDIAN TEMPLES] I wrote one in Bengali on the same subject. Late Professor Nihar Ranjan Roy, the renowned historian and Indologist, after going through it, asked me to meet him at his residence. I have had the opportunity to discuss the subject in great details with him. During the discussion, Professor Roy suggested me to translate the book into English and also advised me to incorporate a chapter on "Erotica in Terracotta Phase", which I had not dealt with in my Bengali book. To be candid, I was hesitant to act according to his suggestion. The simple reason : I had written hardly anything in English earlier, barring some technical Reports on Civil Engineering projects. It is unfortunate that I cannot now submit my 'home-task' to my 'Teacher', who, incidentally, was a total stranger to me, personally, before that first and last meeting, shortly before his passing away.'

'মিথুনাচার'-বিষয়ে আমার লেখা দুটি বইই—বাঙলা ও ইংরেজি—বিগত দুই-তিন দশক পূর্বেই নিঃশেষিত। বিশেষ কারণে তা পুনর্মুদ্রিত করা হয়নি।

আলোচনাকালে অধ্যাপক রায় আমাকে প্রসঙ্গত বলেছিলেন যে, ভারতশিল্পের মূল্যায়নে যাঁরা আদিসূরী—উইলিয়াম জোন্‌স্, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভাউ দাজী, আনন্দ কুমারস্বামী, পরে অবনীন্দ্রনাথ, স্টেলা ক্রামরিশ, নন্দলাল বোস প্রভৃতি এই পোড়ামাটির শিল্পগুলির বিষয়ে কিছুই বলে যাননি। সহজবোধ্য হেতুতে। এগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁদের গবেষণাকালের পরে। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন আমাকে কথাপ্রসঙ্গে আরও বলেছিলেন যে, তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থে (*বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*) তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেননি। তবে পরবর্তী সংস্করণে তিনি তাম্রলিপ্তি, চন্দ্রকেতুগড়, হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত 'পোড়ামাটির ভাস্কর্যে মিথুনাচার' বিষয়ে আলোচনা করবেন।

সুধীজন মাত্রেই জানেন যে, সে সুযোগ আর তিনি পাননি।

*　　*　　*

এই 'টেরাকোটা' বা পোড়ামাটির শিল্প নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নগরসভ্যতা থেকে। সেগুলি অধিকাংশই নদীতীরবর্তী বর্ধিষ্ণু বন্দর, অথবা বহির্ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ ঘনজনপদ। সিন্ধুসভ্যতার (2500-1500 খ্রিঃ পূঃ) পরবর্তী যুগে, দুই সহস্রাব্দের ব্যাপ্তিতে (1,000 খ্রিঃ পূঃ—1000 খ্রিঃ), এই সব নগরসভ্যতার উত্থান-পতন। শিল্প নিদর্শনগুলি মন্দির-ভাস্কর্য নয়; ধর্মের সঙ্গে তাদের কোনো প্রত্যক্ষ যোগসূত্র নজরে পড়ে না। ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্য নয়, এগুলি সবই পোড়ামাটির টালিতে অর্ধোত্থিত (alto-relievo)। বস্তুত ভাস্কর্যের কাজই নয়, মৃৎশিল্পের কাজ। কাদা-মাটিতে টালির (plaque) আকারে শিল্পগুলি তৈরি হবার পর আগুনে পোড়ানো হয়েছে। কোনোটিই ওজনে ভারি নয়, আকারে বৃহৎ নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, পরিবহনযোগ্য। কোনো কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত এগুলিকে ঐন্দ্রজালিক-ধর্মীয় অনুশাসনের উপাদান (magico-religious cultic specimen) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাতে ভারতীয় শিল্পের নান্দনিকস্বরূপ বিচারে ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হয়েছে। পুরাতত্ত্ববিদ ডক্টর দেবাঙ্গনা দেশাই লিখছেন :

> The depiction of coital couples and orgies is seen in terracottas of Chandraketugarh and Tamluk, dating from circa second century B.C. onwards and those of Kausambi and Bhita of the second to first century B.C. These

terracotta plaques, some with elaborate posture of congress, date before the period of the full-fledged Tantric movements and disprove the fact that the *maithuna* couples and orgiastic groups occur only in the Medieval temples.[1]

অনুবাদে : 'চন্দ্রকেতুগড় ও তমলুকে মৈথুনরত মিথুন এবং যৌথ-যৌনাচারের বীভৎসতা পোড়ামাটির শিল্প-নিদর্শনে দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে নির্মিত। এ ছাড়া দ্বিতীয় ও প্রথম খ্রিস্টপূর্বাব্দে গড়া পোড়ামাটির কিছু শিল্প নিদর্শন পাওয়া গেছে কৌশাম্বী ও বিহ্‌তাতে। এই পোড়ামাটির টালিগুলিতে দেখা যাচ্ছে সঙ্গমরত নরনারীর বহু বিচিত্র মিলনভঙ্গি। এগুলি তন্ত্রসাধনার ব্যাপক প্রচারের পূর্বযুগের শিল্পনিদর্শন। ফলে আমাদের যে ধারণা আছে—অর্থাৎ মৈথুনরত মিথুন অথবা যৌথ-যৌনাচারের নিদর্শন পাওয়া যায় শুধু মধ্যযুগের মন্দির ভাস্কর্যে—এরা সেটা অপ্রমাণ করে।'

হয়তো একই জাতের সিদ্ধান্ত থেকে ড. মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্ *মার্গ* পত্রিকায় লিখেছিলেন : 'Extant remains are certainly part of a continuous tradition for the representation of couples in sexual poses, which began with the beginning of the sculptures in India and until the British put a legal ban on secular obscene art'[2]

এইসব গবেষক পরিবেশিত ভ্রান্ত মতামতের জন্যই আমাদের এই পোড়ামাটির ভাস্কর্যের আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, যদিও এগুলি ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

প্রথমেই বলি, এই পোড়ামাটির টালিগুলি পাওয়া গেছে মূলত নয়টি প্রাচীন জনপদ থেকে :

(1) **তক্ষশীলা** : উত্তরাপথে, ভারতপ্রবেশের সিংহদ্বার
(2) **বারস** : উত্তরভারতে
(3) **বিহ্‌তা** : বিহারে
(4) **ঐচ্ছত্র** : বিহারের বেরিলী জেলায়; এককালে যা ছিল উত্তর-পাঞ্চাল রাজ্যের রাজধানী
(5) **কৌশাম্বী** : বৎস্য রাজ্যের রাজধানী
(6) **নাগার্জুনকোণ্ডা** : অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত বৌদ্ধযুগের একটি সমৃদ্ধিশালী বন্দর
(7) **তাম্রলিপ্তি** : বঙ্গদেশের মেদিনীপুর জেলায় দক্ষিণপ্রান্তে। সমুদ্রগামী অসংখ্য অর্ণবপোতে সমৃদ্ধ বন্দর
(8) **চন্দ্রকেতুগড়** : মৌর্যযুগ থেকে শুরু করে বাঙলার পাল যুগ পর্যন্ত এটি ছিল একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। বর্তমান 'বারাসাতে'র কাছে
(9) **হরিনারায়ণপুর** : বঙ্গদেশের দক্ষিণে একটি বিশিষ্ট বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র

এই পোড়ামাটির নিদর্শনগুলির ক্ষেত্রে ঘটেছে বিচিত্র এক জাতের দুর্ঘটনা। গবেষকদল সমালোচনাকালে যে সব নিন্দাসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন—amorous, lewd, couples showing blatantly sexual poses, orgiastic [অনুবাদে যা : প্রগল্ভ, কামুক, নির্লজ্জভাবে সঙ্গমরত মিথুন, যৌথযৌনাচারী] তাদের সঠিক সংজ্ঞার্থ জানাননি। ফলে, পাঠক বুঝে উঠতে পারেন না, শিল্পনিদর্শনগুলি কতদূর যৌনতাজ্ঞাপক অথবা অশ্লীল। পাঠক সচরাচর ধরে নেন যে, উপরিবর্ণিত নয়টি জনপদে প্রাপ্ত পোড়ামাটির শিল্পনিদর্শনে পাওয়া গেছে অঢেল মৈথুনরত মিথুন এবং যৌথযৌনাচারের নমুনা।

এই ধারণাটি আদ্যন্ত ভ্রান্ত। বাস্তবে এই নয়টি জনপদ থেকে যত শিল্পনিদর্শন পাওয়া গেছে তার **শতকরা নব্বইভাগই যৌনতাবর্জিত**। যে সব টেরাকোটা 'প্লাক'-এ মিথুনমূর্তি গড়া হয়েছে সেগুলির অধিকাংশই যুগলমূর্তি বা উত্তেজিত পর্যায়ের [আমরা যাদের এ-গ্রন্থে (পৃঃ 15-16) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মিথুন বলে চিহ্নিত করেছি]। তাদের যৌনাঙ্গ খোদাই করা হয়নি, তারা আদৌ নির্লজ্জ নয়। স্বীকার্য, সামান্য কয়েকটি মৈথুনরত মিথুনের আলেখ্য অথবা যৌথযৌনাচারী মিথুন, এবং cunnilingus অথবা fellatio। কিন্তু তারা সংখ্যায় কম, অত্যন্ত কম।

আমরাও বোধহয় একই জাতের ভুল করছি। ওই শব্দগুলি—"কম, বেশি, অত্যন্ত কম, যথেষ্ট বেশি"—শব্দগুলিও ব্যক্তিগত মূল্যায়ন-নির্ভর। আমরা বরং সুস্পষ্ট পরিসংখ্যান দাখিল করি :

বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এবং গ্রন্থে মুদ্রিত শতাধিক পোড়ামাটির নমুনার ভেতর আমরা এ পর্যন্ত আটটি বিক্ষিপ্ত নমুনা খুঁজে পেয়েছি, যাদের ইতিপূর্বে-কৃত শ্রেণিবিভাগ অনুসারে আমরা শেষ তিন-চারটি টাইপ-এর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি—অর্থাৎ ওই আটটি নমুনা 'সঙ্গমরত,' 'সঙ্গমানুষঙ্গের শিকার', 'অবাস্তব' বা

'যৌথযৌনাচারী'। দ্বিতীয় কথা, ওই আটটি নমুনা সংগৃহীত হয়েছে নয়টি স্থানের ভেতর মাত্র তিনটি জনপদ থেকে—চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক এবং কৌশাম্বী। ভাষান্তরে, বাকি ছটি জনপদ থেকে একটিও ওই জাতের টেরাকোটা নমুনা পাওয়া যায়নি। এই পরিসংখ্যানের প্রেক্ষিতে ডক্টর দেশাই এবং ডক্টর আনন্দ্-এর সিদ্ধান্ত দুটি আপনারাই পুনর্মূল্যায়ন করুন।

যে আটটি নমুনায় যৌনাচার বিকটভাবে প্রকট তার ছয়টি পাওয়া গেছে একই স্থানে : চন্দ্রকেতুগড়ে, একটি তমলুকে ও একটি কৌশাম্বীতে। এই যখন পরিসংখ্যানের তথ্যগত 'বেসিক ডাটা' তখন গবেষকেরা কীভাবে সমগ্র পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্পকে এভাবে কালিমালিপ্ত করেন ভাবতে অবাক লাগে!

উদাহরণ 1 : পরিবহনযোগ্য দশ সে.মি. (চার ইঞ্চি) উচ্চতা পোড়ামাটির টালিতে অর্ধোৎকীর্ণ (alto-relievo) একটি অবাস্তব যৌথযৌনাচারের দৃশ্য : টাইপ VIII; বর্তমানে কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত [চিত্র 2·1]। কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের তদানীন্তন কর্ণধার ড. এস. বিশ্বাস এই শিল্পবস্তুটির সম্বন্ধে বলেছেন :

> "পোড়ামাটির টালিতে দেখছি একটি যৌথ-যৌনাচারের দৃশ্য। কেন্দ্রস্থলে নায়ক-নায়িকা সঙ্গমরত। মেয়েটি তার নায়কের কোলের উপর পিছন ফিরে বসেছে, দুদিকে দুই পা প্রসারিত করে। নায়ক তাকে পিছন থেকে উপভোগ করছে। দুটি স্ত্রীলোক পিছন থেকে ঠেকা দিয়ে তাদের ভারসাম্যরক্ষায় সাহায্য করছে। আরও দুটি রমণী এক-এক পাশে অঞ্জলিমুদ্রায় উপবিষ্টা; কিন্তু তাদেরও পদদ্বয় দুদিকে প্রসারিত"।[3]



চিত্র 2.1 চন্দ্রকেতুগড় : উদাহরণ চিত্র 1-এর আলোকচিত্র



চিত্র 2.2 চন্দ্রকেতুগড় : উদাহরণ 1-এর সম্ভাব্য রেখচিত্র

বর্ণনা থেকে মনে হয় এটি আমাদের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী টাইপ VIII; ছয়টি বিবস্ত্রা রমণীর ভেতর একজনই মাত্র সংগমরতা। বাকি চারজন পত্নী বা উপপত্নী নায়ককে সাহায্য করছে মাত্র।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, ড. দেবাঙ্গনা দেশাই তাঁর

একে একে আলোচনা করা যাক :

1. চন্দ্রকেতুগড় [সেকালে গঙ্গার মোহনার কাছাকাছি চন্দ্রকেতুগড় ছিল একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র—বর্তমান বারাসাতের কাছাকাছি।

প্রাক-মৌর্যযুগ থেকে পালযুগ পর্যন্ত এই বন্দর-নগরের প্রতিপত্তি। এখান থেকে আবিষ্কৃত দ্বিশতাধিক শিল্পনিদর্শনের মধ্যে মাত্র ছয়টি পোড়ামাটির টালিতে গড়া অর্ধোৎকীর্ণ ভাস্কর্যে তীব্রভাবে মিথুনাচারের প্রকাশ।]

গবেষণায় এই একই শিল্পবস্তুটিকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন :

> 'সুঙ্গযুগের এই পোড়ামাটির প্লাকে একটি জটিল মিথুনাচারের অবতারণা করা হয়েছে। কেন্দ্রস্থলে একটি মিথুন, মৈথুনরত অবস্থায় উপবিষ্ট। কেন্দ্রীয় নায়কটি কিন্তু শীর্ষাসনে সঙ্গমরত—যে ভঙ্গি আমরা খাজুরাহোতে দেখতে পাই। এই মৈথুনরত নায়ক নায়িকাকে দুটি রমণী সাহায্য করছে। তারা অঞ্জলিমুদ্রায় প্রলম্বিতপদা। কেন্দ্রস্থিতা নায়িকা একই সঙ্গে দণ্ডায়মান একটি পুরুষের লিঙ্গমেহনরতা।'[4]

পাঠক হিসাবে আমরা রীতিমতো ধাঁধায় পড়ে যাই। দুটি বর্ণনায় প্রভেদ আশমান-জমিন। ডক্টর বিশ্বাস দ্বিতীয় কোনও পুরুষের সন্ধান পাননি, অথচ ডক্টর দেশাই দেখলেন কেন্দ্রস্থ মেয়েটি যুগপৎ দুজন পুরুষের কামচরিতার্থ করছে।

বাস্তবে, এই মূর্তিগুলি এমনভাবে জীর্ণ ও ক্ষয়িত যে কিছুই বোঝা যায় না—পুরুষ ও নারী মূর্তিকে পৃথকভাবে শনাক্ত করাই ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব হয়ে পড়ে! আমি মুল নিদর্শনটি আশুতোষ সংগ্রহশালায় দেখেছি, তাই বলব চিত্র 2.1 বেশ ভালো ফটো উঠেছে। কিন্তু তা থেকে আপনারা কি কিছু বুঝতে পারছেন? কে পুরুষ, কে নারী? বা, কয়টি ব্যক্তি আছে? সমালোচক ও গবেষকদল তাঁদের ছাত্রাবস্থায় লব্ধ জ্ঞান ও শব্দভাণ্ডারে অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে বর্ণনা করেছেন মাত্র।

ডক্টর দেবাঙ্গনা দেশাই এই শিল্পবস্তুটির বর্ণনাশেষে উপসংহারে বলছেন :

> 'It is difficult to suggest the exact significance of this **orgy.** Does it represent a **fertility rite**? Or does it indicate the practice described by Vatsyayana in which the women, dissatisfied with their polygamous husbands, smuggled men into their harem? But in the case of the latter type hypothesis the portrayal of the two women with outstretched legs and in *anjalimudra* cannot be explained away. These gestures are **ritualistic** in significance.[5] **(স্পষ্টাক্ষর মদীয়)**

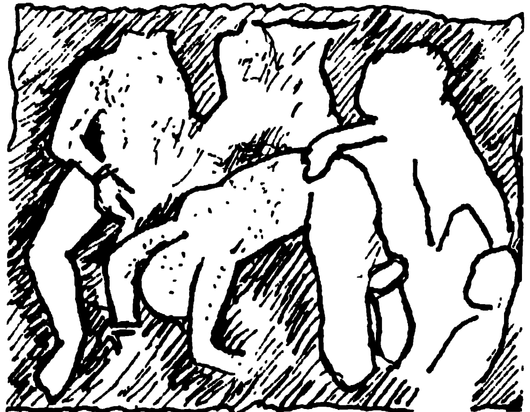
> [এই গুহ্য **যৌথযৌনাচারের** ধর্মীয় কাণ্ডকারখানার প্রকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। এটি কি **উর্বরতা-আচারের** নিদর্শন? না কি বাৎস্যায়ন-বর্ণিত বহুবল্লভা নারীর রূপায়ণ? সেই যারা তাদের বহুপত্নীক স্বামীদের ব্যভিচারে বিরক্ত হয়ে অন্দরমহলের ভিতর বহিরাগত পুরুষদের নিয়ে আসত? সে ক্ষেত্রে ওই দুটি প্রসারিতপদা রমণীদ্বয়ের ভূমিকা কীভাবে গ্রহণ করা যায়, যারা অঞ্জলিমুদ্রায় উপবিষ্টা? এই মুদ্রা ও ভঙ্গি তো শুধু **ধর্মীয় গুহ্যাচরণেই** দেখতে পাওয়া যায়।]

আমরা অনতিবিলম্বেই এ শিল্পনিদর্শনের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করব। আমাদের ধারণায় এ কোনো গুহ্য ধর্মাচরণের প্রতীক আদৌ নয়। এ বিষয়ে ডক্টর দেশাই নিজ সিদ্ধান্ত বিষয়ে যথার্থভাবেই সন্দিগ্ধ হয়েছেন।

কিন্তু তার পূর্বে অন্যান্য শিল্প নিদর্শনগুলি যাচাই করে দেখা যাক :



চিত্র 2.3 চন্দ্রকেতুগড় : উদাহরণ 2-এর আলোকচিত্র



চিত্র 2.4 চন্দ্রকেতুগড় : উদাহরণ 2-এর সম্ভাব্য রেখচিত্র

উদাহরণ 2—এটিও টাইপ VIII—অর্থাৎ অবাস্তব যৌথযৌনাচারের নিদর্শন। এ ক্ষেত্রেও দেখছি একটি পরিবহনযোগ্য পোড়ামাটির টালি, যার মাথায় ছিদ্র আছে। উচ্চতা সাড়ে ছয় সেমি (আড়াই ইঞ্চি)। নির্মাণকাল আনুমানিক দ্বিতীয়-তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দ (চিত্র 2.3)।

ডক্টর বিশ্বাস এই নমুনাটির সম্বন্ধে লিখেছেন :

> অর্ধোৎকীর্ণ শিল্পনমুনার কেন্দ্রস্থলে দেখছি একটি রমণীকে। সে ধনুকের আকারে বিচিত্র ভঙ্গিতে সঙ্গমরতা। একই সঙ্গে সম্মুখস্থ আর একজন পুরুষের সঙ্গে মুখমেহনরতা।[6]

এক্ষেত্রে অবশ্য ফিগারগুলি অনেক পরিষ্কার (চিত্র 2.4)। বেশ বোঝা যায়, কেন্দ্রস্থ রমণী যুগপৎ দুজন পুরুষের সঙ্গে কামক্রীড়ারতা।

ডক্টর দেশাই এটির উল্লেখ করেননি।

উদাহরণ 3—তৃতীয় উদাহরণও একটি পরিবহনযোগ্য ছোট 'প্লাক' (plaque)। উচ্চতায় পনের সেমি (ছ ইঞ্চি); অবাস্তব যৌথযৌনাচার, টাইপ VIII—নির্মাণকাল আঃ প্রথম খ্রিস্টপূর্ব। বর্তমানে এটিও কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহশালায় রক্ষিত (চিত্র 2.5)।

এবারও ডক্টর দেশাই দেখছি এর উল্লেখ করেননি ; কিন্তু ডক্টর বিশ্বাস বলেছেন :

> একটি পিঠ-উঁচু চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় নায়ক তার নায়িকার সঙ্গে সঙ্গমরত। মেয়েটি সালঙ্কারা। দ্বিতীয় একটি পুরুষ কামক্রীড়ায় অংশ নিচ্ছে। কেদারার পাশে মদিরাপূর্ণ ভৃঙ্গার, পূর্ণপাত্রে নানাবিধ আহার্য।[7]

এবারেও দেখা যাচ্ছে দুটি পুরুষ এবং একজন রমণী। যা সমকালীন সামাজিক অনুশাসনে অবাস্তব। কামদার কেদারা, মদিরাভৃঙ্গার ও খাদ্যপাত্র ইঙ্গিত দেয় এটির সঙ্গে কোন গুহ্যধর্মাচরণ সম্পর্কবিমুক্ত। এটি ব্যভিচারী অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিবিম্ব।

উদাহরণ 4—চতুর্থ উদাহরণটি আমাদের শ্রেণিবিন্যাস হিসাবে টাইপ VI—মৈথুনরত তথা দর্শনকামী (voyeurism)—চন্দ্রকেতুগড় থেকে একই কালের শিল্পনিদর্শন। ডক্টর দেশাই-এর গ্রন্থে ফটো-প্লেট 4।

দণ্ডায়মান মৈথুনরত একজোড়া নারী-পুরুষ। তৃতীয় এক ব্যক্তি—পুরুষ কি স্ত্রী বোঝা যায় না—ওদের দুজনকে ভারসাম্যরক্ষায় সাহায্য করছে।

উদাহরণ 5—চন্দ্রকেতুগড় থেকে সংগৃহীত এই পঞ্চম শিল্পনিদর্শনটিও প্রায় সমকালীন। এটিও 'টেরাকোটা-প্লাক'। ডক্টর দেশাইয়ের গবেষণা গ্রন্থে এটির আলোকচিত্র আছে (তাঁর গ্রন্থের ফটো-প্লেট 10)। এক্ষেত্রে দণ্ডায়মান অবস্থায় নরনারী মৈথুনরত। তৃতীয় ব্যক্তি না থাকায় এটিকে যৌথযৌনাচার বলা চলে না।

উদাহরণ 6—একটি দুর্লভ হস্তমৈথুনরতা রমণীর মূর্তি। 'উত্থানপদ' অবস্থায় মেয়েটি তার গোপনাঙ্গে তির



চিত্র 2.3 চন্দ্রকেতুগড় : উদাহরণ 3-এর আলোকচিত্র



চিত্র 2.4 চন্দ্রকেতুগড় : উদাহরণ 3-এর সম্ভাব্য রেখচিত্র

জাতীয় কোনকিছু প্রবিষ্ট করাচ্ছে। এমন আত্মকামী রমণীমূর্তি ভারতীয় ভাস্কর্যে কদাচিৎ দেখা যায়। বস্তুত আমি স্বচক্ষে কখনো দেখিনি। ফটোগ্রাফও নয়।

* * *

2. তমলুক [অর্থাৎ সে-কালের তাম্রলিপ্তি বন্দর। প্রাচীনকালে এই বন্দর থেকে বাঙালি নাবিকেরা চীন, যবদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দূরদেশে যাত্রা করতেন। মহাভারত এবং কালিদাসে এ বন্দরের উল্লেখ আছে। আছে ফা-হিয়েন (400 খ্রিঃ), হিউ য়েন-ৎসাঙ (640 খ্রিঃ) বা ইৎ সিঙ (800 খ্রিঃ)-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তেও।]

তমলুক থেকে অসংখ্য শিল্পনিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। তার ভেতর মাত্র একটিতে আমরা মিথুনাচারের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করি :

উদাহরণ 6—আশুতোষ সংগ্রহশালায় বর্তমানে রক্ষিত পোড়ামাটির থালায় অর্ধোৎকীর্ণ একটি শিল্পবস্তু। এটিকেও ওই একই সময়কালে চিহ্নিত করা যায়, অর্থাৎ আঃ দ্বিতীয়-প্রথম খ্রিঃ পূঃ। এবারও দেখছি একটি সৌখিন আরামকেদারায় একটি সঙ্গমরত মিথুন। তারা মুখোমুখি এবং মেয়েটি উপরে : পুরুষায়িতা-ভঙ্গিতে।

* * *

কৌশাম্বী : এলাহাবাদের কাছে, ত্রিবেণীসঙ্গমের অনতিদূরে, কৌশাম্বী সেকালে ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী বন্দর তথা শিল্পনগরী—বৎস্যরাজার রাজধানী। গঙ্গা যেহেতু সেকালে নাব্য ছিল তাই সমুদ্রগামী অনেক অর্ণবপোত কৌশাম্বীতে পৌছাতে পারত। কোশল এবং মগধে আগমনকারীদের কাছে এই বাণিজ্যকেন্দ্রটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণ 7—নয়াদিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত এই পোড়ামাটির শিল্প- নিদর্শনে যে মিথুনমূর্তিটি দেখেছি তাকে সঙ্গমরত বলা চলে না। সুদৃশ্য কামদার কেদারায় উপবিষ্ট নায়কের ক্রোড়ে নায়িকা বসেছে—এরা শৃঙ্গাররত মিথুন মাত্র।

* * *

আমাদের ধারণা হয়েছে যে, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকেরা এইসব শিল্পনিদর্শনগুলিকে তাঁদের প্রত্নতত্ত্বের তাত্ত্বিক কয়েকটি বাঁধা ছকে গণ্ডিবদ্ধ করতে চান। এই বাঁধা ছকটি ধর্মীয় গুহ্যপ্রকরণের (magico-religious cults) দ্বারা সীমায়িত। ডক্টর দেবাঙ্গনা দেশাই লিখছেন :

> Terracotta and allied objects of the ancient period offer two types of sexual representations:
> (i) **Cultic** and **ritual,** as in the examples of the female **deity** and male partner and crudely carved plaques bearing **sexual** and **orgiastic** themes;
> (ii) **Secular**, with poetic and **nagaraka** touches, fulfilling the demands of the sensuous public as in the examples of terracottas and secular subjects from Mathura, Rajghat, Aichchatra, Chandraketugarh and numerous excavated sites of the historic period.[8]
>
> [প্রাচীন যুগের এইসব পোড়ামাটির বা অন্যান্য বস্তুর শিল্পনিদর্শনগুলি দুইভাগে বিভক্ত করা যায় :
> (i) **ধর্মবিশ্বাসপ্রসূত** অথবা পুরোহিততন্ত্রের **সংস্কারাচ্ছন্ন অনুষ্ঠানের** অঙ্গ। যেমন দেখছি, **দেবীমূর্তি** বা তাঁর নায়কের ক্ষেত্রে এবং স্থূলভাবে নির্মিত 'প্লাক'গুলিতে, যাতে **উৎসবোন্মত্ত** নরনারীর **যৌনাচার** বিধৃত;
> (ii) **অনাধ্যাত্মিক** জাগতিক শিল্প। এগুলি **নাগর-শিল্পের** কাব্য-সুষমা মণ্ডিত। এই ধরনের পোড়ামাটির শিল্পবস্তু যথেষ্টভাবে ছড়িয়ে আছে ঐতিহাসিককালের নগরসভ্যতায়—মথুরায়, রাজঘাটে, ঐচ্ছত্র, চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি প্রাচীন জনপদে।]

আমরা লক্ষ্য করে দেখছি, এই উপসংহারটি লিপিবদ্ধ করার পরে গবেষেক ডক্টর দেবাঙ্গনা দেশাই তাঁর নিজের সিদ্ধান্তেই কিছু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি তারপরে লিখছেন :

> বিস্ময়ের কথা এই যে, ধর্মীয় মূর্তিগুলি এবং পুরোহিততন্ত্র-নির্দেশিত ভাস্কর্যগুলি কেন সমকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের দিয়ে নির্মাণ করানো হল না? ভারতশিল্পে সর্বত্র, এমন কি বহির্ভারতেও, আমরা অব্যতিক্রমভাবে লক্ষ্য করেছি, ধর্মসম্বন্ধীয় মূর্তিগুলির নির্মাণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সে-যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্করবৃন্দের ওপর।[9]

আমাদের মতে ডক্টর দেশাইয়ের শ্রেণিবিন্যাসের ভেতরেই রয়ে গেছে ভ্রান্তি। আর সেজন্যই তিনি উপসংহারে তাঁর নিজ-সিদ্ধান্তেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

প্রথম কথা, উপস্থাপিত আটটি দৃষ্টান্তের ভেতর গবেষক কোথায় দেখলেন দেবমূর্তি (deity)?

দ্বিতীয়ত, সমকালীন ধর্মবিশ্বাসপ্রসূত বা পুরোহিততন্ত্র নির্দেশিত কেন মনে করা হল এগুলিকে? কোন্ ধর্ম? কোন্ সমকালীন পুরোহিততন্ত্রের নির্দেশ? তান্ত্রিকরা তখনো অনাগত, বজ্রযান বা সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্ম ভারতে অজাত। তাহলে?

তৃতীয় কথা, বাৎস্যায়নবর্ণিত বহুবল্লভা নারীর যুক্তি কী ভাবে প্রযোজ্য? বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে এই বহুবল্লভা 'চিত্ররথ' নারীদের প্রসঙ্গে স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন : "But this is a rare exception of nymphomaniac girls, and is known as *Citraratha,* not prevalent in *Jambudwipa* "[10] ফলে একই সময়ে এক নারীর পক্ষে দুই পুরুষের সঙ্গে রতিক্রীড়ায় রত হবার অনুমোদন আদৌ নেই কামশাস্ত্রে। 'উল্লেখ করা' আর 'অনুমোদন করা' কি এক জিনিস? তাহলে তো কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামী ধর্মাবতারকে বলতে পারে 'হুজুর, ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ এবং খুনের কথা তো বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। আমার দোষটা কী?'

আরও একটা দিক লক্ষ্য কবার মতো। প্রদর্শিত শিল্পবস্তুতে ক্রমাগত দেখছি সৌখিন আসবাব—উঁচুপিঠ কেদারা, আরামকেদারা, পানীয় ভৃঙ্গার, মদের চাট! এগুলি ধর্মাচরণ ও পুরোহিততন্ত্রের সঙ্গে খাপ খায় না—এ সবই ব্যভিচারী অভিজাত সম্প্রদায়ের কামতৃপ্তির অনুষঙ্গ।

* * *

আমরা তাই মনে করি পোড়ামাটির এইসব শিল্পনিদর্শনগুলিকে—দুই নয়, তিন ভাগে বিভক্ত করা উচিত :

(i) **ধর্মীয় ও পুরোহিততন্ত্রের নির্দেশানুসারে**—যেমন যোনিদেবী, (Personified Yoni), ধনদেবী (Opulent Mother goddess), গৌরীপট-বিধৃত শিবলিঙ্গ [এগুলি আমাদের আলোচ্য যুগের কিছু পূর্বে নির্মিত : কুল্লি, যোয়াব, রানাঘুন্টাই, শাহীতুম্প, আমরী, নাল প্রভৃতি জনপদে, এবং তারও পূর্বকল্পে হরপ্পা, মহেন-জো-দরো, চানুদারোতে];

(ii) **অনাধ্যাত্মিক জাগতিক শিল্পসম্ভার**—নাগরশিল্পের কাব্যিক সুষমামণ্ডিত। উদাহরণ : পঞ্চচূড়া দেবী, গজলক্ষ্মী প্রভৃতি;

(iii) **ন্যক্কারজনক অশ্লীলতামণ্ডিত** (purely pornographic)—যা সমকালীন অবক্ষয়ী সমাজ-ব্যবস্থায় উদ্ভূত হয়েছিল। এগুলি শিল্পসমালোচনার লক্ষ্মণগণ্ডির বাইরের বস্তু।

আমাদের বিশ্লেষণের সিদ্ধান্ত নিম্নলিখিত উপসংহার :

(ক) আলোচ্য সময়কালে (তৃতীয় খ্রিঃ পূঃ থেকে তৃতীয় খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আনুমানিক ছয় শতাব্দী)—যখন এইসব পোড়ামাটি বা বালিপাথরের ভাস্কর্য খোদাই করা হয়েছিল তখন সেই সব জনপদে আবশ্যিকভাবে উপস্থিত ছিল এক বিশেষ শ্রেণির অর্থবান ক্রেতা। তারা রোম, পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে এইসব বন্দরে ক্রমাগত যাতায়াত করত—সার্থবাহ, বণিক, রাজপ্রতিনিধি, ব্যবসায়ীর দল। গবেষক রোজেনফিল্ডের ভাষায় : "The geographic position of India and the routes linking it with Rome, Iran and China made it an important centre of the civilized world in the first three centuries of the Christian era."[11]

এইসব ভাসমান বিদেশী এবং স্বদেশী ক্রেতাদের মুখ চেয়ে নানান আকর্ষণীয় বস্তুসম্ভার—বিশেষ করে যা ওজনে ভারি নয়, সৌখিন, ঘর-সাজাবার উপকরণ—নির্মিত হতো। সিল্কের কাপড়, গজদন্তের শিল্পবস্তু, চুনি-পান্না-বসানো অলঙ্কার, মৃগনাভি, চন্দনকাঠের কারুকৃতি প্রভৃতি। তাম্রলিপ্তির মতো বন্দরে, চন্দ্রকেতুগড় অথবা কৌশাম্বীর মতো বাণিজ্য- নগরে তখন বহু বিদেশী নাবিক ও রাজপুরুষের সমাবেশ ঘটত, যারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গবঞ্চিত। তাদের কাছে এই জাতের 'পর্নোগ্রাফিক' প্লাক আকর্ষণীয় বস্তু। ফলে এইসব জনপদে যেমন জনপদবধূদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল, তেমনি বাজারে এই জাতের অশ্লীল শিল্পবস্তুরও চাহিদা বেড়ে যায়। ইতিহাস বলে, একই ব্যাপার ঘটেছিল পম্পাই এবং হারকিউলেনিয়াম জনপদে, খ্রিস্টজন্মের দুই-তিন শতাব্দী পূর্বে। সেখানে গড়ে উঠেছিল এক একটি 'ইরোটিকা মিউজিয়াম' (চূড়ান্ত পর্নোগ্রাফিক শিল্পনিদর্শনের সংগ্রহশালা)। এখনো তা বর্তমান।

(খ) খ্রিস্টজন্মের দু-তিন শতাব্দী আগে-পিছে উত্তর দিক থেকে ক্রমাগত বিদেশীদের আক্রমণ হয়েছে, শুধু শক-হুনদলই নয়, যুচি, কাহ্ন, কুষাণ, পহ্লব প্রভৃতি। ধীরে ধীরে বহির্বাণিজ্যের যে বাতাবরণ ও সড়কটি উত্তরাপথে ছিল—খাইবার ও বোলান গিরিবর্ত্মের ভেতর দিয়ে—তা রুদ্ধ হয়ে যায়। বিদেশীদের যাতায়াত কমে যায়। তাই ওইসব জনপদ টিকে থাকলেও সেখানে এইজাতের

সৌখিন পোড়ামাটির 'প্লাক' বাজার হারায়। দ্বিতীয় শতাব্দীর পর তাই আর তা আমরা দেখতে পাই না।

(গ) এই শিল্পসম্ভারগুলির ওজন ছিল কম। পরিবহনযোগ্য বস্তু, আর তার মাথায় ছিদ্রের অবস্থিতি সঙ্কেত দেয় যে, এগুলি নাবিকদের কেবিনে, সার্থবাহদের প্রমোদকক্ষে গৃহশোভাবৃদ্ধির কাজে লাগত।

(ঘ) বাৎস্যায়ন বহুবল্লভা নারীর কথা বলেছেন ব্যতিক্রম হিসাবে। তাদের 'চিত্ররথ'রূপে চিহ্নিত করেছেন—আরও বলেছেন আর্যাবর্তের বাইরে 'স্ত্রী-রাজ্যে' (বা 'প্রমীলারাজ্যে') ছিল তাদের বসতি—এ জন্য সভ্যতার আদিযুগ থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত আমরা কোথাও মন্দির-ভাস্কর্যে বহুবল্লভা নারীমূর্তি দেখতে পাই না—অর্থাৎ কোনো নারী যুগপৎ দুজন পুরুষের সঙ্গে কামক্রীড়ায় রত। পরবর্তী যুগে—খাজুরাহো, কোনার্ক, অম্বরনাথ, ভাবকায়—কেন তা পাই সে প্রশ্ন আমাদের বর্তমান পরিচ্ছেদের সীমারেখার বাহিরে। কিন্তু পোড়ামাটির শিল্পসম্ভারে কেন তা ব্যতিক্রম হিসাবে পাচ্ছি তার একটা সম্ভাব্য যুক্তি কি এ রকম হতে পারে?—

নারীসঙ্গ-বঞ্চিত বিদেশী বণিক ও রাজপুরুষেরা ব্যয়ভার ভাগাভাগি করে নেবার প্রয়োজনে দু-তিনজন পুরুষ হয়তো একটি বারবনিতাকে অর্থমূল্যে নিয়োগ করত। সেক্ষেত্রে এক নারীর পক্ষে একসঙ্গে দুটি বা তিনটি পুরুষকে দেহদান করার দৃশ্য আর অকল্পনীয় থাকে না। পুরোহিততন্ত্রের ধর্মীয় নির্দেশ অথবা রুচিশীল নাগরশিল্পের নির্দেশ না থাকলেও এতে পর্নোগ্রাফির নির্দেশ ছিল। ফলে এই বস্তুগুলির বাজারও ছিল। তাই তাদের অস্তিত্ব স্বাভাবিক।

(ঙ) শ্রীমতী দেশাই-এর বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের জবাবটাও এখানেই। তিনি এই পোড়ামাটির নিদর্শনগুলিকে মাত্র দুইভাগে বিভক্ত করেছিলেন— ওদের মধ্যে দেব বা দেবীমূর্তির কল্পনা করেছিলেন। বাস্তবে এগুলি নির্ভেজাল পর্নোগ্রাফিক। আর সেটাই ওদের স্থূলতার হেতু। যেসব দেশে কুরুসোয়া, ত্রুফো, ডি সিকা, ফেলিনী, বার্গম্যান অসাধারণ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন সেসব দেশে গেলে দেখবেন—'ব্লু-ফিল্মের' ডিরেকটারদল চলচ্চিত্র-সুষমা নিয়ে মাথা ঘামায় না। দর্শক যা দেখতে চায়, ঠিক তাই তারা দেখায়। আর যেসব দেশে প্রকাশ্যে সেইসব 'নীল-চলচ্চিত্র' দেখানোর অনুমোদন নেই, সেই সত্যজিৎ-ঋত্বিকের দেশেও কুবের-তনয়রা রুদ্ধদ্বার কক্ষে আজও তা দেখে থাকেন। সেখানেও সৌখিন আসবাব, ভৃঙ্গারপাত্র, শূলপক্ক মাংস এবং মদের সঙ্গে পরিবেশিত হয় একই শৃঙ্গাররস।

সেখানেও শিল্পবস্তুর স্থূলতা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

আমাদের ধারণা—টেরাকোটা যুগের অশ্লীল প্লাকগুলির ব্যাখ্যা শুধুমাত্র এভাবেই হতে পারে। ❑

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কেন মিথুন?

[এই পরিচ্ছেদে মিথুনাচার সম্পর্কে শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। চিত্রবহুল নয় তা। তাই মার্জিনে সমান্তরাল একটি অনুভাবনার চিত্রকল্প সাজানো গেছে। ভিক্টোরিয় রক্ষণশীলতার প্রাগ্বর্তী যুগে পশ্চিমখণ্ডে শিল্পচেতনায় নন্দনতত্ত্ব ছিল অবাধ। অনুরূপভাবে, ব্রাহ্মসমাজের বিধিনিষেধ আরোপের প্রাক্কালে, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, ভারতচন্দ্রের লেখনী ছিল নিরঙ্কুশ। এখানে তাঁদের কাব্য-অনুসারী কিছু চিত্র-উদ্ধৃতি সংযোজন করা গেছে। কবিরচিত 'প্রেম-শৃঙ্গার-মৈথুনের' চিত্ররূপ। ভারতীয় ভাস্কর্যের সূর্য অস্তমিত হবার পরেও, ইংরেজ-আগমনের ঠিক পূর্বযুগে, শিল্পী-মানসের একটি প্রতিচ্ছবি এখানে হয়তো পাওয়া যাবে। এই সঙ্গে ভারতভ্রমণকালে লেখকের আঁকা কিছু স্কেচও পাদপূরণার্থে সন্নিবেশিত হল।]



শুধু কোনার্ক-খাজুরাহো নয়, বৃহত্তর ভারতবর্ষের সর্বত্র—নেপাল, সিকিম, ভুটান-সহ অবিভক্ত ভারতের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে—মন্দির গাত্রে অযুত-নিযুত মিথুন মূর্তি। অরুণাচল থেকে গুজরাট, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী। কোনার্ক-খাজুরাহোতে তারা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে 'অশ্লীল' ভঙ্গিতে উপস্থাপিত, এই যা। না হলে, নির্লজ্জতার নিরিখে, ভাবকা, অম্বেরনাথ, নেপাল প্রভৃতি স্থানের মন্দিরেও তারা সমানভাবে 'অশ্লীল'।

গির্জায়, মসজিদে, সিনাগগে, বৌদ্ধদের চৈত্যে বা বিহারে সারা পৃথিবীতে এ জিনিস তো আমরা দেখতে পাই না। ফলে কেন এমনটা হল, এ সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে প্রশ্নটা জাগবেই।

আমাদের মূল প্রশ্নটা ব্যক্ত হয়েছে গবেষিকা দেবাঙ্গনা দেশাইয়ের আর্ত জিজ্ঞাসায় : "If sex were considered as a distraction and hindrance of self-realisation in the highest thought and wisdom of our culture, why was it so flagrantly depicted on its religious buildings? Why is it that temple-sculpture does not reflect ideology expounded in the Upanishads and the Gita?"[1] **['আত্মোপলব্ধি এবং তুরীয় চিন্তাধারায় যৌনতা শুধু বাধারই সৃষ্টি করে'—এ তত্ত্ব যদি ভারতীয় জ্ঞানচর্চায় এবং সংস্কৃতিতে স্বীকৃত তাহলে তা কেন এত নির্লজ্জভাবে আমাদের মন্দিরগাত্রে বিচিত্রিত হল? কেন সেখানে প্রতিফলিত হল না উপনিষদ এবং গীতার বাণী?]**

মন্দির-ভাস্কর্যে মিথুনাচার সম্বন্ধে আদিসূরীর দল—মিত্র (1822-91) বা জেমস্ ফার্গুসন (1808-86) উড়িয়্যার মন্দিরগাত্রে এই মূর্তিগুলি লক্ষ্য করেছিলেন (খাজুরাহোর কথা তখন জানা ছিল না) আলোচনাও করেছিলেন; কিন্তু তাদের উৎস, উদ্দেশ্য বা



চিত্র 3.1 পহিল বদরি কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য় পিড়-এ অনঙ্গ।—ভারতচন্দ্র

হেতু সম্বন্ধে তেমন কিছু বলে যাননি। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (1882-1926) শুধুমাত্র তাঁর বিরক্তি-মিশ্রিত বিস্ময়টুকু প্রকাশ করেছেন : "This is the most perplexing feature of Orissan Architecture" [উড়িষ্যা স্থাপত্যে এটাই সবচেয়ে সমস্যাজড়িত প্রশ্ন][2]

'বাংলার ইতিহাস'-লেখক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (1885-1930) একই কথা বললেন : "The presence of indecent figures on religious edifice is still a puzzle" [ধর্মমন্দিরের বহির্গাত্রে এই নীতিবিগর্হিত মূর্তিগুলি আজও এক অমীমাংসিত প্রশ্ন][3]

লক্ষণীয়, ঠিক কোন্ জাতের মূর্তিকে এঁরা নীতি-বিগর্হিত বা indecent বলেছেন তা স্পষ্ট নয়। যুগলমূর্তি, আলিঙ্গনাবদ্ধ মিথুন বা চুম্বনরত নরনারীকে সম্ভবত তাঁরা নীতি-বিগর্হিত বলে চিহ্নিত করেননি—নিম্ন যৌনাঙ্গ বিকশিত করা সঙ্গমরত মূর্তিতেই আপত্তি জানিয়েছিলেন। এটা অবশ্য আমাদের অনুমান।

প্রায় আশি-নব্বই বছর আগে *মানসী* পত্রিকায় দেখছি এই বিষয় নিয়ে কয়েক সংখ্যায় আলোড়ন উঠেছিল। তদানীন্তন ভারত সংস্কৃতির দিকপালেরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (1864-1919), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (1861-1930), আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (1864-1938), মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (1853-1931) প্রভৃতি এ বিষয়ে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক *মানসী* পত্রিকার ১৩৩০ (1923) বঙ্গাব্দের আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন সংখ্যা এবং পুনরায় পর বৎসরের আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যাগুলি দেখতে পারেন। আমরা সেই দীর্ঘ দুষ্প্রাপ্য আলোচনার সংক্ষিপ্তসার এখানে পরিবেশেন করছি।



চিত্র 3.2 'অঙ্গনে আওব যব রসিয়া...' বিদ্যাপতি

অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত (1885-1936) একবার রোগশয্যায় শায়িত মহাপণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে মন্দির ভাস্কর্যের এই অসঙ্গতির বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করেন। পরে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং রাজেন্দ্রলালের সঙ্গেও তিনি আলোচনা করেন। বিভিন্ন ভারতবিদ পণ্ডিতের মতামত সংগ্রহ করে বিপিনবিহারী '*মানসী*' পত্রিকার ওই সাতটি সংখ্যায় একটি দীর্ঘ ধারাবাহিক আলোচনা করেছিলেন।

বিপিনবিহারীর প্রশ্নটি ছিল :

> 'উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের মন্দিরগাত্রে বীভৎস erotic figure-এর সমাবেশ কেন হইল,' এই প্রশ্ন উত্থাপন করা মাত্র আমরা তাহাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। অনেকের মতে, ইহা আর কিছু নহে, কেবলমাত্র হিন্দুর জাতীয় চরিত্রাপকর্ষের নিদর্শন স্বরূপ হিন্দুর দেবমন্দিরে চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সত্যিই কি তাহাই? (লক্ষণীয় কোনার্ক বা খাজুরাহো সম্বন্ধে এ প্রশ্ন বিপিনবিহারী তোলেননি)

রোগশয্যায় শায়িত রামেন্দ্রসুন্দর (তখন তাঁর বয়স ৫৫) প্রত্যুত্তরে বললেন, "আপনি আজ যে প্রশ্নের উত্থাপন করিলেন সে সম্বন্ধে আমি কিছু ভাবিয়া দেখিয়াছি। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরগাত্রে ঐ সকল মূর্তি থাকা সত্ত্বেও আসমুদ্র ভারতবর্ষের নরনারী পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে সেই মন্দির দর্শন করিতে আসেন। কখনো কাহারো কোন দ্বিধাবোধ হয় না। শুধু জগন্নাথের মন্দিরে কেন, ভুবনেশ্বরের মন্দিরে, কোনার্কের সূর্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষে এইপ্রকার বীভৎস মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। ...নিশ্চয়ই উড়িষ্যার শিল্পকলার উহা একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি তিনি একখানি পুঁথি পাইয়াছেন, বোধহয় খ্রিস্টিয় দশম কি একাদশ শতাব্দীর হইবে। তাহাতে শিল্পশাস্ত্রের নিয়মাবলী বিবৃত রহিয়াছে; মন্দির নির্মাণ সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত আছে। মন্দিরগাত্র সুশোভন করিবার জন্য এইরূপ erotic figures-এর আবশ্যিকতা সেখানে লিপিবদ্ধ করা আছে।"

হরপ্রসাদ কোন্ পুঁথির কথা বলেছিলেন জানি না, উড়িষ্যা স্থাপত্য বিষয়ে কোনো প্রাচীন পুঁথিতে মিথুনাচার ভাস্কর্যের যাথার্থ্য বিষয়ের আলোচনা আমাদের অন্তত নজরে পড়েনি। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু (1901-1972) এ বিষয়ে অনেকগুলি পুঁথি সংগ্রহ ও সংকলন করেন। তার ভেতর '*ভুবনপ্রদীপ*' প্রধান। আমরা কিন্তু সেখানে কোথাও মন্দিরগাত্রে মৈথুনরত মিথুন খোদাই করার নির্দেশ খুঁজে পাইনি। একটিমাত্র শ্লোক আমরা পেয়েছি শৈবমন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে :

শেষং মঙ্গলবিহগৈঃ শ্রীবৃক্ষস্বস্তিকৈর্ঘটৈঃ।
মিথুনৈঃ পত্রবল্লীভিঃ প্রমথৈশ্চোপশোভয়েৎ।।

অর্থাৎ শিবের মন্দির নির্মাণের সময় নিম্নলিখিত চিহ্নগুলি উৎকীর্ণ করা প্রয়োজন : সাপ, মঙ্গলচিহ্ন, পাখি, বিল্বপত্র, ঘট, স্বস্তিকচিহ্ন এবং মিথুন। এখানে 'মিথুন' শব্দটি প্রকৃতি-পুরুষের সহাবস্থানসূচক। তারা যে মৈথুনরত



চিত্র 3.3 'কটি সুন্দর নিন্দিত মৃগপতি গজগামিনী কামিনী সিংহগতি।'—ভারতচন্দ্র

অবস্থায় থাকবে এমন কোন নির্দেশ নেই। বাল্মীকির 'ক্রৌঞ্চমিথুন', কালিদাসের 'হংসমিথুন' এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের 'বাক-প্রাণ মিথুন' শব্দে মৈথুনকার্যের কোনো ব্যঞ্জনা নেই।

> যতদূর স্মরণ হয় সার উইলিয়াম হান্টার তাঁহার উড়িষ্যার বিবরণীতে এই সকল মূর্তি বৈষ্ণবধর্ম সম্পৃক্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, জগন্নাথদেবের মন্দির বৈষ্ণবদিগের প্রধান মন্দির, প্রধান তীর্থ। কাজেই সেখানে বৈষ্ণব সাধনপদ্ধতির অনুরূপ আদিরসাত্মক মূর্তি চিত্রিত হইবে, ইহার আর বিচিত্র কী?

স্যার হান্টারের এ মত গ্রাহ্য নয়। নানা কারণে। প্রথমত বৈষ্ণব সাধনপদ্ধতির সঙ্গে মৈথুনের কোন সম্পর্ক নেই, আছে সহজিয়া পদ্ধতির সঙ্গে। কিন্তু 'সহজিয়া' মত প্রচারিত হবার বহু পূর্বযুগ থেকে ভারতীয় মন্দিরে মৈথুনরত মিথুন মূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় কথা : জগন্নাথদেবের মন্দিরে বৈষ্ণব ভাবধারার মূর্তি বিশেষ দেখা যায় না—রাসলীলা, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি বৃন্দাবনলীলা সেখানে বিচিত্রিত হয়নি।

মানসী পত্রিকার ধারাবাহিক রচনায় দেখছি বিপিনবিহারী এরপর তাঁর বন্ধু গৌরহরি সেনকে নিয়ে হাজির হলেন পণ্ডিত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র দরবারে। কথাপ্রসঙ্গে বিপিনবিহারী অক্ষয়কুমারকে প্রশ্ন করেন, "রামেন্দ্রবাবুর থিওরিটার সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য শুনিতে ইচ্ছা করি।" অক্ষয়কুমার বললেন,

> ও সম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই, কিন্তু আমি একথা লইয়া উড়িষ্যার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সদাশিব শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার একটি থিওরি আছে : সেটি খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কিছু গলদও আছে। সদাশিবের মত ঔপরিষ্ট কার্যের চিত্র উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রেই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্রিত পুরুষগুলি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রতিকৃতি। বৌদ্ধ যুগের শেষাশেষি নিশ্চয়ই এমন অবস্থা আসিয়াছিল, যখন বৌদ্ধ ধর্মকে হেয়, জঘন্য, কদর্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

আমাদের বিচারে সদাশিব শাস্ত্রী মশায়ের এ মতটি আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সেকথা অক্ষয়কুমারও বুঝতে পেরেছিলেন। সদাশিবের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাঁর মতকে 'সমীচীন' বলে অভিহিত করে প্রায় একনিশ্বাসে বলেছেন, এ মতে কিছু 'গলদ'ও আছে।

প্রথম কথা : সদাশিবের আপ্তবাক্য ব্যতীত মৈথুনরত মিথুনের পুরুষমূর্তিগুলি যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের তা বোঝার কোনো উপায় নেই। বৌদ্ধসন্ন্যাসীর মস্তক মুণ্ডিত, অথচ নির্মিত মূর্তিগুলির মাথায় বাবরি। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রত্যাশিত ত্রিরত্ন, দণ্ড, উত্তরীয়, ভিক্ষাপাত্র কোনো কিছুরই আভাস নেই। সাধারণ দর্শক কীভাবে বুঝবে যে, ওরা বৌদ্ধ (অর্থাৎ বজ্রযানী তান্ত্রিক) সন্ন্যাসী? সদাশিবই বা তা কী করে বুঝলেন?

দ্বিতীয় কথা : যে যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দানা বেঁধে উঠছিল, অজাতশত্রু যেযুগে

'শোণিতের স্রোতে' বৌদ্ধধর্ম মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন তার বহু যুগ পরে মন্দিরে এই মিথুন মূর্তিগুলি উৎকীর্ণ করা হয়। যে যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তখন এমন ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারত। তবু মনে রাখতে হবে মহাযান বৌদ্ধধর্মে মৈথুনকার্যকে ধর্মের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা হয় না।



চিত্র 3.4 তিমির দিক ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন-রাতিয়া।।

তাছাড়া এই মন্দিরগুলি যখন নির্মিত হয়, তখন উড়িষ্যা থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিতাড়িত—পুষ্পগিরি, রত্নগিরি প্রভৃতি কয়েকটি সঙ্ঘারামে কোনোক্রমে টিকে আছে। অন্যদিকে বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম তখনো ঘাঁটি গাড়েনি। ফলে সেই সময়ে এ-জাতীয় 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা' দেবার উগ্রবাসনা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তৃতীয়ত : মৈত্রেয় মশাই এবং ত্রিবেদী মশাই দুজনেই বিচার করেছেন 'সাবজেক্টিভ' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাঁদের অভ্যুপগম (hypothesis) হচ্ছে মূর্তিগুলি 'জঘন্য, ন্যক্কারজনক, বীভৎস এবং অশ্লীল।' কিন্তু কার দৃষ্টিতে? কোন্ দর্শকের কাছে? যাবতীয় সাধারণ দর্শকের নেই রামেন্দ্রসুন্দরের মতো সুন্দর অপাপবিদ্ধ দৃষ্টি অথবা অক্ষয়কুমারের মতো অক্ষয় দেবদুর্লভ চরিত্রগুণ। তাছাড়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস— জিজ্ঞাসিত হলে তাঁরাও স্বীকার করতেন, যৌনতার প্রসঙ্গ বাদ দিলে মূর্তিগুলির সৌন্দর্য অনস্বীকার্য। তাদের মুখভাবে ও দেহ-সৌকুমার্যে বীভৎসতার বাষ্পমাত্র নেই।

যে প্রশ্নগুলি আপনার-আমার মনে জেগেছে সেটাই শেষ পর্যন্ত বললেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ। বিপিনবিহারী—ধারাবাহিক রচনায় দেখছি—অতঃপর তাঁরই দ্বারস্থ হয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ছাত্র, অক্ষয়কুমার ঐতিহাসিক, কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ দার্শনিক। দেখা যাচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক দার্শনিক বিচারে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি এক নতুন দিগন্তে আকর্ষণ করতে পেরেছেন :

> উড়িষ্যায় মন্দিরগাত্রের চিত্রসম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার মতভেদ আছে। ওই যে ভিতর ও বাহির, স্বর্গ ও নরক উহা ঠিক ঐভাবে দেখা যায় কি না তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। 'নরক' বলিলে যে বিভীষিকার ভাব মনে উদয় হয় ঐ ভাস্কর্যগুলি দেখিয়া তাহা হয় কি? হইতে পারে, বিশুদ্ধচিত্ত সাধুসজ্জনের চিত্তে ঘৃণার উদ্রেক হয়, কিন্তু আপামর জনসাধারণ বোধহয় নেহাৎ ঘৃণার চক্ষে দেখেন না। মানুষের মধ্যে যে পশুটি সুপ্ত হইয়া আছে, সে যে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিবে না, এমন প্রতিশ্রুতি কেহই দিতে পারিবেন না। য়ুরোপের ক্যাথিড্রালগুলি সম্বন্ধে কিন্তু ঐ স্বর্গ-নরকের থিওরিটা খাটে। সে সকল মন্দিরগাত্রে শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার চিত্রিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে খ্রিস্টানের মনে ভীতি উৎপাদন করে। সে শিল্প-নিদর্শন বাস্তবিকই বীভৎসরসমণ্ডিত। কিন্তু আমি জগন্নাথ মন্দির সম্বন্ধে বলিতে চাহি যে, উহার তাৎপর্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

* * *

এইখানে বিংশ শতাব্দির প্রথম পাদে ভারতবিদ পণ্ডিতদের আলোচনা স্থগিত রেখে আমরা কয়েকটি বিষয়ে পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই :

(১) লক্ষণীয়, আলোচক পণ্ডিতবর্গ বারে বারে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের কথা বলেছেন। ক্বচিৎ কখনো কোনার্কের উল্লেখ আছে, কিন্তু খাজুরাহোর উল্লেখ কেউ করেননি। তার হেতু বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে খাজুরাহো ছিল ঘন জঙ্গলে আবৃত, অগম্য এবং বস্তুত অজ্ঞাত। টমাস গ্রে-র ভাষায়

খাজুরাহোর অবস্থা তখন সমুদ্রগভীরে 'Full many a gem of purest ray serene'। কোনার্কও দুর্গম। পুরী থেকে সমুদ্রতীরবর্তী বালুবেলায় সারারাত গোযানে ভ্রমণ করলে সেখানে পৌঁছানো যেত। বিপিনবিহারী যেসব পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ আদৌ স্বচক্ষে কোনার্ক দেখেছেন কি না সন্দেহ। তবে ফার্গুসন কোনার্কের সূর্যমন্দির দর্শন করেছিলেন 1837 খ্রিস্টাব্দে। তিনি তাঁর অমূল্যগ্রন্থে একটি স্কেচও রেখে গেছেন।[4] সেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে ফার্গুসনের আঁকা স্কেচের একটি অনুলিপি এ



*চিত্র 3.5 মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইনু
নয়ন ন তিরপিত ভেল,
লাখ-লাখ যুগ হিয়ে-হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।।'—বিদ্যাপতি*

গ্রন্থে দেওয়া গেছে। আমার দেখা ফার্গুসনের গ্রন্থের পাতা এমনই পাঁপড়- ভাজা হয়ে গেছে যে তার 'ফটোকপি' করানো গেল না। বাধ্য হয়ে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে (p. 233—চিত্র 12.2)সেটির অনুলিপি করেছি। সার রাজেন্দ্রলাল গোযানের সাহায্যে মন্দিরটি পরিদর্শন করেন 1868 সালে। তাঁর অনুরোধে তদানীন্তন বড়লাট সার অ্যাশলে ইডেন 1869 সালে এ মন্দির পরিদর্শন করেন।

(২) কিন্তু বিপিনবিহারীর আলোচনায় প্রায় প্রত্যেকটি পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের 'অশ্লীল' মূর্তির কথা। ভুবনেশ্বর ও কোনার্কের উল্লেখ মাঝেমাঝে থাকলেও অধিকাংশই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের কথা বলেছেন।

আমি জগন্নাথ মন্দির প্রথম দর্শন করি 1948 সালে। তাবপর 2003 সাল পর্যন্ত পঞ্চান্ন বছরে অন্তত ত্রিশ বার সেই মন্দিরে গিয়েছি, কিন্তু একবারও একটিও 'অশ্লীল' মিথুনমূর্তি আমার বা আমার সঙ্গী-সঙ্গিনীর নজরে পড়েনি। আমার বিশ্বাস, আপনারাও ওই সময়কালে তা দেখতে পাননি। তাহলে জগন্নাথ মন্দিরের প্রসঙ্গ গত শতাব্দীর প্রথমপাদে অতগুলি পণ্ডিতের আলোচনায় উত্থাপিত হল কেন? সে কৈফিয়তটাই এবার দিই—

পুরীতে জগন্নাথদেবের মূর্তি কোন্ বিস্মৃত অতীতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হযেছিল তাব সঠিক নির্দেশ নেই, কিন্তু আমরা যে বিশাল মন্দিরটি বর্তমানে দেখি তা নির্মাণ করেছিলেন কলিঙ্গরাজ চোড়গঙ্গদেও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে (1100-1150)। ভুবনেশ্বরেব অধিকাংশ বৃহৎ মন্দিব নির্মিত হয়েছিল তার পূর্বযুগে এবং কোনার্ক তার প্রায একশ বছব পবে (1200-1250)। পূর্বযুগে



*চিত্র 3.6 'গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।'—বিদ্যাপতি*

ভুবনেশ্বরে এবং পরবর্তীকালের কোনার্ক মন্দিরে মিথুনাচার অত্যন্ত প্রকট, কিন্তু পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে সেই তথাকথিত 'অশ্লীল' মূর্তিগুলি না দেখতে পেয়ে রীতিমতো বিস্মিত হয়েছিলাম। 1980 সালে যখন বাঙলায় *"ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন"* গ্রন্থটি রচনা করি তখন এই সঙ্গত প্রশ্নের কোনো জবাব আমি পাঠকবর্গকে দিতে পারিনি।[5] অর্থাৎ কেন অতগুলি পণ্ডিত বিংশ শতাব্দির প্রথম পাদে জগন্নাথদেবের মন্দিরে অশ্লীল মূর্তির কথা বলেছিলেন। লিঙ্গরাজ এবং কোনার্ক মন্দিরের মধ্যবর্তীকালে নির্মিত জগন্নাথ মন্দিরে কেন 'উৎকট' মিথুনমূর্তি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত?

সম্প্রতি এই সমস্যার একটি সমাধান খুঁজে পেয়েছি। সে সমাধানটি এ গ্রন্থের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে (মিথুন : পুরীর প্রধান মন্দিরে মিথুনাচার) সন্নিবেশিত করা গেছে।

1962 সালে ফ্রান্সিস লীসন এ বিষয়ে একটি গবেষণাগ্রন্থ[6] প্রকাশ করেন। ভারতীয় মন্দিরে মিথুনাচারের সম্ভাব্য হেতুগুলি তিনি নানান সূত্র থেকে সংকলন করেছিলেন। তাঁর মতে সম্ভাব্য হেতুর সংখ্যা আট। এই আটটি হেতুর মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তা তিনি বলেননি। তাঁর নিজস্ব কোনো মতামতও দাখিল করেননি। সেটা তিনি পাঠকের বিচারবুদ্ধির ওপরে ছেড়ে দিয়েছেন।

লীসনের সূত্র অনুসারে আমরা মিথুনাচারের যাথার্থ্য যাচাই করতে পারি :

(1) ONENESS : **(একমেবাদ্বিতীয়ম)** : মিথুনমূর্তিগুলি সৃষ্টির প্রতীক—স্ত্রী-পুরুষের মিলনে জগতপ্রপঞ্চের সৃষ্টিতে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান—'ওঁ' মন্ত্রের মতো।

(2) BLISS : **(আনন্দ)** : পার্থিব মাধ্যমে সেই মন্ত্রটির উদঘাটন—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।' [আনন্দই বিশ্বপ্রপঞ্চকে প্রাণিত করে]

(3) TEMPTATION : **(প্রলুব্ধিকরণ)** : নিছক কামভাবের উদ্রেক করতেই মিথুন মূর্তিগুলি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। প্রকৃত সাধককে পরীক্ষা করাই হচ্ছে মুল উদ্দেশ্য।

(4) INNOCENCE : **(সরলতা)** : শিল্পীরা তাঁদের সারল্যের কারণে মূর্তিগুলি গড়েছেন—নৃত্যগীত, শিকার, যুদ্ধের মতো কামকেলিও জীবনের এক অনিবার্য পর্যায়—এই সরল বিশ্বাসে।

(5) PROTECTION : **(তুক হিসাবে)** : কু-দর্শক অথবা অপদেবতার কু-দৃষ্টি থেকে মন্দিরকে রক্ষা করতে।

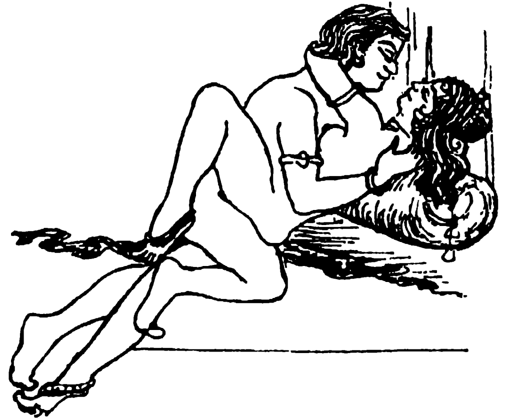
(6) ATTRACTION : **(আকর্ষণ)** : সাধারণ দর্শককে আকৃষ্ট করতে।

(7) EDUCATION : **(যৌনশিক্ষা)** : বাৎস্যায়ন প্রণীত কামশাস্ত্রের সচিত্র পাঠ। লোকশিক্ষার প্রয়োজনে।

(8) TANTRA : **(তন্ত্রের প্রভাব)** : বামাচার, তান্ত্রিক অথবা বজ্রযানের বিভিন্ন আসনের সচিত্র বিজ্ঞাপন।

* * *

অতঃপর আমরা ওই আটটি সূত্রকে বিচার করে দেখতে পারি :



চিত্র 3.7 'ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম। কোথায় বসন ভূষণ দাম।।'—ভারতচন্দ্র

(1) **একমেবাদ্বিতীয়ম্ সূত্র** : হ্যাভেল বলেছেন :

In the Upanisads sexual relationship is described as one of the means of apprehending the divine nature and throughout Oriental literature it is constantly used metaphorically to express the true relation between the human soul and God.[7]

[উপনিষদ বলছেন, ঐশ্বরিক সত্তার অনুভূতিলাভের অন্যতম পন্থা যৌনসংসর্গ, তাই সমগ্র প্রাচ্য-সাহিত্যে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় মানবাত্মা

ও পরমাত্মার সত্যস্বরূপ উদঘাটনে এই প্রতীকটিকে বারে বারে ব্যবহার করা হয়েছে।]

হ্যাভেলের ওই মন্তব্যটিকে মেনে নিতে বাধা নেই—কিন্তু ওই উক্তিকে মৈথুনরত মিথুন মূর্তিগুলির যাথার্থ্যে যাঁরা ব্যবহার করতে চান তাঁদের প্রতি আমাদের বক্তব্য : প্রথমত, মন্দিরগাত্রে যা রচিত হয়েছে তা 'সাহিত্য' নয়, নয়নেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিল্পবস্তু। দ্বিতীয়ত, ওই ব্যাখ্যায় প্রতীক চিহ্ন এবং মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ প্রত্যক্ষ মৈথুনরত মিথুন এক বস্তু নয়।

হ্যাভেলের উদ্ধৃতির পরে লীসন লিখেছেন like the magic syllable AUM (ঐন্দ্রজালিক শব্দাংশ 'ওঁ'-এর মতো)। এই মতটি লীসন সংগ্রহ করেছিলেন *'মার্গ'* (*'MARG'*) পত্রিকায় প্রকাশিত অ্যালেন ড্যানিলুর একটি প্রবন্ধ[8] থেকে। যুক্তির আদি উৎস ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি মন্ত্র—

> "তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে
> যদা বৈ মিথুনৌ
> সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্।।"
> ১/১/৬

'মার্গ' পত্রিকায় প্রবন্ধকার তার অনুবাদে বলেন : The union of the sexes is equivalent to the magic syllable AUM. When the two sexes come together each fulfils the desire of the other.

[বিপরীত লিঙ্গের মিলন বাস্তবে ঐন্দ্রজালিক শব্দ 'ওঁ'-এর সমার্থক। যখন বিপরীত লিঙ্গদ্বয় সংযুক্ত হয় তখন একে অপরের কামনার অবসান ঘটায়।]

আপাতবিচারে অনুবাদটি ত্রুটিহীন, কিন্তু উপনিষদকারের মৌল বক্তব্যের পারম্পর্য বিচার করলে বোঝা যায়, অনুবাদটি ভ্রান্ত। ঠিক পূর্ববর্তী মন্ত্রে 'মিথুন' শব্দটির অর্থ ভিন্নপ্রকার। সেখানে 'sex' বা 'লিঙ্গযোনি'র মিলন অর্থে 'মিথুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। ঠিক পূর্ববর্তী মন্ত্রটি হচ্ছে :

> বাগেব ঋক্ প্রাণঃ সাম ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথস্তদ্ধ।।
> এতন্মিথুনং যদ্বাক্ চ প্রাণশ্চ ঋক চ সাম চ।। ১/১/৫

অর্থাৎ—"বাক্য (বা শব্দ) ঋক, প্রাণই সাম, ওঁ এই অক্ষরে উদ্গীত। যেখানে বাক ও প্রাণের মিলন, সেখানেই ঋক ও সামের মিথুন"।

বুঝুন! 'ঋক ও সাম'-এর মিলনকে, শব্দব্রহ্ম ও প্রাণশক্তির এই সংযোগকে—যা নাকি শাস্ত্রকারের মতে 'ওঁ' মন্ত্রে বিধৃত, তাকে প্রকাশ করতে মন্দিরগাত্রে ওই মৈথুনরত মিথুন মূর্তিগুলি খোদিত হয়েছিল, একথা বলা বালভাষ নয়? 'ঋক-সাম' মিথুনে, 'বাক-প্রাণ' মিথুনে আর যাই থাক, 'sex' নেই।



চিত্র 3.8 আদিবাসী দম্পতি, অরুণাচল, 27.7.97

ডক্টর কুমারস্বামী একস্থলে বলেছেন, 'ভারতীয় শিল্পে বারে বারে দেখা যায় যৌনপ্রতীকের মাধ্যমে জগৎপ্রপঞ্চের লীলার প্রকাশ। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনমাধ্যমে বিশ্বছন্দের অনুবর্তন।'

মানছি। কিন্তু শৃঙ্গাররত, আলিঙ্গনাবদ্ধ, চুম্বনরত মিথুনমূর্তি অতিক্রম করে যখন নিরাবরণ মৈথুনরত মিথুনে উপনীত হই, তা অতিক্রম করে মুখমেহন, পশ্বাচার ও যৌথযৌনাচারে এসে পৌঁছাই, তখন আর ও তত্ত্বটা মানতে পারি না। একাধিক নারী-পুরুষের এ জাতের যৌথ-যৌনাচারের বর্ণনা কোনো ভারতীয় শাস্ত্রে বা সাহিত্যে কখনো দেখিনি। বাল্মীকি, কালিদাস, ভাস থেকে বৈষ্ণব পদকর্তার—বস্তুত কোনো ভারতীয় রোমান্টিক কবির—কলমেই এসব যৌনাচারের বর্ণনা নেই। একমাত্র বাৎস্যায়নের রচনায় এদের উল্লেখ আছে। ব্যতিক্রম হিসাবে। অনুমোদন নেই—আছে তীব্র তিরস্কার।

(2) **আনন্দ** . অনুরূপভাবে পূর্বাচার্যরা যখন বলেন, মদনানন্দের পথেই ভূমানন্দের আস্বাদন সম্ভব—উপনিষদের বা শাক্ততন্ত্রের এই নাকি নির্দেশ তখন আমরা প্রতিবাদ করব : এটা আংশিক সত্য, 'হোল ট্রুথ' নয়।

(3) **প্রলুব্ধিকরণ** : এই মতের বক্তব্য বিশেষভাবে বোঝা যায় ওয়াই ব্রাউনেব একটি উদ্ধৃতি থেকে।[9] ওই বিদেশী পর্যটককে নাকি পুরী মন্দিরের জনৈক পুরোহিত বলেছিলেন, "জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের পথটি মানবজীবনের পথের সঙ্গে তুলনীয়। পথের দুধারে সাজানো আছে কামনা-বাসনার নানান উপকরণ। যাকে তোমাদের ধর্মপ্রচারকেরা বলেন, 'দুর্নীতিপূর্ণ, অশ্লীল।' কিন্তু ফ্রয়েড কি অশ্লীল? 'সত্য' কখনো অশ্লীল হতে পারে? তীর্থযাত্রী যদি বহিরঙ্গেব এইসব ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনার আবর্তে পড়ে থাকে, তবে তাকে মন্দিরের বাহিরদ্বার থেকেই ফিরে আসতে হবে। তার চিত্তশুদ্ধি হয়নি—ফলে, মন্দির প্রবেশের অধিকার তার নেই।"

তত্ত্বটা আদৌ মেনে নেওয়া যায না। একাধিক হেতুতে। প্রথম কথা : মলমূত্রাদি ত্যাগও আবশ্যিক জৈবসত্য। কিন্তু বিশ্বশিল্পে তা প্রতিফলিত হয়নি—একমাত্র ব্যতিক্রম কোপেনহেগেনের 'ম্যানিকিনপিস্'। 'সত্য' যখন 'শিব' ও 'সুন্দরের' সঙ্গে সম্পৃক্ত একমাত্র তখনই সে শিল্পের উপজীব্য হতে পারে। মলমূত্রত্যাগ, পাশবিক অত্যাচার, পশুমৈথুন, পায়ুমৈথুন বাস্তব ঘটনা হতে পারে, শিল্পসত্য নয়। ফ্রয়েডের থিয়োরি নিশ্চয় অশ্লীল নয়, যেহেতু তা জীববিজ্ঞানসম্মত, মনোবিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। তাঁর অমর গ্রন্থ The Psychopathology of Everyday Life, যাতে নর এবং নারী নামধেয় জন্তুর—আজ্ঞে হ্যাঁ, জন্তুই—স্তন্যপায়ী প্রাইমেট বর্গের 'হোমোস্যাপিয়ান স্যাপিয়ান্স'—তাদের তথাকথিত যৌন-বিকৃতির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফলে নিশ্চয় তা অশ্লীল নয়। কিন্তু সেই গ্রন্থটি অবলম্বন করে যদি কোনো প্রযোজক একটি মেগাসিরিয়াল বানিয়ে, বড়কর্তাদের ম্যানেজ করে টিভি-র ধারাবাহিক প্রচার শুরু করেন তবে সে শিল্প-প্রচেষ্টা নিশ্চয় অশ্লীল।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা নিবেদন করি। ইতিপূর্বে বলেছি, কোপেনহেগেনের 'ম্যানিকিনপিস' এ বিষয়ে শিল্পে একমাত্র সার্থক ব্যতিক্রম। সম্প্রতি আরও একটি বিচিত্র ব্যতিক্রম দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, যা বর্ণিত কাহিনির প্রয়োজনে, শিল্পসার্থকতার বিচারে রসোত্তীর্ণ। আমি অপর্ণা সেন পরিচালিত চলচ্চিত্র 'পারমিতার একদিন'-এর একটি বিশেষ দৃশ্যের কথা বলছি।

দ্বিতীয় কথা : হিন্দুধর্ম উদার ও সহনশীল। তীর্থযাত্রীকে—মনে রাখবেন, আমরা সংসারত্যাগী সত্যানুসন্ধানী সন্ন্যাসীর কথা বলছি না—মন্দিরদ্বারে সমাগত মনুষ্যসমাজের বৃকোদরভাগের কথা বলছি—সেই সাধারণ যাত্রীকে এভাবে পিছন থেকে টেনে ধরার প্রচেষ্টা হিন্দুধর্মে অপ্রত্যাশিত। হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুধর্ম, তার লৌকিক আচার সব সময়েই সাধারণ মানুষকে শুভপথে পরিচালিত করে। সকল অবস্থাতেই সে মুক্তিকামীকে সাহায্য করে। প্রলোভন দেখায় না। তীর্থযাত্রী যখন তার কামনা-বাসনাকে সাময়িকভাবে জয় করে বিশুদ্ধ চিত্তে মন্দিরের প্রবেশদ্বারে এসে দাঁড়ায়, ঠিক তখনি তাব চোখের সামনে সেই ভুলে থাকা অধ্যায়গুলি পুনরায় মেলে ধরার নির্দেশ কোনো হিন্দুশাস্ত্রে নেই, থাকতে পারে না। ধর্মপ্রবক্তারা জানেন সংসারে পাঁক আছে। নির্দেশ দেন, পাঁকাল মাছের



চিত্র 3.9 পথপার্শ্বে দেখা এক তরুণী, অরুণাচল, 24.9.97

মতো অনাসক্ত হতে। পাঁক গুলিয়ে সমস্ত মনোজগতকে দূষিত করার আয়োজন শাস্ত্রনির্দেশ-বিরোধী। তাই এক্ষেত্রে লীসনের সিদ্ধান্তটাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় :

> This is a modern interpretation inspired by Western notion of the indecency of sex, and it is doubtful if this was the real intention of the builders of the temples.[10]

[পাশ্চাত্য চিন্তায় যৌনতাকে অশালীন মনে করা হয়। সেই চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে আধুনিককালে এই মতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এজাতীয় চিন্তা মন্দির-নির্মাতাদের আদৌ ছিল কিনা সন্দেহ জাগে।]

(4) **সরলতা** : অর্থাৎ শিল্পীদল যৌনতার মধ্যে সরলভাবে জীবনের একটি পর্যায়কে দেখেছিলেন। এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। যে সরলতা নিয়ে গ্রীক ভাস্করদল তাদের দেবদেবীর নগ্নমূর্তি গড়েছিলেন—অ্যাপোলো, আফ্রোদিতে (ভেনাস), হার্মেস (মার্কারি), ব্যাক্কাস-এর যৌনাঙ্গ নির্দ্বিধায় রূপায়িত করেছিলেন—'ন্যুড'কে পাশ্চাত্য শিল্পে চিবস্থায়ী আসনে বসিয়েছেন, সেই-জাতীয় সরলতা এই মধ্যযুগের ভারতীয় ভাস্করদের ছিল বলে মেনে নেওয়া যায় না। অনেকগুলি হেতুতে। প্রথম কথা : পাশ্চাত্য শিল্পে পুরুষ ন্যুডের মূল যৌনাঙ্গ আবশ্যিকভাবে অনুত্থিত। খ্রিস্টপূর্ব যুগের শিল্পী প্রাক্‌সিটেলেস্‌ থেকে রেনেসাঁ যুগের ডোনাটেল্লো, মিকেলাঞ্জেলো সকলেই এ নিয়ম মেনে চলেছেন। ভারতীয় মন্দির ভাস্কর্যে নগ্ন পুরুষের যৌনাঙ্গ সর্বদাই সমুত্থিত—যেন আন্ডারলাইন করা। দ্বিতীয় কথা : পশ্চিমের শিল্পীরা মিলনের দৃশ্যে কখনো স্ত্রী-পুরুষের যৌনাঙ্গ উৎকীর্ণ করেননি। দুই-তিন সহস্র বছরের এই 'টাবু' সকল শিল্পীই মেনে চলেছেন। ভারতে—বিশেষ করে কোনার্ক-খাজুরাহোতে—তা করা হয়নি। তার হেতু সরলতা বলে কেমন করে মেনে নিই?

(5) **তুক হিসাবে** : লীসন তাঁর গ্রন্থে তিনজন পূর্বাচার্যের মত উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা তিনজনই প্রতীচ্যের পণ্ডিত। তাঁদের বক্তব্য : অপদেবতা বা কু-লোকের দৃষ্টি থেকে মন্দিরকে রক্ষা করতে এই মূর্তিগুলি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। ঠিক যেভাবে আজও রাজমিস্ত্রিরা নতুন বাড়ি তৈরি করার সময় একটি বাঁশের মাথায় ঝাঁটা-চুবড়ি-জুতো ঝুলিয়ে দেয়। অর্থাৎ 'বুরী নজরবালে তেরা মু কালা'!

এ মতের সমর্থনে বিদেশী পণ্ডিতেরা কোনো প্রাচ্য-শিল্পশাস্ত্রের অনুশাসন উদ্ধৃত করে দেখাতে পারেননি। নাগর, বেসর অথবা দ্রাবিড় স্থাপত্যের ওপর রচিত কোনো পুঁথিতে এমন কথা লেখা নেই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতত্রয়ী একথা বলেছেন দুটি প্রেরণা থেকে। প্রথম কথা, তাঁদের দেশেই মধ্যযুগে এ-জাতীয় কুসংস্কার ছিল। ডেজমন্ড মরিস্‌ লিখেছেন : In the Middle Ages many churches in Europe had phallases inscribed on their outer walls to protect them from evil influences, but in almost all cases these were destroyed afterwards as 'depraved.'[11]

দ্বিতীয় সূত্র : এদেশীয় কিছু অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের মুখের কথা। যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়। এমন একটা ব্যাপক শিল্পচেতনা, যার ভৌগোলিক বিস্তার সমগ্র উপমহাদেশ, যার কালীক ব্যাপ্তি সহস্রাব্দব্যাপী, তা কিছু সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের 'তুক-তাক'-নির্ভর হতে পারে না। মানছি, হয়তো এ- জাতীয় চিন্তা কোনো বিশেষ রাজমিস্ত্রিকে প্রভাবিত করেছিল। বা তাদেব নিয়োগকর্তা সাময়িকভাবে মেনে নিয়েছিলেন। আপনার-আমার ভদ্রাসন গেঁথে তোলার সময় আজও আমরা মিস্ত্রিদের ওই কুসংস্কারকে মেনে নিই। কেন? কারণ জানি—গৃহপ্রবেশের আগেই ওগুলি অপসারিত হবে। মিস্ত্রিরা যদি আবদার করত গৃহনির্মাণ শেষ হলেও ভদ্রাসনের মাথায় ওই ঝাঁটা-জুতো চিরস্থায়ী আসন পাবে, তাহলে তাদের সে আবদার নিশ্চয় আমরা মেনে নিতাম না।



চিত্র 3.10 আদিবাসী মিথুন, অরুণাচল, 29.3.97

সুতরাং কোনো গ্রাম্য রাজমিস্ত্রির কথায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মূল হেতু হিসাবে মেনে নেওয়া : আর্চডিউক ফার্ডিনান্ডের হত্যাকাণ্ড।

এই প্রসঙ্গে আরও জানাই শ্রী উর্মিলা অগ্রবাল লিখেছেন :

"Passages in *Utkal-Khand*, the *Agni Purana* and the *Brihat Sanghita* support

> the view that such obscene figures were intended to protect the structures against lightning, cyclones or other visitations of nature.''[12]
> [উৎকলখণ্ড, *অগ্নিপুরাণ* ও *বৃহৎ-সংহিতার* কোনো কোনো শ্লোকে উল্লেখ আছে যে বজ্রপাত, ঝঞ্ঝা বা ওই-জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মন্দিরকে রক্ষা করার জন্য এই অশ্লীল মূর্তিগুলি নির্মিত হত।]

দুর্ভাগ্যবশত লেখিকা জানাননি এসব গ্রন্থের কোথায় এমন নির্দেশ আছে। আমরা তা আদৌ খুঁজে পাইনি।

(6) **আকর্ষণ** : অ্যালেন ড্যানিলু এই মত প্রতিষ্ঠা করতে লিখেছেন :

> এইজাতীয় মূর্তির সন্ধানে সাধারণ মানুষ মন্দিরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। পোতা থেকে মন্দির চূড়ার সর্বত্র অনুসন্ধান করে চলে। এভাবে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে করতে, আর তার সঙ্গে ফুল ও ধূপের গন্ধে, আরতির প্রভায়, শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিতে তার মন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যায়—সে মন্দিরের পবিত্র আবহাওয়ায় ধরা দেয়।[13]

যুক্তিটা মেনে নিলে ধরে নিতে হয় যে, মন্দির-নির্মাতাদের না ছিল তত্ত্বজ্ঞান, না সাংসারিক বুদ্ধি। তত্ত্বজ্ঞান আমাদের বলে—শুধুমাত্র মন্দির পরিক্রমা—তাও কোনো শুভবুদ্ধি বা ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় নয়—নিতান্ত কলুষ চিন্তার বশবর্তী হয়ে—কখনো মুক্তির সন্ধান দিতে পারে না। যতক্ষণ না মুক্তির ইচ্ছা মুমুক্ষুর অন্তরে স্বতঃ উৎসারিত হয়। অপরপক্ষে যার বিন্দুমাত্র সাধারণ বুদ্ধি আছে সে বুঝে নেবে যে, পোতা থেকে মন্দির চূড়ার সর্বত্র অশ্লীল মূর্তিগুলি দেখা শেষ হলে কামুক যাত্রীটি আদৌ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দিকে অগ্রসর হবে না; সে সন্ধান নেবে : লালবাতিজ্বলা জনপদবধূদের চাক্‌লাটা কোন্ মহল্লায়!

(7) **যৌনশিক্ষা** : এই মতের যাঁরা সমর্থক তাঁরা বলতে চান বাৎস্যায়নবর্ণিত কামশাস্ত্র সাংসারিক বিচারে একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। তাই রাজনির্দেশে কামকলার একটি সচিত্র পাঠ দেওয়া হয়েছে মন্দিরগাত্রে। এখানে মনে রাখা দরকার, বাৎস্যায়ন কামকলার চর্চা করেছেন খাগের কলমে, সংস্কৃত শ্লোকে; আর কলিঙ্গ ভাস্কর তা করেছেন ছেনি-হাতুড়ি যোগে, পাথরে। ফলে কোনো কোনো মৈথুনরত মিথুনমূর্তিকে বাৎস্যায়ন-বর্ণিত আসনের প্রত্যক্ষ রূপায়ণ বলে মনে হতে পারে। সেটাই তো স্বাভাবিক। আপনি যদি বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে কোনো গ্রন্থ রচনা করেন তাহলে বারে বারে আপনাকে ডারউইনের প্রসঙ্গে ফিরে আসতে হবে। আবার বিবর্তনের পরিবর্তে আপনার আলোচ্য বিষয় যদি হয় আপেক্ষিকতাবাদ, তাহলে আপনাকে বারে বারে আইনস্টাইনের দ্বারস্থ হতে হবে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। মূর্তিগুলি নিতান্ত ঘটনাচক্রে বাৎস্যায়ন অনুসারী, তাঁর গ্রন্থের সচিত্র পাঠ নয়।



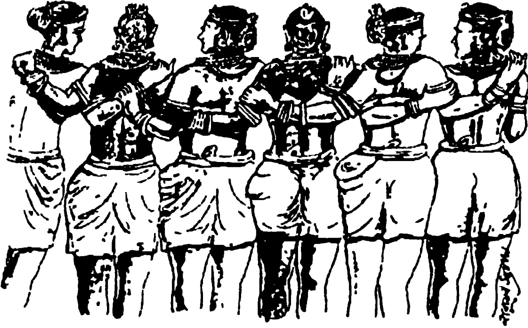
চিত্র 3.11 রেলো-রেলো নাচ, দণ্ডকারণ্য, 1960

কোনো কোনো পণ্ডিত আবার এখানে কিছু দার্শনিক তত্ত্ব পেড়ে ফেলেছেন। যৌনশিক্ষার সঙ্গে অধ্যাত্মবাদকে জড়িয়ে একটা উচ্চপর্যায়ের ধোঁয়াশার সৃষ্টি করেছেন। যথা : *'মার্গ'* পত্রিকার সম্পাদক প্রখ্যাত শিল্পসমালোচক ডক্টর মুলক্‌রাজ আনন্দ্ লিখেছেন :

> ''Since sexual curiosity is, apart from awakening of sensibility toward Reality, also one of the main causes of the perversions of the mind, it must be satisfactorily explained and analysed, so that education can lead not only to healthy enjoyment of the variegated pleasures of the body but also clarify the mind of the filth attached to the sacred act.[14] [যৌন অনুসন্ধিৎসা শুধু বাস্তবতার (ডক্টর আনন্দ্ যেহেতু ক্যাপিটাল R ব্যবহার করেছেন তাই 'বাস্তবতার' বদলে 'পরমসত্য' শব্দটাই হয়তো সুপ্রযুক্ত) উন্মেষের উদ্রেকই করে না, তারা

মানবমনের বিকৃতির অন্যতম মূল উপজীব্য। তাই এই অনুভূতিটাকে সাফল্যমণ্ডিতভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। এমনভাবে তা করা দরকার যাতে ওই যৌনশিক্ষা দৈহিক-মিলনের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসম্মত পাঠ সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করতে পারে। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে তা আমাদের মন থেকে এই পবিত্র কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সকল কলুষ অপনোদন করতে পারে।]

স্তম্ভিত হতে হয় ডক্টর আনন্দ্-এর এই 'আনন্দ ব্যাখ্যা' শুনে। তিনি কেমন করে সব কয়টি মিথুন-ভাস্কর্যকে অব্যতিক্রমভাবে 'স্বাস্থ্যসম্মত পাঠ' বলতে পারলেন? তিনি কি খাজুরাহোর একাধিক মন্দিরে (কাণ্ডারীয় মহাদেও, লক্ষ্মণেশ্বর, জগদম্বা) কেন্দ্রীয় অবস্থানে নির্মিত মূর্তিগুলি দেখেননি? নিরবলম্ব অবস্থায় শীর্ষাসনে কোনো একটি



চিত্র 3.12 'হুলকি নাচ' পিছন থেকে, দণ্ডকারণ্য, 1960

মরমানুষের পক্ষে একই সঙ্গে তিন-তিনটি নারীদেহ সম্ভোগ করা সম্ভবপর? এগুলি 'স্বাস্থ্যসম্মত' যৌনাচার? বাৎস্যায়ন থেকে হ্যাভলক এলিস কেউই এমন অবাস্তব ব্যভিচারের বর্ণনা করেননি। সেগুলি সব 'healthy enjoyment of variegated pleasures'? ক্যাপিটাল R দূর অস্তু, ছোট হাতের 'r' ব্যবহৃত realityর ধারে-কাছে তা নেই। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যৌনসঙ্গমের পটভূমিতে ভাস্কর কল্পলোকে ভাসমান। বাস্তবে অসম্ভব জেনেও যেমন তিনি কল্পলোকের গজবিরাল, সিংহবিরাল, যক্ষ-কিন্নর-অপ্সরী গড়েছেন তেমনিই খোদাই করেছেন কিছু অবাস্তব যৌন সংসর্গের দৃশ্য। সেগুলি কোনো যৌন-অনুভূতির বাস্তব ব্যাখ্যা নয়, বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ তো আদৌ নয়। নিছক শিল্পীমনের খামখেয়ালিপনার প্রতীক।

(8) **তন্ত্রের প্রভাব** : এ ক্ষেত্রে লীসন যাঁদের মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁরা সবাই প্রতীচ্যখণ্ডের পণ্ডিত। এবারেও একমাত্র ব্যতিক্রম সেই তথাকথিত শিল্পবিশারদ পদ্মভূষণ মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কথা থাক, মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্ কি জানতেন না যে, চীনাচার, বামাচার তান্ত্রিক এবং বজ্রযানী বৌদ্ধদের গোপন সাধন পর্যায়ে বাইবেল বর্ণিত কোনো ঘোষণা নেই : Come unto me and thou shall be saved—মামেকং শরণং ব্রজ। কাপালিক, তান্ত্রিক তো বটেই, এমনকি আউল-বাউল সহজিয়াপন্থীরাও তাদের ধর্মীয় আচারে যে যৌনাচার অনুপ্রবেশ করেছে সে তথ্যটা অত্যন্ত সঙ্গোপনে রাখে। সাধনচক্রের সেই একান্ত গুরুমুখী গুপ্তবিদ্যার ক্রিয়াকলাপ তাঁরা কিছুতেই মন্দিরগাত্রে বিচিত্রিত করতেন না।

আমাদের আপত্তি লীসন ব্যবহৃত 'শিক্ষা' শব্দটিতে। তন্ত্রশিক্ষা না বলে যদি বলা হত 'তন্ত্রের প্রভাব' তাহলে আমাদের এত আপত্তি হতো না। অধ্যাপক সার জন উড্‌রফ তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থে এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন।[15] সেসব কথা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ নেই। এখানে আমরা লীসনের আটটি সম্ভাব্য হেতুর মধ্যে আলোচনা সীমিত করেছি মাত্র।

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে পাঠকের দৃষ্টি একটি বিষয়ে আকর্ষণ করতে চাই : এফ. ওয়াই. ব্রাউনকে পুরীর জগন্নাথমন্দিরের পুরোহিত যা বলেছিল সেই প্রসঙ্গে। বর্তমানে (2004) সে মন্দিরে ওই জাতীয় মিথুনমূর্তি আদৌ নেই। তাহলে ব্রাউন সাহেবের কাছে জগন্নাথমন্দিরের পুরোহিত ওই কৈফিয়ত কেন দিয়েছিল? ব্রাউন কি জগন্নাথ মন্দিরে ঐ জাতের মূর্তি দেখেছিলেন? সে আমলে কি অ-হিন্দুকে জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরে যেতে দেওয়া হতো? আরও লক্ষণীয়, ব্রাউন বইটি প্রকাশ করেছেন 1930 সালে। সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তিনি জগন্নাথ মন্দিরে কিছু 'অশ্লীল' মূর্তি দেখেছিলেন। এ বিষয়ে আমরা পুরীমন্দির পরিক্রমাকালে বিস্তারিত আলোচনা করব (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)।

এতক্ষণ আমরা লীসনের গ্রন্থ অনুসারে আটটি সম্ভাব্য হেতুর আলোচনা করছিলাম। আগেই বলেছি, লীসন কোনো সিদ্ধান্তে আসেননি। গ্রন্থশেষে তিনি পাঠককেই প্রশ্ন করেছেন : বলুন? কোন্ মতটি গ্রাহ্য?

আমরা তা বলছি না। কারণ আমাদের মতে আরও কয়েকটি সম্ভাব্য হেতু রয়ে গেছে যার আলোচনা লীসন

করেননি। এই গ্রন্থে আমরা আরও তিনটি হেতুর কথা লিপিবদ্ধ করছি। তার প্রথমটি লীসন ঠিকমতো আলোচনা করেননি, দ্বিতীয়টি বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থে থাকায় হয়তো লীসনের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তৃতীয়টি বর্তমান লেখকের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত।



চিত্র 3.13 একটি মাড়িয়া তরুণী, কোকোমেটা উৎসব, দণ্ডকারণ্য 1961

(9) **বিতৃষ্ণা উদ্রেগার্থে** : এই মতটি মহাপণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর। *মানসী* পত্রিকায় দেখছি রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, ধর্ম হিসাবে বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সন্ন্যাসী দেহটাকে অত্যন্ত কদর্য বলিয়া গণ্য করিত। ইন্দ্রিয়সমূহই বিপদ ও বেদনা আনয়ন করে। শাস্ত্রানুসারে গলিত ন্যক্কারজনক দ্রব্য সম্মুখে ধরিয়া রূপজ মোহ জয় করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ ত্রিবেদী মহাশয় কবি ভর্তৃহরির *বৈরাগ্যশতক*-এর একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

স্তনৌ মাংসগ্রন্থী কনককলসাত্যুপমিতৌ
মুখং শ্লেষাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতম্।
স্রবন্মূত্রক্লিন্নং করিকরস্পর্ধি জঘনং
মুহুর্নিন্দ্যং রূপং কবিকরবিশেষৈর্গুরুকৃতম্।।

আমরা পণ্ডিতপ্রবর রামেন্দ্রসুন্দরের এই অভিমতটি গ্রহণে অসমর্থ। নানা কারণে।

প্রথম কথা কোনো শিল্পীকে বা শিল্পীদলকে এভাবে সাধারণসূত্রে বাঁধা যায় না। শিল্পী—তিনি চিত্রকর, ভাস্কর, কবি, কথাসাহিত্যিক যাই হোন না কেন—যখন যে রস পরিবেশন করেন তখন সেই রসসমুদ্রেই অবগাহন করেন। রামেন্দ্রসুন্দর কবি ভর্তৃহরির সামান্য উদ্ধৃতি দিয়েছেন। দেখছি—'*বৈরাগ্যশতকে*' ভর্তৃহরি বলেছেন—রমণীর স্তনদ্বয় স্বর্ণকলসের উপমান নয়, মাংসগ্রন্থীমাত্র। মুখ চাঁদের সঙ্গে তুলনীয় নয়, তা শ্লেষ্মাগারমাত্র। কবিকরস্পর্ধিরূপে বর্ণিত তার জঙ্ঘার সঙ্গমস্থলও ক্লেদাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু কবি ভর্তৃহরির সমগ্র কাব্য কি সেই বৈরাগ্যের সুরে বাঁধা? সেই একই কবির আব একটি কবিতার অংশবিশেষ শ্যামাপদ চক্রবর্তীর অনুবাদে শোনাই :

অয়ি নবযৌবনা
তোমারে নিন্দা করি পণ্ডিতজনা
আপনারে করে প্রতারণা
আর অন্যে প্রবঞ্চনা।
সবসত্যের সার
তপস্যাফল স্বর্গ, আর স্বর্গের ফল সুধারসশৃঙ্গার।।

বলুন : কোন্ ভর্তৃহরি সত্য?

আমরা বলব : দুজনই। *পথের দাবীর* একটিমাত্র পংক্তি উদ্ধৃত করে বলা যায় না যে, শরৎচন্দ্রের মতে সব জাতের ভারতীয় সর্পই নির্বিষ, যেহেতু তারা বিলেত থেকে আসেনি। রবীন্দ্রনাথের 'মরণ তু আও রে আও' উদ্ধৃতি শুনিয়ে প্রমাণ করা যায় না 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' পংক্তিটা রবীন্দ্ররচনাবলীতে প্রক্ষিপ্ত।

সে যাই হোক, বিতৃষ্ণা উদ্রেক করার উদ্দেশ্যে শিল্পীরা ওই অনবদ্য মূর্তিগুলি খোদাই করেছিলেন একথা কিছুতেই মানা যায় না। তাহলে মূর্তিগুলি বীভৎস হতো, কদর্য হতো। বিতৃষ্ণা উদ্রেককারী হতো। তা হয়নি।

(10) **ক্লান্তি-অপনোদন** : এই মতটি পরিবেশন করেছিলেন আর এক ভারতবিদ পণ্ডিত : অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু। তিনি লিখছেন—

> কোনারকের মন্দিরের বিশাল আকার দেখিয়া জানিতে ইচ্ছা করে—কিসের প্রেরণায় শিল্পীরা বহুকাল ধরিয়া এমন সৃষ্টিতে নিযুক্ত ছিলেন? কিসেই বা এতকাল ধরিয়া তাঁহাদের উৎসাহকে সচেতন রাখিয়াছিল? ... এতগুলি বদ্ধকাম ও তাহারও অধিক সংখ্যায় রমণীয় ললিতমূর্তি দেখিয়া মনে হয় যে, শিল্পীদের উৎসাহ সংরক্ষণে এগুলির স্থান নিচে নহে। এরূপ মূর্তি তৈয়ার করিতে তাহাদের উৎসাহ কমিবার কোনো কারণ থাকে না, বরং অবসাদের সময় চিত্রের

ব্যাখ্যানবস্তুই তাহাদের কাজে বাঁধিয়া রাখিবে, উৎসাহ বৃদ্ধি করিবে। ... শিল্পীরা এতবড় কাজ করিয়া থাকিলেও তাহারা যে আমাদেরই মতো শ্রান্ত হইয়া পড়িত এবং কোনো কাজ নিরন্তর করিতে করিতে অনেক সময় অশ্লীল উৎসাহবর্ধক মূর্তি গড়িত, এই রকম কোনো ব্যাখ্যা সহজভাবে ভাবিলে অনেক গোল মিটিয়া যায়।[16]

অধ্যাপক বসু একজন বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত। উড়িষ্যার স্থাপত্য-ভাস্কর্য বিষয়ে তিনি প্রামাণিক গবেষণা করেছেন। অনস্বীকার্য। কিন্তু সেকারণে তাঁর এই সিদ্ধান্তটি আমাদের যুক্তিবাদী অন্তঃকরণ গ্রহণ করতে অসমর্থ। একাধিক হেতুতে। আমাদের মতে গোল অত সহজে মিটবার নয়। ভিন্ন দেশে, ভিন্নকালে 'কোনার্ক-মন্দিরের মতো' অথবা তার চেয়েও বড় স্থাপত্যকীর্তি মরমানুষই গড়ে তুলেছে। এমন মানুষ, যারা ভিন্ন দেশের বা ভিন্নকালের হওয়া সত্ত্বেও 'আমাদেরই মতো শ্রান্ত হইয়া পড়িত।' যথা : মিশরের একাধিক পিরামিড, আম্মান বা আবু সিম্বেলের



চিত্র 3.14 উৎসব সজ্জায় মৃস্কিয়া তরুণা, দণ্ডকারণ্য, 1961

মন্দির, পারস্য স্থাপত্যে পার্সিপোলিস-এর শতস্তম্ভের প্রাসাদ, এথেন্সের অ্যাক্রোপলিস বা পার্থেনন, রোমের প্যান্থিয়ন, কলোসিয়াম বা সেন্ট পীটর গির্জা, চীনের প্রাচীর বা বরবুদুরের মন্দির। এগুলি আকারে, আয়তনে, উচ্চতায় কোনভাবেই কোনার্ক সূর্যমন্দিরের অপেক্ষা ন্যূন নয়। ভারতবর্ষেও অজন্তা-এলোরা, রামেশ্বরমের শিবমন্দিরে, অথবা তাজমহলে যত 'ম্যান-ডেজ' লেগেছে, অর্থাৎ যত মানুষ যতদিন ধরে কাজ করেছে, তাও কোনার্কের তুলনায় বেশি। কই, এদের কোনোটির ক্ষেত্রেই তো শিল্পীদের ক্লান্তি অপনোদনের এমন ব্যবস্থা করা হয়নি? শিল্পীরা যে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন একথা কে অস্বীকার করবে? সব বড় কাজেই ক্লান্তি আসে। পিরামিড থেকে হুভার ড্যাম—কোথাও তো ক্লান্তি অপনোদনের জন্য অশ্লীল মূর্তি গড়তে হয়নি।

দ্বিতীয় কথা : কোথায় কী জাতের মূর্তি বসবে সেকথা নিশ্চয় নির্ধারণ করে দিতেন একজন মূল পরিকল্পনাকার বা চীফ আর্কিটেক্ট। তিনি নিশ্চয় স্বহস্তে ছেনি-হাতুড়ি চালাতেন না। তিনি তো অনায়াসে ক্লান্ত রামের বদলে শ্যামকে নিয়োগ করে এ অপবাদ থেকে রেহাই পেতে পারতেন। অপরপক্ষে সেই মূল নিয়ামকের নির্দেশ না গ্রহণ করে রাম-শ্যাম-যদু আপন আপন খেয়ালে ক্লান্তি অপনোদনার্থে উৎসাহবর্ধক অশ্লীল মূর্তি গড়ে যাবে এটাও তো অসম্ভব কথা।

তৃতীয় এবং সব থেকে বড় যুক্তি : যেখানে ওই ক্লান্তি অপনোদনের প্রশ্ন আদৌ ওঠে না? যেমন ভুবনেশ্বরের বৈতাল, আমেদাবাদের কাছাকাছি ভাবকা বা নেপালের কিছু ছোট মন্দিরের ক্ষেত্রে ও যুক্তি তো খাটে না। সেখানে কেন 'অশ্লীল' মূর্তি দেখতে পাই?

(11) **জনসংখ্যাবৃদ্ধি** : এ যুক্তিটির কথা কোনো পূর্বসূরিকে আলোচনা করতে দেখিনি। আমাদের মনে হয়েছে সাধারণ সম্ভাব্য একটি হেতু হিসাবে এটাও বিচার করে দেখা যেতে পারে।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে ভারতরাষ্ট্রে ভ্রূণহত্যা ছিল সামাজিক অন্যায়, নৈতিক পাপ, আইনত অপরাধ। জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষাবলম্বনের অপরাধে অনেকে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। অথচ বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিপরীত মেরুতে আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আইনসিদ্ধ ভ্রূণহত্যা এখন অপরাধ নয়, জন্মনিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত। কেন? কারণ—তৃতীয় বিশ্বে জনসংখ্যাবৃদ্ধি বর্তমান পৃথিবীতে অন্যতম বৃহত্তম সমস্যা।

মধ্যযুগে অবস্থাটা ছিল ঠিক বিপরীত। যার রাজ্যে যত বেশি জনবল তার সামরিক ক্ষমতা তত বেশি। লক্ষণীয়,

আচার্য শঙ্কর (780-812) পুরীধামে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে, বৈতালমন্দিরে মৈথুনরত মিথুন প্রথম খোদিত হবার মাত্র দুই-তিন দশক পূর্বে। খাজুরাহোতে মিথুনাচার শিকড় গেড়েছে আচার্য শঙ্করের পুরীধাম প্রতিষ্ঠার একশ বছরের মধ্যে। শঙ্করাচার্যের অভ্যুত্থানের পর, শঙ্করের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহু হিন্দু যুবক সন্ন্যাসের দিকে ঝোঁকে। তারা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পর আর সংসারাশ্রমে প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক হয়ে পড়ে। এতে রাজশক্তির পক্ষে বিচলিত হয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়। যৌবনের প্রথম পর্যায়ে সন্ন্যাসগ্রহণের প্রবণতার বিরুদ্ধে রাজশক্তিকে সচেতন হতে হয়— যাতে প্রজাবৃদ্ধি ঘটতে পারে। সুতরাং এমনও হতে পারে যে, জনসংখ্যা হ্রাসের প্রয়োজনে আজ যেমন শাসকবৃন্দ জন্মনিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হয়েছে, সে যুগে তদানীন্তন রাজশক্তি জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজনে কামকেলিকে বিজ্ঞাপিত করতে চেয়েছিলেন। আজ বিজ্ঞাপনের মাধ্যম যেমন সংবাদপত্র এবং দূরদর্শন মিডিয়া, সে যুগে তা ছিল বিখ্যাত মন্দিরের বহির্গাত্র। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রত্যহ অসংখ্য নরনারীর সমাবেশ ঘটত। শঙ্করাচার্যেব পুরীধাম প্রতিষ্ঠা এবং কলিঙ্গের মিথুন ভাস্করের জোয়ার যে সমকালীন, এটা ঐতিহাসিক তথ্য। দ্বিতীয়টি প্রথমটির প্রতিঘাতে কিনা সেটাই বিচার্য।

গ্রীক দার্শনিক Zeno এবং Epicurus-এর বিপরীতমুখী দর্শন মানব-সভ্যতায় এভাবে বারবার পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। বুদ্ধদেবের সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ এবং দলে দলে যুবকবৃন্দের সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে চার্বাক দর্শনে বলা হয়েছিল : 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ/ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।'

একটি আধুনিক উদাহরণও উল্লেখ করা চলে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে বাঙালি মনে সন্ন্যাসগ্রহণের দিকে একটা জোয়ার আসে, যা স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার কালে ষাঁড়াষাঁড়ির বানরূপে উত্তাল হয়ে ওঠে। স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক শঙ্করাচার্যের মতো সাধারণ যুবকদলকে সন্ন্যাসজীবনমুখী করে তোলেন। রামকৃষ্ণ মিশন এবং স্বামী প্রণবানন্দের আহ্বানে যুবশক্তি যখন সন্ন্যাস-আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করল ঠিক তখনই—যেন বৈরাগ্য ও বন্ধন, সন্ন্যাস ও সংসারের 'দ্বন্দ্বে' অগ্রসর হয়ে এলেন তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ। স্বামীজি যখন যুবসমাজকে সংসারাশ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেশসেবার ব্রতে দীক্ষা নিতে বলছেন, তাদের ডেকে বলছেন 'হে ভারত! ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত', ঠিক তখনই রবীন্দ্রনাথ তাঁর *নৈবেদ্য* কাব্যে বলছেন, 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়/অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।'

প্রণবানন্দ মহারাজ যখন যুবশক্তিকে সন্ন্যাসাশ্রমের দিকে আকর্ষণ করছেন তখন রবীন্দ্রনাথ রচনা করে চলেছেন, রোমান্টিক *কড়ি ও কোমল*, আবেগমণ্ডিত *চিত্রাঙ্গদা*, *ক্ষণিকা*, *চিরকুমার সভা।*

একদিকে বিবেকানন্দ অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ, একদিকে প্রণবানন্দ অপরদিকে নজরুল—Zeno এবং Epicurus-এর সেই 'দ্বন্দ্ব' যেন পুনর্জন্ম নিয়েছিল।

ফলে হয়তো আদি শঙ্করাচার্যের 'ত্যাগের' বিরুদ্ধে এটা কলিঙ্গরাজের 'ভোগের' নৈবেদ্য। এ দুইয়ের সমন্বয়েই যে সমাজের অগ্রগতি।

আমরা কিন্তু এই এগারোটি সম্ভাব্যসূত্রের মধ্যেই সমাধানটিকে খুঁজছি না। এর অতিরিক্ত আরও কিছু তত্ত্বকথা আছে সেকথা পরে বলব। ❐

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মিথুনের শ্রেণিবিন্যাস, 'ইরটিকা-ইন্ডেক্স' এবং রাজারানী



মিথুনাচারের সামগ্রিক আলোচনার প্রয়োজনে প্রথম পরিচ্ছেদেই ভারতীয় ভাস্কর্যে আদিরসাত্মক মূর্তিগুলিকে প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল : 'একক অলঙ্করণ' এবং 'মিথুন'। প্রথমটির বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি—প্রাগৈতিহাসিক 'মাদার-গডেস'-এর পরিকল্পনার প্রাগুষাযুগ থেকে। মিথুন মূর্তিগুলিকে পরবর্তীকালে আটটি শ্রেণিতে বিভক্ত করার প্রস্তাবও আমরা রেখেছি—তাদের আদিরসের গাঢ়তা, যৌনতা বা তথাকথিত অশ্লীলতার ক্রমবর্ধমানতার বিচারে। মিথুনগুলিকে এভাবে শ্রেণিবদ্ধভাবে শনাক্ত করা কষ্টসাধ্য হতে পারে, অসম্ভব হবে বলে আমাদের মনে হয়নি। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি তথা মূল্যায়নে কোনো মিথুনমূর্তির শ্রেণিভুক্তিকরণে হয়তো সামান্য ইতরবিশেষ হতে পারে; কিন্তু তাতে সমগ্র মন্দিরের 'ইরটিকা'-মূল্যায়নে বিশেষ পার্থক্য হবার কথা নয়। এ বিষয়ে আমরা কয়েকটি ছোটখাট পরীক্ষাও করেছিলাম। মিথুনাচার বিষয়ে গবেষণার বাসনা নিয়ে আমি প্রথমবার উড়িষ্যা ভ্রমণ করি সস্ত্রীক। ব্যক্তিগত মূল্যায়নে কতটা পার্থক্য হতে পারে বুঝে নিতে আমরা দুজন একটি বিশেষ মন্দিরের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে মিথুনমূর্তিগুলি গণনা করেছিলাম—এবং পূর্বস্বীকৃত সংজ্ঞা অনুসারে তাদের শ্রেণিভুক্ত করে হিসাব মিলিয়ে দেখেছিলাম। ফলাফলে দেখা গিয়েছিল মূর্তিগুলির শ্রেণিবিন্যাসে নব্বই-পঁচানব্বই শতাংশে কোনো মতপার্থক্য হয়নি।

বেশ কয়েকবছর পরে দুজন বিশিষ্ট শিল্পবিদের সঙ্গে কলিঙ্গ পরিক্রমার সৌভাগ্য হয়। একজন বিশিষ্ট শিল্পসমালোচক দ্বিজেন্দ্রলাল মৈত্র, অপরজন ভারতবিখ্যাত শিল্পী ইন্দ্র দুগার। আমার অনুরোধে একটি মন্দিরে একইভাবে পৃথক গণনা করে তুলনা করা হয়। দেখা যায়, তিনজনের পরিসংখ্যান প্রায় একই রকম। দুই-তিন শতাংশ মেলেনি।

পরবর্তী প্রক্রিয়াটি বিতর্কমূলক : বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত মিথুনের যৌনতা তথা অশ্লীলতার তুলনামূলক মান-নির্ণয়। অথচ এ কাজটি আমাদের পক্ষে আবশ্যিক।

যৌনতা এবং অশ্লীলতা যে সমার্থক নয় একথা সর্বজনস্বীকৃত। এটুকু বলা যায় : একে অপরের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হলেও তারা পরস্পর-প্রভাবিত। একটি বৃদ্ধি পেলে সচরাচর অপরটিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলে কোনও একটি শিল্পবস্তুর যৌনতা এবং অশ্লীলতার 'পরিমাপ', অর্থাৎ 'ইরটিকা-ইন্ডেক্স' পৃথক। সর্বযুগেই। তাছাড়া সে 'মান' বা মাপকাঠিটাও সর্বযুগে সমান থাকে না। প্রতি যুগের দর্শকদেব শিল্প সম্বন্ধে নান্দনিক ধ্যানধারণা তথা বিচার বিভিন্ন। ভিক্টোরিয় যুগের রক্ষণশীলতা এবং বর্তমান যুগের শিল্পমূল্যায়ন সম্পূর্ণ পৃথক। একই কালে দেশভেদেও তা পৃথক হতে পারে। আরবে, ইরানে, তুর্কীতে আজও বোরখা চলে, যা প্রগতিশীল অমুসলমান রাজ্যে চলে না। ব্যক্তিবিশেষেও মূল্যনিরূপণে পার্থক্য হতে পারে। আজ আমাদের পক্ষে বুঝে নেওয়া অসম্ভব দশম বা একাদশ শতাব্দিতে একজন গড়-দর্শকের দৃষ্টিতে কোনো একটি মিথুনমূর্তি কতখানি যৌনতাব্যঞ্জক বা অশ্লীল বলে মনে হতো। তেমনি আজকের দিনে একজন শিক্ষিত দর্শকের সঙ্গে একজন নিরক্ষর সরল গ্রামবাসীর দৃষ্টিভঙ্গিতে কতখানি পার্থক্য হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। প্রশ্ন হচ্ছে : আজকের দিনে একজন 'গড় দর্শকে'র দৃষ্টিতে কোনো একটি মিথুনমূর্তি কী পরিমাণে যৌনতাব্যঞ্জক অথবা অশ্লীল, তা কি পরিমাপ করে বলা সম্ভব? আমাদের মনে হয়েছে, এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় : বেশ কিছু সাধারণ দর্শকের মতামত সংগ্রহ করে তার একটি গড় নির্ধারণ করা।

এখানে বলি, হয়তো আগেও বলেছি, 1980 সালে আমি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলাম : *ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন*। সেই গ্রন্থের সঙ্গে প্রতি কপিতে একটি করে আবেদন-পৃষ্ঠা বিতরণ করা হয়েছিল— তাতে পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ করা হয়েছিল গ্রন্থনির্দেশিত ছয়-

জাতির মিথুন-মূর্তিতে তাঁরা যেন যৌনতা-তথা-অশ্লীলতার মান নির্দেশ করে, ভোটপত্রটি প্রকাশকের ঠিকানায় ফেরত পাঠান। বেশ কিছু সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা নিজেরা ডাকটিকিটি কিনে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। প্রায় একই সময়ে ইন্সটিট্যুট অব এঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) আমাকে ভারতীয় মন্দির ভাস্কর্যে অশ্লীলতার বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন, গোখেল রোডের স্যার আর. এন. মুখার্জি প্রেক্ষাগৃহে। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত প্রায় একশতজন প্রাপ্তবয়স্ক এঞ্জিনিয়ার (অনেকে সস্ত্রীক) আমার বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন। স্লাইড সহযোগে বক্তৃতা দিয়ে আমি শ্রোতৃমণ্ডলীকে অনুরোধ করি তাঁদের ভোট দিতে (নাম না জানিয়ে)। এই সমস্ত ভোটপত্র মিলিয়ে যে শেষ-ফলাফল লাভ করেছি তারই মাধ্যমে আমরা একটা 'ইরটিকা-ইন্ডেক্স' (Erotica Index) নির্ণয় করতে চাই। এটাই আমাদের যৌনতা তথা অশ্লীলতা-নির্ণয়ের মূল মানদণ্ড।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থে যদিও আমরা মিথুনমূর্তিগুলিকে আটটি শ্রেণিভুক্ত করে বিচার করছি, প্রথম রচনাকালে তা করেছিলাম ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করে। যেহেতু ভোট-গ্রহণের সময় আমাদের 'ইলেকশন ম্যানিফেস্টো'তে ছিল ছয়টি শ্রেণি, তাই বর্তমান পরিচ্ছেদে আমাদের সেভাবেই পরিসংখ্যান নির্ণয় করতে হবে।

সেই ছয় শ্রেণির একটু বিস্তারিত বর্ণনা দিই। বর্তমান গ্রন্থে আমরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছি প্রথম গ্রন্থ রচনাকালেও তারা তাই ছিল। ভাষান্তরে, ভোট গ্রহণকালে : যুগলমূর্তি, উত্তেজিত মিথুন এবং শৃঙ্গাররত 'মিথুন' যা ছিল বর্তমান গ্রন্থেও তাই আছে। কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু সে সময় সমকামী এবং আত্মরতিমূলক মিথুনকে 'মৈথুনরত মিথুন' শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া 'কানিলিঙ্গাস', 'ফেলাশিও'দের অস্বাভাবিক মিথুন বলে ধরা হয়েছিল। পশুমৈথুন, পায়ুমৈথুনদের অশাস্ত্রীয় শেষ পর্যায়ভুক্ত মনে করা হয়েছিল।

সংক্ষেপে ভোটদাতাদের সামনে আমরা যে ছয়টি শ্রেণি উপস্থিত করেছিলাম তা তখন ছিল নিম্নোক্তরূপ :

I ... যুগলমূর্তি ... বর্তমানে যে সংজ্ঞা নির্দেশিত তাই

II ... উত্তেজিত মিথুন ... ঐ ঐ

III ... শৃঙ্গাররত মিথুন ঐ ঐ

IV ... মৈথুনরত মিথুন ... বর্তমানে যে সংজ্ঞা নির্দেশিত তার সঙ্গে সমকামী ও আত্মরতিমূলক মিথুন যুক্ত ছিল।

V ... অস্বাভাবিক মিথুন ... মুখমেহন (কানিলিঙ্গাস, ফেলাশিও)

VI ... অশাস্ত্রীয় মিথুন ... যৌথযৌনাচার, পশুমৈথুন, পায়ুমৈথুন।

স্বীকার্য, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত বর্তমান সংস্করণে আমরা বর্তমান যৌনশাস্ত্রবিদ, মনস্তত্ত্ববিদ এবং 'ম্যারেজ-কাউন্সিলার'দের পরামর্শমতো 'কানিলিঙ্গাস' বা 'ফেলাশিও'কে অস্বাভাবিক মিথুন বলে ধরতে পারিনি। সমকামীদের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সে যাই হোক, গত শতাব্দীর আশির দশকে প্রথম গ্রন্থটি রচনার সময় আমরা যে-শর্তে ভোটদাতাদের মতামত দিতে বলেছিলাম সেই শর্ত স্বীকার করে এই পরিচ্ছেদে আমরা 'ইরটিকা-ইন্ডেক্স' নির্ধারণ করতে বাধ্য হয়েছি ছয়টি শ্রেণিভুক্ত মিথুন নিয়েই।

প্রসঙ্গত আরও বলি, আশির দশকে দুই হাজার কপি গ্রন্থ নিঃশেষিত হবার পর প্রকাশক ও ক্রেতাপাঠকের তাগাদা সত্ত্বেও আমি গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করিনি— 'মিথুনাচার'কে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে পুনর্মূল্যায়ন করতে চেয়েছিলাম বলে।

প্রথম গ্রন্থ প্রকাশকালে পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যে বিজ্ঞপ্তিটি বিতরণ করা হয়, তাতে তাঁদের প্রশ্ন করা হয়েছিল :

> "আপনি কি আমাদের সঙ্গে একমত যে, ভারতীয় মন্দির ভাস্কর্যে বিভিন্ন মিথুন মূর্তিগুলি দর্শন করে সেগুলিকে যৌনতা এবং অশ্লীলতার পরিমাপ অনুসারে শ্রেণিভুক্ত করা সম্ভব?"

এ প্রশ্নের জবাবে প্রায় সকলেই মোটামুটি একমত হয়ে জানিয়েছিলেন

(1) তা করা সম্ভব

(2) চেষ্টা করা যেতে পারে

(3) করে দেখতে দোষ কী?

সামান্য কয়েকজন বলেছিলেন : "শিল্পবস্তু এভাবে শ্রেণিভুক্ত করে বিচার করা সম্ভব নয় বা বাঞ্ছনীয় নয়।" তাঁদের মতে শিল্পবস্তুর নান্দনিক বিচার ভোটের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় না। সে যাইহোক, যাঁরা একমত

হয়েছিলেন তাঁরা আমাদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রশ্নটির জবাবও দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল :

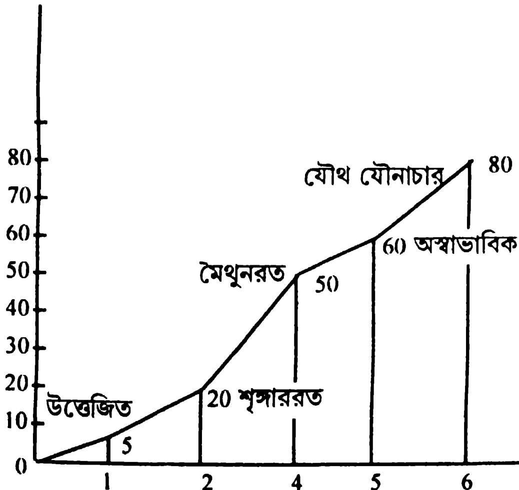
"ধরা যাক কার্লে চৈত্যে দৃষ্ট যুগল মূর্তিটির (বর্তমান গ্রন্থে চিত্র 8.6) 'যৌনতার মান' শূন্য; এবং আপনি আপনার জীবনে যে মিথুনমূর্তিটির যৌনতা-প্রকাশ সর্বাধিক হয়েছে মনে করেন তার মান 100, সেক্ষেত্রে আপনি নিম্নোক্ত ছয় প্রকার মিথুনের '**যৌনতার মান**' কত নম্বর দেবেন?"

গড় নম্বর যা পাওয়া গিয়েছিল তা নিম্নোক্ত রূপ :

I ...	যুগলমূর্তি	 0
II ...	উত্তেজিত মিথুন	 5
III ...	শৃঙ্গাররত মিথুন	 20
IV ...	মৈথুনরত মিথুন	 50
V ...	অস্বাভাবিক মিথুন	 60
VI ...	যৌথযৌনাচার/অশাস্ত্রীয় মিথুন	 80

এই ফলাফল নিয়ে বিচার করলে আমরা সম্ভবত নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারি :

(i) আমাদের শ্রেণিবিভাগ অনুসারে যৌনতার মান ক্রমবর্ধমান। কোনো ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী অপেক্ষা পরবর্তীর যৌনতার মান কমে যায়নি। [বস্তুত গড় ফলাফলে শুধু নয়, প্রতিটি ভোটপত্রেই এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত]



চিত্র 4.1 গণভোটে যৌনতার মানের রেখচিত্র

এ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, আমরা যে ছয়টি শ্রেণিতে যৌনতা বৃদ্ধির কথা ভেবেছি তা সর্বজনসম্মত।

(ii) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য মাত্র 5 নম্বরের।

অথচ দ্বিতীয় আর তৃতীয় শ্রেণীর পার্থক্য 15। মনে হয় নাভিনিম্নের মূল যৌনাঙ্গকে প্রকাশিত করার প্রতিফলন এটি। তার কারণ পাশ্চাত্যের চিত্র-ভাস্কর্যে আমরা যৌনমিলনের দৃশ্যে নিম্ন যৌনাঙ্গ প্রকাশিত হতে দেখি না। সেটা সর্বযুগেই আপত্তিকর বলে বিবেচিত হয়েছে। তাছাড়া ভারতীয় নযনগ্রাহ্য অন্যান্য শিল্পবস্তুতে—চিত্রে, ম্যুরালে, মিনিয়েচারে, ধাতবপাত্রে বা পোশাকের অলঙ্করণে, বস্তুত মন্দিব-বিচ্যুত ভাস্কর্যেও—আমরা মিলন দৃশ্যে পুরুষ-স্ত্রীর জননেন্দ্রিয় বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় দেখতে অভ্যস্ত (একমাত্র পরিবহনযোগ্য পোড়ামাটির 'প্লাক' ছাড়া)।

(iii) তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির মিথুনে পার্থক্যটা সবচেয়ে বেশি। একেবারে আড়াইগুণ বৃদ্ধি 20→50। বুঝতে অসুবিধা হয় না নরনারীর সঙ্গমদৃশ্যটি লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার যে দশবিশ সহস্রাব্দের কঠিন নির্দেশ তা লঙ্ঘিত হয়েছে বলেই যৌনতাবৃদ্ধিব এই হেতু। চলচ্চিত্র বিষয়ে ভারতীয় সেন্সর বোর্ড আরোপিত নিষেধাজ্ঞাও পরোক্ষভাবে কাজ করে থাকবে। আমরা ও ব্যাপারটা চলচ্চিত্রে ও সাহিত্যে এতকাল ইঙ্গিতেই বুঝে এসেছি। *গৃহদাহে* শরৎচন্দ্র অচলা ও সুরেশের ডিহিরী-অন-শোনে প্রথম রাত্রিযাপনের বর্ণনা দিতে প্রাকৃতিক ঝড়ের একটি দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছিলেন। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি লেখক ইঙ্গিতে কী বলতে চান।

(iv) অপরপক্ষে শেষ দুটি শ্রেণিতে যৌনতার বৃদ্ধি সে তুলনায় হয়নি। হয়তো ভোটদাতাদের বক্তব্য : 'শেষ কথা তো বলাই হয়ে গেছে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মারা না-মারা সমান!'

আর একটি প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়েছিল : বিভিন্ন শ্রেণিভুক্তের '**অশ্লীলতার মান**'-এ সেক্ষেত্রে কত নম্বর দেওয়া হবে, যদি ধরে নেওয়া যায় কার্লে-মিথুনে

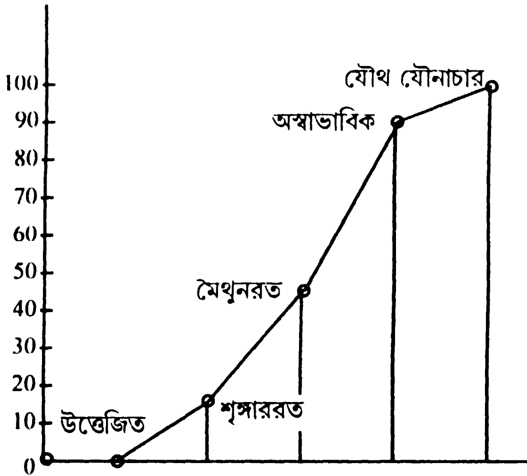
(চিত্র 8.6) অশ্লীলতা-মান 0 এবং ভোটদাতা-দৃষ্ট সর্বাধিক অশ্লীল মূর্তির মান – 100।

এই প্রশ্নের জবাবে আমরা যে ফলাফল পেয়েছিলাম তার গড় নিম্নরূপ :

I ...	যুগলমূর্তি	....	0
II ...	উত্তেজিত মিথুন	....	0
III ...	শৃঙ্গাররত মিথুন	....	15
IV ...	মৈথুনরত মিথুন	....	45
V ...	অস্বাভাবিক মিথুন	....	90
VI ...	যৌথযৌনাচার/অশাস্ত্রীয় মিথুন	....	100

এবার নির্বাচনের ফলাফল ধরে আমরা এইজাতীয় বিশ্লেষণ করতে পারি :

(i) উত্তেজিত মিথুন মূর্তিগুলি বিন্দুমাত্র অশ্লীল নয়। যেহেতু কাব্যে, নাটকে এবং ইদানীং চলচ্চিত্রে তা আমরা দেখতে অভ্যস্ত।



চিত্র 4.2 গণভোটে অশ্লীলতার মান

(ii) শৃঙ্গাররত মিথুনে মূল যৌনাঙ্গ প্রকটিত হওয়ায় কিছুটা অশ্লীল বলে মনে করা হয়েছে।

(iii) এবারে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ভেতর পার্থক্য 30 অথচ চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণীর পার্থক্য 45। এটি একটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিশ্লেষণ; হয়তো সমগ্র অ্যানালিসিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। আমরা তার হেতু হিসাবে দ্বিবিধ যুক্তি দাখিল করতে পারি। প্রথম কথা : হয়তো দোষটা আমাদের। 'অস্বাভাবিক' নামকরণটাই হয়তো হয়ে গেছে একটা 'লিডিং কোশ্চেন'। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ আধুনিক যৌনতত্ত্ববিদ যে এইসব যৌন আচরণকে স্বাভাবিক বলে চিহ্নিত করেছেন—'কানিলিঙ্গাস, ফেলাশিও' প্রভৃতিকে —তা সর্বসাধারণের জানা নেই। নিজেদের জীবনে যেটা গোপনতম গুহ্যবার্তা তাকে প্রকাশ্যে প্রচণ্ড অশ্লীল মনে হয়েছে।

(iv) শেষোক্ত শ্রেণির যৌনাচারের না আছে নান্দনিক, না সামাজিক, না শাস্ত্রীয় সম্মতি। কোনো যুগে, কোনো কামশাস্ত্রবিদ এগুলিকে অনুমোদন করেননি। ফলে পশুমৈথুন, পায়ুমৈথুন এবং যৌথযৌনাচারকে চরম অশ্লীল বলে চিহ্নিত করাই তো প্রত্যাশিত।

মিথুনাচারের পরবর্তী আলোচনায় আমরা এই দুই সংখ্যার 'গড়' মানকে গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নে প্রাপ্ত প্রতি শ্রেণির নম্বর যোগ দিয়েছি, তারপর 'দুই' দিয়ে ভাগ দিয়েছি। এই গড় সংখ্যাকে আমরা বলেছি সেই শ্রেণির 'ইরটিকা-ইন্ডেক্স' অর্থাৎ 'যৌনতা তথা অশ্লীলতার সংযুক্ত মান'।

এই কাজটি করা হল দুটি কারণে। প্রথমত, গাণিতিক জটিলতা এড়াতে; দ্বিতীয়ত, আংশিকভাবে স্বীকৃতি দিতে যে, যদিও যৌনতা এবং অশ্লীলতা একে অপরের সমার্থক নয়, তবু স্বীকার্য : একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, কোনো শ্রেণির মিথুনের 'ইরটিকা-ইন্ডেক্স' হচ্ছে গণিতশাস্ত্র মতে যৌনতা এবং অশ্লীলতার একটি 'ইন্‌ডিটারমিনেট ফাংশন'—অনির্ণীত পারস্পরিক সম্পর্ক।

কলিঙ্গ-মন্দিরে ইরটিকা-ইন্ডেক্স

কলিঙ্গে আমরা সর্বসমেত এগারোটি মন্দির খুঁটিয়ে দেখেছি এই গবেষণা কাজের জন্য। তার মধ্যে কোনোটিতে—যেমন খিচিঙ—মাত্র একবারই গিয়েছি; আবার কোনো কোনোটি, যেমন কোনার্ক বা লিঙ্গরাজ, দেখেছি আট-দশবার। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির তো বিশ-ত্রিশবার।

এই এগারোটি মন্দিরে বিভিন্ন শ্রেণির মিথুনমূর্তিগুলি এবার আমরা কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে দেব। তারপর

সেই মন্দিরগুলির 'ইরটিকা-ইন্ডেক্স' নির্ণয় করব। প্রক্রিয়াটি হবে এই জাতের : প্রথমে প্রতি শ্রেণির মিথুন সংখ্যাকে তার 'ইরটিকা-ইন্ডেক্স' দিয়ে গুণ করা হবে। তারপর সেই সংখ্যাগুলি যোগ দিয়ে যোগফলকে মোট মিথুন-সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হবে। ভাগফল হবে ওই মন্দিরের 'ইরটিকা-ইন্ডেক্স'। অর্থাৎ সেই ভাগফলই হচ্ছে ওই মন্দিরের 'যৌনতা-তথা-অশ্লীলতার মান'।

একটা উদাহরণ নিয়ে অঙ্কটা কষলেই প্রক্রিয়াটা বোঝা যাবে। ধরা যাক লিঙ্গরাজ মন্দির :

শ্রেণি :	I	II	III	IV	V	VI	মোট
মান :	0	2.5	17.5	47.5	75	90	–
মিথুন সংখ্যা :	2	25	7	—	—	--	34

মন্দিরের ইরটিকা

- 2×0+25×2.5+7×17.5+0+0+0 = 185

লিঙ্গরাজের ইরটিকা-ইন্ডেক্স = 185 - 34 − 5.5

সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কলিঙ্গে 'ইরটিকা-ইন্ডেক্স' কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার চিত্ররূপ দেখানো হয়েছে গ্রাফে (চিত্র 4.3)।

মন্দিরগুলির নির্মাণ-সময় নিয়ে নানা মুনির নানা মত। আমরা ড. কে. সি. পানিগ্রাহীর গবেষণালব্ধ সাল-শতাব্দীর অনুসরণ করেছি। উপরোক্ত সারণি এবং গ্রাফ থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে :

(i) পরশুরামেশ্বর থেকে অনন্তবাসুদেব মন্দিরের কালের ব্যাপ্তি চারশ বছর। খিচিং (প্রাক্তন ময়ূরভঞ্জ স্টেটে) বাদে এই সবগুলি দেউলই ভুবনেশ্বরে অবস্থিত। এই দশটি মন্দিরের ভিতর পাঁচটি শিবমন্দির, তিনটি শক্তি মন্দির, একটি বিষ্ণুমন্দির। বাকি একটি — রাজারানীতে —কী বিগ্রহ ছিল তা জানা যায় না। লক্ষ্য করে দেখছি, পাঁচটি শৈবমন্দিরে সর্বসমেত মিথুন আছে 143টি আর তার ভিতর মাত্র 2টি হচ্ছে মৈথুনরত মিথুন। অপরপক্ষে তিনটি শক্তি-মন্দিরে মিলিত-ভাবে মিথুন পেয়েছি 58টি, তার ভিতর মৈথুনরত মিথুনের সংখ্যা 8টি। ভাষান্তরে, শৈব মন্দিরে 'মৈথুনবত মিথুনে'র অনুপাত প্রতি 41-এ একটি; অথচ শক্তি মন্দিরে সে অনুপাত প্রতি 7-টিতে একটি।

এক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে আসা যায় : শক্তি-উপাসকেরা শৈব-উপাসকদের তুলনায 'মৈথুনবত মিথুন'-এব প্রতি বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন।

(ii) আরও লক্ষ্য করা যায় যে, ভুবনেশ্ববেব শিল্পীবা অবাস্তব ষষ্ঠ শ্রেণির মূর্তি আদৌ গড়েননি। সেখানকার পাঁচটি শৈবমন্দিরে একটি মাত্র 'লেসবিয়ান' (সমকামী নারী) মিথুন আমাদের নজরে পড়েছে (পরশুরামেশ্বরে)। গৌরী ও রাজাবানীতে একটি কবে অবাস্তব মিথুন আমবা পেয়েছি।

(iii) ভুবনেশ্বরের বাজারানী দেউলটি নানান কারণে অনন্য। আমরা সে বিষয়ে একটু পরেই

মন্দিরের নাম	নির্মাণকাল	I	II	III	IV	V	VI	মোট	ইঃ ইন্ডঃ
	খ্রিস্টাব্দ	0	2.5	17.5	47.5	75	90		
পরশুরামেশ্বর (শিব)	750	22	24	-	1	1	—	48	3 8
বৈতাল (শক্তি)	850	12	19	—	2			33	4.4
মুক্তেশ্বর (শিব)	950	5	0	—	1		-	6	8.0
ব্রহ্মেশ্বর (শিব)	1000	5	26	8	—	-	—	39	5.3
গৌরী (শক্তি)	1025	5	4	2	3	1	—	15	17.8
রাজারানী (শক্তি)	1050	5	6	3	4	1	—	19	17.4
কেদারেশ্বর (শিব)	1075	—	2	4	—	—	--	6	12.5
খিচিঙ (শক্তি)	1100	2	2	1	3	—	2	10	34.5
লিঙ্গরাজ (শিব)	1125	2	25	7	--	---	—	34	55.0
অনন্তবাসুদেব (নারায়ণ)	1150	3	3	2	2	—	—	10	13.8
কোনার্ক (সূর্য)	1250	23	89	78	121	20	56	387	36

বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা চারটি 'মৈথুনরত' এবং একটি 'লেসবিয়ান' মিথুন দেখেছি।

(iv) অবাস্তব ও অশাস্ত্রীয় মিথুন দেখা দিয়েছে প্রথমে খিচিং-এ (1200) এবং পরে কোনার্কে (1200-1250)। দুটিই নির্মিত হয়েছে খাজুরাহোর (1100-1150) শিল্পস্ফুরণের পরবর্তী কালে। আমাদের অনুমান : মিথুনাচারে এই উগ্রতা কলিঙ্গ আমদানি করেছিল খাজুরাহোর চাণ্ডিল্য শিল্প থেকে। প্রসঙ্গত বলি . মৌখিক আলোচনার সময় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় এ বিষয়ে আমার সঙ্গে সহমত হয়েছিলেন।

(v) খিচিঙের চামুণ্ডা মাতার দেউলটিকে আমরা ইতিপূর্বে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছি। কিন্তু বাস্তবে সেটি পুনর্নির্মিত হয়েছে মাত্র বিংশ শতাব্দিতে। তদানীন্তন ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের রাজা আহ্বান করেন বিখ্যাত ভারতবিদ রমাপ্রসাদ চন্দকে খিচিং-এ অবস্থিত প্রস্তরখণ্ড ও চামুণ্ডা মন্দিরেব ধ্বংসাবশেষের ওপর একটি গবেষণা করতে। ভারতবিদ চন্দ ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড একত্র করে চামুণ্ডা মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের ওপর সেই মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করান। বাকি ছড়ানো ভাস্কর্যগুলি একটি নবনির্মিত সংগ্রহশালায় সাজিয়ে দেন। ফলে চামুণ্ডা মন্দিরের বিভিন্ন শ্রেণির মিথুন গণনা করে আমরা সে মন্দিরের যে 'ইরটিকা-ইন্ডেক্স' নির্ধারণ করেছি তার জন্য আমরা ড. চন্দের কাছে প্রভূতভাবে ঋণী। তাঁর নির্বাচনে কোনো মিথুনের স্থান হয় মন্দিরে, কারওবা সংগ্রহশালায়। সুতরাং কলিঙ্গের সামগ্রিক বিচারের সময় এই মন্দিরটির 'ইরটিকাইন্ডেক্স'কে মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করা সমীচীন হবে না।

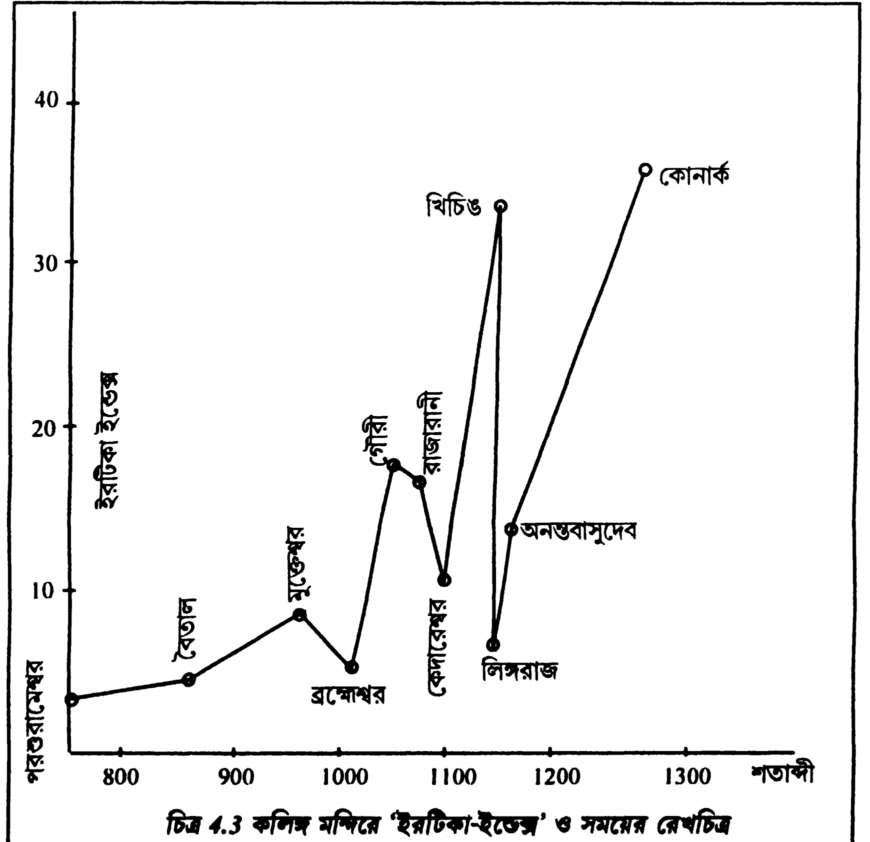
এই মন্দিরেই কলিঙ্গে সর্বপ্রথম দৃষ্ট হল একটি যৌথ-যৌনাচার দৃশ্য।

(vi) গ্রাফে আমরা লক্ষ্য করে দেখছি, দুবার ইরটিকা-ইন্ডেক্সে অবনতি ঘটেছে। একবার মুক্তেশ্বরের অব্যবহিত পরে, দ্বিতীয়বার রাজারানী নির্মাণের ঠিক পরে। ইতিহাসে দেখছি, এই দুটি মন্দির নির্মাণের পরেই কলিঙ্গে শাসকবংশের পরিবর্তন হয়েছে। মুক্তেশ্বর নির্মাণের পরেই ভৌমকরদের পরাজিত করে কেশরী বংশ কলিঙ্গের ক্ষমতা দখল করেন; এবং গৌরী-রাজারানী নির্মাণের পরেই কেশরীবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে গঙ্গবংশ হন কলিঙ্গরাজ।

যদি পর পর দুটি কাকতালীয় ঘটনা ঘটেছিল বলে ধরে না নিই, তাহলে সাধারণ সূত্র হতে পারে : কলিঙ্গে রাজবংশ পরিবর্তনের অব্যবহিত পরেই 'ইরটিকা-ইন্ডেক্স'-এর অবনতি ঘটেছে। কেন?

আমরা একটি সম্ভাব্য যুক্তি দাখিল কবতে পারি :

আমরা ইতিহাসে দেখেছি, কোনো একজন নবাগত



চিত্র 4.3 কলিঙ্গ মন্দিরে 'ইরটিকা-ইন্ডেক্স' ও সময়ের রেখচিত্র

শাসক পূর্ববর্তী রাজবংশের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করার অব্যবহিত পরে কয়েকটি কাজ সচরাচর করে থাকেন। ভারতবর্ষের সেই ট্রাডিশান আজও সমানে চলেছে। ইদানীং কোনো রাজনৈতিক দল ভোট যুদ্ধে জয়ী হয়ে যখন গদি দখল করেন তখন একই রকম আচরণ করে থাকেন—কী রাজ্যে, কী কেন্দ্রে।

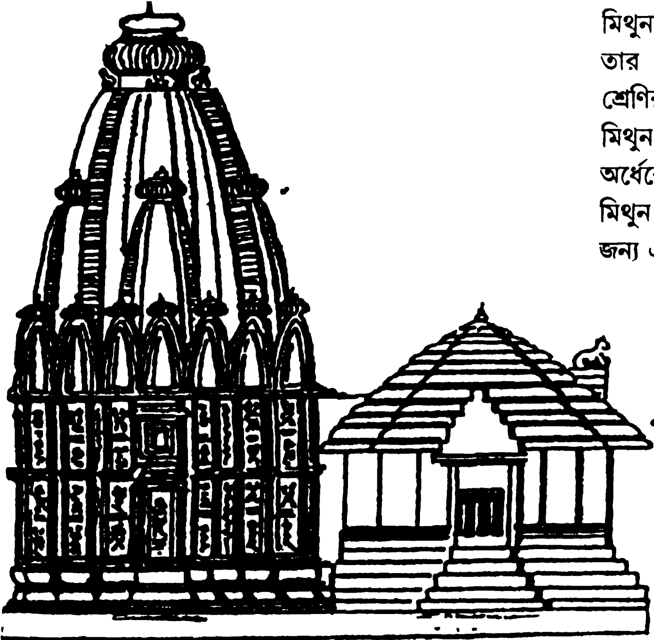
কী জাতীয় আচরণ?

নবীন শাসক প্রজাসাধারণের পরিচিত সমাজবিরোধীদের— কালোবাজারী, ভেজাল-নির্মাণকারী, গুণ্ডাদল সর্দার প্রভৃতিদের ধরপাকড় শুরু করে দেন। প্রজাবর্গকে বোঝাতে যে, নতুন শাসনব্যবস্থায় ওসব বাঁদরামো চলবে না। প্রজারা (ইদানীং ভোটাররা) খুশি হয়। নবীন শাসকের প্রতি আস্থাবান হয়ে ওঠে। নবাগত শাসক কিছুদিন অপেক্ষা করেন, জনমত তাঁর নয়া শাসন শান্তচিত্তে গ্রহণ করেছে বুঝতে পারলে ধীরে ধীরে ওইসব সমাজবিরোধীদের মুক্ত করে দেওয়া হয়। কারণ তারাই তো শাসকদলের শোষণ-ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ!

এরই সমান্তরাল চিত্র কি তির্যকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কলিঙ্গের মিথুনাচারে? শাসকবৃন্দ জানেন, সাধারণ দর্শক (তীর্থযাত্রীরা) ওইসব যৌনতাজ্ঞাপক মিথুন মূর্তিগুলি পছন্দ করে না। তাদের খুশি করতেই মন্দিরে যৌনতা তথা অশ্লীলতার প্রদর্শন কমে আসে। তারপর নতুন শাসক তাঁর গদিতে নিশ্চিন্ত হতে পারলে পুনরায় তাঁদের ক্লেদাক্ত জীবনযাত্রার প্রতিফলন ঘটাতে শুরু করেন মন্দির ভাস্কর্যে।

(vii) ভুবনেশ্বরে, বস্তুত কলিঙ্গরাজ্যে, প্রথম উল্লেখযোগ্য বিষ্ণুমন্দির অনন্তবাসুদেব, যা রাজানুগ্রহে নির্মিত। এটির নির্মাণকাল খাজুরাহো শিল্পস্ফুরণের সমসাময়িক। এখানে আমরা দু-দুটি মৈথুনরত মিথুন দেখেছি; যদিও বিগত দুইশত বৎসরের মধ্যে (মুক্তেশ্বরের পরে) কোনো শৈবমন্দিরে এ জাতীয় মৈথুনরত মূর্তি উৎকীর্ণ হয়নি। তবু লক্ষণীয়, খিচিং-এর মতো এ মন্দিরে অবাস্তব বা শাস্ত্রবিরোধী কোন মূর্তি সংযোজিত হয়নি।

(viii) অনন্তবাসুদেব মন্দির নির্মাণের (1100) মাত্র একশ বছরের মধ্যে নির্মিত হল (1200) কোনার্কের সূর্যমন্দির। ততদিনে খাজুবাহোব সবকয়টি প্রধান মন্দির নির্মিত হয়ে গেছে। এখানে আমরা দেখলাম মিথুনাচারের ইরটিকা-ইন্ডেক্স প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। আমাদের গণনা মোতাবেক বর্তমানে দৃষ্ট সূর্যমন্দিরে (চব্বিশটি রথচক্রে দৃষ্ট মিথুনমূর্তিগুলি বাদ দিয়ে) সর্বমোট মিথুনের সংখ্যা 387। তার ভিতর 121টি মৈথুনরত মিথুন, 76টি শেষ দুই শ্রেণির অস্বাভাবিক মিথুন ও যৌথযৌনাচার/অশাস্ত্রীয় মিথুন—সংযুক্তভাবে। অর্থাৎ সর্বমোট মিথুন মূর্তির অর্ধেকের অপেক্ষা বেশি শেষ তিনটি শ্রেণির উগ্রবাদী মিথুন। কিন্তু কোনার্ক মন্দিরের আলোচনা এখন নয়। তার জন্য একটি পৃথক পরিচ্ছেদ নির্দেশিত হয়েছে।



চিত্র 4.4 রাজারানী মন্দির, পার্শ্বদৃশ্য

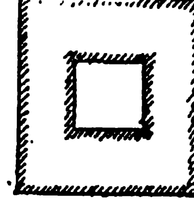
রাজারানী-দেউলের অনন্যতা

কলিঙ্গ স্থাপত্য-ভাস্কর্যে কোনার্ক ও খিচিঙ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভুবনেশ্বরে অবস্থিত রাজারানী মন্দিরটির বিষয়ে তা হয়নি। পর্যটকেরা ভুবনেশ্বরে দুটি অসামান্য মন্দিরকে সচরাচর উপেক্ষা করে যান। একটি ব্রহ্মেশ্বর, অপরটি রাজারানী। অথচ আমাদের মতে এ দুটি মন্দির অবশ্যদ্রষ্টব্য। প্রথমটি অসাধারণ ভাস্কর্য-দক্ষতায়, দ্বিতীয়টি তার অনন্যতায়।

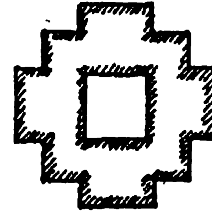
ভুবনেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরগুচ্ছ—মুক্তেশ্বর, কেদার, গৌরী, পরশুরামেশ্বর প্রভৃতির—থেকে বেশ কিছুটা দূরে বড় রাস্তার পূর্বপারে চারটি মন্দির আছে, যেখানে পদব্রজে যেতে পর্যটকেরা ইতস্তত করেন, তার মধ্যেই পড়ে এ দুটি মন্দির—ব্রহ্মেশ্বর এবং রাজারানী। অন্তত রাজারানীটা দেখতে ভুলবেন না। আমি পঞ্চাশ বছর আগে যখন প্রথমবার রাজারানী মন্দিরটি দেখি তখন দূর থেকে মনে হয়েছিল সেটি যেন সমুদ্রের মাঝখানে দণ্ডায়মান একটি 'লাইট-হাউস'। তার চারিদিকেই ছিল পাকা ধানক্ষেত। আমার প্রথম দর্শনের সময় সে শস্যক্ষেত্র ছিল সোনালী ফসলে উপচীয়মান। বাতাসে তাদের দোলনে সমুদ্রতরঙ্গের প্রতিরূপ। বর্তমানে সে পরিবেশ আর নেই। আলপথে সেখানে পদব্রজে যেতে হয় না।

বালি-পাথরের মূর্তিগুলিতে নোনা হাওয়ায় বসন্তের গুটির দাগ। তবু কী অপূর্ব সেসব মূর্তি—নৃত্যরতা দেবদাসী, অষ্টদিকপাল, নানান শ্রেণিভুক্ত মিথুন, গজবিরাল, সিংহবিরাল, গন্ধর্ব, কিন্নর, সুতনুকা, দেবদেবী! অন্যান্য মন্দির থেকে শুধু ভৌগোলিক দূরত্বই নয় আরও নানান হেতুতে রাজারানী মন্দির—একটি ব্যতিক্রম। সে অনন্যা। সে অদ্বিতীয়া।

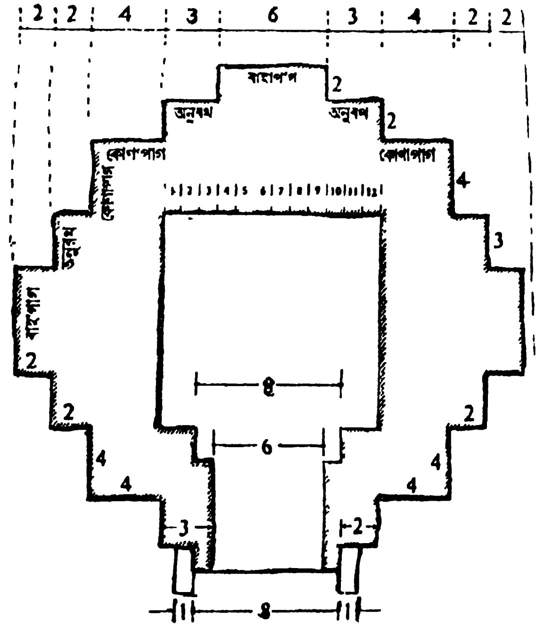
প্রথম কথা : নামকরণের অনন্যতা। ভুবনেশ্বরের যাবতীয় শৈবমন্দিরের শেষে পাবেন (একমাত্র 'লিঙ্গরাজ' ব্যতিরেকে) 'ঈশ্বর' শব্দটি—রামেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর, ভরতেশ্বর, শত্রুঘ্নেশ্বর (চারটিই অবলুপ্ত), পরশুরামেশ্বর, মুক্তেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, কেদারেশ্বর প্রভৃতি। শক্তি ও বিষ্ণু মন্দিরের ক্ষেত্রে গর্ভমন্দিরের দেবতা বা দেবীর নাম অনুসারে তাদের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন : বৈতাল, গৌরী, মোহিনী, অনন্তবাসুদেব। রাজারানীর নামকরণের সময় দুটি রীতির কোনোটাই স্বীকার করা হয়নি। লিঙ্গ রাজের ক্ষেত্রে 'ঈশ্বর' শব্দটি না পাওয়া গেলেও নামের ভেতর মন্দিরের মূল দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই অলঙ্ঘনীয় রীতি কেন বর্জিত হল রাজারানীর ক্ষেত্রে? এ মন্দিরে কোন্ দেবতা বা দেবীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল? কেউ জানে না। আদৌ কোনো দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কি না সে বিষয়েই সন্দেহ। কোনো কোনো গবেষক বলেছেন কলিঙ্গে সেকালে লালচে রঙের এক জাতের বালিপাথর বা স্যান্ডস্টোন পাওয়া যেত, তার নাম 'রাজারানিয়া'; সেই পাথর দিয়ে এ মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল বলে এই নামবৈচিত্র্য। এ কথা অনস্বীকার্য যে,



একরথ



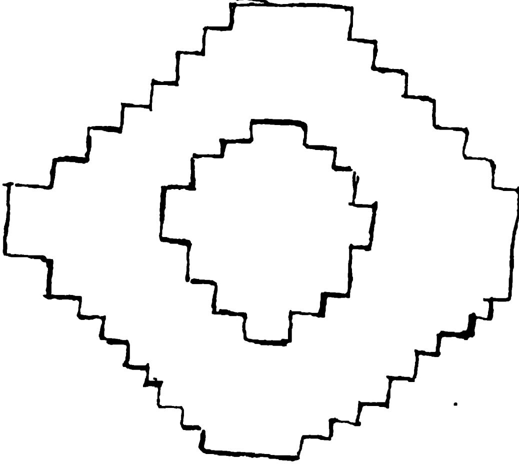
ত্রিরথ



পঞ্চরথ

চিত্র 4.5 কলিঙ্গ রীতিতে বিমানের ভূমিনকশা

পাথরগুলি অন্য মন্দিরের পাথরের মতো নয়, এর রঙ কিছুটা লালচে। কারও কারও মত এ মন্দিরে আদৌ কোন বিগ্রহ কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাঁদের যুক্তি : বিমানটি সযত্নে গঠিত হবার পর জগমোহন গড়তে গড়তেই কিছু বাধা পড়ে। হয় বহিরাক্রমণ অথবা রাষ্ট্রবিপ্লব। কারণ,



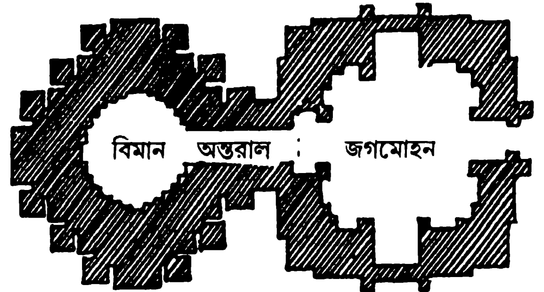
চিত্র 4.6 চাণ্ডিল্য রীতিতে (খাজুরাহো) বিমানের ভূমিনকশা (গর্ভগৃহের প্রাচীর খাঁজকাটা)

জগমোহনটি নিতান্ত দায়সারাভাবে শেষ করা। তাতে কোনো অলঙ্করণের চিহ্ন নেই। এই মতাবলম্বীরা তাছাড়াও বলেন, কোনো পুরাণে এই রাজারানী মন্দিরের উল্লেখ নেই—*একাম্রচন্দ্রিকা, কপিল সংহিতা* অথবা পুরী মন্দিরে রক্ষিত তালপাতার পুঁথি *মাদলাপঞ্জীতে* এ মন্দিরের নাম উল্লেখ করা হয়নি। যদিও অন্যান্য মন্দিরের নাম ও বর্ণনা করা হয়েছে। এ যুক্তি মেনে নিতে পারা যায় না। কারণ রাজারানী নির্মাণকালে কোনো রাষ্ট্রবিপ্লব বা বহিঃশত্রুর আক্রমণের উল্লেখ ইতিহাসে নেই। একথা ঠিক যে, সমকালে রাজ্যশাসন-ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছিল; কেশরী বংশ থেকে গঙ্গবংশে। কিন্তু তার জন্য মন্দির-নির্মাণ কার্য সাময়িকভাবে স্থগিত থাকতে পারে, বর্জিত হবে কেন? আগন্তুকরা তো বিধর্মী নয়? তাছাড়া ও-কথাটাও মেনে নেওয়া যায় না যে, কোনো শাস্ত্রে এ মন্দিরের উল্লেখ নেই।

একটি মাত্র পুরাণে এর তির্যক উল্লেখ আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেটি *একাম্র-পুরাণ*। তার চতুর্দশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, মুক্তেশ্বর দেউলের সত্তর ধেন্বন্তর দূরত্বে নির্মিত হয়েছিল : 'শক্রেশ্বর দেবালয়'। 'শক্র' হচ্ছে ইন্দ্রের এক নাম এবং 'ধেন্বন্তর' শব্দেব অর্থ 'ধেনুর দূরত্ব', একটি পূর্ণবয়স্ক গাভির দৈর্ঘ্য—নাকের ডগা থেকে লেজ। 'সত্তর ধেন্বন্তর' শব্দের অর্থ : সত্তরটি গরু পরপর 'লেজে-নাক' ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান হলে যে দূরত্ব হবে। মুক্তেশ্বর মন্দিরকে কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহাব করে 'সত্তব ধেন্বন্তর' ব্যাসের একটি বৃত্ত টানলে দেখা যাচ্ছে সেই বৃত্তের ওপর পড়ছে একটিমাত্র দেউল : অসমাপ্ত বাজারানী। ভাষান্তরে, রাজারানী—*একাম্রপুবাণ* মতে— শক্রেশ্বব। এ মন্দিরে যদি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা আদৌ না হয়ে থাকে তবে *একাম্রপুরাণে* তার উল্লেখ থাকা সম্ভবপব নয়। কারণ স্থাপত্য-ভাস্কর্যে সমৃদ্ধ হলেও কোনো পুরাণ তার নামোল্লেখ করবে যখন তাতে কোনো দেবমূর্তির প্রতিষ্ঠা হয। ফলে ধরে নেওয়া যায় যে, এটি শিবের মন্দির হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খুব তাড়াহুড়ো করে দেবদেউলটির আবশ্যিক অনুষঙ্গ জগমোহনটি সমাপ্ত করে। তারপর, যে কোনো কারণেই হোক, পরবর্তী যুগের কলিঙ্গবাসী দেবমূর্তিকে অন্যত্র অপসারিত কবে, এই অসাধারণ দেউলকে ত্যাগ করে। তার স্থাপত্য অথবা ভাস্কর্যকে কলিঙ্গের শিল্প-ইতিহাস সহ্য করেনি। কিন্তু কেন?

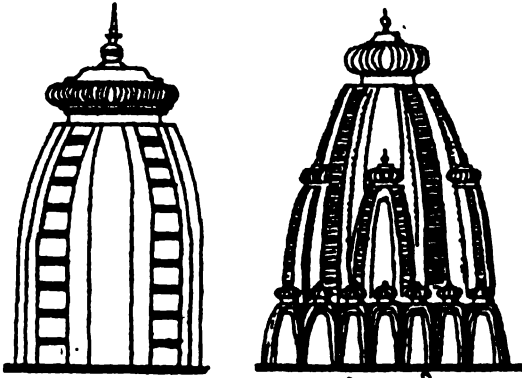
একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ মন্দির নানাভাবে কলিঙ্গের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের প্রচলিত রীতিকে অস্বীকার করে স্বকীয়তায় ভাস্বব। এ এক সম্পূর্ণ নতুন জাতির দেবদেউল (চিত্র 4.4)।

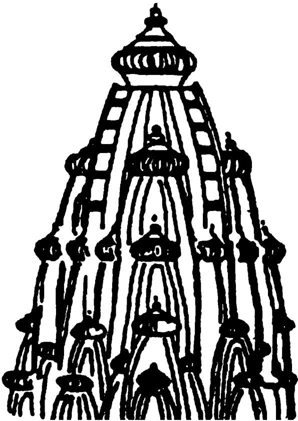
প্রথমত, ভুবনেশ্বরের যাবতীয় দেবমন্দির বালির রঙে বালিপাথরে গাঁথা। একমাত্র ব্যতিক্রম : রাজারানী। সেটি লালচে বা 'পাটকিলে' রঙের 'রাজারানিয়া' প্রস্তরে নির্মিত।



চিত্র 4.7 রাজারানী মন্দিরের ছেদ-নকশা

দ্বিতীয়ত, এর মন্দির চূড়া গঠিত হয়েছে এক নতুন রীতিতে। কলিঙ্গ-প্রচলিত রেখ-দেউলের মন্দিব চূড়া এ ঢঙের হয় না। এখানে তিনস্তরে তেত্রিশটি মন্দির চূড়া নির্মিত হয়েছে। প্রথম স্তর, যেখানে বাড়-অংশ সমাপ্ত হয়ে গণ্ডী অংশ শুরু হয়েছে। সেখানে আছে সর্বমোট চব্বিশটি ক্ষুদ্রায়তন মন্দির-চূড়া। সেগুলি এমনভাবে সাজানো যাতে যে-কোনো দিক থেকে সাতটি চূড়া দেখা যাবে। দ্বিতীয় স্তরের মন্দিরে চূড়ার সংখ্যা আটটি—এক-একদিকে তিনটি করে। শুরু হয়েছে প্রথম স্তরের আমলকতল থেকে এবং উচ্চতায় প্রথম দলের মন্দির-চূড়ার উচ্চতার দেড় গুণ। কেন্দ্রীয় চূড়াটি প্রথম স্তরের মন্দির চূড়ার দ্বিগুণ। চিত্র 4.7-এ আমরা বাড় অংশ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানকার





চিত্র 4.8 মন্দিরচূড়া গঠনের রীতিভেদ

ভূমিসমতলে একটি ছেদ-নকশা (sectional plan) এঁকে নির্মাণ ছন্দটা দেখিয়েছি।

এ নির্মাণ-কৌশল আদৌ কলিঙ্গ-স্থাপত্য অনুসারী নয়; বরং খাজুরাহো-মন্দিরের স্থাপত্য অনুসরণে। কলিঙ্গ মন্দিরে শিখরের ঢঙটা দেখানো হয়েছে চিত্র 4.8-এর। সেখানে এক-এক দিকে দুটি করে রিবনের মতো ছটি পাট। তাতে ছোট-ছোট আমলকের আভাস (চিত্র 4.8-এ নয়টি আছে)। আমলকটির ব্যাস গণ্ডী-ব্যাসের অর্ধেক, তার উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম। চিত্র 4.8-এ একটি খাজুরাহো দেউলের সম্মুখদৃশ্যও (elevation) দেখানো হয়েছে। এই মন্দির চূড়াটি নির্মিত হয়েছিল রাজারানী মন্দির নির্মাণের প্রায় অর্ধশতবর্ষ পূর্বে। রাজারানীতে পাঁচ-থাকের মন্দির-চূড়া। চিত্র 4.8-এ নিচে, রাজারানীর মন্দির-চূড়ার সম্মুখদৃশ্য। একত্রে তিনটি মন্দির চূড়ার নকশা দেখলেই বোঝা যায় রাজারানী মন্দিরের স্থপতি কাকে অনুসরণ করেছেন।

তৃতীয় কথা : রাজারানী মন্দিরের বিমান তথা জগমোহনের ভূমিনকশার ছক। কলিঙ্গের সব মন্দিরে দেখি ছেদ-রেখায় ভেতরে মন্দিরের বা জগমোহনের প্ল্যান হয় বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্র। সেগুলি খাঁজ-কাটা নয়। অথচ খাজুরাহোতে মন্দির বা জগমোহনের ভেতরের দেওয়াল বহিরাংশের ছন্দ মেনে খাঁজকাটা। চিত্র 4.6-এ কাণ্ডারীয় মহাদেও মন্দিরের ভূমি-নকশায় এটা দেখতে পাবেন। রাজারানী মন্দিরের (বিমান এবং জগমোহন দুটিই) ভেতরের প্রাচীর ওইভাবে খাঁজকাটা। বিমানে, অর্থাৎ মূলমন্দিরে, সেটা এত বেশি পরিমাণে হয়েছে যে, মন্দিরের ভেতরটা প্রায় গোলাকৃতি।

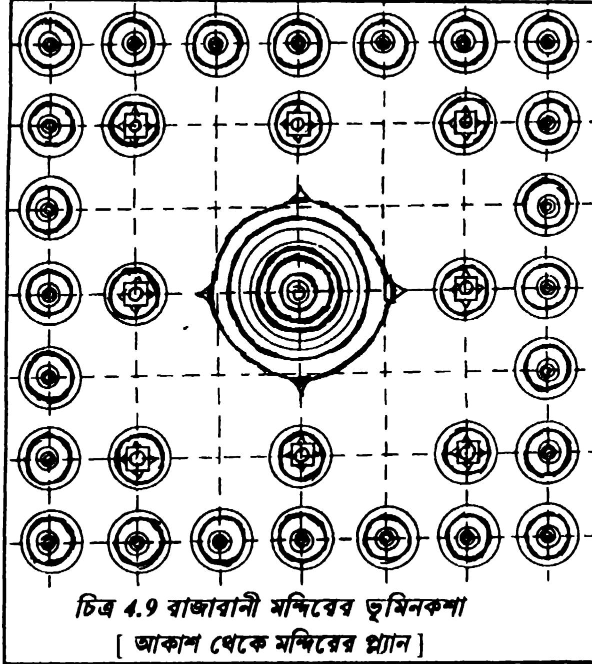
চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এ মন্দিরের 'সুতনুকার' মূর্তিগুলি খাজুরাহো-ঢঙের। অনেকে নিজ মেরুদণ্ডকে পাক দিয়ে ওপাশে ফিরে থাকে। কলিঙ্গে এটা কম দেখা যায়। প্রায় দেখাই যায় না। অথচ খাজুরাহোতে এ ধরনের মূর্তি প্রচুর।

শেষ কথা : ভুবনেশ্বরে অবস্থিত এই ছোট্ট মন্দিরে—যার জগমোহনে অলঙ্করণ করার পূর্বেই ভাস্করদলকে যে কোনো কারণেই হোক থেমে যেতে হয়েছিল—আছে সর্বাধিক সংখ্যক মৈথুনরত মিথুন। খাজুরাহোর প্রভাবে হয়েছে কি?

সব কটি পর্যবেক্ষণ মিলিয়ে আমাদের মনে হয়েছে এ মন্দিরের মূল পরিকল্পনাকার বা মূল স্থপতি খাজুরাহো স্থাপত্যচিন্তায় পরিশীলিত। কলিঙ্গ শিল্পে তাঁর আদিপাঠ

হয়নি। হয়তো সেটাই মূল হেতু যেজন্য ভবিষ্যৎকাল অপূর্ব ভাস্কর্য অস্বীকার করে এ মন্দিরকে 'জাতিচ্যুত' করে রেখেছে। তার দেবমূর্তিটি অপসারণ করা হয়েছে। তার নাম পরিবর্তন করে শক্রেশ্বরকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'রাজারানীর মন্দির' নামে।

এ মন্দিরের নির্মাতা কোন্ কলিঙ্গ নৃপতি তা জানা যায় না। আমরা আদৌ বিস্মিত হব না যদি কোনো ভবিষ্যৎ গবেষক প্রমাণ করেন : এই মন্দিরের নির্মাতা পাণিপীড়ন করেছিলেন খাজুরাহোর চাণ্ডিল্য-বংশীয় কোনও ক্ষত্রিয়নৃপতির কন্যার। হয়তো প্রিয়তমা মহারানীর অনুরোধে অথবা ইচ্ছায় কলিঙ্গরাজ জেজাকভুক্তি থেকে এক স্থপতিবিদকে নিয়ে আসেন। সেক্ষেত্রে আমরা পাঁচ-পাঁচটি প্রশ্নের যুক্তিসম্মত সমাধান লাভ করি। এমন হতে পারে যে, বৃদ্ধ বয়সে মহারাজ আশঙ্কা করেছিলেন যে, তাঁর প্রয়াণের পরে কলিঙ্গবাসী তাঁর শক্রেশ্বর মন্দিরকে অস্বীকার করতে চাইবে। সাধারণ মানুষ না চাইলেও ঈর্ষান্বিত সমকালীন কলিঙ্গ রাজস্থপতি! হয়তো কলিঙ্গের স্থাপত্য-ইতিহাসে এই বিজাতীয় প্রভাবদুষ্ট স্থাপত্যকীর্তিটিকে স্বীকারই করা হবে না। হয়তো সমাপ্ত দেউলে মূর্তি-প্রতিষ্ঠা করাতেই তাদের আপত্তি হবে। এই আশঙ্কাতেই কি কলিঙ্গরাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কোনো রকমে জগমোহনটি সমাপ্ত করেন? তাতে অলঙ্করণ না করেই নিজের জীবদ্দশায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন? আর সেই কারণেই হয়তো *একাম্র-পুরাণ* শক্রেশ্বর-মন্দিরকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে।



চিত্র 4.9 রাজারানী মন্দিরের ভূমিনকশা
[আকাশ থেকে মন্দিরের প্ল্যান]

ভবিষ্যৎকাল এইসব হেতুতেই হয়তো ওই অন্তেবাসী মন্দিরটিকে সর্বতোভাবে বর্জন করেছিল। তার আশেপাশে আর কোনো মন্দির গঠিত হয়নি। সেখানে যাবার জন্য সড়ক পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়নি! ধানক্ষেতের মাঝখানে উপেক্ষিত নিঃসঙ্গ মন্দিরটি যুগে যুগে উপেক্ষিত হয়েছে।

ভবিষ্যৎকাল যেন বলতে চেয়েছে : দেবমূর্তিহীন এই বিজাতীয় ঘরানার অপূর্ব ভাস্কর্যমণ্ডিত সৌধটি 'মন্দির' নয়। তাই ওর নামটা পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বলা হযেছে : ওটা কিছু নয়—এক স্ত্রৈণ রাজা আর তার বিদেশী রানীর এ এক বিচিত্র খামখেয়াল : 'রাজারানিয়া'। ❑

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ন্যূড : পাশ্চাত্য শিল্পভাবনায়

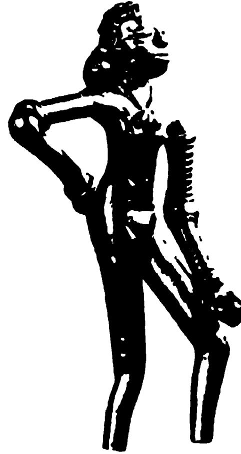


হ্যাঁ, শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিল্পভাবনাতেই। প্রাচ্যে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, ওই শিল্পানুভাবনাটি শুধু দুর্লভ নয়, সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সেই মহেন-জো-দরোর যুগ থেকে চার-পাঁচ হাজার বছর পাড়ি দিয়ে শশী হেস্ বা রবি বর্মার জমানা পর্যন্ত। 'ন্যূড' শব্দটির সমার্থক বাঙলায় কোন শব্দই নেই। 'দিগম্বরী, দিগ্‌বসনা, বিবসনা, বিবস্ত্রা' প্রভৃতি শব্দে ন্যূড শব্দের অর্থ ঠিকমতো প্রকাশিত হয় না। এমন কি ইংরেজিতে undressed, unclothed, stripped, naked শব্দও ন্যূড (nude)-এর সমার্থক নয়। 'ন্যূড' এবং 'নেকেড' শব্দের পার্থক্য বোঝাতে ইংরেজি অভিধান বলছেন

> *Nude* has a more respectable tone than *naked* The noun *nude* denotes an unclothed figure, male or female, in painting and sculpture ..... and the association of the word with an aesthetic appreciation often invests it with a kind of glamorous appeal lacking in *naked* Fashion designers can advertise some feminine clothings as having *nude* look but dare not call it *naked* For the same reasons one speaks of sleeping in the *nude*, never *naked*

ভারতীয় শিল্পের চার-পাঁচ হাজার বছরের ভেতর—সিন্ধুসভ্যতার কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত—কোনও ন্যূড মূর্তি বা চিত্র গড়া হয়নি। মহেন-জো-দরোর বিবসনা ব্রোঞ্জ নর্তকী (চিত্র 5.1) থেকে শুরু করে অসংখ্য দিগম্বরী কালী মূর্তি, এমনকি খাজুরাহো, কোনার্ক, ভাবকা, অম্বরনাথের সহস্র সহস্র নগ্ন নারীমূর্তি যাচাই করার পরেও আমরা বলতে বাধ্য : ভারত-শিল্পে ন্যূড অনুপস্থিত।

শিল্পশাস্ত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া থাক বা না থাক, শিল্পী এবং শিল্পরসবোদ্ধারা ধরে নেন 'ন্যূড' শুধু বিবসনা হলেই চলবে না, তাকে অলঙ্কারবর্জিতা হতে হবে। শুধু 'নিরাবরণ' নয়, ন্যূড হবে আবশ্যিকভাবে 'নিরাভরণ'। গ্রীক যুগ থেকে রেনেসাঁ অতিক্রম করে আধুনিক কাল পর্যন্ত পাশ্চাত্যশিল্প এই নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলেছে। ক্ষেত্রবিশেষে বর্জিত বস্ত্রের আভাস হয়তো ক্যানভাসে বা মূর্তিতে বর্তমান, কিন্তু তা দেহকে আবরিত করবে না। চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আবির্ভূতা *ক্লিডিয়ান ভেনাস* (চিত্র 5.14) থেকে *জর্জনের নিদ্রিতা ভেনাস (চিত্র* 5.28) অথবা তিজিয়ানোর *সুপ্তোত্থিতা ভেনাস* (চিত্র 5.30) চিত্রে বস্ত্রের আভাস বা ইঙ্গিত আছে, কিন্তু তা নগ্ন নারীদেহ স্পর্শ করেনি। মডেল অথবা শিল্পীর অন্তরের অবচেতনে সেই বিবর্জিত পোশাকটির প্রভাবেই তা শিল্পে ছায়াপাত ঘটিয়েছে। *সাঁচি বৃক্ষিকা* (চিত্র 5.2) অথবা *মথুরা যক্ষীর* (চিত্র 5.3) ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটেনি। উভয় ক্ষেত্রেই নারীমূর্তির কটিদেশে স্বর্ণমেখলার আভাস এবং লাজবস্ত্রও উপস্থিত; কিন্তু যেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শিল্পী দুটি ক্ষেত্রেই নারীর নারীত্বকে অপ্রকট রাখেননি। মহেন-জো-দরোর ক্ষেত্রে পরিধেয়ের আভাসমাত্র নেই; কিন্তু অলঙ্কার-আতিশয্যে সে পাশ্চাত্য শিল্পভাবনার 'ন্যূড' পর্যায়ভুক্ত নয়।



চিত্র 5.1 ব্রোঞ্জ-নর্তকী, মহেন-জো-দরো আঃ 2500 খ্রিঃ পূঃ

ভারতীয় শিল্পপরিমণ্ডলে 'ন্যূড'-এর এই সামূহিক অনুপস্থিতি আমাদের বিস্মিত করে। আবরণ-তথা-আভরণ-বিযুক্ত নর-নারীর ঈশ্বরদত্ত দেহসৌন্দর্যের চিন্তা

কেন করতে পারলেন না ভারতশিল্পী—দীর্ঘ চার-পাঁচ হাজার বৎসরের সাধনায়?

মিথুনাচারের মূল উপজীব্য নিঃসন্দেহে : আদিরস। অথচ ভারতে লক্ষ লক্ষ মিথুনমূর্তির ভেতর 'ন্যুড' অনুপস্থিত। কারণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে আদিরস ভিন্ন ভিন্ন রূপে শিল্পীকে উজ্জীবিত করেছে এবং পৃথকভাবে বিকশিত হয়েছে। পৃথিবীর দুই প্রান্তে গড়ে উঠেছে আদিরস-উদ্ভূত দুটি পৃথক প্রকাশভাবনা। ভারতে : 'মিথুন', পশ্চিমখণ্ডে : 'ন্যুড'।

স্যার কেনেথ ক্লার্ক 'ন্যুড' প্রসঙ্গে বলছেন :

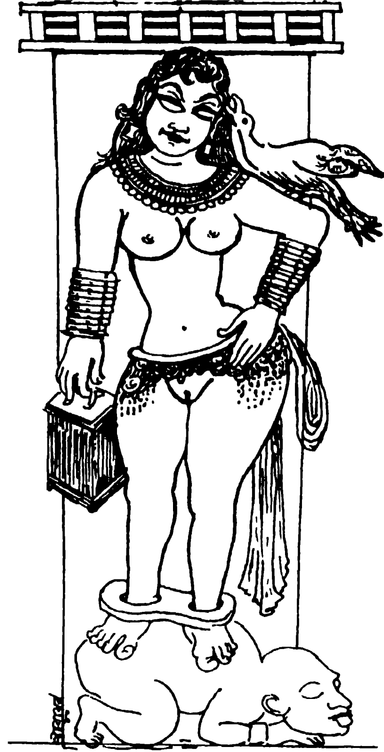
> No nude, however abstract, should fail to arouse in the spectator some vestige of erotic feeling even though it be only the faintest shadow — and if it does not do so, it is bad art and false morals.
>
> (*The Nude*, Sir Kenneth Clarke)

সেই বিচারেও গোমতেশ্বর অথবা মা-কালীর মূর্তি 'ন্যুড' নয়, কারণ সে শিল্পে erotic feeling-এর faintest



চিত্র 5.2 বৃক্ষিকা, সাঁচি তোরণ
আঃ প্রথম খ্রিস্টাব্দ

shadow পর্যন্ত অনুপস্থিত। ভারতে অন্যান্য ক্ষেত্রে নিরাবরণ মূর্তির অভাব নেই; কিন্তু তারা কেউ নিরাভরণা নয়। অপর পক্ষে 'মিথুন' অনুভাবনাটি পশ্চিমখণ্ডে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মিলনের চরমতম মুহূর্তটির পরিকল্পনা (নেপল্‌স্-এর *ইরটিকা মিউজিয়াম* বাদে) পশ্চিমখণ্ডে



চিত্র 5.3 পক্ষী ও পিঞ্জরসহ যক্ষী, মথুরা শৈলী
আঃ প্রথম খ্রিস্টাব্দ

কোনো শিল্পী কোনো যুগেই করেননি। 'ন্যুড' আর 'মিথুনের' পার্থক্য তাদের আবেদনে, পরিবেশিত শিল্পায়নের ভিয়েনে। উপস্থাপিত শিল্পে চরিত্রের সংখ্যা-বিচারে নয়। যদিও 'ন্যুড' বলতে আমরা সচরাচর একটিমাত্র ফিগারের কথা ভাবি—হোক সে পুরুষ অথবা নারী। তেমনি 'মিথুন' বলতে আমরা বিপরীত লিঙ্গের দুটি জীবের যৌথ উপস্থিতি আশা করি—মৎস্যমিথুন, হংসমিথুন, ক্রৌঞ্চমিথুন, সর্বত্র। একমাত্র ব্যতিক্রম : *ছান্দোগ্য-উপনিষদ*-এর : 'বাক-প্রাণমিথুন'।

আদিরসের বিচারে 'নূড' হচ্ছে সাগরসঙ্গমে যাত্রাপথের প্রস্তুতি; আর মিথুন হচ্ছে মহাসঙ্গমে অবগাহন স্নানের একটি পর্যায়। 'ন্যুড' হচ্ছে 'অ্যাপিটাইজার', 'মিথুন' মহাভোজের পরিবেশনা।

আরও একটি প্রভেদ আছে : মিথুন যেন নাবিকের দিকদর্শনযন্ত্র। সে সর্বদাই ধ্রুবমুখী : আদিরসসন্ধানী। অপরপক্ষে—স্যার কেনেথ যাই বলুন—আমরা দুই-তিন

সহস্রাব্দের শিল্প-বিকাশে দেখে এসেছি : 'ন্যুড' বৈচিত্র্যসন্ধানী। যৌনতাকে সম্পূর্ণ পরিহার করে ন্যুড-এর আবেদন হতে পারে : বীররস, রুদ্ররস, ভয়ানকরস, এমন কি করুণ রসও।

ভারতীয় শিল্পে বিবসনা মূর্তি অনিবার্যভাবে আদিরসসংপৃক্ত—অবশ্য কিছু মাতৃমূর্তি এই সাধারণীকরণ সূত্রের ব্যতিক্রম : কালী-তারা-ছিন্নমস্তা। তাছাড়াও ক্বচিৎ দেখা যায় যে, বিবসনা নারীর আলেখ্য ভিন্নরসের দিশারী। দুটি জগদ্বিখ্যাত নমুনা দাখিল করা গেল :

প্রথম উদাহরণটি অজন্তার প্রথম বিহারের গুহাচিত্র—*মহাজনক জাতক* থেকে (চিত্র 5.4)।

দেখা যাচ্ছে, রাজান্তঃরপুরের একটি দৃশ্য। সহচরীবেষ্টিত রাজা ও রানী। সহচরীদের দেহে বস্ত্রালঙ্কারের প্রাচুর্য লক্ষণীয়, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, রানীর অঙ্গে আভরণের প্রাচুর্য থাকলেও আবরণের একান্ত অভাব। গুহামন্দিরের দর্শক—যদি পশ্চাদপটের জাতককাহিনির বিষয়ে অনবহিত থাকেন—অবাক হয়ে ভাববেন, প্রকাশ্য রাজান্তঃপুরে রানী এমন নির্লজ্জের মতো কেন উপস্থিত হয়েছেন? সে প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিই :

চিত্রে দৃষ্ট রাজা হচ্ছেন—মহারাজ মহাজনক—একজন বোধিসত্ত্ব। অর্থাৎ পূর্বজন্মে স্বয়ং বুদ্ধদেব। তিনি বিবাহের পর বৎসরাধিককালের ভিতর সদ্যোবিবাহিতার কৌমার্যহরণে কোনো আগ্রহ দেখাননি। বস্তুত তিনি সম্পূর্ণ কামরহিত। রানী সীবলী প্রশ্ন করেন, তুমি কি আমাকে বিবাহ করে সুখী হওনি রাজা?

মহাজনক সস্নেহে বলেন : তোমার প্রেমের মন্দাকিনীতে অবগাহন করে আমি ধন্য হয়েছি, সীবলী। মনে হয়, আমার কোনও সহোদরা ভগিনী থাকলেও সে আমাকে এত ভালবাসত না।

সূর্যোদয়ে পূর্ণেন্দুর মতো ম্লান হয়ে যায় সীমন্তিনী।

দুই বাহুতে মহারাজকে বন্দী করে পুনরায় প্রশ্ন করে, কিন্তু আমার দেহমনের অন্তরালে প্রেমাস্পদের জন্য আমি কী সম্পদ আকৈশোর সঞ্চয় করে রেখেছি, তা তো তুমি দেখতে চাইলে না কোনোদিন?

মহাজনক বলেন, শুধু তোমার কেন রাজমহিষী, এই জগত-প্রপঞ্চের মর্মমূলে কোন্ গভীর রহস্য লুক্কায়িত আছে আমি সেটাই আবিষ্কার করতে চাই। বিশ্বাস কর, এই উপকরণের দুর্গে আমার যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসে, মনে হয় এই রাজৈশ্বর্যের অবরোধের মধ্যে আমার স্থান নয়। আমাকে সুদূর দিগন্ত যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে।

সীবলী গোপনে অশ্রু মোচন করে।

কাহিনি দীর্ঘায়ত করা নিষ্প্রয়োজন। *অজন্তা অপরূপা* গ্রন্থে জাতকের এই দীর্ঘ কাহিনিটি সবিস্তারে ইতিপূর্বেই বলেছি। সে গ্রন্থ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি শোনাই :

> মধুমাসের এক পূর্ণিমারাত্রে সীবলী যেন প্রগল্‌ভা বারবনিতার মতো উদ্দাম হয়ে ওঠে। প্রসাধনদক্ষার রূপসজ্জাকে নিক্ষেপ করে দূরে। খুলে ফেলে রক্তাম্বরা পট্টবস্ত্র, ময়ূরকণ্ঠিবর্ণা মেখলাবাস, অন্তর্বাসের চম্পকচিনাংশুক। সদ্যস্নাতা, নিরাবরণার বেশে সজ্জিত করে অনিন্দ্যসুন্দর বরতনু। মণিস্তবকিত বেণীতে দুলিয়ে দেয় ইন্দ্রনীলের চন্দ্রকণা, কম্বুকণ্ঠে সজ্জিত করে মৌক্তিকনির্ঝর শতনরী, অনাবৃত গুরুনিতম্বে ঝুলিয়ে দেয় মাণিক্যখচিত স্বর্ণমেখলা।
>
> মণিদীপজ্বলা প্রমোদকক্ষে রত্নসিংহাসনে যেখানে প্রতীক্ষা করছিলেন মহাজনক, ধীর পদে সেখানে এসে দাঁড়ায়। অপাপবিদ্ধ দুটি মুগ্ধনয়ন তুলে মহারাজ দেখতে থাকেন সেই অনাবৃতা নারীমূর্তিটিকে—নিরাবরণার সকুণ্ঠ লাজনম্র নিবেদনভঙ্গিমা। সীবলী বসে পড়ে তাঁর পাশে—



চিত্র 5.14 মহাজনক ও সীবলী, অজন্তা, প্রথম বিহার সপ্তম শতাব্দী

> **লুটিয়ে পড়তে চায় আশ্লেষশয়নে; কিন্তু লক্ষ্য হয় : উদাসী আনমনা হয়ে গেছেন মহারাজ।**
>
> **আর্তকণ্ঠে রত্যাতুরা সীবলী জানতে চায়, আজ আমাকে দেখে তোমার মনে কোনো কামনা-বাসনা জাগছে না, মহারাজ?**

দূর-দিগন্তে নিবদ্ধদৃষ্টি রাজর্ষি বলেন, জাগছে সীবলী। ইচ্ছা করছে আমার মন্দিরের দেবীপীঠে তোমাকে অধিষ্ঠিত করে আজ তোমাকে পূজা করি।

আর্ত হাহাকারে ভেঙে পড়ে সীবলী। এতক্ষণে অনুভব করে, সে রতিমন্দিরে দর্শনাভিলাষিণী তীর্থযাত্রিণীর মতো নিরাবরণা নয়, সে প্রগল্‌ভা নির্লজ্জা বেশ্যার মতো নগ্নিকা। দু-হাত বাড়িয়ে সে খুঁজতে থাকে তার লাজবস্ত্র।

* * *

দ্বিতীয় বিবসনার চিত্রটি আমরা দাখিল করছি অজন্তার ষোড়শ বিহার থেকে—বিশ্ববন্দিত ম্যুরাল : *মরণাহতা রাজকন্যা* বা *The Dying Princess*।

অজন্তার এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রটির সম্বন্ধে অজন্তা-শিল্পভগীরথ আদিসূরী জন গ্রিফিথ্‌স্ বলেছিলেন : "The Florentines could have put better drawing, and the Venetians better colour, but neither could have thrown greater expression put in it."

চিত্রটি 'জনপদকল্যাণীর', অর্থাৎ জনপদের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর। রাজা শুদ্ধোদনের কনিষ্ঠপুত্র নন্দের সঙ্গে তার



চিত্র 5.5 মরণাহতা জনপদকল্যাণী
অজন্তা ষোড়শ বিহার, সপ্তম শতাব্দী

প্রেম। কুমার নন্দ বাস্তবে যুবরাজ; কারণ তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সিদ্ধার্থ গৌতম সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছেন। মহারাজ শুদ্ধোদন এই জনপদকল্যাণীর সঙ্গে কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন। স্থির হয়েছে : মহারাজ শুদ্ধোদন এবার বানপ্রস্থে যাবেন, নন্দকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। আর ওই একই দিনে হবে নন্দের সঙ্গে জনপদকল্যাণীর বিবাহ।

এই মাহেন্দ্রক্ষণে হঠাৎ শোনা গেল : কুমার নন্দ তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন—তিনি সন্ন্যাসী। রাজসিংহাসন এবং জনপদকল্যাণীকে যুগপৎ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ শ্রবণে জনপদকল্যাণীর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। তিনি মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়লেন। অজন্তা ষোড়শ বিহারে সেই চিত্রটিই অঙ্কিত। (চিত্র 5.5)।

চিত্রে সর্ববামে দেখছি, দুটি রাজপুরুষ। একজনের হাতে ধৃত যুবরাজ নন্দের প্রত্যাখ্যাত মুকুট; অপরজন মনে হয় জনপদকল্যাণীকে দুঃসংবাদটি জানিয়েছে। কল্যাণী একটি শয্যায় অর্ধশায়িতা—মূর্চ্ছাতুরা মূর্তি তার। প্রত্যাখ্যাত রাজমুকুটের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। পতনোন্মুখ কল্যাণীকে পিছন থেকে একজন ধরে আছে। সামনের দিকে আর একজন পরিচারিকা উদ্বিগ্ন হয়ে রাজনটীর দিকে তাকিয়ে আছে। তৃতীয় দণ্ডায়মানা আর একজন ব্যজনিকা তাকে বাতাস করছে। তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটি নয়নাভিরাম নয়, যেন এই চরমমুহূর্তে সাবলীল সুন্দর ভঙ্গিতে দাঁড়াবার কথা তার মনেই নেই। প্রত্যেকের মুখে উদ্বেগ ও হতাশার ছায়া। গৃহচূড়ায় একটি ময়ূর। লক্ষণীয়, সে লজ্জায় মাথা নিচু করেছে। ময়ূর সৌন্দর্যের প্রতীক। শিল্পী হয়তো এখানে বলতে চান ওই ময়ূরটি পরাজিতা নায়িকার প্রতীক।

দর্শক এক্ষেত্রে অবাক হয়ে ভাবে এই প্যানেলে দুটি পুরুষ এবং পাঁচটি রমণী মূর্তির ভেতর শুধুমাত্র মূল নায়িকাটিকে কেন বৌদ্ধ শিল্পী বিবসনা করে আঁকলেন? এ বিষয়ে বিভিন্ন শিল্পবিশারদ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দাখিল করেছেন।

কেউ বলছেন, অজন্তা শিল্পীর দৃষ্টিতে নারী সৌন্দর্য এই প্রপঞ্চময় জগতের আর পাঁচটা সুন্দর দৃশ্যের মতোই। প্রস্ফুটিত পদ্ম, আকাশের সপ্তবর্ণা ইন্দ্রধনু, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি বা সূর্যাস্তের বর্ণসম্ভারের সগোত্র। ফলে শিল্পী নিরাসক্তভাবে এই বিবসনা মূর্তিটি এঁকেছেন। পত্রান্তরালে লুক্কায়িত প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে যেমন পত্রের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করে দেখতে হয়, এও সেইজাতীয় প্রয়াস। আমরা এ মতটি মেনে নিতে পারি না। এ যুক্তি তো প্রত্যেকটি রমণীমূর্তির প্রতিই প্রযোজ্য। তাহলে অজন্তা প্রাচীর-চিত্রে শত শত সৌন্দর্যবিকাশী নারীমূর্তির ভেতর হঠাৎ এটিকেই বা বেছে নেওয়া হল কেন?

আর একজন বলেছেন, এটা বাস্তবতার খাতিরে।

বিবাহরাত্রের প্রস্তুতি হিসাবে জনপদকল্যাণী নিজ বর-অঙ্গ সুসজ্জিত করছিলেন, এমন সময়ে ওই দুঃসংবাদটি এসে পৌঁছায়। কল্যাণী তার তনুদেহ আবরিত করার সময়ই পায়নি। এটিও কুযুক্তি। জোড়াতালি দেওয়া ব্যাখ্যা।

মরণাহতা রাজকন্যার এই চিত্রটির বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রিফিথস্ আরও বলেছেন : "For pathos and sentiment and the unmistakable way of telling its story, this picture, I consider, cannot be surpassed in the history of art."

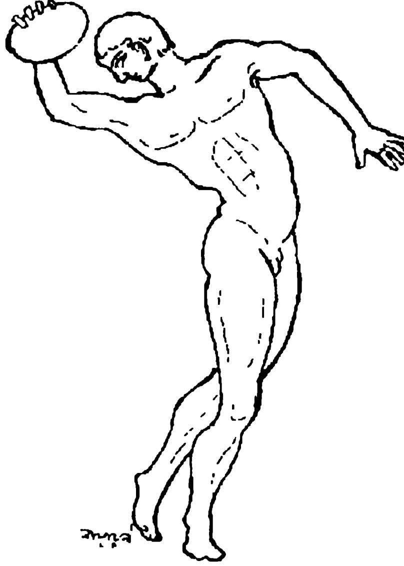
কিন্তু জনপদকল্যাণীকে কেন বিবসনা করে আঁকা হল তার ব্যাখ্যা গ্রিফিথস্-সাহেব দিয়ে যাননি।

মোট কথা, অজন্তাগুহায় অযুত-নিযুত নারীমূর্তির ভেতর আমরা মাত্র দুটি উল্লেখযোগ্য আলেখ্য পেয়েছি, যেখানে রমণী দিগ্‌বসনা! সীবলী এবং জনপদকল্যাণী। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই মূল আবেদন আদিরসের নয়। প্রথমটির, অর্থাৎ সীবলীর ক্ষেত্রে রানী কেন বিবসনা তার যুক্তি কাহিনির ভেতরেই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ার ক্ষেত্রে আমরা কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মূল পরিবেশ ও রস 'করুণ'।

কিন্তু উভয়েই সালঙ্কারা—অর্থাৎ পশ্চিমীভাবনায় 'ন্যুড'-এর যে শর্ত তা স্বীকৃত হয়নি।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়—ভারতীয় শিল্পভাবনায় প্রাচীন এবং মধ্যযুগে বস্ত্রহীন নরনারীর আলেখ্যের অভাব নেই, কিন্তু তারা কেউই নিরাভরণ নয়। তাছাড়া তাদের সঙ্গে আদিরসের কোন সম্পর্ক নেই। কালী-তারা-ছিন্নমস্তা প্রভৃতি হিন্দু দেবীর মূর্তি অথবা গোমতেশ্বর কিংবা দিগম্বর-জৈন সম্প্রদায়ের অসংখ্য মূর্তি আদিরস থেকে শত হস্ত দূরে। মন্দিরের অযুত-নিযুত মিথুন মূর্তি অলঙ্কারবাহুল্যে 'ন্যুড' অনুভাবনার নয়।

এবার পাশ্চাত্য শিল্পের কথা বলি। সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্তী কালে 'ন্যুড' বলতে আমরা বুঝে এসেছি অনাবৃতা রমণীমূর্তি। কিন্তু অভিধান-মতে 'ন্যুড' নারী-পুরুষ উভয়কেই নির্দেশ করতে পারে। একেবারে আদিযুগে গ্রীক সংস্কৃতিতে 'ন্যুড' বলতে শুধু নিরাবরণ পুরুষকেই বোঝাতো। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাগ্বর্তী কোনো ন্যুড রমণীমূর্তি গ্রীক সভ্যতায় পাওয়া যায়নি। এমনকি তার পরের দু-তিন শতাব্দী ধরেও তারা এসেছে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে। তার হেতু গ্রীক-শিল্প ও পৌরাণিক অনুভাবনায় সৌন্দর্যের দেবতা অ্যাপোলো আবির্ভূত হয়েছিলেন অনাবৃত দেহে। অথচ সেযুগে আফ্রোদিতে ছিলেন প্রচুরতর বস্ত্রাবৃতা। মনে হয়, এই ব্যবস্থাটি সমকালীন গ্রীক সমাজ-ব্যবস্থার অনুসরণে। কিশোর ও তরুণবয়স্ক গ্রীক ক্রীড়াবিদেরা বিবস্ত্র-অবস্থায় মুক্ত প্রাঙ্গণে ব্যায়াম করত, অথবা সমুদ্রসৈকতে সূর্যস্নান করত। অপরপক্ষে গ্রীকমহিলাবৃন্দ গৃহাবরোধের বাইরে আসার সময় প্রচুর বস্ত্রাবৃতা হতেন। আরবে, মিশরে বা ভারতে স্ত্রীলোকেরা আদিযুগে উন্মুক্তবক্ষারূপে জনসমক্ষে উপস্থিত হতেন, তাতে সামাজিক কোনো বাধা ছিল না। গ্রীসে সে প্রথা প্রচলিত ছিল না।



চিত্র 5.6 ডিসকাস নিক্ষেপকারী, গ্রীক শৈলী

776 খ্রিঃ পূর্বাব্দে যখন প্রথম অলিম্পিকের আয়োজন করা হল তখন প্রতিযোগীরা সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন অবস্থায় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালের গ্রীক শিল্পে (চিত্র 5.6) তার প্রতিফলন নজরে পড়ে। তখন কোনো গ্রীক রমণীর অধিকার ছিল না প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে। এমনকি দর্শক হিসাবেও মহিলারা অলিম্পিক দেখতে আসতে পারতেন না। তবু সে যুগে পুরুষ প্রতিযোগীরা মুখে মুখোস পরে—আত্মগোপন করে—নগ্নাবস্থায় প্রতিযোগিতায় অংশ নিত (চিত্র 5.7)। এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে প্রতিযোগীদের উত্তরণ ঘটে কিছু পরবর্তী যুগে। তখন তারা নারীদর্শকহীন প্রাঙ্গণে বিবস্ত্র অবস্থায় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শুরু করে।

অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনে নারীর প্রথম প্রবেশাধিকার বিষয়ে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক একটি কাহিনি সংগ্রহ করা গেছে। আমাদের আলোচ্য গবেষণার সঙ্গে হয়তো তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, কিন্তু এই অনবদ্য কাহিনিটি লিপিবদ্ধ না করে থামতেও পারছি না।

আগেই বলেছি, প্রথম যুগে অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গন

শুধুমাত্র ছিল পুরুষদের দখলে। প্রাঙ্গণের একান্তে উচ্চ পাদপীঠের ওপর স্থাপিত হতো গ্রীক-ইন্দ্রদেব জিয়ুস্-এর একটি বিরাট মূর্তি। উদ্বোধনের পূর্বে 'জিয়ুস'কে পূজা করার নিয়ম; কিন্তু পূজার অধিকার হচ্ছে ডিমিটার-মন্দিরের প্রধান পূজারিণীর। ডিমিটার হচ্ছেন জিয়ুস-এর দ্বিতীয়া পত্নী —উর্বরতার দেবী—আমাদের মা-কালীর মতো ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। ডিমিটার দেবীর প্রধান পূজারিণী সসহচরী এসে জিয়ুসের পূজার মন্ত্রোচ্চারণ করতেন, অলিম্পিকের মশালটি স্বহস্তে জ্বালতেন। তারপর সদলবলে অলিম্পিক ময়দান ত্যাগ করে চলে যেতেন। সানুচর তাঁর প্রস্থানের পরে আর কোনো স্ত্রীলোক অলিম্পিক প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকতে পারত না। যদি কেউ লুকিয়ে দেখতে এসে ধরা পড়ে যেত তাহলে তাকে টিপাকুম পর্বতশিখর থেকে কয়েকশত মিটার নিচে ছুঁড়ে ফেলার কানুন ছিল। অবধারিত মৃত্যুদণ্ড!

এটুকু পূর্বকথন সেরে এবার আমার উপকথা শুরু করি। না, উপকথা নয়, ইতিহাস। তথ্যটা সংগ্রহ করেছি দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের একজন ঐতিহাসিকের রচনা থেকে। তিনি পাউসেনিউস্ (Pausanius)। গ্রীকভাষা থেকে তাঁর



চিত্র 5.7 অলিম্পিকে নগ্ন পুরুষ প্রতিযোগী, গ্রীক শৈলী

রচনাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন জুডিথ্ স্বোয়াডিঙ (Judith Swaddling)। প্রকাশক ব্রিটিশ মিউজিয়াম। এই সুদুর্লভ গ্রন্থটি—*The Ancient Olympic Games* আমাকে সরবরাহ করেছিলেন বিখ্যাত ক্রীড়া-সাংবাদিক শ্রী চিত্ত বিশ্বাস (চিরঞ্জীব)।

পিসিরডোস সিনিয়ার ছিলেন স্পার্টার এক দুর্ধর্ষ মুষ্টিযোদ্ধা। পরপর চারবার তিনি অলিম্পিকে প্রতিটি প্রতিযোগীকে হারিয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। তারপর পঞ্চমবারে অলিম্পিকে প্রতিযোগী হবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রাগ্বর্তী চ্যাম্পিয়ান ডিওয়াগোনাস্-এর কন্যাকে তিনি



চিত্র 5.8 অলিম্পিক মুষ্টিযোদ্ধা
রোমানিস্টিক শৈলী

বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের একটি পুত্র সন্তানও হয়েছিল। পুত্রের নাম পিসিরডোস জুনিয়ার। মায়ের নাম? সেটা ইতিহাসে লেখা নেই, ইতিহাসের সেটা কেতা নয়—

'কত রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে।
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে।'

পঞ্চমবার প্রতিযোগিতায় কিন্তু অবতীর্ণ হতে পারেননি সিনিয়ার পিসিরডোস্। ক্ষয়রোগাক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে তিনি মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যেতে থাকেন। ওঁর সন্তানটি তখন বালক মাত্র। তাই তিনি তাঁর সহধর্মিণীকেই বক্সিং-এর নানান কায়দা-কানুন শিখিয়ে যান, আর অনুরোধ করে যান তাঁর দেহান্তে তাঁদের সন্তান যখন তারুণ্যলাভ করবে তখন যেন মায়ের কাছে সে বক্সিং শেখে। পিতার পঞ্চমবারের প্রত্যাশিত স্বর্ণপদক যেন পুত্রের প্রথমবারের সুবর্ণপদকরূপে ওঁদের গৃহেই ফিরে আসে!

স্বামীর দেহান্তে বিধবা নিষ্ঠাভরে পুত্রকে বক্সিং শেখাতে থাকেন। পিতার বিদায়কালীন মনোবাসনার কথা জানতে পেরে পিতৃহীন পিসিরডোস জুনিয়ার অপরিসীম নিষ্ঠায় বক্সিং শিখতে থাকে।

দিন যায়। ক্রমে বালক হল কিশোর, কিশোর হল তরুণ। দুর্জয় মুষ্টিযোদ্ধা হয়ে ওঠে সে। স্পার্টা জনপদের প্রতিটি প্রতিযোগীকে পরাস্ত করে সে অলিম্পিকে স্পার্টার প্রতিনিধিত্ব করার অনুমতি পায়। সেখানে সে অন্যান্য নগরসভ্যতার প্রতিযোগীদের—থিবস্, এথেন্স, ম্যাসিডোনিয়ার প্রতিযোগীদের—একে একে পরাজিত করে সবশেষে ফাইনালে উন্নীত হল। সেকালে নিয়ম ছিল গতবারের চ্যাম্পিয়ান 'ওয়াক-ওভার' পেয়ে ফাইনালে চলে যাবে। এবারের নক-আউট টুর্নামেন্টে যে সর্বশেষ বিজয়ী, সেই একমাত্র অধিকারী গতবারের চ্যাম্পিয়ানের সঙ্গে ফাইনাল লড়ার।

গতবারের বিজয়ী এক্ষেত্রে এক বিশালকায় দৈত্য! আঠারো বছরের নতুন প্রতিযোগীর চেয়ে সে মাথায় প্রায় একবিঘৎ লম্বা! তাকে দেখে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ান তো হেসেই বাঁচে না। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার বল্‌গা চেপে ধরা লব-কুশকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র যেমন হেসে ফেলেছিলেন। শুরু হল শেষ দ্বৈরথ-যুদ্ধ—দুর্ধর্ষ দৈত্য গোলিয়াথ বনাম গুল্‌তি-হাতে ডেভিড! অর্থাৎ বকরাক্ষস বনাম বালক কৃষ্ণ। কিন্তু চিরকাল যা হয়েছে এবারেও তাই হল। বালকের এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে ভূতলশায়ী হল ভূধর। সমস্ত দর্শকমণ্ডলী উৎসাহ-উদ্দীপনায় আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছে; আর ঠিক সেই মুহূর্তেই জনসমুদ্রের হর্ষধ্বনিকে ছাপিয়ে শ্রুত হল এক তীক্ষ্ণ তীব্র উৎসাহবর্ধক আশীর্বাদ : সাবাশ বেটা!



চিত্র 5.9 অলিম্পিকে প্রথম যুগের নারী প্রতিযোগিনী, গ্রীক শৈলী

মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল জনতা।

সন্দেহাতীতরূপে এ এক : নারীকণ্ঠ!

ভূতলশায়ী ভূধর আর উঠে বসল না। তরুণ পিসিরডোস্ নির্বিচারে বিজয়ী। কিন্তু প্রধান বিচারপতি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন :

—নিঃসন্দেহে তরুণ পিসিরডোস্ জুনিয়ার এবারের স্বর্ণপদকজয়ী। গতবারের বিজয়ীকে সে হারিয়েছে 'নক-আউট'-এ। কিন্তু তাকে চ্যাম্পিয়ান ঘোষণা করার পূর্বে আমি জনতার কাছে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই : চরমতম মুহূর্তে আমরা সবাই ওই অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে ভেসে-আসা একটা প্রশংসাবাক্য শুনেছি : 'সাবাশ বেটা'! সেটা পুরুষ-কণ্ঠে নয়। এখানে সবাই পুরুষের বেশে উপস্থিত। অনেকেই মুখাবরণ পরিধান করে এসেছেন। এই জনতার ভেতর ছদ্মবেশধারিণীকে চিহ্নিত করা সম্ভবপর নয়; কিন্তু আমি জানতে চাই অলিম্পিকের পবিত্র নিয়মাবলীকে কলুষিত করে এ জনারণ্যে কি কোনো গ্রীক মহিলা উপস্থিত আছেন? আছেন তা আমি জানি; কিন্তু আত্মঘোষণার হিম্মৎ কি সেই মহিলাটির আছে? কেউ কি আমাকে জানাবেন?

ছদ্মবেশধারী একটি মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। সগর্বে নির্ভীকভাবে ঘোষণা করলেন নিজের নাম। যে নামটি ইতিহাস লিখে রাখতে ভুলেছে। কোন ঐতিহাসিকের মতে তাঁর নাম Kallipateira, আবার কারও মতে তিনি Pherenika; কিন্তু নামে কী বা এসে যায়? তাঁর পরিচয়টাই বড় কথা। আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন—তিনি এই তরুণ বিজয়ীর গর্ভধারিণী জননী।

বিচারক অবশ্য তাঁর সে পরিচয় আদৌ জানতেন না। তিনি কঠিনস্বরে বললেন, আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, এই পুণ্য ক্রীড়াঙ্গনে নারীর প্রবেশাধিকার নাই। বিধিমতে আমি আপনাকে শাস্তি দেবার পূর্বে আপনার কৈফিয়তটা জানতে চাই—আপনি কোন্ অধিকারে এই অ্যাম্ফিথিয়েটারে উপস্থিত হয়েছেন?

দৃপ্তকণ্ঠে মহিলা প্রত্যুত্তর করলেন : বিজয়ী প্রতিযোগীর 'গুরু'র অধিকারে। অলিম্পিক নিয়মাবলীতে বলা আছে যে, প্রতিটি প্রতিযোগীর শিক্ষাগুরুর এ ক্রীড়াঙ্গনে বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার আছে। আর সে আইনে বলা হয়নি যে, শিক্ষাগুরু কোনো মহিলা হতে পারবেন না। এই হচ্ছে আপনার সওয়ালে আমার জবাব।

ঠিক তাঁর পাশ থেকে এবার উঠে দাঁড়ালেন এক পক্ককেশ অশীতিপর বৃদ্ধ। তাঁর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন—তিনি বহু পূর্বজমানার এক প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ান। তিনি

বিচারককে বুঝিয়ে বললেন, মহিলাটি তাঁরই আত্মজা এবং পূর্বদশকের চ্যাম্পিয়ানের ধর্মপত্নী। বর্তমান বিজয়ীকে তিনি কীভাবে মুষ্টিযুদ্ধ শিখিয়েছেন তাও বিশদ বর্ণনা করে বোঝালেন।

সমস্ত অ্যাম্ফিথিয়েটার মহিলাটির নামে —যে নামটি ইতিহাস লিখে রাখতে ভুলেছে—জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে।

সেই দিন থেকে অলিম্পিকে মহিলাদের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হল। ক্রমে মেয়েরা প্রতিযোগিনী হিসাবেও আসতে শুরু করে। ততদিনে পুরুষ প্রতিযোগীরা খাটো জাঙিয়া পরে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ শুরু করেছে।

অলিম্পিকে স্ত্রীলোকদের যোগদানের ব্যাপারে স্পার্টার অবদান অনস্বীকার্য। সেই নাগরিক সভ্যতায় শুধু পুরুষ নয়, কিশোরী ও তরুণীদেরও দৈহিকভাবে বলশালী করার ব্যবস্থা ছিল। স্পার্টার পীড়াপীড়িতেই অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনে মেয়েদের আবির্ভাব। আদিমযুগের একটি চিত্রে (চিত্র 5.9) দেখছি, প্রতিযোগিনী তার ফ্রকের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তখনো মহিলা প্রতিযোগীরা জানু অনাবৃত করে খাটো-জাঙিয়া পরিধানের অধিকার পায়নি।

পুরুষ ন্যূড :

গ্রীক শিল্পে সূর্যের দেবতা অ্যাপোলো হচ্ছেন আদর্শ পুরুষমূর্তি। পৌরুষব্যঞ্জক, সুগঠিততনু, বীরবত্তার পরাকাষ্ঠা। তাঁর প্রাচীনতম যে মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটিকে কিন্তু আদর্শ পুরুষমূর্তি বলে স্বীকার করে নিতে বাধে (চিত্র 5.10)। মূর্তিটির ভাব আড়ষ্ট, মাথা দেহের তুলনায় বড় এবং ভাস্কর্যে ত্রিমাত্রিক স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব।



চিত্র 5.0 অ্যাপোলো প্রাচীনতম ন্যূড, 600 খ্রিঃ, পূঃ

পরবর্তী উদাহরণটি প্রায় সওয়া শ'বছর পরের। এর নির্মাতা ক্রিটিয়ুস (চিত্র 5.11)। এ মূর্তিটি আরও বাস্তবানুগ, আরও সজীব এবং এই মূর্তিতে একটা গতির ব্যঞ্জনার পূর্বাভাস আছে।

তৃতীয় উদাহরণটি (চিত্র 5.12) বিখ্যাত গ্রীক ভাস্কর পলিক্লিটুসকৃত। প্রাগ্বর্তী-যুগের মিশরীয় স্থাবরতা থেকে এই ত্রিশ বছরেই যেন গ্রীক ভাস্কর্যের উত্তরণ ঘটেছে। পলিক্লিটুস-এর অ্যাপোলো যেন পরমুহূর্তেই নড়ে-চড়ে উঠবে—সে যেন গ্রীক ভাস্কর্যে জঙ্গমতার ভগীরথ।

স্থাবরতা থেকে মুক্তি পাবার পরেই এল নানান জাতের ন্যূড : মল্লযোদ্ধা, মুষ্টিযোদ্ধা, 'ডিস্‌কোবোলাস' (চিত্র 5.6), লাকুন-গ্রুপ প্রভৃতি।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উপস্থাপিত প্রথম যুগের তিনটি অ্যাপোলো-মূর্তিতেই—বস্তুত সে আমলের প্রায় প্রতিটি পুরুষমূর্তি— সম্পূর্ণ নগ্ন এবং তাদের যৌনাঙ্গ নিখুঁতভাবে উৎকীর্ণ করা। কিন্তু সেগুলি আদৌ আদিরসের দ্যোতক নয়। হস্তপদাদির মতো মানবদেহের অঙ্গ বিশেষ। বাস্তববাদিতা বা 'রিয়ালিজম্'-এর অনুরোধে। সমাজ যেহেতু সেটাকে অশালীন বলে ভাবেনি, ভাবতে অভ্যস্ত ছিল না, তাই এটা কারও কাছে অশ্লীল মনে হয়নি। এর সঙ্গে ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যর তুলনা করলেই আমরা অনুভব করি—কোনার্ক, খাজুরাহো, ভাবকা বা যেখানেই পুরুষমূর্তিকে মিথুনের অংশীদার রূপে বিবস্ত্র অবস্থায় গড়া হয়েছে সেখানেই তার পুরুষাঙ্গ সমুত্থিত। বাস্তবতা বা রিয়ালিজমের খাতিরে নয়, শিল্পীর মূল অনুপ্রেরণা : আদিরস!

স্বীকার্য, এই সহস্রাব্দ-প্রচলিত নিয়মের কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে ভারতীয় ভাস্কর্যে, যাকে বলে 'কোটিকে গুটিক'। যেমন : শিব, লাকুলীশ, দিগম্বর-জৈন তীর্থঙ্করদের নিরাবণ মূর্তি—যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ শ্রবণবেলগোলার গোমতেশ্বর। এছাড়া সর্বত্র পুরুষমূর্তির সেই অঙ্গবিশেষ যেন 'আন্ডারলাইন' করা। এখানেই পাশ্চাত্যশিল্পের 'ন্যূড'-এর সঙ্গে ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে বিবস্ত্র পুরুষমূর্তির নান্দনিক পার্থক্য।

নারী-ন্যূড :

গ্রীক যুগ থেকে রেনেসাঁ অতিক্রম করে উনবিংশ শতক পর্যন্ত পশ্চিমখণ্ডে পুরুষ নগ্নমূর্তি একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা মেনে এসেছে। আদি-অ্যাপোলোর নানান বিবর্তন হয়েছে—আঙ্গিকে, উপস্থাপন-শৈলীতে,

ভাবব্যঞ্জনায়। সে রূপান্তরিত হয়েছে স্থাবর থেকে জঙ্গমে। কিন্তু তার রূপারোপের চিন্তাধারায় কোন বাধা আসেনি। আদিমতম অ্যাপোলো মূর্তির সঙ্গে মিকেলাঞ্জেলোর অনবদ্য ডেভিডের যেটুকু পার্থক্য তা শুধু রচনাশৈলীতে, মুন্সিয়ানায়, জাতিগত নান্দনিক বিচার পার্থক্যে নয়। অপরপক্ষে রেনেসাঁ যুগে উপনীত হয়ে নারীন্যুড অত্যন্ত দ্রুতভাবে কয়েকটি পরিকল্পনাগত পার্থক্যের সম্মুখীন হল, যা বিবর্তন নয়, বিপ্লব। কী আঙ্গিকে, কী উপস্থাপনচাতুর্যে, কী রসের ব্যঞ্জনায়। পুরুষের আদর্শ যদি অ্যাপোলো, তাহলে, আগেই বলেছি, নারীন্যুডের আদর্শ : গ্রীক অভিধায় আফ্রোদিতে বা রোমান পরিচয়ে ভেনাস।



চিত্র 5.11 প্রথম জঙ্গম অ্যাপোলো, 480 খ্রিঃ পূঃ



চিত্র 5.12 অ্যাপোলো—পলিক্লিটুস, 450 খ্রিঃ পূঃ

ন্যুড আফ্রোদিতে আবির্ভূতা হলেন আদিম-অ্যাপোলো মূর্তি পরিকল্পনার দুই শতাব্দী পরে। যেন বাইবেলের নির্দেশ মেনে আদমের পঞ্জরাস্থি থেকে 'ছায়েবানুগতা' ঈভ। প্রথম যুগে ভেনাস মূর্তিও আড়ষ্ট, স্থাবর, কাষ্ঠপুত্তলীবৎ। আদিম আফ্রোদিতের সেই সমভঙ্গ কাষ্ঠপুত্তলীবৎ রূপকে আভঙ্গঠামে প্রথম রূপান্তরিতা হতে দেখছি *'অ্যাসকুইলিন ভেনাস'*-এ (চিত্র 5.13)। তবু এক্ষেত্রেও কোথায় কী যেন একটা ত্রুটি আছে। অ্যাসকুইলিন ভেনাস-এর মুখটি পরিণতবয়স্কার। বাকি দেহ প্রায়-কিশোরীর!

গ্রীক পরিকল্পনায় ক্লাসিকাল-সৌন্দর্যের পশরা নিয়ে বিকশিতা হলেন *'ক্লিডিয়ান ভেনাস'* (চিত্র 5.14)। স্রষ্টা তদানীন্তন গ্রীক ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী : প্র্যাক্সিটেলিস্। চিত্রে দৃষ্ট মূর্তি তাঁর স্বহস্ত নির্মিত নয়। তাঁর ছাত্রের অনুকৃতি। সমকালীন ভেনাসমূর্তির মধ্যে সর্ববিখ্যাত : *ভেনাস-ডি-মেলো।* 1820 খ্রিস্টাব্দে এই মূর্তিটি টুকরো টুকরো অবস্থায় সমুদ্রগর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়। সম্ভবত এটি প্র্যাক্সিটেলিসকৃত। মোনালিজাকে বাদ দিলে এই মূর্তিটি আজও পারীর ল্যুভ সংগ্রহশালার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। সর্বপরিচিত সে মূর্তির আলেখ্য নিষ্প্রয়োজন। তাঁর কিন্তু নিম্নাঙ্গ আবৃত।

খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তীকালে যতগুলি গ্রীক ভেনাসমূর্তি পাওয়া গেছে তার প্রায় প্রত্যেকটিই ন্যুড। লক্ষণীয়, অ্যাসকুইলিন ও ক্লিডিয়ান ভেনাস-এ শিল্পী ছিলেন তাঁর নির্মিত মূর্তির বস্ত্রাভাব বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই সেই পরিধেয় বস্ত্রের ইঙ্গিত রয়েছে শিল্পে। *ক্রিটান ভেনাস* (চিত্র 5.15) ও *সাইরিন ভেনাস* (চিত্র 5.16) পরিচ্ছদমুক্তা কিন্তু লজ্জাযুক্তা! হাতে বা হাতের কাছেই তাঁদের আবরণী দ্রষ্টব্য। পরবর্তী-কালে শিল্পীর মনে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না।

রোমক শিল্পেও এই ধারাটি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের অভ্যুত্থানের পর মূর্তিপূজার বিরোধী পাদরীদের প্রভাবে মূর্তিগঠনেই ভাটা পড়ে যায়। নগ্ন মূর্তি তো বটেই। তার দীর্ঘ সহস্রাব্দ পরে রেনেসাঁর ঊষাযুগে দেখছি ইতালীয় শিল্পীদল ভেনাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে বদ্ধপরিকর। গ্রীক ভাস্কর লিপিয়ুস-নির্মিত একটি ভেনাসমূর্তি চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফ্লোরেন্সের কাছাকাছি সমুদ্রগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত হয়। ফ্লোরেন্স তখন পাশ্চাত্যশিল্পের কেন্দ্রবিন্দু। সাড়ম্বরে সেই ভেনাস মূর্তিটিকে শহরের এক চৌমাথার মোড়ে প্রতিষ্ঠা করা হল। নগরবাসীরা উৎসবে মত্ত। প্রধান রাজশিল্পী লরেঞ্জোতি বসলেন ওই ভেনাসের একটি মর্মর অনুকৃতি করতে। কিন্তু বাদ সাধল চার্চ। খ্রিস্টধর্মের গোঁড়া সমর্থকেরা তালিবানী

ধর্মান্ধতায় পোপের কাছে আর্জি জানালেন মূর্তিটি অপসারিত করতে হবে। অনতিবিলম্বেই এসে গেল মহান পোপের আদেশ। 1357 সালের সাতই নভেম্বর ভেনাস মূর্তিটিকে উৎপাটিত এবং কবরস্থ করা হল।

এই ধর্মান্ধতার যুগে ন্যূড অনুচিন্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সান্দ্রো বত্তিচেলীর (1445-1510) অবদান অসামান্য। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, এই বত্তিচেলী ছিলেন গোঁড়া পাদ্রী সাভোনারোলার (1452-1498) প্রায় সমসাময়িক। যে সাভোনারোলা খ্রিস্টান জগত থেকে অশ্লীলতা তথা দুর্নীতি দূরীকরণ মানসে আগুন জ্বালিয়েছিলেন—তাতে ধ্বংস করেছিলেন বহু অমূল্য গ্রন্থ ও শিল্পকর্ম!

বত্তিচেলী ছিলেন ফ্রা ফিলিপ্পিনোলিপির শিষ্য এবং ফ্লোরেন্সের নগরপাল (বস্তুত রাজা) সুবিখ্যাত শিল্প-পরিপোষক লরেঞ্জো দ্য ম্যাগ্‌নিফিশেন্ট-এর অনুগৃহীত। লরেঞ্জোর এক জ্ঞাতিভ্রাতার প্রাসাদে একটি বিশালায়তন ম্যুরাল আঁকেন তিনি। সেটি বিশ্বশিল্পের এক অনবদ্য উদাহরণ : *প্রিমাভেরা* (চিত্র 5.17)।

রেনেসাঁর আদিযুগে রমণী-সৌন্দর্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এই চিত্রটি এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। চিত্রটিতে একাধিক নারীচরিত্র। বসন্তোৎসবে উপস্থিত : ভেনাস, মূর্তিমতী বসন্তদেবী, থ্রি গ্রেসেস্ [তাঁরা হলেন : Euphrosyne, Aglaia, এবং Thalia —গ্রীক পরিকল্পনায় তাঁরা আবশ্যিকভাবে ন্যূড]। এদের কাউকেই বত্তিচেলী কিন্তু 'ন্যূড' রূপে আঁকেননি। তাদের পরিধানে আছে আস্বচ্ছ বস্ত্র। রমণীর দেহভঙ্গিমার পরিষ্কার আভাস আছে, কিন্তু তারা নগ্নিকা নয়। শিল্পীর কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, রমণীমূর্তিগুলি এমনভাবে রূপায়িত যাতে মনে হয় তারা অপার্থিব, বায়বীয়, ভারমুক্ত। তারা যেন ঠিক রক্তমাংসের জীব নয়। বিষয়বস্তু চয়নেও আপত্তি করার কিছু নেই : বসন্তোৎসব! নারীদেহ বিকশনের পথে পোশাক এক্ষেত্রে অন্তরায় হল না। অথচ আস্বচ্ছ বস্ত্রের উপস্থিতিতে 'তালিবানী' কট্টর নীতিবাগিশেরাও ছেনি-হাতুড়ি হাতে ছুটে আসার সুযোগ পেলেন না। প্রায় সার্ধসহস্রাব্দের ব্যবধানে 'ন্যূড' যেন পুনর্বার অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পেল।



চিত্র 5.13 অ্যাসকুইলিন ভেনাস, 450 খ্রিঃ পূঃ



চিত্র 5.14 ক্লিডিয়ান ভেনাস, 350 খ্রিঃ পূঃ

বছর ছয়েক পরের কথা। আর একপদ অগ্রসর হলেন বত্তিচেলী। এবার আঁকলেন *ভেনাস-এর জন্ম।* (চিত্র 5.18) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদের তালিকায় প্রথম দশটি ক্যানভাসের মধ্যে তার স্থান। এই চিত্রটির মাধ্যমে ন্যূড শিল্পে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। চিত্রের কেন্দ্রস্থলে দেখা যাচ্ছে সাগরতনয়া ভেনাসকে। তিনি একটি প্রকাণ্ড ঝিনুকের ওপর দণ্ডায়মানা। ঝিনুকটি সমুদ্রের ঢেউয়ে তটভূমির দিকে ভেসে আসছে। ভেনাস-এর দক্ষিণে সমুদ্রবায়ু; বামে পুষ্পভাবনম্রা ধরিত্রীদেবী। দেখছি, মাতা ধরিত্রী এগিয়ে আসছেন রীতিমতো জমকালো একটি পরিচ্ছদ হাতে। ভাবখানা : "মা রে! তুই তো জানিসনে! বরুণরাজ্যের রীতিনীতি এই অরুণ-আলোর রাজ্যে অচল। পৃথিবীতে নারীদেহকে রেখে-ঢেকে রাখার কানুন। নে মা, পরে নে এই পোশাকগুলো!'

এবারও কূটকৌশলে আপন উদ্দেশ্য সফল করলেন শিল্পী। নগ্নমূর্তির বামহস্তের সংস্থাপনে শালীনতা রক্ষিত হল। ধর্মান্ধ পাদরীরা কোনো আপত্তি করার সুযোগ

পেলেন না। 'ন্যূড' সগৌরবে পাশ্চাত্য শিল্পে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—ভেনাসমূর্তির ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি। কোনো মরমানুষের পক্ষে ওভাবে দাঁড়ানো সম্ভবপর নয়। জিজ্ঞাসিত হলে বত্তিচেলী হয়তো বলতেন, 'বটেই তো। ওর কোনো ভারই নেই, তার ভারসাম্য কিসের?'



চিত্র 5.15 ক্রিট দ্বীপে প্রাপ্ত ভেনাস, বর্তমানে মিউনিক সংগ্রহশালায় রক্ষিত



চিত্র 5.16 ভেনাস, সাইরিন দ্বীপে প্রাপ্ত, সম্ভবত প্রাক্সিটেলেস্‌কৃত

অনেক বিদগ্ধ সমালোচক বলেছেন, ভেনাসকে দেখলে মনে হয় সে অপার্থিব। বাতাসে ভাসছে। মেঘের মতো! ফ্লোরেন্সের উফিজি সংগ্রহশালায় অরিজিনাল ছবিটা দেখে আমার কিন্তু তা মনে হয়নি। আমার বরং মনে হয়েছিল—ভেনাস যেন এখনও মানসিকভাবে জলের ভেতরে আছে—বরুণরাজ্যে! তার ভারহীনতার হেতু : বয়াঙ্সি, অর্থাৎ প্লবতা। ও ভাসছে ঠিকই, তবে বাতাসে নয়, 'জলের আকাশে'। মানে ও ভাসছেও না, ডুবছেও না। জলের ভেতর স্থির হয়ে আছে। যেন ডেকার্টে পরিকল্পিত 'কার্টিশান ডাইভার' (Cartesion Diver)। সমুদ্রজলের তলায় জলের সমপরিমাণ ঘনাঙ্কের এক নারী! জল-গগনে ও ত্রিশঙ্কু!

বত্তিচেলীর এই ভেনাসকে যদি ক্লিডিয়ান ভেনাসের সঙ্গে তুলনা করেন তবে মনে হবে এই পুনরুজ্জীবিতা নারী এক অপার্থিব সত্তা। রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা নয়, ওর দেহের একমাত্র উপাদান : কবিকল্পনা। ভেনাসের গ্রীবা, তার বামহস্তের রেখাঙ্কনে বত্তিচেলী সজ্ঞানে অ্যানাটমিকে অস্বীকার করেছেন। সমুদ্রতরঙ্গের সঙ্গে ওর প্রতিটি প্রত্যঙ্গ যেন 'অনুনাদে' এক ঐকতান রচনা করেছে। পরবর্তী যুগে এ থেকেই শিল্পে 'ম্যানারিজম্'-এর জন্ম।

আরও লক্ষণীয়, শিল্পী নগ্নিকা ভেনাসের লজ্জানিবারণ করেছেন তারই মাথার চুলে। উদ্দেশ্য যে শুধু নীতিবাগীশদের আপত্তি খণ্ডন করা তাই নয়, মনে হয় তিনি নিজেও রীতিমতো দোটানায় কাজ করে গেছেন। শিল্পের তাগিদে তিনি ন্যূডকে পুনরুজ্জীবিত করলেও সারাজীবনে কখনো নরনারীর মূল যৌনাঙ্গটি আঁকেননি। তাঁর নায়িকারা প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই কৌশলে—এক হাতে এলায়িত কুন্তলগুচ্ছ টেনে এনে—শালীনতা রক্ষা করেছে। শিল্পীর Lone Venus অথবা Story of Nastagis degil Onesti (দুটিই বার্সিলোনা, গাম্বো সংগ্রহশালায় রক্ষিত) এবং Calumnyতে (ফ্লোরেন্স, উফিজি সংগ্রহশালা) একই ভঙ্গিতে ন্যূড তার নিম্ন যৌনাঙ্গ আচ্ছাদিত করেছে।

বত্তিচেলী যেন লক্‌গেটের পাল্লাটা খুলে দিলেন। দেড়-দুশ বছরের ভিতরেই রেনেসাঁর নানান দিকপাল—লেঅনার্দো, মিকেলাঞ্জেলো, রাফায়েল, বেলিনী, তিজিয়ানো, জর্জনে, কোরেজ্জিও, ড্যুরার, পেরুজিনো, ভেরোনিজ, ওয়েডেন প্রভৃতি একের পর এক ন্যূডের বন্যায় শিল্পজগত ভাসিয়ে দিয়েছেন। তদানীন্তন সমাজের কোনো কট্টর নীতিবাগীশ, বা চার্চের কোনও ধর্মযাজক, কেউই আর আপত্তি করেননি। পোপ অবশ্য একবার ফতোয়া জারি করেছিলেন— সিস্‌তিন চ্যাপেলে মিকেলাঞ্জেলোর অনবদ্য সৃষ্টি *'শেষ বিচার'* (Last

Judgement) দৃশ্যে ন্যূডদের পোশাক পরাতে হবে। কিন্তু সে আদেশ পালিত হবার পূর্বেই পোপ স্বর্গারোহণ করেন। ফলে, তাঁর সে আদেশটি কার্যকরী করা হয়নি।

ন্যূড পাশ্চাত্য শিল্পে পুনরায় স্বীকৃতি পেল; কিন্তু কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে :

প্রথম শর্ত : ন্যূডেব ভেতর আদিরস সন্ধান করা চলবে না। আর পাঁচটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমান্তরালে নিরাবরণ তথা নিরাভরণ দেহ—নারী অথবা পুরুষের—নির্মিত বা অঙ্কিত হতে পারবে।

দ্বিতীয় শর্ত : আদর্শ নারী বা পুরুষ হবে ন্যূডের মডেল। তার দেহ সুন্দব এবং সুগঠিত হওয়া চাই।

তৃতীয় শর্ত : ন্যূড তার নগ্নতা বিষয়ে সচেতন থাকবে না। স্নানঘরের নির্জনতায় মানুষ যেমন তার নগ্নতা বিষয়ে সচেতন থাকে না, সেই রকম।

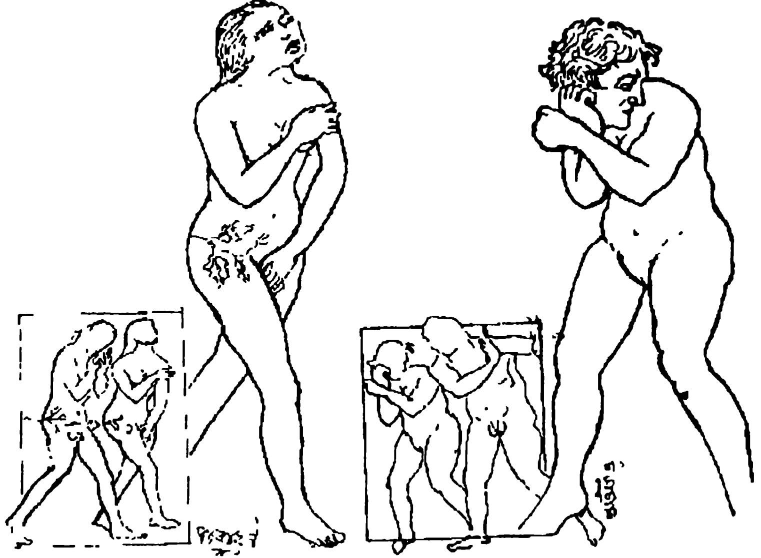
এই তিনটি শর্তই আদিম গ্রীক যুগ থেকে রোমান বা রোমানেস্ক যুগ অতিক্রম করে রেনেসাঁর আদিযুগ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত।

আমাদের মতে রেনেসাঁ যুগে শ্রেষ্ঠ পুরুষন্যূড গড়েছেন মিকেলাঞ্জেলো (1475-1564) তাঁর বিশাল ডেভিড মূর্তিতে। এটি ফ্লোরেন্স সংগ্রহশালায় রক্ষিত (চিত্র 5.19)। আর রেনেসাঁর শেষ যুগে শ্রেষ্ঠ নারী ন্যূড এঁকেছেন আঙরে (1780-1867) *লা সূর্স* (উৎসমুখ) (চিত্র 5.20)

ডেভিডের বাঁ-হাতে গুল্‌তি —সে গোলিয়াথ দৈত্যের প্রতীক্ষারত। আঠারো-বিশ বছরের তারুণ্যের প্রতীক। আর আঙরের নায়িকা সম্ভবত পঞ্চদশী—এসেছে 'ঝরনাতলার উছলপাত্রের' সন্ধানে। উভয় ক্ষেত্রেই গ্রীক আদর্শের ন্যূড-তত্ত্বের সূত্রত্রয় স্বীকৃত—আদিরস অনুপস্থিত। ওরা নিজ নিজ নগ্নতা সম্বন্ধে অনবহিত এবং তারা সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

সচেতনার ওই তৃতীয় সূত্রটা একটি বিশেষ ক্ষেত্রে উপেক্ষা করতে বাধ্য হলেন রেনেসাঁ শিল্পীরা। বাইবেল বর্ণিত আদম-ঈভের ক্ষেত্রে। তারা দুজন তো নগ্নতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার পাপেই স্বর্গ থেকে বিতাড়িত। ফলে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে শিল্পীরা অনুমতি পেলেন সেই তৃতীয় শর্তটি অতিক্রমণের।

এ বিষয়ে প্রথম সার্থক শিল্পী বোধকরি মাসাচ্চিও (1401-1428?)। খ্রিস্টান পাদরীদের আদেশে তিনি ফ্লোরেন্সে একটি গির্জায় গড়লেন আদম-ঈভের



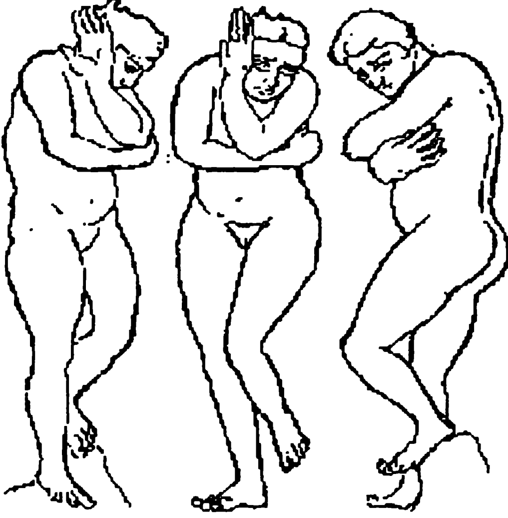
চিত্র 5.21 আদম-ঈভ, মাসাচ্চিও [1401-1428]

চিত্র 5.22 ঈভ—মিকেলাঞ্জেলো সিস্‌তিন চ্যাপেল

অর্ধোৎকীর্ণ (alto-releivo) মূর্তি। স্বর্গ থেকে বিদায়-মুহূর্তের দৃশ্য। দুজনেই নগ্ন এবং বাইবেল-বর্ণনা অনুসারে নিজ-নিজ নগ্নতা সম্বন্ধে সচেতন। বেশ বোঝা যায়—আদি পাপের জন্য তাবা দুজনেই মর্মান্তিকভাবে লজ্জিত এবং অনুতপ্ত। ঈভকে দেখে মনে হচ্ছে সে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে করতে স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হচ্ছে। (চিত্র 5.21)

কিন্তু মিকেলাঞ্জেলো ঠিক এভাবে আদম-ঈভকে গড়েননি তাঁর সিস্‌তিন চ্যাপেলের ম্যুরালে (চিত্র 5.22)। তাঁর আদম-ঈভও নগ্নতা বিষয়ে সচেতন, নগ্নতা আবৃত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টাও ঈভকে করতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার পেছন ফিরে তাকানোর মধ্যে যেন একটা প্রতিবাদী মানসিকতার দ্যোতনা। সে যেন পেছন ফিরে তার বিচারককে বলতে চায় : মাতৃগর্ভ থেকে দুনিয়াদারী করতে এ বেশে আমাকে পাঠিয়েছিল কে? আমি, না আপনি?

এই প্রতিবাদী রূপটি ঈভ চরিত্রে আর একভাবে প্রতিভাত হল তিন-চার শ বছর পরে পারীর মহান শিল্পী অগুস্তে রোদ্যাঁর (1840-1917) হাতে। রোদ্যাঁর ঈভ (চিত্র 5.23) তার ডান হাতে বুকটাকে ঢাকতে চাইছে—যেন



চিত্র 5.23 ঈভ—রোদ্যাঁ [1840-1917]

প্রতিবর্তী প্রেরণায়; কিন্তু তার বাঁ-হাত যেন আত্মপক্ষ সমর্থনে সোচ্চার। মিকেলাঞ্জেলোর ঈভ শুধু প্রতিবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়েছিল, রোদ্যাঁর ঈভ জানালো চ্যালেঞ্জ! তার বামহস্তের মুদ্রার ব্যক্তব্য : 'অলরাইট অলমাইটি! নির্বাসন দণ্ড মেনে নিলাম। কিন্তু যাবার আগে আপনাকে একটা কথা জানিয়ে যেতে চাই। মর্ত্যে আমরা একটা নতুন স্বর্গ রচনা করব! মিলনে, বিরহে, ঐকান্তিক দাম্পত্যপ্রেমে এবং প্রেমাস্পদের জীবনরক্ষার্থে আত্মবলিদানে! এসব শব্দের অর্থ আপনাদের স্বর্গবাসীরা বুঝবে না—'।

আদম-ঈভের বাধ্যতামূলক নগ্নতা থেকে ক্রমে বাইবেলের অন্যান্য কাহিনিতেও বিবস্ত্র নরনারীর মূর্তি বা চিত্র গড়তে শুরু করলেন রেনেসাঁ দিকপালেরা।

সিসতিন চ্যাপেলে মিকেলাঞ্জেলো আঁকলেন বাইবেল-বর্ণিত মহাপ্লাবনের দৃশ্য (চিত্র 5.24)। 'নোয়ার নৌকা' পরিচ্ছেদ থেকে। প্রাণধারণের তাগিদে আতঙ্কতাড়িত মানুষজনের ছোটাছুটি। শিল্পীর পরিবেশ্য রস : 'ভয়ানক'। কিন্তু শিল্পীর তুলিতে ভয়ানক রসকে অতিক্রম করে ফুটে উঠল বাইবেলের মহামন্ত্র : Love thy neighbour ! জননী তার সন্তানকে বুকে চেপে ধরে তীরে আশ্রয় খুঁজছে—পরিধেয় বস্ত্রের অপেক্ষা সন্তানের কথাই তার মনে আছে। এ তো প্রত্যাশিত দৃশ্য; কিন্তু ওই যে যুবকটি তার আহত প্রতিবেশীকে কাঁধে করে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিচ্ছে ওতেই যেন সার্থক হয়ে উঠেছে বাইবেলের মহান বাণী (চিত্র 5.24)।

তা সে যাই হোক, এই পরিকল্পনায় ভয়ানক-বীভৎস-করুণ-শান্ত রসই মূর্ত হয়ে ওঠার কথা—আদিরসের স্থান এখানে নেই। তবু মিকেলাঞ্জেলো একাধিক ন্যূড এঁকেছেন। বাস্তবতার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠায় শিশুক্রোড়ে জননী এবং রক্ষিতপ্রাণ যুবকটির যৌনাঙ্গ চিত্রণে মহান শিল্পী অকুণ্ঠ। স্ত্রীলোকটির ক্ষেত্রে বস্ত্রপ্রান্তটা আর একটু ঘুরিয়ে দিলেই শালীনতা রক্ষা করা কতই না সহজ ছিল;



চিত্র 5.24 মহাপ্লাবন, সিস্‌তিন চ্যাপেল, মিকেলাঞ্জেলো [1475-1564]

কিন্তু না। শিল্পী তা করেননি। কারণ তিনি আপনার-আমার মতো কোনো 'অবসেশনে' ভুগছেন না। চিত্রিত চরিত্রগুলির নগ্নতার বিষয়ে কোনো গুরুত্বই আরোপ করতে চাননি তিনি। শুধু অঙ্কিত চরিত্রগুলি নয়, শিল্পী নিজেও যেন ও বিষয়ে অনবহিত।

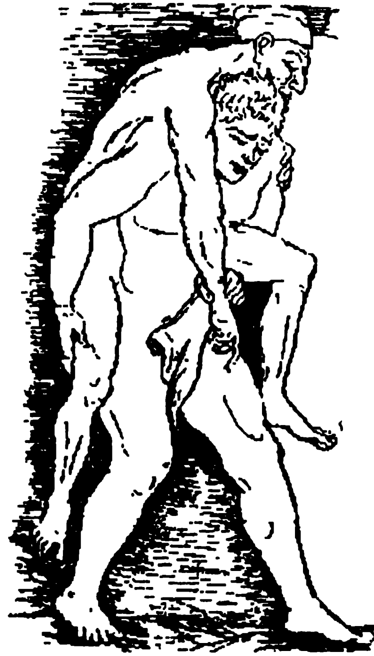
তুষারতীর্থ কেদারনাথে একবার এক নাগা সন্ন্যাসীকে দেখেছিলাম। সেই সম্পূর্ণ বিবস্ত্র সন্ন্যাসীর মতো মিকেলাঞ্জেলো যেন উদাসীন।

এই অতি বৃহৎ ম্যুরালটির একটি খণ্ডদৃশ্য—যা চিত্র 5.24-এ ধরানো যায়নি তা পুনরায় এঁকেছি (চিত্র 5.25)। এখানে এক বৃদ্ধকে দেখছি কোনক্রমে একটি যুবককে বহন করে নিয়ে চলেছেন। আবেদন সেই একই : প্রতিবেশীকে ভালোবাস। কিন্তু এবারেও শিল্পী যৌনতা বিষয়ে উদাসীন। বৃদ্ধের হস্তবন্ধনী কয়েক আঙুল নিচু দিয়ে হলে শালীনতা রক্ষা করা যায়। শিল্পীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

রেনেসাঁ যুগের আর এক দিকপাল রাফায়েল (1483-1520) ছিলেন মিকেলাঞ্জেলোর চেয়ে আট বছরের অনুজ।



চিত্র 5.25 মহাপ্লাবনের আংশিক চিত্র মিকেলাঞ্জেলো [1475-1564]



চিত্র 5.26 ভ্যাটিকান গির্জায়, রাফায়েল [1483-1520]

তাঁর ওপর যখন ভ্যাটিকান চার্চের অপর একটি প্রাচীরে মূরাল আঁকার আদেশ হল, তখন রাফায়েল যেন অগ্রজপ্রতিম শিল্পীর সওয়ালের জবাব দিলেন। মিকেলাঞ্জেলো যেন বল্‌তে চেয়েছেন—আগামী প্রজন্মের ভেতরেই মানুষ চিরজীবী হতে চায়, তাই নিজ-জীবন বিপন্ন করেও বৃদ্ধ একটি যুবকের দেহ নিরাপদ আশ্রয়ে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। রাফায়েল যেন তার জবাবে বলতে চাইলেন—না, মানুষ শুধু ভবিষ্যতের জন্যই লালায়িত নয়, অতীতের প্রতিও সে শ্রদ্ধাশীল। তাই তিনি আঁকলেন পুত্র পিতাকে বহন করে নিয়ে যাবার দৃশ্য। এটা মহাপ্লাবনের পরিকল্পনা নয়—রাষ্ট্রবিপ্লবে ট্রোজান বীর এনিয়ুস তাঁর পঙ্গু পিতৃদেবকে বহন করে নিয়ে চলেছেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। রাফায়েলও ন্যূড এঁকেছেন; কিন্তু যুবকের নিরাবরণ দেহের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখালেও বস্ত্রপ্রান্তটি ঘুরিয়ে এনে তার নগ্নতাকে রেখেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে (চিত্র 5.26)।

তাহলে কি ধরে নেব যৌনাঙ্গ রূপায়ণে ভারতবর্ষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল 'অবজেক্‌টিভ'—শিব, লাকুলীশ বা জৈন-তীর্থঙ্করদের মূর্তি যুগনিরপেক্ষভাবে যেমন অনাবৃত—পশ্চিমখণ্ডে তা 'সাবজেকটিভ'? মাসাচ্চিও, বত্তিচেলী, রাফায়েল শালীনতাবোধের একরকম সংজ্ঞা মেনে চলেন, আর মিকেলাঞ্জেলো অন্যরকম?

না, সে রকম সাধারণীকরণ ঠিক যুক্তিযুক্ত হবে না। লক্ষ্য করে দেখুন—সাধু, সন্ত, যীশু বা মা-মেরীর ক্ষেত্রে মিকেলাঞ্জেলো নিজেও বহুক্ষেত্রে ন্যূড আঁকেননি। 'ক্রুসিফিকেশন অব সেন্ট পীতর'-এ [পলিন চ্যাপেল, 1547-50] অসংখ্য ন্যূড-এর মাঝখানে সেন্ট পীতর এবং পল বস্ত্রাচ্ছাদিত। সিসতিন চ্যাপেলেও একই ব্যাপার—অসংখ্য ন্যূডের ভেতর যীশু, মা-মেরী, সন্ত বার্থলোমিউর মূর্তি ন্যূড নয়। তাহলে? বেশ বোঝা যায়—মিকেলাঞ্জেলোর অন্তরে নগ্নতা-বিষয়ে একটা মূল্যবোধ নিশ্চয়ই ছিল। না-হলে বারে বারে আমরা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গকে বস্ত্রাচ্ছাদিত দেখছি কেন? শেষ জীবনে অবশ্য তিনি অন্য একটি ন্যূড-যীসাস গড়েছিলেন।

না, মনে হয়, মিকেলাঞ্জেলো সেই কেদারনাথে-দৃষ্ট নাগা সন্ন্যাসীর মতো সামাজিক মূল্যবোধের ঊর্ধ্বে নন।

তাছাড়া রেনেসাঁ যুগের সেই মহানশিল্পী যে ন্যূড আঁকা বা গড়া খুব পছন্দ করতেন এ বিষয়ে দ্বিমত হতে পারে না। ধরা যাক তাঁর প্রথম যুগের আঁকা একটি 'প্লাক'—'দোনি তন্দো'! 'তন্দো' হল গোলাকার ধাতব থালিকা,

অনেকটা আমাদেব লক্ষ্মীব-সবার মতো। বিষযবস্তু 'হোলি ফ্যামিলি'। অর্থাৎ মা-মেবী, শিশু যীশু এবং যোসেফ। অপূর্ব একটি 'তন্দো' রূপায়িত করলেন মিকেলাঞ্জেলো, কিন্তু যিনি এটি নির্মাণের অর্ডার দিয়েছিলেন তিনি সেটা কিনে নিতে অস্বীকাব কবলেন। কারণ এই 'হোলী ফ্যামিলি'ব পশ্চাদপটে শিল্পী গডেছেন একটি সমুদ্রতীর এবং সেই সমুদ্রতীবে একটি প্রাচীরে উপবিষ্ট জনাপাঁচেক যুবাপুরুষ তখন সূর্যস্নান করছে। তারা সবাই ন্যুড! 'হোলী ফ্যামিলি'-ব সঙ্গে তাদেব কী সম্পর্ক? যীশুর জন্মকালে প্যালেস্টাইনে এভাবে যুবকেরা সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় প্রকাশ্যে



চিত্র 5.27 কাসিনাব যুদ্ধ, মিকেলাঞ্জেলো [1475-1564]

সূর্যস্নান করত না। তিনি গ্রীকশিল্পের অনুসারী ওই নগ্নমূর্তিগুলি এঁকেছিলেন। এ জন্যই সেটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

আর একটি উদাহরণ : *কাসিনার যুদ্ধ* (চিত্র 5.27)।

ফ্লোরেন্স নগরবাসীদের সঙ্গে তখন পার্শ্ববর্তীরাজ্য পীসা অধিবাসীদের একটি যুদ্ধ চলছে। গ্রীষ্মকাল। ফ্লোরেন্স সৈন্যদলের একটি বিচ্ছিন্ন প্লেটুন আর্নো নদীতে অবগাহনরত। হঠাৎ সংবাদ এল শত্রুদল অতর্কিতে আক্রমণ করেছে। তৎক্ষণাৎ অর্ধস্নাত সৈন্যদল যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে নিল। মিকেলাঞ্জেলো সেই খণ্ড মুহূর্তটিকে ধরে রাখতে চাইলেন। একটা স্ন্যাপশটে। ফলে বীররসই এখানে মৌল আবেদন। পেশীবহুল সৈন্যদলের সকলেই নগ্ন। বাস্তবতার অনুরোধে পুংজননেন্দ্রিযগুলি নিখুঁতভাবে আঁকা— তবু স্বীকার কবতেই হবে, এ নগ্নতার সঙ্গে যৌনতার কোন সম্পর্ক নেই।

মিকেলাঞ্জেলো যদি সেই ঐতিহাসিক খণ্ডমুহূর্তের দু-দশ মিনিট আগে অথবা পবে তাঁব 'মন-ক্যামেরার' শাটারটা খুলতেন তাহলে এতগুলি সুগঠিত নগ্নদেহ আঁকবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতেন।

* * *

আদম-ঈভ ব্যতিরেকে অন্যান্য ন্যুড যে তার নগ্নতা বিষয়ে সচেতন থাকবে না—এই সূত্রটি প্রথম লঙ্ঘন করলেন তিজিয়ানো তাঁর 'সুপ্তোত্থিতা ভেনাস'-এ।

'ন্যূড' যে আদিরসাত্মক হতে পারবে না, সে যে তার নগ্নতার বিষয়ে সচেতন থাকবে না—এই ধারণাটি গ্রীক যুগ থেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে। আমাদের মতে, এই ধারার শেষ শিল্পী হচ্ছেন : জর্জনে (1478-1511)। তিনি ছিলেন ভেনিস-শৈলীর শিল্পগুরু গিওভান্নি বেলীনির (1430-1516) এক প্রিয়ছাত্র এবং ষোড়শ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ ভেনিশীয় শিল্পাচার্য। জর্জনের আঁকা *শায়িতা ভেনাস* [বর্তমানে স্টেট পিকচার গ্যালারি, ড্রেসডেনে সংরক্ষিত] বোধ করি প্রথম শায়িতা ভেনাস। আর সেটিই প্রাগ্বর্তী শিল্পচেতনার শেষ ন্যূড। নিদ্রাভিভূতা ভেনাস বিশাল প্রকৃতির পশ্চাদপটে নিজের নগ্নতা সম্বন্ধে



চিত্র 5.33 নবযুগের ক্লিওপেট্রা
রেমব্রান্ট [1606-1669]

সম্পূর্ণ অনবহিতা। ভেনাসের পরিত্যক্ত পোশাক নিখুঁত বাস্তব; কিন্তু রক্তমাংসে গড়া নগ্নিকা নারী মূর্তিটি যেন প্রকৃতির সঙ্গে সৌন্দর্যসুষমায় একটা ঐকতান রচনা করেছে (চিত্র 5.28)।

জর্জনে-অঙ্কিত এই *নিদ্রিতা ভেনাস* রেনেসাঁ-যুগে পাশ্চাত্য শিল্পের এক কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের অসংখ্য রেনেসাঁ দিকপাল—তিজিয়ানোর *ভেনাস*, মানের *অলিম্পিয়া*, গইয়ার *মাজা*, *দ্য ন্যূড* প্রভৃতি সব কটি শিল্পেই ওই নিদ্রিতা ভেনাসের ভঙ্গি। শিল্পীরা সকলে একই কম্পোজিশন অনুসরণ করেছেন বটে কিন্তু জর্জনের *নিদ্রিতা ভেনাস*-এর সঙ্গে তাদের ভাবগত নান্দনিক পার্থক্য আশমান-জমিন্!

তার হেতু : জর্জনের *নিদ্রিতা ভেনাস* একটি শৈল্পিকচিন্তার যবনিকা। এ নাটকের পটোত্তলন করেছিলেন বত্তিচেলী আর যবনিকা ফেললেন জর্জনে। পরবর্তীকালের যাবতীয় ন্যূড ভিন্ন জাতের, ভিন্ন আবেদনের, ভিন্ন মেজাজের। কেন, তাই বলি :

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো [427-347 B.C.] তাঁর *সিম্পোজিয়ামে* বলেছেন : ভেনাস দু'জাতের –অপার্থিব ভেনাস (Venus Coelestis) এবং প্রাকৃতিক ভেনাস (Venus Naturalis)। প্রভেদটা যেন মা লক্ষ্মীর স্বর্গীয় সৌন্দর্যের সঙ্গে কামনা-বাসনা বিজড়িত উর্বশীর মোহিনী রূপ। প্রথম জাতের ভেনাস অভিভূত করে; বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় মাথা আপনিই নত হয়ে যায়। দ্বিতীয়া আমাদের মনে কামনার উদ্রেক করে।

জর্জনের ভেনাস সেই হিসাবে শেষবারের মতো Venus Coelestis। দ্বিতীয় জাতির ভেনাস—পার্থিব কামনা-বাসনা জাগরিত করা ভেনাস আবির্ভূতা হলেন তিজিয়ানো বা টিশিয়ানের তুলিতে : *আর্বিনো ভেনাস* (চিত্র 5.29)। কম্পোজিশানের দিক থেকে, আঙ্গিকের দিক থেকে দুই ভেনাস যেন যমজ বোন। জর্জনের *নিদ্রিতা ভেনাস* এবং তিজিয়ানোর *সুপ্তোত্থিতা ভেনাস* দুজনেরই বাঁ-হাত, বামস্তন, চরণদ্বয়ের রেখাঙ্কনে আশ্চর্য সাদৃশ্য। অথচ অনুভূতির রাজ্যে, নান্দনিক বিচারে, যেন ইতিমধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। তিজিয়ানোর ভেনাস সুপ্তিমগ্না নয়, সুপ্তোত্থিতা। সে যেন চোখ মেলে দেখতে চায় : 'কে পরালে মালা?'

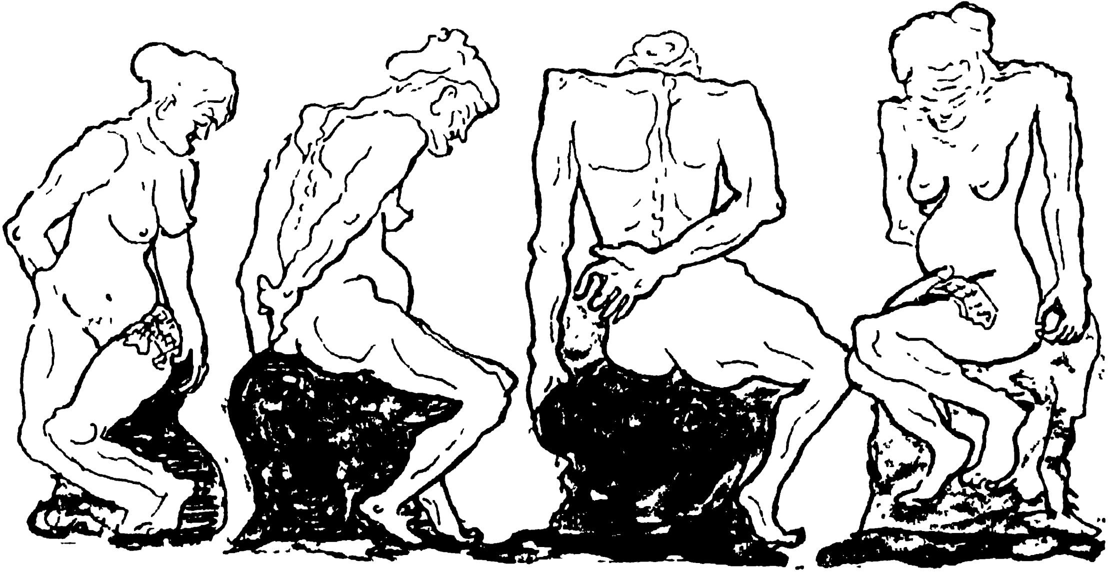
তার নগ্নতা সম্বন্ধে সে সচেতন। তার চোখের কোনায়, অধরপ্রান্তে কী যেন এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত—যা য়ুরোপীয় চিত্রকলার ন্যূডে এতদিন দেখিনি। দেখেছি, ভারতবর্ষে, সাঁচী বৃক্ষিকার রূপায়ণে (চিত্র 5.2), মথুরা যক্ষীর আমন্ত্রণে (চিত্র 5.3)।

ঘটনাচক্রে তিজিয়ানো আর জর্জনে দুজনেই ছিলেন গুরু বেলীনির প্রিয়ছাত্র। সহপাঠীর ওই চিরাচরিত চিন্তাধারাকে আক্রমণ করতেই যেন তিজিয়ানো এই চিত্রটি

আঁকলেন। সহাধ্যায়ীর ভেনাস-এর বহিরঙ্গরেখায় কোনো পরিবর্তন হল না, হল তার সচেতনতায়। তার নগ্নতা বিজ্ঞাপনের স্বেচ্ছাচারিতায়। ভেনাসের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে—সহস্রাব্দের মোহনিদ্রা অন্তে এতদিন পরে জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল আস্বাদনে সে সচেতনা মোহিনী!

তিজিয়ানো থামলেন না। দশ বছরের ভেতর একের-পর এক পাঁচ-সাতখানি শায়িতা ন্যুড আঁকলেন। সকলেই জাগ্রতা, পার্থিব, নিজের নগ্নতা সম্বন্ধে সচেতন—এবং ক্ষেত্রবিশেষে একা নয়। প্রত্যেকেই সুগঠিততনু, দৃঢ়গ্রীব কিশোরীসুলভ কোরকস্তনী, অথচ মধ্যক্ষামা নয়, কিঞ্চিৎ স্ফীতোদরা। একই আঙ্গিক, একই শয়নভঙ্গি, একই

রুবেন্স অস্বীকার করলেন সহস্রাব্দস্বীকৃত শর্তটি : ন্যুড হবে অচিহ্নিতা মডেল। দর্শক যেন আর্ট গ্যালারিতে এসে কোনো ন্যুড দেখে বলতে না পারে : 'আরে, এ মেয়েটা তো আমার চেনা , অমুক!' এই চিরাচরিত কানুনকে নস্যাৎ করতে রুবেন্স আঁকলেন একটি বিরাট ক্যানভাস : *থ্রি গ্রেসেস্*। বিষয়বস্তু ক্লাসিকাল। তিনি কিন্তু আদৌ কোনও মডেল ব্যবহার করলেন না। মন থেকে আঁকলেন তিন-তিনটি বিবসনা সুন্দরীকে। তারা কেউই তন্বী, মধ্যক্ষামা নয়—সুন্দরী মৃণালগ্রীব, আলুলায়িতকুন্তলা, বক্ষে যুগল পূর্ণকুম্ভ, সুডৌল জঙ্ঘা, দৃঢ়নিবদ্ধ গুরুনিতম্ব (চিত্র 5.31)।



চিত্র 5.34 হেলমেট নির্মাতার সেই সুন্দরী স্ত্রী, রোদ্যাঁ [1840-1917]

আবেদন : *অর্গানবাদকসহ ভেনাস, কিউপিডসহ ভেনাস* (দুটিই মাদ্রিদ সংগ্রহশালায় রক্ষিত), *বাক্কানাল, দানে, প্রাদো-সুন্দরী* প্রভৃতি।

* * *

ন্যুড-তত্ত্ব প্রায় একই সময়ে পর পর আরও দুটি ধাক্কা খেল। যেন দুটি শাখা নদী ভিন্ন পথে রওনা হল সাগরসঙ্গমে। প্রথমটির ভগীরথ ফ্লান্ডার্স-শিল্পী পিটার পল রুবেন্স (1577-1640); দ্বিতীয় ধারাটির জন্মদাতা আমস্টার্ডমের শিল্পী রেমব্রান্ট হার্মেন্ট্জ্ (1606-69)। একে একে বলি :

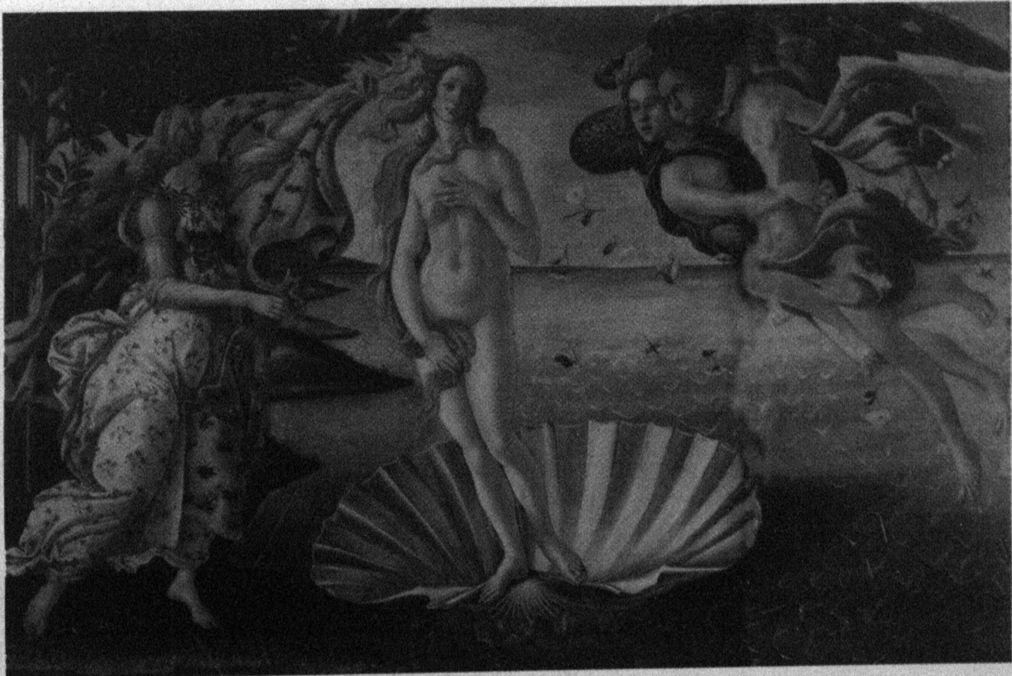
রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে আদ্যন্ত কল্পনায় এঁকেছেন। কিন্তু তিনজন বিবসনার ভিতর দুজনকে স্পষ্ট সনাক্ত করা গেল! বামদিকের বিবস্ত্রা রমণী শিল্পীর দ্বিতীয়া স্ত্রী হেলেনা ফরমেন্ট, এবং দক্ষিণদিকে তাঁর প্রথমা পত্নী ইসবেলা ব্রান্ড!

কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত! শহরে টি-টি পড়ে গেল—এ কী বেলেল্লাপনা!

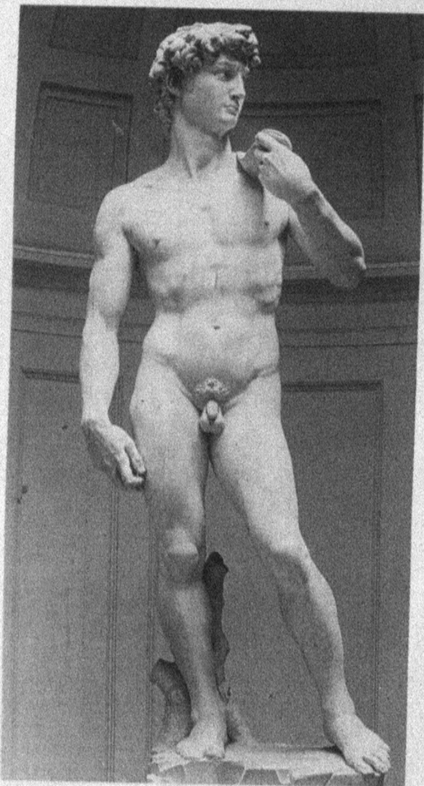
রুবেন্সের দ্বিতীয়া স্ত্রী হেলেনা আদালতে আবেদন করলেন যে, তাঁর প্রাক্তন স্বামী তাঁর শ্লীলতাহানি করেছেন। সালোঁ প্রদর্শনী কক্ষে সারা প্যারি তাঁর নগ্নতা দেখছে! শিল্পী তাঁর অজ্ঞাতে তাঁকে নগ্নিকারূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু



চিত্র 5.17 : প্রিমাভেরা—দ্য থ্রি গ্রেসেস্—বত্তিচেল্লি।



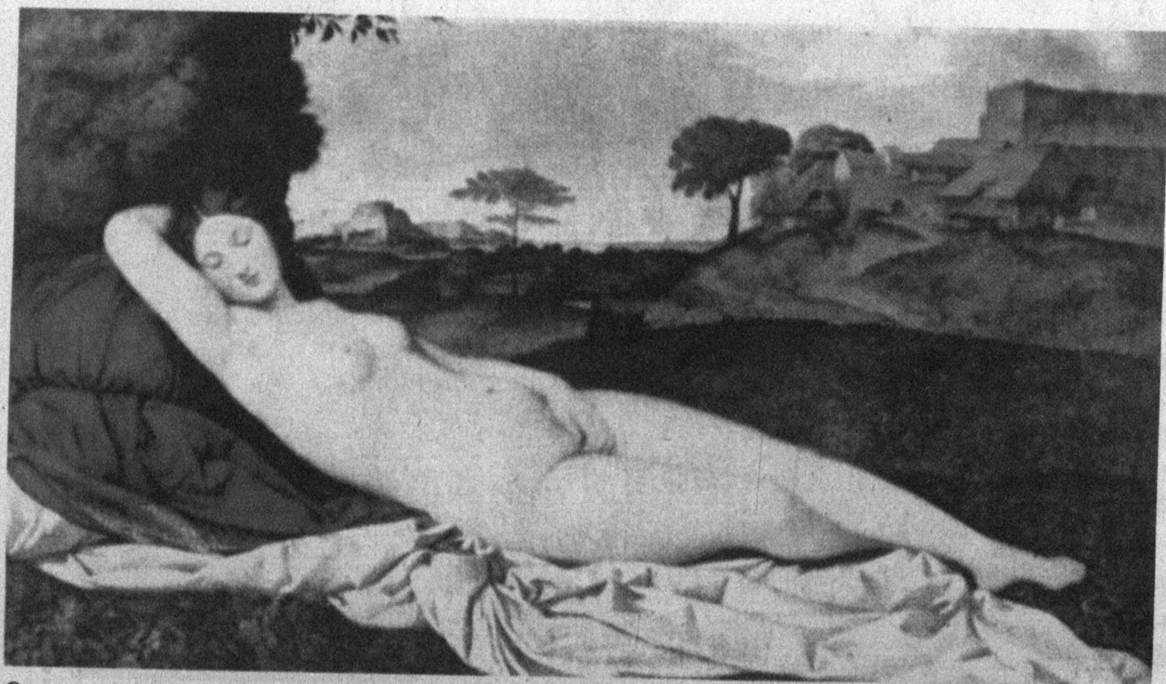
চিত্র 5.18 : বার্থ অফ ভেনাস—বত্তিচেল্লি।



চিত্র 5.19 : ডেভিড—মিকেলাঞ্জেলো।

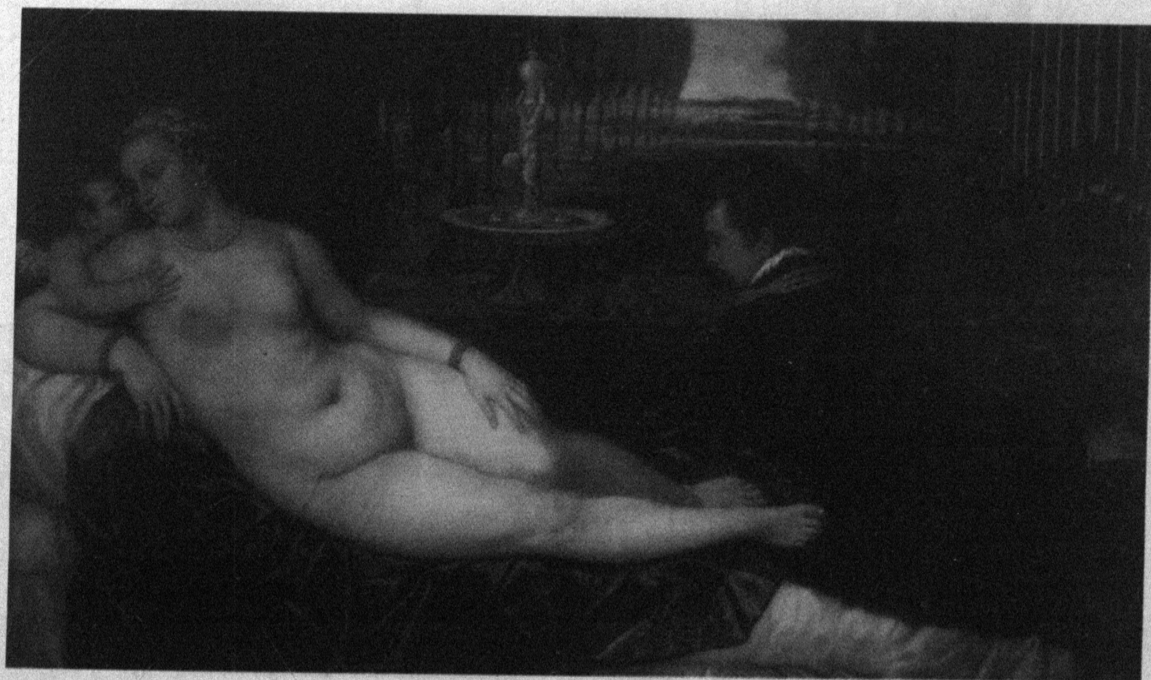


চিত্র 5.20 : লো সুর্স—আঙরে।



চিত্র 5.28 : জর্জিয়নে—নিদ্রিতা ভেনাস।

চিত্র 5.29 : উরবিনো ভেনাস—টিশিয়ান।



চিত্র 5.30 : কিউপিড উইথ ভেনাস—টিশিয়ান।



চিত্র 5.31 : দ্য থ্রি গ্রেসেস্—রুবেনস্।



চিত্র 5.32 : লিডা অ্যান্ড দ্য সোয়ান—লিওনার্দো।

তিনি কিছুতেই আদালতে প্রমাণ করতে পারলেন না শিল্পীর অপরাধ। শিল্পী তাঁকে মডেল করে এ ছবি আঁকেননি। বস্তুত কল্পনায় যখন এই ন্যূডটি শিল্পী সৃষ্টি করেন তার পূর্বেই তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে! বিচারক আবেদনটি অগ্রাহ্য করেন। হেলেনার বিবসনা সৌন্দর্য আজ বিশ্বের দর্শকের সামনে! তৈলচিত্রটি আদৌ নষ্ট করা হয়নি। তার বর্তমান মূল্য কয়েক শত কোটি টাকা।

তন্বী, মধ্যক্ষামা গুণকে পরিহার করে 'ন্যূড' যে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল এর মূলে আছেন লেঅনার্দো। তাঁর আঁকা *লীডা ও হংস* (চিত্র 5.32) চিত্রটি রুবেন্সের ওই *গ্রেসত্রয়ীর* পূর্ববর্তী কালে অঙ্কিত। দেবরাজ জিয়ুস হংসের ছদ্মবেশে



চিত্র 5.35 এবার আমরা তলোয়ার ভেঙে লাঙল বানাবো—Vecetich (বিংশ শতাব্দী)

নেমে এসেছিলেন স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে। লীডার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে, তার কৌমার্যহরণমানসে। সেই ক্লাসিকাল বিষয়বস্তুর উপর কাজ করেছেন লেঅনার্দো দ্য ভিঞ্চি [1452-1519]। এখানে লীডার সৌন্দর্য যেন ভিন্ন জাতের। হৃষ্টপুষ্ট বা নধরকান্তি বললে এই নারী-সৌন্দর্যের ঠিক ব্যাখ্যা হয় না। ইংরেজি শব্দ voluptuous-এর বাঙলা প্রতিশব্দ কী হবে জানি না।

লেঅনার্দোই ন্যূডের উপর এই ভলাপচুয়াসনেস্ গুণ প্রথম আরোপ করলেন। এটি খুব জুৎসই হয়ে উঠল ক্রমে। ভলাপচুয়াস্ মডেলরা যাতায়াত শুরু করলেন বিভিন্ন শিল্পীর স্টুডিওতে—তিন্তোরেত্তো, করেজ্জিও, ভেরোনিজ, ওয়েডেন, ড্যুরার, রুবেন্স, ভেলাজক্যেৎ, বুশ্যের সকলে একই জাতের হৃষ্টপুষ্ট মহিলার ন্যূড আঁকতে থাকেন। এমনকি পরবর্তী যুগের দেলাক্রোয়ে বা দাভিদও এই জাতীয় নারী-সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তাদের চিরজীবী করে গেছেন!

ন্যূড-তত্ত্বের সঙ্গে 'অপরিচয়ের' সে সূত্রটি ছিল—ন্যূড আঁকা হবে অজ্ঞাত মডেলের—এই ধারণাটা ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে গেল। আগেই বলেছি, এ চিন্তাধারার ভগীরথ রুবেন্স।

ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ানের ভগিনী পলিন বোনাপার্ট তাঁর যৌবনকালে ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী। রাজশিল্পী তাঁর কাছে সসঙ্কোচ প্রস্তাব রেখেছিলেন : আপনার একটি ন্যূড আঁকতে চাই।

পলিন বোনাপার্ট স্বীকৃতা হলেন এ লোভনীয় প্রস্তাবে। তিনি যখন জরাগ্রস্তা হয়ে যাবেন, যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হবেন তখনো বিশ্বের শিল্পজগতে তাঁর বিশ্ববিজয়িনী বিবসনা সৌন্দর্য অমলিন থাকবে—এ তো পরমপ্রাপ্তি। তিনি বললেন, আমি স্বীকৃত, তবে একটি শর্তে—

রাজশিল্পী ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, বটেই তো! জানি! মুখটি ছবিতে বদলে দিতে হবে, এই তো?

পলিন বাধা দিয়ে বলেন, না! নিশ্চয় না! তাহলে তো সেই ছবিতে 'আমি' থাকবই না—

—তাহলে?

—আপনার ন্যূড-এর পশ্চাদপটে থাকবে প্রাকৃতিক দৃশ্য—সমুদ্র, নির্জন প্রান্তর, অরণ্যানী! এ রাজপ্রাসাদের স্থূলতা নয়!

এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি উল্লেখ করতে হল বোঝাতে, সে যুগে সুশিক্ষিত নরনারী 'ন্যূড'কে কী চোখে দেখত। রুবেন্সের স্ত্রী হেলেনা ফরমেন্টের সঙ্গে পলিন বোনাপার্টের চিন্তাধারায় কী আশমান-জমিন ফারাক—দুশ' বছরের ব্যবধানে!

আরও দু-একশ বছরের ভেতর এ চিন্তাটিও পরিবর্তিত হয়ে গেল। ফরাসি শিল্পী অগুস্তে রেনোয়া (1841-1919) তাঁর স্ত্রীর একাধিক ন্যূড এঁকেছেন। তার পশ্চাদপটে প্রকৃতির বিশালতা নেই—আছে স্টুডিওঘরের টুকিটাকি।

* * *

ন্যুড-তত্ত্বের অপর একটি প্রশাখার ভগীরথ রেমব্রান্ট (1606-69)। শিল্পীর মনে প্রশ্ন জাগল : ন্যুডের সঙ্গে নারীর রমণীয়তা, সৌন্দর্য এবং যৌবন কেন আবশ্যিকভাবে যুক্ত করতে হবে? এ রাজ্যে সুন্দরী নারীর একচেটিয়া অধিকারকে অস্বীকার করে তিনি তাঁর এক প্রৌঢ়া পরিচারিকার ন্যুড আঁকলেন রঙিন চখের ব্যবহারে (চিত্র 5.33)। চিত্রটির নামকরণের মাধ্যমেই শিল্পীর প্রতিবাদী মানসিকতা সোচ্চার। সমকালীন ক্লাসিকাল চিন্তাধারাকে ব্যঙ্গ করতেই তিনি এ ছবির নাম দিলেন : *স্টাডি অব এ ন্যুড উয়োম্যান অ্যাজ ক্লিওপেট্রা।'* এই নতুন চিন্তাধারাটি ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল সমকালীন অন্যান্য দিকপালের ধারণায় : হোগার্থ, হলবেইন, ক্র্যানাঞ্চ প্রভৃতি। তবে এ চিন্তাধারায় চরম সাফল্য দেখা গেল উনবিংশ শতাব্দিতে, অগুস্তে রোদ্যাঁর ছেনি-হাতুড়িতে : *সেই মেয়েটি, যে একদিন ছিল হেলমেট-নির্মাতার সুন্দরী স্ত্রী* (চিত্র 5.34) এই অশীতিপরা বৃদ্ধাটি যে যৌবনে সুন্দরী ছিলেন তা রোদ্যাঁ প্রত্যক্ষজ্ঞানে জানতেন। সে-কথা আমার *রোদ্যাঁ* বইতে বিস্তারিত বলেছি।

ন্যুড-তত্ত্বের এই সব শাখাপ্রশাখার অস্তিত্ব সত্ত্বেও মূলধারণাটি কিন্তু পশ্চিমী শিল্পকলার ফল্গুধারায় প্রবাহিত ছিল। যুগে-যুগে শিল্পীর দল সেই আদিম গ্রীক অনুভাবনায় ন্যুড গড়ে গেছেন—তারা তাদের নগ্নতা বা যৌনতা সম্বন্ধে সচেতন নয়। তারা সুগঠিততনু, নৈর্ব্যক্তিক, নিত্যনতুন বিষয়বস্তুতে নিমগ্ন। একটি উদাহরণ দিয়ে এই মূল ধারাটির সমাপ্তি টানা গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধান্তে একটি অনবদ্য ন্যুড গড়েছিলেন ভাস্কর Vecetich : *Let us turn our Swords to Ploughshares* (চিত্র 5.35)। বিষয়বস্তু সমকালীন, নান্দনিক আবেদন ক্লাসিকাল গ্রীকযুগের।

* * *

পারানিঘাটের যাত্রীদের মূল লক্ষ্য ওপারে যাওয়া। খেয়াঘাটের মাঝির প্রতিশ্রুতিও তাই। কিন্তু মাঝনদীতে কখনো-সখনো মাঝিভাই যখন ভাটিয়ালী গান ধরে তখন হয়তো যাত্রীরা এপার-ওপার দুপারের কথাই ভুলে যায়। 'সুজন নাইয়া'র সুরের ধারায় সে কেবল অদেখা, অধরা সম্পদের খোঁজে মানসিক যাত্রা করে। একসময় খেয়া নৌকা ওপারের ঘাটে ভেড়ে। মাঝি গান থামায়, যাত্রীরাও মানসযাত্রা থামিয়ে পারের কড়ি গুনে দিয়ে ঘাটে নামে।

'ন্যুড' তত্ত্বও অনেকটা ওই রকম। তার মূল লক্ষ্য খেয়াঘাটের নৌকার মতো ওপারের ঘাট—যে ও-পারেতে 'সর্বসুখ'—আদিরসের সঙ্গমতীর্থ। কিন্তু রেমব্রান্ট, বা রোদ্যাঁর মতো মাঝির পাল্লায় পড়লে আমরা মাঝগাঙে সেকথা ভুলে যাই।

আদিরস যে ন্যুড তত্ত্বে অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্পৃক্ত এ-কথা অনেক পণ্ডিত মানতে গররাজি। উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে ব্রিটিশ দার্শনিক এস. আলেকজান্ডারের বক্তব্য :

> If the nude be so treated that it raised in the spectator ideas or desire appropriate to the material subject, it is *false art and bad morals*
>
> [নগ্ন শিল্পবস্তুটি যদি এমনভাবে উপস্থাপিত হয় যাতে দর্শকের অন্তরে তার বস্তুতান্ত্রিক উপাদানের মাধ্যমে কামনা-বাসনার উদ্রেক করে, তবে বলব : সেটি **ভ্রষ্ট শিল্প এবং নিকৃষ্ট নীতির**।]

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি দিচ্ছি প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচক স্যার *কেনেথ ক্লার্কের The Nude* বইটি থেকে। এর আংশিকরূপ আমরা এ নিবন্ধের প্রথম দিকেই দিয়েছি :

> In the mixture of memories and sensations aroused by the nudes of Rubens or Renoir are many which are 'appropriate to the material subject'. And since these words from a famous philosopher are often quoted, it is necessary to labour the obvious, and say, no nude, however abstract, should fail to arouse in the spectator some vestige of erotic feelings, even though it be the only faintest shadow—and it if does not do so, it is **bad art and false morals**.
>
> [স্বীকার করতে হবে স্মৃতি ও অনুভূতির নিরিখে রুবেন্স ও রেনোয়ার অনেকগুলি ন্যুড 'বস্তুতান্ত্রিক উপাদানে গঠিত।' আর যেহেতু ওই শব্দগুলি একজন প্রখ্যাত দার্শনিকের উক্তি এবং শিল্পসমালোচনায় বহুলপ্রযুক্ত উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহৃত, তাই এক্ষেত্রে সহজ সত্যটা স্বীকার করে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আমরা বলতে চাই—ন্যুড মাত্রেই, তা যতই বিমূর্তভাবে উপস্থাপিত হোক না কেন, দর্শকের মনে কিছু যৌন অনুভূতির ক্ষীণ

আভাস ফুটিয়ে তুলবেই। হয়তো সে অনুভূতির ছায়াপাত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। তা হোক; যদি সেটুকুও করতে না পারে, তবে বলব : ওই ন্যূড শিল্পকর্মটি **নিকৃষ্ট শিল্প এবং ভ্রান্তনীতিবাহী**]

দেখা যাচ্ছে, দুই শিল্প-সমালোচক ললিতকলার ভূমণ্ডলে দুই ভিন্ন মেরুপ্রান্তবাসী! কট্টর নীতিবাগীশেরা দার্শনিক আলেকজান্ডারকে সমর্থন করবেন, তাঁদের মতে 'ন্যূড'-এর সঙ্গে যৌনতা এবং আদিরস সম্পর্ক-বিযুক্ত। অপরপক্ষে যাঁরা উদার মতাবলম্বী এবং বাস্তবানুগ, তাঁরা বলবেন, বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা মূর্খতা। কেনেথ ক্লার্কই ন্যায্য কথা বলেছেন।

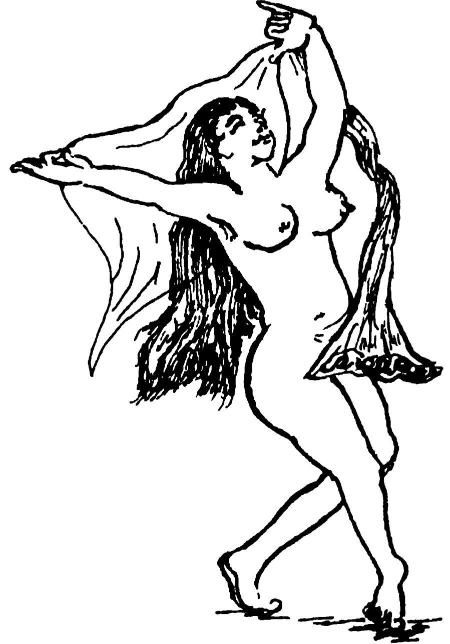
আমাদের বক্তব্য : দুজন মহাপণ্ডিতই ভ্রান্ত!!

তাঁরা কেউই শিল্পসত্যে উপনীত হতে পারেননি। আর তাঁদের দুজনের ভ্রান্তির মূল হেতু তাঁরা 'পরিবর্তনশীল' ধারণাকে 'ধ্রুব' রূপে গ্রহণ করেছেন।

জানি, আমার এ ধৃষ্টতাপ্রকাশে আপনারা বিস্মিত । আমার মতো নগণ্য মানুষ কোন্ সাহসে অধ্যাপক আলেকজান্ডার এবং স্যার কেনেথ ক্লার্ক দুজনকেই পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দিতে চায়! জাস্টিস্ পাঠক-পাঠিকা! আপনাদের ডিভিশান-বেঞ্চে আমার সওয়ালটাও দাখিল করতে দিন। বিচার করে রায় দিন, ভুল হলে শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব।

কিন্তু তার আগে, আপনাদের একটা গল্প শোনাব, ধর্মাবতার! মনগড়া কিস্সা নয়, স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের *মহাভারত* থেকে :

একদিন কাশ্যপগোত্রভুক্ত ঋষি বিভাণ্ডক তাঁর আশ্রমের প্রান্ত দিয়ে প্রবহমান গঙ্গায় অবগাহন স্নান করছিলেন। হঠাৎ তিনি এক অপ্রত্যাশিত নূপুরধ্বনি শুনে আশ্চর্য হয়ে চোখ তুলে তাকালেন। দেখলেন, গঙ্গাতীরের এক *নির্জন প্রান্তরে এসে উপস্থিত হয়েছেন স্বর্গের* অপ্সরী উর্বশী। মনে হল, উর্বশীও সম্পূর্ণ একাকী গঙ্গাতীরে এসেছেন অবগাহনস্নানের উদ্দেশ্যে। উর্বশী চারিদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন—আকণ্ঠ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত ঋষি বিভাণ্ডককে তাঁর নজরে পড়ল না। গঙ্গাতীর সম্পূর্ণ জনহীন মনে করে উর্বশী একে একে তাঁর বসনভূষণ খুলে ফেলতে থাকেন। পরিধানের রক্তচীনাংশুক উত্তরীয়, অন্তর্বাস প্রভৃতি খুলে ফেলে উর্বশী সম্পূর্ণ বিবসনা হয়ে ধীরে ধীরে জলে নামতে থাকেন। বৃক্ষশাখার পত্রান্তরাল থেকে ছোপ-ছোপ রোদের কৌতূহল এসে লুটিয়ে পড়তে থাকে নগ্নিকা নারীর তনুদেহে—মুখে, গ্রীবায়, স্তনাগ্রচূড়ায়, নিরাবরণ জঙ্ঘায়, গুরুনিতম্বে। ঋষি বিভাণ্ডকের সংযম চূর্ণ হয়ে গেল। বোধ করি তিনি প্রণিধান করলেন ওই নগ্নিকা রমণীর রূপলাবণ্য বাস্তবে 'appropriate to the material subject'। তবু তিনি কোনো শব্দ করলেন না, উর্বশীকে জানতে দিলেন না যে, গঙ্গতীর দর্শকশূন্য নয়। আ-নাসিকা গঙ্গাজলে নিমজ্জিত থেকে ঋষি বিভাণ্ডক সেই ন্যূডের সৌন্দর্যসুধা আকণ্ঠ পান করতে থাকেন। স্নানান্তে উর্বশী পুনরায় পাড়ে উঠে গেলেন। অঙ্গ-মার্জন-বস্ত্রখণ্ড তাঁর সঙ্গে ছিল না। মুক্ত প্রকৃতির মোহে আপন খেয়ালে উর্বশী সিক্ত দেহেই এক নগ্ননৃত্যে আত্মনিয়োগ করেন। ঋষি বিভাণ্ডকের পক্ষে আর ঊর্ধ্বরেতা হয়ে থাকা সম্ভব



চিত্র 5.36 স্নানান্তে উর্বশীর নির্জন-নগ্ন নৃত্য

হল না। সংযম হারিয়ে তিনি গঙ্গায় নিমজ্জিত অবস্থাতেই হস্তমৈথুনে কামতৃপ্ত হলেন।

পুরাণে বা মহাকাব্যে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। কাহিনির পরবর্তী অধ্যায়ে জানা গেল : ঋষি বিভাণ্ডকের রেতঃসংযুক্ত গঙ্গাজল পান করে এক হরিণী গর্ভিণী হয়ে পড়ে। কালে সেই হরিণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। তাঁর দেহাকৃতি মানুষের, শুধু হয়তো জননীর 'জীন'-এর প্রভাবে তাঁর মাথায় শিং। তাই তাঁর নাম হল ঋষ্যশৃঙ্গ। অতি দুর্লভ প্রতিভাবানদের ক্ষেত্রে এমনটা নাকি হয়ে থাকে। অন্তত মিকেলাঞ্জেলো সেই বিশ্বাসে তাঁর গড়া

'মোজেস' মূর্তিটি শৃঙ্গযুক্ত করেছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ জন্ম থেকেই অতি সাত্ত্বিক প্রকৃতির। কৈশোরের প্রারম্ভেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে তপস্যা শুরু করেন। সমগ্র আর্যাবর্তের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহর্ষি হয়ে ওঠেন যৌবনের প্রারম্ভেই।

এই সময় অঙ্গরাজ্যে অনাবৃষ্টিজনিত কারণে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। মহামন্ত্রী গ্রহাচার্যের সঙ্গে পরামর্শ করে মহারাজকে বলেন, এই মন্বন্তর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় পর্জন্যদেবের এক মহাযজ্ঞ; কিন্তু শুধুমাত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি যদি সেই যজ্ঞ করতে স্বীকৃত হন, তবেই।

অঙ্গরাজ তাঁর অভ্যস্ত চিন্তাধারায় মনে করলেন— অরণ্যচারী এক যুবককে রাজসভায় নিয়ে আসার সহজতম উপায় তাকে কিছু সুন্দরী রূপোপজীবিনীর প্রলোভন দেখানো। মহামন্ত্রী তৎক্ষণাৎ রাজনটীকে ডেকে পাঠালেন, কিছু স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে তাকে আদেশ করলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রমে যেতে। যুবক ঋষিকে নানাভাবে প্রলোভন দেখিয়ে রাজসভায় নিয়ে আসতে।



চিত্র 5.37 অঙ্গরাজনটীর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নগ্ননৃত্য

সেই আদেশ পেয়ে নর্তকীর দল এসে উপস্থিত হল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রমে। তারা নানাভাবে তরুণ ঋষিকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করল; কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের মনে কামভাবের উদ্রেক করতে পারল না। রাজনর্তকী অবশেষে সন্ন্যাসীর সম্মুখে শুরু করে দিল এক উদ্দাম নগ্ননৃত্য! ঋষ্যশৃঙ্গ সেই নগ্ননারীর নৃত্যদর্শনে কী বলেছিলেন তা আপনাদের জানা—

'আনন্দময়ী মুরতি তুমি, ...
কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা।
তোমার পরশ অমৃতসরস
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।।'

চরম ব্যর্থতা মাথায় নিয়ে, অথচ কী পরমপ্রাপ্তি অন্তরে সংগ্রহ করে, রাজনটী ফিরে এল অঙ্গরাজ্যে। মহামন্ত্রীর কাছে এসে সবিনয়ে বললে,

'ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী, চরণপদ্মে নমস্কার।
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা, লও ফিরে তব পুরস্কার।।'

কাহিনি এইটুকুই। এবার আসুন আলোচ্য বিশ্লেষণে প্রবেশ করা যাক। নৃত্য একটি দর্শনযোগ্য ললিতকলার শিল্পকর্ম। কাহিনিতে আমরা দু-দুটি নৃত্যশিল্পের উপস্থাপনা পেয়েছি। দুটিই নগ্ননৃত্য : nude dance। অথচ দুটি নৃত্যের উদ্দেশ্য, প্রেরণা, উপস্থাপনা এবং দর্শকের ওপর সেই শিল্পকর্মের প্রতিক্রিয়ায় আশমান-জমিন ফারাক। উর্বশীর নৃত্য ছিল নির্মল আনন্দোচ্ছ্বাস! উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে স্নানান্তে সে আনন্দের প্রাবল্যে নৃত্য করেছিল। সে শিল্পটি ছিল দর্শক-নিরপক্ষ, ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত, প্রাণরসের তাগিদে। শিল্পীর অজ্ঞাতে অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন একজন গোপন দর্শক। নৃত্যদর্শনে তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আমরা দেখেছি।

দার্শনিক আলেকজান্ডারের সূত্র অনুসারে উর্বশীর ওই নির্জন আনন্দোচ্ছ্বাস false art and bad morals (ভ্রষ্ট শিল্প এবং নিকৃষ্ট নীতির)। কেন? যেহেতু the nude is so treated that it raised in the spectator ideas or desires appropriate to the material subject [উর্বশীর নগ্ননৃত্য এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল যাতে দর্শকের মনে কামনা-বাসনার উদ্রেক হয়েছিল।]

কী? মানতে পারছেন?

অপরপক্ষে অধ্যাপক আলেকজান্ডারের মতে অঙ্গ দেশের বারবনিতার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নির্লজ্জ নগ্ননৃত্য আদৌ ভ্রষ্ট শিল্প অথবা ভ্রান্তনীতির নয়, কারণ আলোকজান্ডার সাহেবের অ্যাসিড-টেস্টে দেখা গেছে দর্শকের চিত্তে তা কামনা বাসনা জাগাতে পারেনি!

আজব যুক্তি!

এবার স্যার কেনেথ ক্লার্কের সুসমাচারটা বিচার করে দেখা যাক :

মনে করুন উপরোক্ত কাহিনির প্রথম দৃশ্যে গঙ্গাস্নান করছিলেন বিভাণ্ডক নন, তাঁর পুত্র জিতকাম ঋষ্যশৃঙ্গ স্বয়ং। সেক্ষেত্রে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি—

নিরাবরণা উর্বশীর নির্জন আনন্দনৃত্য দর্শনে ঋষ্যশৃঙ্গ একইভাবে মনে মনে বলতেন, "আনন্দময়ী মুরতি তোমার,.... তোমার নয়নে দিব্য বিভা।"

সে ক্ষেত্রে স্যার কেনেথ ক্লার্কের সূত্র অনুসারে উর্বশীর সেই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দনৃত্য, প্রাকৃতিক নির্জন পরিবেশে যা ফলাকাঙক্ষাবর্জিত এক বিমল উচ্ছ্বাস, এবং যা দর্শন করে দর্শক শুধু আনন্দ লাভই করলেন, তা হয়ে যেত 'নিকৃষ্ট শিল্প' এবং 'ভ্রান্ত নীতি'র। কেন? যেহেতু ঋষ্যশৃঙ্গের অন্তরে সেই নগ্ননৃত্য কোনও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যৌন অনুভূতি (vestige of erotic feelings) জাগাতে পারেনি।

সেটাই বা মেনে নিতে পারছি কই?

আমাদের মতে শিল্পবস্তুতে যৌনতার পরিমাণ নির্ভর করে দু-দুটি মানসিকতার পারস্পরিক প্রতিস্পর্শে। শিল্পস্রষ্টা এবং শিল্পরস-সমজদারের। শিল্পমাত্রই যোগের সাধনা। উভয় অর্থেই যোগ : ধ্যানের যোগ এবং গণিতের যোগ। শুধু ভাস্কর্য বা চিত্রাঙ্কণ নয়, ললিতকলার যাবতীয় শাখাতেই এই সূত্রটি প্রযোজ্য—মঞ্চাভিনয়, নৃত্য, যাত্রা, সঙ্গীত, সাহিত্য, চলচ্চিত্র। শিল্পস্রষ্টার মর্মমূলে যে ভাবের উৎপত্তি হয়েছে সেটি দর্শক অথবা শ্রোতার হৃদয়ে সংক্রমণেই শিল্পের সার্থকতা। শিল্প কী? শিল্পীর অন্তর্লীন গঙ্গোত্রীতে উদ্ভূত রসজাহ্নবীর উত্তরণ শিল্পবোদ্ধার গঙ্গাসাগরে : রসায়নবিদের কাছে তা ধনাত্মক অনুঘটক (পজিটিভ ক্যাটালিস্ট), প্রযুক্তিবিদের কাছে যা 'গীয়ার', সাহিত্যিকের কাছে যা হাইফেন-চিহ্ন, গণিতজ্ঞের কাছে যা সমীকরণচিহ্নের প্রতীক—শিল্পীর কাছে শিল্পও তাই। নাট্যকারের কাছে নাটক, চিত্রশিল্পীর কাছে তার ক্যানভাস, সঙ্গীতমগ্নার কাছে তার গান। এক-একটি বাহক মাত্র।

কোনো বাস্তব বা কল্পিত অভিজ্ঞতায় শিল্পীর স্পর্শকাতর অন্তরে একটা অনুরণন জাগল; প্রকাশের যন্ত্রণায় শিল্পী গর্ভিণী নারীর মতো তখন উদ্বেল হয়ে ওঠেন। হয়তো সেটা বাস্তবে শরাহত এক ক্রৌঞ্চীর মৃত্যুতে ক্রৌঞ্চের আর্ত-বিলাপ—হয়তো সেটা মদনভস্মের পর 'বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী'র মর্মান্তিক হাহাকার! যতক্ষণ না সেই অনুভূতিটা বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিবেশিত হচ্ছে ততক্ষণ হিমাদ্রিশৃঙ্গে প্রথম-আষাঢ়ে স্ফীতকায় ব্রহ্মপুত্রের মতো কবি চঞ্চল হয়ে ওঠেন। শিল্পী তখন একটা মাধ্যম খুঁজে ফেরেন—শিল্পরস পরিবেশনে ব্রতী হন। হয়তো দেখা গেল, শিল্পীর অপরিচিত একদল দর্শক বা শ্রোতা—হয়তো তারা ভিন্ন মহাদেশের, ভিন্ন সহস্রাব্দের এবং যারা সেই বাস্তব অথবা কল্পিত অনুভূতিতে আদৌ আহত হয়নি, তবু 'মাধ্যমের' ইন্দ্রজালে তারা শিল্পীর সঙ্গে একই রসের আস্বাদনে অনুনাদিত। তা যখন হয়, তখন সেই 'মাধ্যম'কে আমরা বলি শিল্প, বলি ললিতকলা।

শিল্পী-নিরপেক্ষ যেমন শিল্প হতে পারে না, তেমন উপভোক্তা ব্যতিরেকেও তা অসম্পূর্ণ। উর্বশী নির্জন প্রান্তরে আপন খেয়ালে নগ্ননৃত্য করেছিল, আপনি-আমি যেমন বাথরুমে শাওয়ারের তলায় আপনমনে গান গাই—তা শিল্প নয়। তা আপন খেয়ালের আনন্দোচ্ছ্বাসমাত্র। উর্বশীর সে আনন্দোচ্ছ্বাস শিল্পীর অজ্ঞাতেই শিল্প হয়ে উঠেছিল ঘটনাচক্রে, সেখানে বিভাণ্ডক উপস্থিত থাকায়। আপনার-আমার স্নানঘরের গানও তেমনি শিল্প হয়ে উঠতে পারে যদি আমাদের অজান্তে পাশের ঘর থেকে কেউ সে গান শুনে বিভোর হয়ে ওঠে।

ললিতকলার এই যে উপবৃত্তাকার রূপ- দু-দুটি 'ফোসাই' দ্বারা এই যে শিল্পজগত বিধৃত—এই মৌল তত্ত্বটা না খেয়াল করেছেন অধ্যাপক আলেকজান্ডার, না স্যার ক্লার্ক। ওঁরা ধরে নিয়েছেন শিল্প একটি বৃত্ত, যার পরিধিতে শিল্পীর বৃত্তাকার পরিক্রমা এবং কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থিত শুধু দর্শক। তাই দুজনেই 'ন্যূড'কে বিচার করতে চেয়েছেন দর্শক-প্রতিক্রিয়ার মূল্যায়নে। এবং সেই সঙ্গে তাঁরা ধরে নিয়েছেন : দর্শকের যৌন-সংবেদনশীলতা, যৌনাসক্তির প্রবণতা একটা ধ্রুবক।

আমাদের মতে : ভ্রান্তিটা সেখানেই। কোনো বিশেষ একজন দর্শকের ওপর প্রতিক্রিয়া না হলেও সেটি নিকৃষ্ট শিল্প ও ভ্রান্ত নীতির হতে পারে—যেমন হয়েছিল অঙ্গ প্রদেশের বারবনিতার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উলঙ্গনৃত্য। আবার দর্শকের মনে কোনো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যৌন অনুভূতি জাগ্রত না করলেও—ক্লার্কসাহেব যাই বলুন—তা উৎকৃষ্ট শিল্পের প্রতিবেদন ও সুনীতির হতে পারে; যেমন হয়েছিল সীবলীর সলজ্জ নিরাবরণ আবেদন। অপরপক্ষে দর্শকের অন্তরে তীব্র কামনা-বাসনা জাগ্রত করা সত্ত্বেও কোনো শিল্প সুনীতির নিদর্শন হতে পারে—আলেকজান্ডার-সাহেব যাই বলুন—যেমন হয়েছিল প্রাণানন্দে নির্জন প্রান্তরে উর্বশীর 'নার্সিসীয়' দিগবসন-নৃত্য।

সহজ কথায়, ললিতকলার কোনো নিদর্শন নিকৃষ্ট শিল্প/ভ্রান্ত নীতির অথবা নিকৃষ্ট নীতি/ভ্রান্ত শিল্পের হয়েছে কি হয়নি বুঝে নিতে হলে আমাদের একটি দ্বিমূল সমীকরণের (কোয়াড্রেটিক ইকোয়েশানের) অঙ্ক কষতে হবে। তার দুটি 'মূল'—অধ্রুবক 'রুট' :

এক : 'সাধারণ-দর্শকের' ওপর তার প্রতিক্রিয়া। সেই সাধারণ দর্শকের মানসিকতা, তার শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা, তার বোধশক্তিতে কী-জাতের অনুনাদ জন্ম নিল, তার কেমন লাগল।

দুই : শিল্পীর মানসিকতা।

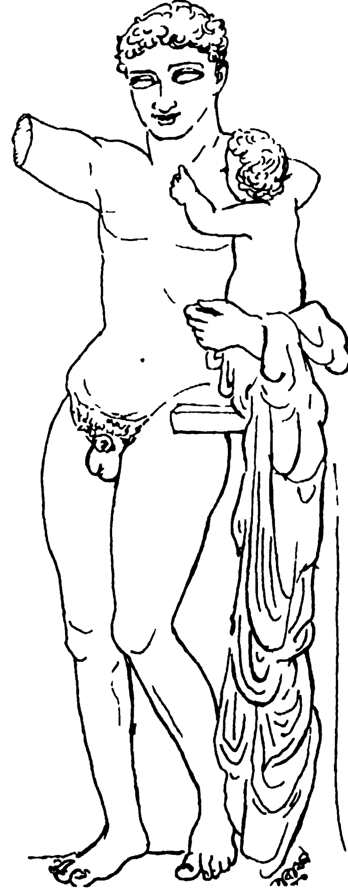
এক্ষেত্রে ওই 'সাধারণ' বিশেষণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঋষ্যশৃঙ্গ বা বোধিসত্ত্ব মহাজনকের বোধের নিরিখে কষলে অঙ্কের শেষ ফলটা অভ্রান্ত হবে না। তত্ত্বটা বিচার করতে হবে সমকালীন সামাজিক বাতাবরণে। কার সমকাল? এখানেও দু-জাতেব ফলাফল। শিল্পীর সমকাল ও দর্শকের সমকাল। শিল্পী ও গড় দর্শক যদি সামাজিক নীতিবোধের একই সমতলে দাঁড়িয়ে না থাকেন, তাহলেও অঙ্কটা ভুল হয়ে যেতে পারে।

যেমন প্রায়ই হয় খাজুরাহো-কোনার্ক মিথুনমূর্তির মূল্যায়নে--আজকের দর্শকের।

পশ্চিমখণ্ডের 'ন্যুড'-অনুভাবনার আর একটি বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে এখনো আলোচনা করা হয়নি। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া, চীন প্রভৃতি সভ্যতায় সম্পূর্ণ বিবস্ত্র পুরুষের মূর্তি, পুরুষাঙ্গ প্রদর্শিত করা ভাস্কর্য বা অর্ধোৎকীর্ণ (alto-relieve) আলেখ্য দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অথচ ওইসব শিল্পসংস্কৃতিতে বিবসনা নারীমূর্তি যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। একমাত্র প্রাচীন গ্রীসেই যৌনাঙ্গ প্রদর্শিত করা সম্পূর্ণ নিরাবরণ পুরুষ ও নারীর ন্যুড মূর্তি পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রায় প্রথম যুগ থেকেই কোনো কোনো পুরুষমূর্তির জননেন্দ্রিয় অলিভ পাতায় ঢাকা দিয়ে গড়া হয়েছে। একেবারে প্রথম যুগ থেকে না হলেও প্র্যাক্সিটেলিস্ (খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী)-এর যুগ থেকে। প্র্যাক্সিটেলিসের স্বহস্তে-গড়া পুরুষমূর্তি দুটিমাত্র পাওয়া গেছে—প্রথমটি 'হার্মিস ও শিশু ডায়োনিস্াস' (চিত্র 5.38) মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল অলিম্পিয়াতে 1871 খ্রিস্টাব্দে। সে মূর্তিতে শিশু ডায়োনিস্শাস বস্ত্রাবৃত, কিন্তু যুবক হার্মিসের যৌনাঙ্গ নিষ্ঠাভরে খোদিত। কিন্তু একই শিল্পীর গড়া 'অ্যাপোলো' মূর্তিতে (চিত্র 5.39) দেখছি অ্যাপোলোর যৌনাঙ্গ অলিভ পাতায় ঢাকা দেওয়া হয়েছে। কেন? প্রখ্যাত শিল্পসমালোচক কনস্টানটিন বারাশ্চি (Constantin Baraschi,—*Sculpture of the Nude*, 1970, p. 51) বলছেন, প্র্যাক্সিটেলিসেরই গড়া 'another statue by this famous sculptor—also 8 heads high—show *Aphroditi* (of Knido) completely nude, for the first time in Greek sculpture....'

আমাদের প্রশ্ন প্র্যাক্সিটেলিস্—যিনি প্রথম নগ্ননারীর মূর্তি বিশ্বশিল্পকে উপহার দিলেন তিনি—আফ্রোদিতের যৌনাঙ্গ আবরিত করার প্রয়োজন দেখেননি; হার্মিস দেবতাব—যাকে রোমানরা বলত 'মার্কারি'—যৌনাঙ্গ গড়তেও শিল্পী দ্বিধা করেননি। সেক্ষেত্রে তিনি কেন অ্যাপোলোর ক্ষেত্রে অলিভ পাতার আবরণ দিলেন?

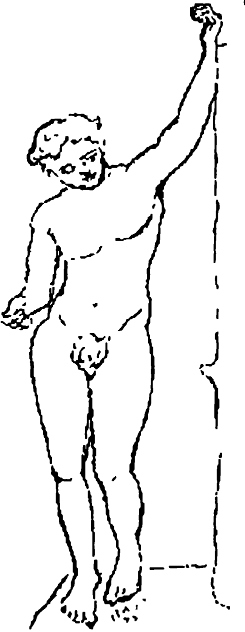
জবাব নেই। বহু শিল্পশাস্ত্র ঘেঁটে দেখেছি। কিন্তু কে, কেন কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পুরুষের যৌনাঙ্গ অন্তরালে রাখার প্রয়োজনে অলিভ পাতার আচ্ছাদন দিচ্ছেন বোঝা যায় না। পরবর্তী শিল্পীর দল দুই জাতেরই পুরুষ ন্যুড



চিত্র 5.38 হার্মিস ও শিশু ডায়োনিসাস্, প্রাক্সিটেলিস (খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী)

গড়েছেন। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে কিন্তু অলিভ-পত্রের আচ্ছাদন কোথাও ব্যবহৃত হতে দেখি না।

ধরুন রেনেসাঁ যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর মিকেলাঞ্জেলোর কথা। তিনি অলিভ পাতার আবরণটা পছন্দ করতেন না। প্রয়োজনবোধে যৌনাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করেছেন। যেমন সিস্টিন চ্যাপেলে যাবতীয় সাধুসন্তদের দেহ—যীশু, মা-মেরী, বার্থালোমিয়ু, জন, পীটর প্রভৃতি। রোম-গির্জায় বিশ্ববন্দিত 'পীয়েতা' ভাস্কর্যে মা-মেরীর ক্রোড়ে শায়িত যীশুর কটিদেশে বস্ত্র বিজড়িত। কিন্তু যেখানে তিনি 'ন্যুড' গড়তে চেয়েছেন সেখানে কোনো প্রতিবন্ধকতাকেই পাত্তা দেননি। স্বয়ং যীশুর একাধিক 'ন্যুড' গড়েছেন দুরন্ত দুঃসাহসীর মতো · 'ক্রুশবিদ্ধ যীশু' অথবা 'পুনরুত্থিত যীশু' (Risen Jesus), (চিত্র 5.41)।



চিত্র 5.39 অ্যাপোলো

এই প্রসঙ্গে মিকেলাঞ্জেলোর মানস-পুত্র অগুস্ত রোদ্যাঁর জীবনের একটা ঘটনার কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

1877 সালের কথা। অগুস্ত রেনে রোদ্যাঁকে তখনো পারীর শিল্পজগত পুরোপুরি স্বীকৃতি দেয়নি। প্রাচীনপন্থীরা তাকে পাত্তা দিতে চায় না। অথচ ইতিমধ্যেই সে কোনো কোনো প্রভাবশালী মহলে প্রচণ্ড কৌতূহলের সঞ্চার করেছে। রোদ্যাঁর আর্থিক সঙ্গতি তখন অল্প। অবিবাহিত। কিন্তু মেরী রোজ ব্যুরে নামে একটি মেয়ের সঙ্গে 'লীভ টুগেদার' করছে—একত্রে বসবাস আর কি। এই কারণেই বিচ্ছেদ হয়েছে তার শিক্ষাগুরু বৃদ্ধ শিল্পাচার্য ওরেস্ লেকক্ দ্য বোয়াবোদ্রানের সঙ্গে। তিনি ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন রোদ্যাঁ যেন বিয়ে করে রোজ ব্যুরেকে। রোদ্যাঁ রাজি হয়নি।

পারীতে বৎসরান্তে সালোঁ প্রদর্শনী যেন গঙ্গাসাগরের মেলা। শিল্প পুণ্যার্থীরা সমবেত হয় বছরে একবার। রোদ্যাঁ স্থির করল সেই প্রদর্শনীতে তার প্রথম ভাস্কর্য নিদর্শন পাঠাবে। তার পাঠানো প্রথম ভাস্কর্য হল 'সেন্ট জন দ্য ব্যাপ্তিস্ত্, প্রীচিং।'

জন কৃষিজীবী পরিবারের ছেলে। যীশুর চেয়ে বয়সে বেশ কিছু বড়। জর্ডনের পবিত্র জলে তিনিই পরবর্তীকালে যীশুকে 'ব্যাপটাইজ' করেন। যীশুর আবির্ভাবের পূর্বযুগে জন স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন যে, প্রভুর আবির্ভাব আসন্ন। ঠিক যেমন অদ্বৈতাচার্য জানতে পেরেছিলেন চৈতন্যদেবের আসন্ন আগমনবার্তা।

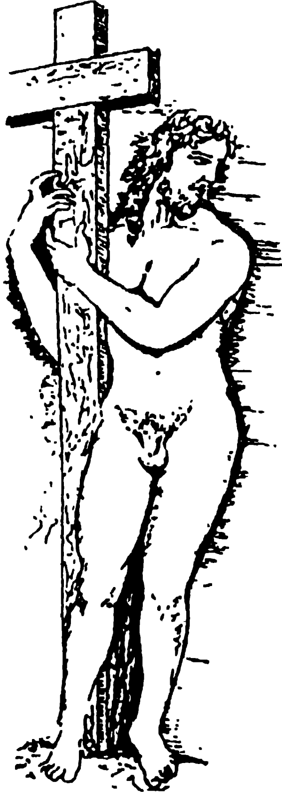
জন ঘর ছেড়ে পথে বেবিয়েছিলেন খুঁজতে। সত্য-সুন্দরের সন্ধানে তাঁর অভিযাত্রা। নির্জন আরব-মরুভূমিতে একক সাধনায় আকাশের দিকে দু-হাত তুলে তিনি আর্তনাদ করতেন : প্রভু! আলো দেখাও! পাপে এ পৃথিবী যে ক্লেদাক্ত হয়ে গেল! এখনো কি ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের মহালগ্ন আসেনি?

তারপব একদিন প্রত্যাদেশ পেলেন : প্রভু যীশু আসছেন। ত্রাণকর্তারূপে!



চিত্র 5.40 'সেন্ট জন প্রিচিং' রোদ্যাঁ (1840-1917)

মরুভূমি থেকে ফিরে এলেন তরুণ তাপস। অপরূপ যুবাপুরুষ তিনি। একমাথা অবিন্যস্ত কেশরাজি, একবুক ঘন কালো শ্মশ্রু। ইতিমধ্যে মরুভূমির দুরন্ত বালুঝটিকায় তাঁর জীর্ণ বস্ত্রের শেষ সুতোটি পর্যন্ত অন্তর্হিত। সে বোধ নেই সন্ন্যাসীর। জেরুসালেমের পথে পথে দিগম্বর সাধু আগমনী গান গেয়ে ফেরেন : তোমরা প্রস্তুত হও! তিনি আসছেন! জগৎত্রাতা।



চিত্র 5.41 সান্টাস্পিরিটা—ক্রুশ হস্তে যীশু, মিকেলাঞ্জেলো (1475-1564)

শিষ্যারা জানতে চান, 'তিনি' আবার কে? আপনিই তো মহাসন্ন্যাসী!

জন বলেন, না, না। আমি তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই। তাঁর পায়ের জুতোর ফিতেটা বেঁধে দেওয়ার যোগ্যতাও নেই আমার!

এ পর্যন্ত বাইবেল কাহিনি। বাইবেল আরও বলেছেন, জেরুসালেমের তদানীন্তন রোমান গভর্নর হেরড-এর আদেশে জনকে বধ করা হয়। বাইবেল-বর্ণিত এই কাঠামোটুকু সম্বল করে বিগত যুগের এক খ্রিস্টান সন্ন্যাসী রচনা করে গেছেন একটি কাহিনি : *সালোমে*।

সালোমে ছিল জেরুসালেমের রোমক-শাসক হেরডের ব্যভিচারী আত্মজা। অষ্টাদশী, অপরূপ রূপসী এবং অসামান্যা কামার্তা। দুর্গের অলিন্দ থেকে সে একদিন দেখতে পায় দিগম্বর তরুণ সন্ন্যাসীকে। সালোমের মনে উদয় হল কামভাব। রাজাদেশে তরুণ তাপসকে কারারুদ্ধ করা হল এক নির্জন কক্ষে। গভীর রাত্রে অভিসারিকার বেশে সেখানে আবির্ভূতা হল সালোমে। প্রস্তরশয্যায় বিবস্ত্র তরুণ সন্ন্যাসীকে প্রদীপ তুলে রাজপুত্রী দেখল। বোধকরি সে বলেছিল, 'কুমার কিশোর,/দয়া কর যদি গৃহে চলো মোর/এ ধরণীতল কঠিন কঠোর/এ নহে তোমার শয্যা।'

কাহিনির বাকি অংশটা মেলেনি। সালোমে সন্ন্যাসীর কাছে পেল ভর্ৎসনা-মিশ্রিত প্রত্যাখ্যান। জীবনে কখনো প্রত্যাখ্যাতা হয়নি রাজপুত্রী। তার শয্যাসঙ্গী হতে জেরুসালেমের যাবতীয় তরুণ উন্মাদ! চরম প্রতিশোধ নিল প্রত্যাখ্যাতা। রাজাদেশে পরদিন শিরশ্ছেদ করা হল জনের।

সুধীজনমাত্রেরই স্মরণ হবে এই সূত্রটি অবলম্বন করে অস্কার ওয়াইল্ড রচনা করেছিলেন একটি অনবদ্য নাটক *সালোমে*। কিন্তু আইরিশ লেখকের রচনা 1893 সালে। অর্থাৎ রোদ্যাঁর ভাস্কর্য নির্মাণের পনের বছর পরে।

রোদ্যাঁ নির্মাণ করলেন তাঁর ভাস্কর্য : 'জন দ্য ব্যাপ্টিস্ত্‌।'

ভাস্কর্যটি যখন সালোঁতে পাঠানো হল তখন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সালোঁর কর্তৃপক্ষ এবং নির্বাচকমণ্ডলী।

সেন্ট জন সম্পূর্ণ নগ্ন! জনের ন্যূড গড়েছেন রোদ্যাঁ (চিত্র 5.40)।

নিষ্ঠা নিয়ে ভাস্কর সন্ন্যাসীর যৌনাঙ্গটিও উৎকীর্ণ করেছেন—বোধকরি সালোমের উপকথাটি স্মরণ করে।

অনতিবিলম্বে সালোঁর প্রতিনিধিবৃন্দ এলেন অগুস্তের স্টুডিওতে। সেই তাঁরা যাঁরা গতবার রোদ্যাঁর ভাস্কর্যকে প্রদর্শনীতে স্থান দিতে প্রবল বাধা দিয়েছিলেন। সফলকামও হয়েছিলেন। তাঁদের মুখপাত্র হিসাবে কবি মালার্মে বললেন, মসুয়ে রোদ্যাঁ, আমরা আপনার সেন্ট জন পরিকল্পনায় মুগ্ধ। সালোঁ সেটা এ বছর প্রদর্শনীকক্ষে উপস্থাপিত করতে স্বীকৃত, কিন্তু একটি শর্ত আছে। আপনি যদি একটি ছোট অলিভ পাতায়....

অগুস্তের ভ্রূযুগলে জাগল কুঞ্চন। বলে, 'পবিত্র

বাইবেল কি বলেননি—'মরুভূমির দুরন্ত ঝড়ে জন-এর পরিধেয়বস্ত্রের শেষ সুতোটি পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়েছিল'?'

—বলেছেন। কিন্তু পবিত্র বাইবেল পাঠযোগ্য সাহিত্য, এটি সর্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত দৃশ্যকাব্য।

—ফ্লোরেন্স আকাদেমিয়ায় সতের ফুট দীর্ঘ মিকেলাঞ্জেলোর ডেভিড কি সর্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত দৃশ্যকাব্য নয়?

—মসুয়ে রোদ্যাঁ! 'ডেভিড' সেন্ট নয়। সে বীর!

—আর মিকেলের 'সান্টা স্পিরিটা' 'ক্রুশহস্তে যীশু'? 'সান্টা মারিয়া সোপ্রা মিনার্ভার' 'পুনর্জীবিত যীশু'?

—মসুয়ে রোদ্যাঁ! রেনেসাঁ-যুগ তিন শ বছরের অতীত। দুনিয়ার সবকিছু পালটে গেছে, যাচ্ছে। দর্শকের মনও পরিবর্তনশীল। তাঁর আমলে যা হয়েছে, হতো, এখন তা সালোঁ বরদাস্ত করতে পারে না।

একগুঁয়ে জেদী শিল্পী দৃঢ়স্বরে বলে, আমি দুঃখিত মসুয়ে। আপনাদের অনুরোধে আমি আমার শিল্পে কোনো পরিবর্তন করতে পারব না।

—তার মানে সালোঁর সহযোগিতা আপনার কাম্য নয়?

—চুলোয় যাক আপনাদের সালোঁ! আমার যদি সৃজনী প্রতিভা থাকে, তাহলে সারা পৃথিবীকে একদিন সে কথা স্বীকার কবতে হবে! আর হ্যাঁ, সালোঁও তখন নতজানু হয়ে সে কথা মেনে নেবে।

ওঁরা নতমস্তকে ফিরে গেলেন।

মেরী রোজ—ওঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গিনী—এতক্ষণ সামনে আসেনি। সে জানে, ওঁদের চোখে সে নিজে শিল্পীর পোষা ময়না, মডেল, রক্ষিতা মাত্র! তাই আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল এতক্ষণ। ওঁদের প্রস্থানের পর এঘরে এসে বলে, অমন কড়া-কড়া কথাগুলো না বললেই পারতে!

—তুমি এসব বুঝবে না!

'বুঝবে না, বুঝবে না, বুঝবে না।' মেরী রোজ কোনদিনই কিছু বুঝবে না। বুঝনেওয়ালা একমাত্র ওই ওর গোঁয়ার মরদ—অগুস্ত রেনে রোদ্যাঁ!

নিরক্ষরা সে। গ্রামের মেয়ে। সুন্দরী ও সুগঠিততনু। কিন্তু রোদ্যাঁর মতে সে শিল্পের কিছু বোঝে না!

কিন্তু ওখানেই ব্যাপারটা মিটল না। পরদিন সালোঁর পক্ষ থেকে আবার সাক্ষাৎ করতে এলেন পারীর এক প্রাচীন শিল্পাচার্য। একাকী। স্টুডিওর কলবেল বাজাতে দোর খুলে দিল মেরী রোজ। ভূত দেখল যেন! আগন্তুক রোদ্যাঁর গুরুদেব : ওরেস লেকক দ্য বোয়াবোদ্রান! সেই যে বৃদ্ধ তাঁর প্রিয় ছাত্রকে দীর্ঘদিন পূর্বে ত্যাগ করেছিলেন, যেহেতু গোঁয়ারটা রোজ মেরীকে বিবাহ করতে সম্মত হয়নি। মেরী চেনে তাঁকে।

বলল, মেৎর? আপনি?

—হ্যাঁ। মসুঁয়ে অগুস্ত রেনে রোদ্যাঁ কি বাড়ি আছেন?

মেরী রোজ ঘাবড়ে যায়। তবে কি সে চিনতে ভুল করেছে? ওরেস্ লেকক দ্য বোয়াবোদ্রান অগুস্তকে চিরকাল 'তুই-তোকারি' করতেন—রোজ জানে। ততক্ষণে ভেতর থেকে এগিয়ে এসেছে রোদ্যাঁ। স্তম্ভিত হয়ে যায় সে। লেকক দীর্ঘদিন তার স্টুডিওতে আসেননি—সেই যেদিন সে জানিয়েছিল মেরী তার মডেল, স্ত্রী হবে না কোনদিন। দশবছর আগেকার সে কথোপকথন রোদ্যাঁ ভোলেনি। তবু লেকক্‌কে দেখেই ও বুঝতে পারে—আজ কেন ওই বৃদ্ধ তার দরজায় আসতে বাধ্য হয়েছেন। গুরুকে স্টুডিওর ভেতর আসতে বলে না। আচমকা তার মুখ দিয়ে বার হয়ে যায় : এট্ ট্যু ব্রুতাস্! আপনিই না একদিন বলেছিলেন শিল্পীর পক্ষে আপোস করার চেয়ে উপোস করা ভালো? মাপ করবেন, মেৎর! আমি রাজি নই।

দরজায় দুই চৌকাঠে দু-হাত বাড়িয়ে সে প্রবেশপথটা রুদ্ধ করে দাঁড়ায়। লেকক তখনো রাজপথে। সেখান থেকেই শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলেন, মসুঁয়ে রোদ্যাঁ! আমি বর্তমানে ফরাসি সরকার ও সালোঁর অফিশিয়াল প্রতিনিধি। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে 'মেৎর' সম্বোধন করবেন না। বলুন, মসুঁয়ে বোয়াবোদ্রান।

অগুস্ত রীতিমতো ঘাবড়ে যায়। আমতা আমতা করে, কী বলতে এসেছেন?

—এই সড়কের ওপর দাঁড়িয়েই তা আপনাকে বলব?

—না, না, তা কেন? আসুন, ভেতরে এসে বসুন! বলুন?

লেকক ওর স্টুডিওতে প্রবেশ করলেন। ওর ওয়ার্ক-টুলটা টেনে নিয়ে নিজে থেকেই বসলেন। বললেন, বলতে তো আসিনি কিছু; শুনতে এসেছি। কেন আপনার জিদটাই এক্ষেত্রে বড় হবে? কেন সালোঁর প্রস্তাবটা আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন? কেন পারীর শিল্পানুরাগীদের চোখের আড়ালে থাকবে 'জন দ্য ব্যাপ্টিস্ত, প্রীচিং'?

অগুস্ত মহাভারত পড়েনি। না হলে হয়তো ওর মনে হতো এবার দ্রোণাচার্যের সঙ্গে অর্জুনের দ্বৈরথ সমর শুরু হল। নিজেও একটা টুল টেনে নিয়ে বসে। বলে, সে কথা আমি গতকালই বলেছি মসুঁয়ে মালার্মেকে। আবার বলছি :

মিকেলাঞ্জেলোর 'ডেভিড' যদি নগ্ন হতে পারে, তবে 'জন'ও পারেন। সেন্ট হলেও তিনি নরদেহধারী, মর-মানুষ। না হলে সালোমে তাঁকে ভজনা করতে যেত না।

লেকক্ বলেন, মসুঁয়ে রোদ্যাঁ, আমরা 'ডেভিড'-এর সঙ্গে 'জন'-এর তুলনা করছি না, করছি মিকেলাঞ্জেলোর ভাস্কর্যের সঙ্গে আপনার একটি শিল্পের। দুটি শিল্পকর্মের মধ্যে তিনশ বছরের ফারাক। শিল্পের ওপর কি একমাত্র শিল্পীরই অধিকার? সমকালীন দর্শকের কোনো এক্তিয়ার নেই? শিল্পী কী দেখাতে চান শুধুমাত্র সেটাই বিবেচ্য? পারীর দর্শকেরা যদি বলে—আমরা সালোমে নই, আমরা জনের মহত্ত্বটুকুই দেখতে চাই—তাঁর যৌন-আকর্ষণ ছিল কি ছিল না তা জানতে চাই না। —তাহলে শিল্পী সে আবেদনে বধির থাকবেন?

পুরো এক মিনিট সময় নীরব রইল। তারপর অস্ফুটে বলে, কিন্তু গতকালই আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। আর আজই যদি নতুন করে—

—আপনি কেন করবেন? আপনি তো শুধু অনুমতি দেবেন। তা আপনি দিয়েছেনও। আমাকে। এই মুহূর্তে। অপর কেউ অলিভ পাতাটা গড়ে দেবে।

হঠাৎ অগুস্ত-এর নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হয়ে ওঠে। সহজাত-দার্ঢ্যে বলে ওঠে, কে? কে সেই মহান শিল্পী যিনি রোদ্যাঁর শিল্পের ত্রুটি সংশোধন করবেন? নামটা অনুগ্রহ করে জানাবেন কি?

হঠাৎ অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন লেকক্। বলেন, এতক্ষণে তুই একটা জবর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিস অগুস্ত! তা বটে! অগুস্ত রেনে রোদ্যাঁর ত্রুটি সংশোধন করার হিম্মৎ আজ কার আছে দুনিয়ায়? কিন্তু শিল্পতীর্থ পারীতে কি এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না যে, ছোট্ট একটা অলিভ পাতা গড়তে পারে?

অগুস্ত গুম মেরে যায়। বুঝে উঠতে পারে না, ওই অট্টহাসের উৎসটা কোথায়? নিছক কৌতুকই? তাই কি হঠাৎ উনি 'তুই-তোকারি'তে ফিরে এসেছেন?

জিজ্ঞেস করে, কী বলতে চাইছেন আপনি?

লেকক হাসতে হাসতে বলেন, বলছি যে, তোর প্রশ্নটা খুব কঠিন! মনে হয় এর জবাব পণ্ডিতে দিতে পারবে না। পারলে হয়তো পারবে পারীর সাধারণ মানুষ। সাধারণ দর্শক! পারীতে এমন শিল্পী কে আছেন যিনি অগুস্ত রেনে রোদ্যাঁর ত্রুটি সংশোধন করতে পারেন!

অগুস্ত অগ্নিদৃষ্টি মেলে শুধু তাকিয়ে থাকে। জবাব দেয় না। হঠাৎ দ্বারের দিকে নজর পড়ে লেককের। বলেন, ওই তো ও আছে। সাধারণ দর্শকের একজন প্রতিনিধি। তুমি একটু এগিয়ে এসো তো মা? তুমি তো মেরী রোজ ব্যুরে?

ভিতর-দরজার কপাটের আড়াল থেকে কৌতূহলী চোখ দুটি মেলে দেখছিল। এখন বাধ্য হয়ে এগিয়ে এলো। লেকক্কে সসম্ভ্রম অভিবাদন করে—'কার্টেসি বাও'। লেকক বলেন, আমরা একটা নিদারুণ সমস্যায় পড়েছি, মা। অগুস্ত মূর্তি গড়তে গিয়ে একটা ছোট্ট ভুল করেছে। ওর মূর্তিতে একটা ছোট্ট অলিভ পাতা জুড়ে দিতে হবে। অগুস্ত নিজে সেটা গড়তে পারছে না। কে সেটা পারবে বলতে পারো?

অগ্নিকন্যা জোন অফ্ আর্কের প্রদেশ লোরেনের সেই নিরক্ষরা মেয়েটি লজ্জা পেল না। কেন পাবে? অগুস্ত সারা জীবন তাকে শুনিয়ে এসেছে—'তুমি বোকা, তুমি কিছু বোঝ না!' আর আজ সেই অগুস্তের গুরু তাকেই সালিশ মেনেছেন! সাধারণ বুদ্ধিতে ওর যা মনে এলো তাই বলে বসল, আপনি নিজেই সেটা পারবেন মেৎর!

আবার অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন পেতি একোলের প্রাক্তন আচার্য!

—তাই তো! তাই তো! এমন সহজ সমাধানটা তো আমাদের দুজনেরই নজরে পড়েনি। বুড়ো হয়ে গেছি। তবু ছোট একটা অলিভ পাতা কি গড়তে পারব না? আর অধিকার? গোটা পারীর শিল্পতীর্থে তা-বড় তা-বড় শিল্পীর যে অধিকার নেই, একমাত্র ওরেস লেকক্ দ্য বোয়াবোদ্রানের সে অধিকারটাও আছে! ও যে আমার ছাত্তর! রাম-শ্যাম-যদু নয়—পাগলটা যে আমার 'জপের মালা'—অগুস্ত রেনে রোদ্যাঁ!

* * *

পাশ্চাত্য শিল্পের এই ন্যুড তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—এর সমান্তরাল-চিন্তা ভারতীয় শিল্পে কেন বিকশিত হল না? এখানে ধর্মযাজকেরা অথবা রাজশক্তি তো নগ্ন নরনারীর আলেখ্য গড়ায় কখনো কোনও আপত্তি করেনি। আমাদের ইতিহাসে 'কালাপাহাড়' আছে—আদিরসের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম ছিল না। সাভারানোলার মতো শিল্পবিদ্বেষী তো এখানে কোনোদিনই মাথা তুলে ধ্বংসলীলায় মাতেনি। তবু দুই-তিন সহস্রাব্দ ধরে শিল্প গড়ার অবকাশে ভারতীয় ভাস্কর কেন প্রণিধান করতে পারল না: নরনারীর নিরাবরণ তথা নিরাভরণ তনুদেহেও ক্ষেত্রবিশেষে ফুটে ওঠে এক স্বর্গীয় সুষমা। সে সৌন্দর্য আষাঢ় সঘন মেঘের সগোত্র, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত

বনানীর সহোদর, প্রস্ফুটিত পদ্মের প্রতিচ্ছবি। নারীর সৌন্দর্যবর্ধক অলঙ্কার : কেয়ূর-কঙ্কণ-রতনচূড়, শতনরী-নূপুর-নীবিবন্ধ কি নিভৃত মুহূর্তে নিতান্ত বাহুল্য নয়? 'রূপ'-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে কবি বলতে পারলেন :

"অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্ ভান্তি তদরূপমিতি কথ্যতে।"

[অনলঙ্কৃত দেহও যে গুণ থাকিলে অলঙ্কৃতের ন্যায় শোভা পায়, তাহাকে রূপ বলা হয়।] কিন্তু ভারতীয় ভাস্কর তত্ত্বটা কোনোদিনই বুঝলেন না। চার-পাঁচ হাজার বছরের ভেতর ভারতীয় ভাস্কর তার মানসীকে, তার 'সুতনুকা'কে, তার অন্তরতমাকে ডেকে একবারও বলতে পারল না—

"ফেলো গো বসন ফেলো
—ঘুচাও অঞ্চল।
পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ...
অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
আসুক বিমল উষা মানব-ভবনে
লাজহীনা পবিত্রতা—শুভ্র বিবসনে।।"

* * *

য়ুরোপীয় শিল্পভাবনায় ন্যুড বলতে যা বুঝি তা ভারতীয় ভাস্কর্যে এবং চিত্রশিল্পে ক্বচিৎ নজরে পড়ে। পুরুষ 'ন্যুড' গড়া হয়েছে ধর্মীয় কারণে—তার সঙ্গে আদিরসের কোনও সম্পর্ক নেই। কিছু জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি সম্পূর্ণ আবরণ-বিমুক্ত—তাঁরা দিগম্বর সম্প্রদায়ের সাধক: আদিনাথ, নেমিনাথ, গোমতেশ্বর প্রভৃতি। আবরণের সঙ্গে তাঁরা আবশ্যিকভাবে আভরণও ত্যাগ করেছেন। শ্রবণবেলগোলায় দণ্ডায়মান তাপস গোমতেশ্বর-মূর্তির দুটি পদ ও জানু বেয়ে উর্ধ্বগামী কিছু লতাকে দেখবেন। তারা আদৌ আভরণ বা অলঙ্কার নয়। লতাগুল্মের ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ পৃথক। শিল্পী বলতে চান : সাধক এত দীর্ঘসময় নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতো এমন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন যে, দুটি লতা তাঁকে স্থির পাদপরূপে ধরে নিয়ে জানু বেয়ে সূর্যালোকসন্ধানে উর্ধ্বমুখে যাত্রা করেছে।

রমণীমূর্তিতে নিরাবরণা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হলেও, নিরাভরণা যে পাওয়া যায় না, একথা আগেই বলা হয়েছে। আমরাও একটি মাত্র ব্যতিক্রম পেয়েছি, একটি কালীঘাটের পটচিত্রে। মাতা ছিন্নমস্তার দুই পাশে যে দুজন সহচরী আছেন—ডাকিনী এবং বর্ণিনী—তাঁরা শুধু নিরাবরণা নন। সম্পূর্ণরূপে নিরাভরণা। এই দুই আলুলায়িতকুন্তলা সহচরীর ক্ষেত্রে শিল্পী কেন যে প্রচলিত অলঙ্কারগুলি—কণ্ঠহার, মণিবন্ধ, মেখলা, নূপুর প্রভৃতি আঁকেননি বলতে পারি না। 'নেই তাই পাচ্ছ'-সূত্রে এই দুজন প্রাচ্য সুন্দরী পাশ্চাত্য শিল্পের নিরিখে নিখুঁত: ন্যুড।

* * *

ন্যুড-তত্ত্বকে আর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে: প্রতিকৃতি চিত্র। বাস্তব মানুষের প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেচার। গ্রীকযুগ থেকে রেনেসাঁ যুগ পর্যন্ত প্রতিকৃতি-চিত্র—অর্থাৎ ইতিহাস-পরিচিত ব্যক্তিকে 'সিটিং' দিয়ে প্রতিকৃতি—গড়া হয়নি। বাইবেল-বর্ণিত বহু পরিচিত চরিত্রও পেয়েছি—প্রত্যেকটিই শিল্পীর ধ্যানে ধরা আলেখ্য।

রুবেন্স বা রেনোয়ার যুগে পরিচিত ব্যক্তির 'ন্যুড' আঁকা কীভাবে শুরু হল তাও আমরা দেখেছি। রুবেন্স বা রেনেয়ার মতো দুঃসাহসী দলছুট শিল্পীকে বাদ দিয়ে বলা যায় পশ্চিমী শিল্পকলায় প্রতিকৃতির ক্ষেত্রে শিল্পী যথেষ্ট শালীনতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ভাষান্তরে, পরিচিত পুরুষ, বিশেষ করে রমণীমূর্তির, পোর্ট্রেট আঁকার সময় তাঁদের যৌনাঙ্গ রূপায়িত করায় সামাজিক বাধা ছিল। ফলে শৈল্পিক বাধাও।



চিত্র 5.42 ছিন্নমস্তা. ডাকিনী ও বর্ণিনী

প্রতিকৃতি অঙ্কনের প্রথমযুগেই দেখছি জাঁ ভাঁ আইক (1383-1441) অঙ্কিত *জোভানি আর্লফিনে*-তে স্বামীস্ত্রীকে সম্পূর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত করেছেন। ওয়েডেনের (1400-1464) *পোট্রেট অব অ্যা লেডি*, লেওনার্দোর *গ্রিনেভ্রা দ' বেন্সি, বিযাত্রিচে, ইসাবেলা, মোনালিসা*, তিজিয়ানোর *লা বেলা* প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রতিকৃতিচিত্রে স্ত্রীলোকের বক্ষ আবশ্যিকভাবে বস্ত্রাচ্ছাদিত। পশ্চিমের এই শিল্পভাবনার নিরিখে ভারতীয় ভাস্কর্যে পরিচিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি গড়ার সময় কী চিন্তাধারা কাজ করেছিল এবার আমরা তাই যাচাই করে দেখব।

* * *

ভারতীয় ভাস্কর্যে প্রতিকৃতি বা ঐতিহাসিক চরিত্রের শালীনতা :

ভারতীয় ভাস্কর ভাজা, কন্ডেন, কার্লে যুগ থেকে গুহামন্দিরে অসংখ্য দাতার সস্ত্রীক মূর্তি উৎকীর্ণ করেছেন। সেখানে মহিলারা উন্মুক্তবক্ষা। অবশ্য অব্যতিক্রমভাবে সেইসব মহিলাবৃন্দের নিম্ন যৌনাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত। প্রথম খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিন শ' বছর ধরে এবং পরবর্তীকালেও নাসিককে কেন্দ্র করে দুইশত মাইল ব্যাসার্ধে যেসব বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম গড়ে উঠেছিল সেখানে এগুলি দেখা যায়। বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্যে কয়েক শত 'ডোনার-কাপ্‌ল্' বা দাতাদম্পতির মূর্তি উৎকীর্ণ করা আছে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই সমকালীন মহিলা উন্মুক্ত-উরসা। তার হেতু মুসলমান আগমনের পূর্বযুগে সাধারণ ভারতীয় মহিলা—এমনকি সম্ভ্রান্ত পরিবারেও—যৌবনের যুগ্মজয়স্তম্ভ প্রকাশিত করেই সর্বত্র যাতায়াত করতেন। এটার ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তবে অনেক পণ্ডিতের এই রকমই ধারণা। এতে কোনো সামাজিক বাধা ছিল না। কিন্তু ওইসব দাতার সহধর্মিণীর আলেখ্যে কোন যৌনতাবোধ পরিলক্ষিত হতো না। মোহেন-জো-দরোর ব্রোঞ্জনর্তকী (চিত্র 5.1), মথুরাযক্ষী (চিত্র 5.3) অথবা সাঁচি-বৃক্ষিকা (চিত্র 5.2) যেভাবে তাদের নিম্নযৌনাঙ্গ বিকশিত করে, লাস্যময়ী ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মানা, সেভাবে তারা কখনো উপস্থাপিত হয়নি।

সহস্রাব্দ-স্বীকৃত এই শিল্পরীতির তিনটি সুদুর্লভ ব্যতিক্রম গবেষণাকালে আমাদের নজরে পড়েছে। তিনটিই সমকালীন। এই তিনটি ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহিলা ত্রয়ীর নগ্নতা শিল্পী আচ্ছাদিত করেননি। তিনটিই সাঁচি তোরণে উৎকীর্ণ করা। খ্রিস্টজন্মের দু-একশ বছর আগে-পিছে। হেতুটা জানি না। সুযোগ পাওয়ায় এ প্রশ্নটি পেশ করেছিলাম আচার্য সুনীতিকুমারের কাছে। তিনি জানিয়েছিলেন এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর তাঁরও জানা নেই।

প্রথম উদাহরণটি দেখেছি সাঁচির বৃহত্তম স্তূপের উত্তরপ্রান্তের তোরণদ্বারে। ওপর থেকে তৃতীয় প্যানেল—দ্বারপালমূর্তির ঠিক ওপরে। শিল্পবিশারদরা এর নামকরণ করেছেন 'বুদ্ধদেবের কপিলবস্তু নগরীতে প্রত্যাবর্তন।'

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করার সময় তাঁর সারথী চন্নের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান যে, বুদ্ধত্বলাভের পরে তিনি একবার কপিলবস্তুতে প্রত্যাবর্তন করবেন। অনেক বছর পরে সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্বলাভ করেছেন এবং রাজগৃহের বেণুবনবিহারে সদ্ধর্মের প্রচার করছেন এ-কথা জানতে পেরে মহারাজ শুদ্ধোদন বুদ্ধদেবকে কপিলবস্তুতে আমন্ত্রণ জানান। সেই আমন্ত্রণ রাখতে বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে প্রত্যাবর্তন করে শহর সন্নিকটে ন্যগ্রোধারাম বিহারে এসে উপস্থিত হন। মহারাজ সপরিবারে সন্ন্যাসী দর্শনে আসেন। আলোচ্য প্যানেলে সেই ঘটনাটি বিধৃত (চিত্র 5.43)।



চিত্র 5.43 বুদ্ধদেব সন্নিকটে শুদ্ধোদন, গৌতমী ও রাহুলমাতা সাঁচি (খ্রিস্টজন্মের প্রায় সমকালীন)

দেখছি, রাজার সঙ্গে সাতজন পুরললনা এসেছেন। সাঁচি-স্তূপ নির্মিত হয় স্থবিরবাদী বৌদ্ধযুগে। তখনো ভারতীয় ভাস্কর বুদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ করার অনুমতি পাননি। এখানে তাই তাঁর প্রতীক হচ্ছে একটি বোধিদ্রুম। প্যানেলের মাঝামাঝি রাজচ্ছত্র চিহ্নিত মহারাজ শুদ্ধোদনকে সহজেই শনাক্ত করা যায়। তাঁর সম্মুখে দুজন, পশ্চাতে তিনজন, পুরনারী। সম্মুখবর্তী দুজনের একজন দীর্ঘাঙ্গী। তিনি গৌতমের বিমাতা মহাগৌতমী। তিনি বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা দিতে এসেছেন, তাই তাঁর হাতে ভিক্ষাপাত্র। তাঁর মুখে একটি প্রশান্তি—পুত্রকে দীর্ঘদিন পরে দেখতে পেয়ে।

তাঁর সম্মুখে আর একজন পুরললনা। শিল্পী তাঁকে গৌতমের পিতা এবং মাতার তুলনায় অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনিই বোধিদ্রুমের সবচেয়ে নিকটবর্তী। কম্পোজিশানের এই ব্যঞ্জনাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার। কারণ বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে গৌতমের এই সহধর্মিণী 'কাব্যের উপেক্ষিতা'। 'যশোধরা' বা 'গোপা নামটি ব্যবহারেও তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করেছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে সচরাচর তিনি 'রাহুলমাতা' নামে উল্লেখিতা। ক্ষুব্ধ ভারতশিল্পী বোধকরি সেজন্যই ওই মহিলাটিকে রেখেছেন সর্বাগ্রে—বোধিদ্রুমের সবচেয়ে কাছে!

যশোধরার ক্রোড়ে একটি শিশু—বলাবাহুল্য পুত্র: রাহুল। তাঁর সর্বাঙ্গে নানান আভরণ। বস্তুত পাঁচজন পুরললনার মধ্যে তিনিই সর্বালঙ্কারভূষিতা। গৌতমের পরিত্যক্তা সহধর্মিণী—তাঁর সন্তানের জনকের কাছে উপস্থিত হবার দুর্লভ সৌভাগ্যলাভে আজ প্রসাধনের কার্পণ্য করেননি।

মহাগৌতমী আর রাহুলমাতা উভয়েই উন্মুক্তবক্ষা। সেটা অস্বাভাবিক নয়। বাস্তব অবস্থা জানা নেই, কিন্তু সেটাই ছিল প্রচলিত শিল্পরীতি। কিন্তু ভাস্কর রাহুলমাতাকে এমন নির্লজ্জভাবে উৎকীর্ণ করলেন কেন? রাজবধূর কটিদেশে স্বর্ণমেখলা পরিদৃশ্যমান। তাঁর পরিধেয় বস্ত্রের ভাঁজগুলি নিখুঁত। তাহলে শিল্পী সচেতনভাবে রাজবধূকে এমন বে-আব্রু করলেন কেন?

আগেই বলেছি, পর্বতপ্রমাণ বৌদ্ধশাস্ত্রে কোথাও 'যশোধরা'র নাম নেই। অর্থাৎ শুধু রাজপুত্র নয়, বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরাও তাঁকে উপেক্ষা করেছেন। পরিত্যাগ করেছেন। এই যখন সেই রাজবধূমাতার নিয়তি তখন সাঁচির ভাস্কর কোন্ দুঃসাহসে দুঃশাসনের মতো সর্বসমক্ষে তাঁর বস্ত্রাকর্ষণ করে?

চিত্র 5.43-এর অংশবিশেষ বর্ধিত আকারে পুনরায় পরিবেশিত হয়েছে চিত্র 5.44-এ।

কষ্টকল্পনা কিনা জানি না, একটা সম্ভাব্য যুক্তির ক্ষীণ আভাস মনে জাগছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এ সম্ভাবনার কথাটা ছবি আঁকতে আঁকতে মনে পড়ল। তাই কোনো প্রখ্যাত ভারতবিদের সঙ্গে আলোচনার সময় সেটা যাচাই করা হয়নি। এখন সেটা লিপিবদ্ধ করতে কিছু সঙ্কোচও বোধ করছি। কারণ একালের পাঠক-পাঠিকা এটাকে লেখকের পক্ষে ধৃষ্টতা মনে করতে পারেন। তবু যা মনে হচ্ছে বলি:

শিল্পী নিশ্চয় দুঃশাসনের মতো দুর্বিনীত নন। খেয়ালখুশিতে রাজবধূকে exhibitionist রূপে উপস্থাপিত করেননি। প্রধান পরিকল্পনাকার বা মূল স্থপতিবিদের অনুমতিসাপেক্ষেই মূর্তি ওভাবে খোদাই করা হয়েছিল, এটা মেনে নেওয়া স্বাভাবিক। তাহলে কেন?

সমাধানটা কি এভাবে পাওয়া যায়?

রাহুলমাতা তখনো সদ্ধর্ম গ্রহণ করেননি। হয়তো সন্ন্যাসীদর্শনে আসার সময় হতভাগিনীর মনে ক্ষীণ আশা ছিল যে, পুত্রকে স্বচক্ষে দেখে রাজপুত্র মত বদলাতে পারেন। গার্হস্থ্যাশ্রমে পুনরায় ফিরে আসতে পারেন। তাই তো তাঁর আজ এত প্রসাধন। এত অলঙ্কারের ঘটা! লক্ষ্য করে দেখছি, যশোধরা আর সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর সম্মুখে শুধু তাঁর স্বামী। এটা কি তাই রাজবধূর গোপন মনোবাসনার এক তির্যক প্রতিফলন? প্রদর্শনবাদিতা বলে যেটা আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তা কি রাজবধূর আন্তরকামনার এক প্রতীকী প্রতিভাস?

দ্বিতীয় উদাহরণটিও সাঁচি স্তূপ থেকে। দক্ষিণ তোরণের পশ্চিমদিকস্থ স্তম্ভে উৎকীর্ণ। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে। সম্রাট অশোকের চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে উত্তরণের ক্রান্তিকাল।

মগধ সিংহাসনে আরূঢ় হবার ঠিক পরেই অশোককে কলিঙ্গরাজ্যে যুদ্ধযাত্রা করতে হয়। ভুবনেশ্বরের অনতিদূরে তোশলী রণাঙ্গনে লক্ষাধিক কলিঙ্গ-সৈন্যকে বধ করে অশোক জয়লাভ করেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহত সৈনিকদের মৃতদেহ দেখে সম্রাট প্রচণ্ডভাবে মর্মাহত হন। অনুশোচনায় তিনি আত্মহননে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন।

এই প্যানেলে দেখছি শোকাহত সম্রাটকে দুই রানী দুদিকে ধরে আছেন। মহারাজ পতনোন্মুখ। দুই রানী ব্যতিরেকে এ দৃশ্যে আরও কয়েকজন রাজান্তঃপুরচারিকা। প্রত্যেকটি মহিলার কটিদেশে স্বর্ণমেখলা। স্বাভাবিকভাবেই

সকলে বিকচউরসা। এবং সকলের জঙ্ঘাদেশ ঘিরে ভাঁজ খাওয়া প্রচুর বস্ত্র। অথচ আশ্চর্য, চারজন মহিলারই নিম্নযৌনাঙ্গ নিঁখুতভাবে উৎকীর্ণ করা!



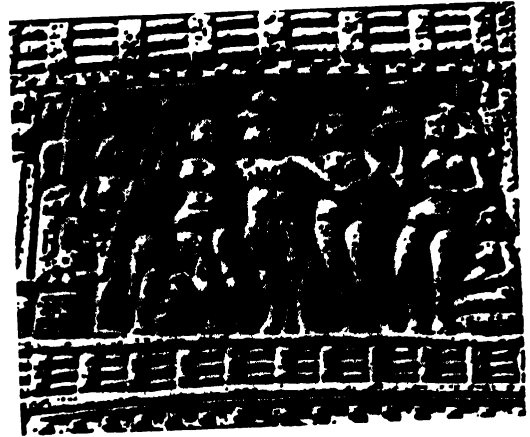
চিত্র 5.44 রাহুলমাতা
[চিত্র 5.43-এর অংশ, বর্ধিতাকারে] সাঁচি

কেন? করুণ-রস ব্যতিরেকে এখানে তো অন্য কোনও রসের প্রবেশাধিকার নেই। তাহলে এই আদিরসাত্মক প্রচেষ্টা কেন? সম্রাট অশোক সাঁচি-স্তূপ নির্মাণের মাত্র দুই শতাব্দী পূর্বেকার যুগের মানুষ। রাজমহিষীদ্বয় অত্যন্ত সম্মানীয়া ব্যক্তি। তাহলে?

এবারও কি আমরা একই জাতির ব্যাখ্যা মেনে নেব? শোকাহত সম্রাটকে গার্হস্থ্যজীবনে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার এ এক তির্যক প্রতিফলন?

তৃতীয় উদাহরণটিও সমকালীন। এটা সংগ্রহ করা হয়েছে ডক্টর জীমারের অমর গ্রন্থ *'দ্য আর্ট অব ইন্ডিয়ান এশিয়া'* থেকে। লেখক এর নামকরণ করেছেন *'ফোর ড্রাইভস্ অব সিদ্ধার্থ'*। ভাস্কর্যে দেখা যাচ্ছে দুর্গের তোরণ অতিক্রম করে একটি রথ রাজপথে বার হয়ে আসছে। রথী অনুপস্থিত, কিন্তু সেই অনুপস্থিত রথীর আসনের ওপর একটি রাজছত্র। গৌতম তখনো বুদ্ধত্ব লাভ করেননি। তবু তাঁকে দেখানো হয়নি। সমকালীন বৌদ্ধ শিল্পনির্দেশে। দ্বিতলে রাজা শুদ্ধোদন সিংহাসনে উপবিষ্ট। তিনি নিচু হয়ে রাজপথের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি। রাজার পশ্চাতে আটজন রাজান্তঃপুরিকা দণ্ডায়মানা। জীমারের গ্রন্থে আলোকচিত্রটি খুব পরিষ্কার নয়। বস্তুত দু-হাজার বছরে মহাকালের স্থূল হস্তাবলেপনে অর্ধোৎকীর্ণ ভাস্কর্যটির এই দশা। মহিলাদের সাজপোশাক, শাড়ির ভাঁজ ঠিক মতো বোঝা যায় না। সৌভাগ্যবশত জীমারের আলোকচিত্র গ্রহণের প্রায় শতবর্ষ পূর্বে আর একজন ভারতবিদ পণ্ডিত এই শিল্পকর্মটির একটি রেখচিত্র আঁকিয়ে তাঁর এক প্রামাণিক গ্রন্থে [*Buddhism in India*, Rhys Davis, P. 64, by T. B. Unwin Ltd. London, 1902] মুদ্রিত করেছিলেন। চিত্রকর অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে সব কিছু খুঁটিয়ে এঁকেছেন। তাতে দেখছি, ওই আটজন পুরললনার ভেতর মহারানীসহ পাঁচজনের জননেন্দ্র সুস্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ করা। অথচ প্রত্যেকের কটিদেশে সুবর্ণ মেখলা শোভিত। সকলেই নানা অলংকারে ভূষিতা। তাহলে এই নির্লজ্জ প্রদর্শনবাদিতার কী অর্থ?

ইতিপূর্বে আলোচিত দুটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনার সুযোগ না পেলেও রিজ ডেভিসের এই চিত্রটি নিয়ে



চিত্র 5.45 শোকাহত সম্রাট অশোক ও দুই মহারানী, সাঁচি তোরণ

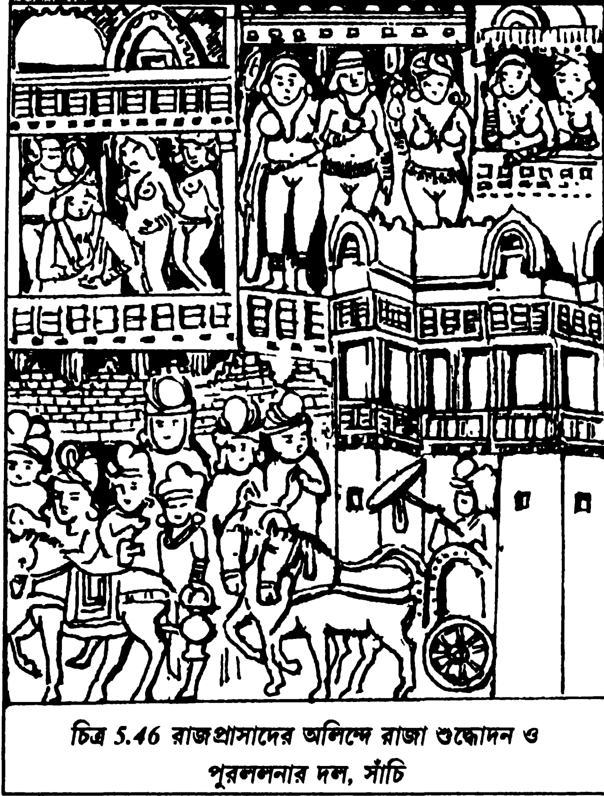
অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের সঙ্গে আলোচনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেটা 1980 সালে। তার পূর্বে তাঁকে আমার একটি বিতর্কিত গ্রন্থের (*ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন*) এক কপি পাঠিয়েছিলাম। আশা করেছিলাম যদি উনি পড়ে কোন মন্তব্য করেন। তাতে আমার প্রভূত উপকার হবে।

উনি তার পরিবর্তে আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। সেই সুযোগে যে কয়টি বিষয়ে আমার অনুপপত্তি ছিল তার একটি তালিকা করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে রি্যজ ডেভিসের ওই গ্রন্থটিও ছিল। সেটি দেখিয়ে আমি জানতে চেয়েছিলাম এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত।

তিনি আমাকে যা বলেছিলেন—সেগুলি সেদিন বাড়ি ফিরে এসে আমার দিনপঞ্জিকায় লিখে নিয়েছিলাম—তাই প্রায় তাঁরই ভাষাতে লিখতে পারছি। উনি বলেছিলেন, "যে অপাপবিদ্ধ মনোভাব নিয়ে গ্রীক শিল্পীরা ন্যূড গড়তেন—শুধু মরমানুষের নয়, দেবদেবীরও—সেই অনুভাবনায় ভারতীয় ভাস্কর একই ভাবে নারী-সৌন্দর্য বিকাশ-প্রয়াসে একাজ করেছিলেন এটা ধরে নিতে দ্বিধা কেন? গ্রীক শিল্পীরা তাঁদের দেবদেবীর—অ্যাপোলো, আফ্রোদিতে, জিয়ুস, আর্মেটিস্ (যাকে রোমকরা বলত 'ডায়ানা') প্রভৃতির জননেন্দ্রিয় উৎকীর্ণ করতে তো কুণ্ঠিত হননি। শুধু বাস্তবতার বিচারে নয়, এতে মূর্তির সৌন্দর্যবৃদ্ধি হচ্ছে এই বিশ্বাস থেকে। তাহলে ভারতীয় শিল্পীরাই বা কেন শিল্পবোধের সেই প্রাগুষাযুগে রাজমহিষী আর পুরললনাদের সেই রকম দেহ গড়তে পারবেন না?"

এটাই বোধকরি এই আপাত-অসঙ্গতির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা।

পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যদেশে ন্যূড অনুভাবনাটি কীভাবে বিবর্তিত হয়েছিল তা আমরা আলোচনা করেছি।



চিত্র 5.46 রাজপ্রাসাদের অলিন্দে রাজা শুদ্ধোদন ও পুরললনার দল, সাঁচি

ভারতে মৌর্য, গুপ্ত, সাতবাহন যুগের পরে আদিরসের রূপারোপ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সম্ভ্রান্ত পবিবারের পুরললনার দল—বৌদ্ধ চৈত্য-বিহারে, পরে মন্দিরগাত্রে দাতাদের সহধর্মিণীরা, সামাজিক প্রথা মেনে উন্মুক্তবক্ষা রূপে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের দেহের নিম্নাঙ্গের গোপনীয়তা সযত্নে রক্ষিত। সার্ধশতবর্ষকালের ভেতর কোনো ঐতিহাসিক বা পরিচিত মহিলার ক্ষেত্রে আর কখনো এ নিয়মের ব্যত্যয় হতে দেখিনি।

তার অর্থ এ নয় যে, শিল্পীরা আদিরসের কারবার বন্ধ করে দিলেন। সেটা বিচ্ছুরিত হল অন্য এক শিল্পধারায়। সে-কথা এ পরিচ্ছেদের এক্তিয়ারের বাইরে: মিথুনাচার। ❑

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মন্দির-ভাস্কর্যে 'সুতনুকা'



জীবনপ্রসবিনী এই পৃথিবীতে মানুষ যেদিন জন্ম নিল—অর্থাৎ হোমো-ইরেক্টাস থেকে বিবর্তিত হল হোমো-স্যাপিয়েন্সে,—তখন সে অনেক কিছুই জানত না। না জানত আগুনের ব্যবহার, না বর্শা বা তীর-ধনুকের। তখন সে ভাল করে হাত মুঠো করতেই পারত না, তা বর্শা বা পাথর ছুঁড়বে কেমন করে? কিন্তু সেই আদিমতম যুগেই একটি অজাত বৈদিক মন্ত্র সে আয়ত্ত করেছিলঃ 'গোত্রং নো বর্ধতাম্'! সেটা জীববিবর্তনের তাগিদে। অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার প্রয়োজনে। এটা তার প্রাণবন্ত উত্তরাধিকার, সৃজনের জন্মগত সংস্কারে। তারপর মানবপ্রজাতির বিবর্তন-ইতিহাসে সে অতিক্রম করে এসেছেঃ হিংস্র কল্প (Savage Epoch—অর্থাৎ হোমোস্যাপিয়েন্স পরিচয় লাভের কাল থেকে তীর-ধনুকের আবিষ্কার), তারপর 'বর্বর কল্প' (Barbaric Epoch—ব্রোঞ্জ-আবিষ্কার থেকে কৃষিকার্য আয়ত্ত করা এবং পোড়ামাটির তৈজসপত্র বানানোর যুগ) এবং বর্তমান 'সভ্য কল্প' (Civilized Epoch—যা এখনো চলছে)। এই কয়েক নিযুত বৎসরে সে অনেক কিছু শিখেছে, কিন্তু তা বলে প্রাক্-প্রজাতি যুগের সেই আদিকলাটা ভোলেনি। সভ্যযুগে পদার্পণ করে সেই ক্রিয়াকাণ্ডকেই বলেছে : আদিরস।

হ্যাঁ, আদিমতম রস তো বটেই! আদিরসের প্রেরণায় সে ক্রমে ক্রমে অনেক শিল্প গড়েছে। এক এক দেশে এক-এক ধরনের, এক-এক যুগে এক-এক রকমের। তার এক তির্যকপ্রকাশ পূর্বপরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করেছি। পশ্চিমখণ্ডেঃ ন্যুড! আবার তারই এক প্রকাশ, ভারতের ভাস্কর্যে : মিথুনাচার।

কোনার্ক সূর্যমন্দিরে আমরা একটা নমুনা জরিপ করেছিলাম, যাকে সাদা বাঙলায় বলে 'সাম্পল সার্ভে'! অর্থাৎ পাশাপাশি উৎকীর্ণ পাঁচশ নরনারীর মূর্তি গণনা করে দেখতে চেয়েছিলাম লিঙ্গভেদে তাদের অনুপাতটা কী? সারা পৃথিবীতে এবং সবযুগেই আদমসুমারির ফলাফলে নর ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান। একেবারে উনিশ-বিশ না হলেও শতকরা 45 : 55। কিন্তু মন্দির ভাস্কর্যে আমাদের আদমসুমারির ফলাফলে দেখা গেল—নারী : পুরুষ : : 87 : 13; ভাস্করদল জীবস্রষ্টার মতো নিরপেক্ষ নন। তার একটা হেতুও আছেঃ যারা গড়েছে এবং যাদের অর্থব্যয়ে গড়া হয়েছে তারা কেউ প্রমীলারাজ্যের বাসিন্দা নন। ফলে এই হাল।

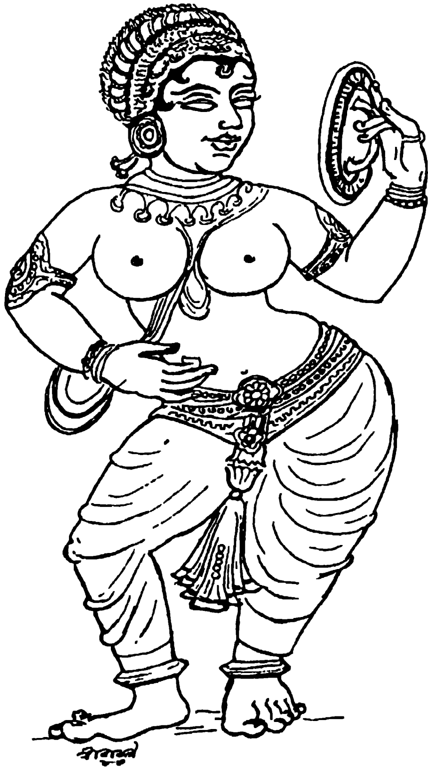


চিত্র 6.1 ব্রোঞ্জের রাজমহিষী
দাক্ষিণাত্য—একাদশ শতাব্দী
[১]

নারীমূর্তিগুলিকে প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করা চলে। প্রথমত, নারী যেখানে একক। শুধু রমণীসৌন্দর্য বিকশনের জন্যই যাদের উপস্থাপনা। দ্বিতীয়ত, নারী যেখানে মিথুনাচারের উপাদান। পুরুষমূর্তির পরিপূরকরূপে।

শিল্পশাস্ত্রে এই দুই জাতির নারীকে পৃথক নামে চিহ্নিত করা হয়নি। উত্তর ভারতে নাগর শিল্পশাস্ত্রে একক রমণীমূর্তিকে কোথাও বলা হয়েছে 'সুরসুন্দরী', কোথাও 'নায়িকা'। দ্রাবিড় ও বেশর শিল্পশাস্ত্রে তাদের 'ভামিনী' নামেও উল্লেখিত হতে দেখেছি। আবার মিথুনমূর্তির 'বেটার-হাফ'কেও নাগর-শিল্পে দেখি 'নায়িকা' নামে অভিহিত হতে।

আমরা তাদের দুটি পৃথক নামে চিহ্নিত করতে চাই। একক নারীমূর্তিকে আমরা 'সুতনুকা' নামে অভিহিত করতে ইচ্ছুক। সুতনুকা আদিমতমা ইতিহাসস্বীকৃতা দেবদাসী। সে নাকি দেবদিন্ন নামে এক যুবকের প্রেমে পাগলিনী হয়ে ওঠে! মিথুনমূর্তির অংশীদারকে সেক্ষেত্রে



চিত্র 6.2 সুতনুকা (হস্তিনী)/দাক্ষিণাত্য

'নায়িকা' বলা চলে। একই রসমণ্ডিত হলেও তারা নানা ভাবের, নানা ভঙ্গির। তাদের কয়েকটি সাধারণ ধর্ম অনস্বীকার্য : প্রত্যেকেই সুগঠিততনু, সুন্দরী, পূর্ণযৌবনা এবং প্রচুর বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা। পাশ্চাত্যে যাকে 'ন্যুড' বলে তারা তা হতে জানে না! নিরাবরণী হলেও তারা নিরাভরণী হয় না।

সুতনুকা-মূর্তিতে দীর্ঘাঙ্গী, কম্বুকণ্ঠী, ক্ষীণকটি, সাবলীল তন্বঙ্গীকে পেয়েছি। উদাহরণস্বরূপ মহাবলীপুরম্ থেকে যে কোন নারীরত্নকে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। আমরা এখানে একাদশ শতাব্দীতে গড়া দক্ষিণ ভারতের জনৈকা রাজমহিষীর ব্রোঞ্জমূর্তির আলেখ্য দিয়েছি (চিত্র 6.1)। এই দীর্ঘাঙ্গিনী পাশ্চাত্য শিল্পের বত্তিচেলির স্টাইলের কথা স্মরণে এনে দেয়।

অপরপক্ষে সুতনুকা কিছু স্থূলাঙ্গিনী হওয়াও বিচিত্র নয়। বেলুর, হালেবিড, হাম্পি বা বিজয়নগরের সুতনুকার দল বেশ হৃষ্টপুষ্ট। প্রাকৃত-ভাষায় যাকে বলে 'গতরে-সতরে'! হয়তো সমকালীন দর্শকের রুচি এই রকমই ছিল। পাশ্চাত্যেও রুবেন্স, আঙরে, দেলাক্রয়ের অনেক নারী এই রকম 'ভলাপচুয়াস'। দাক্ষিণাত্যের বেলুর মন্দির থেকে এক প্রসাধনরতা সুতনুকাকে উদাহরণস্বরূপ পরিবেশন করা হয়েছে (চিত্র 6.2)।

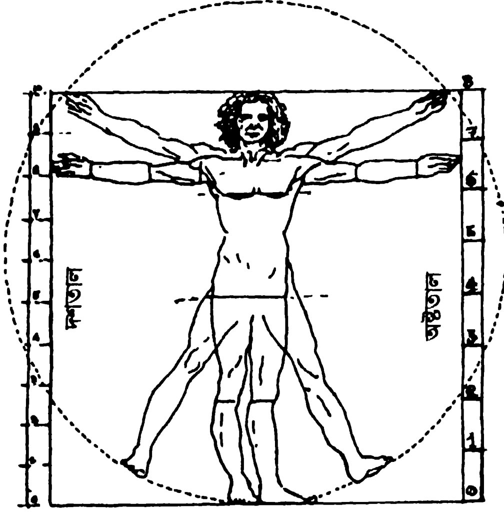
একক সুতনুকার দল বিভিন্ন ভাবের দ্যোতক। সবাই আদিরসের সম্পদ হলেও বিভিন্ন ধারার হতে পারে। কিন্তু সেসব কথা পরে। তার আগে, আসুন, আমরা সন্ধান করে দেখি—শিল্পাচার্যরা নরনারীর মূর্তি গড়ার প্রসঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপজোপ সম্বন্ধে কী নির্দেশ দিয়ে গেছেন। চেন্নাই আর্ট স্কুলের শিল্পশিক্ষক আচারকার তাঁর *রূপদর্শিনী* গ্রন্থে বলেছেন:

> "অতীতে ভারতীয় শিল্পাচার্যেরা মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আনুপাতিক মাপজোপ খুব ভালই বুঝতেন। শাস্ত্রে তার নির্দেশ রেখে গেছেন এবং নিজেরাও সে নির্দেশ মেনে চলতেন।"[1]

আমরা কিন্তু প্রাচীন ভারতের কোনো শাস্ত্রে সেই আনুপাতিক মাপজোপের নির্দেশ খুঁজে পাইনি।

গ্রীসের শিল্পাচার্যরা তাঁদের দেবকুলের মূর্তি গড়ে গেছেন সুগঠিত ব্যায়ামবীরের অনুকরণে। দেবীমূর্তি গড়া হত সমকালীন সুন্দরীশ্রেষ্ঠা 'হেটেরা'দের মডেল করে। গ্রীসে আদিগুরু মানবদেহের অনুপাত সম্বন্ধে কী নির্দেশ

রেখে গেছেন, আদৌ কিছু বলেছেন কিনা, তা আমরা জানি না। তাঁরা শুধু আদর্শ দেহধারী নর ও নারীর হুবহু প্রতিরূপ গড়ে গেছেন।



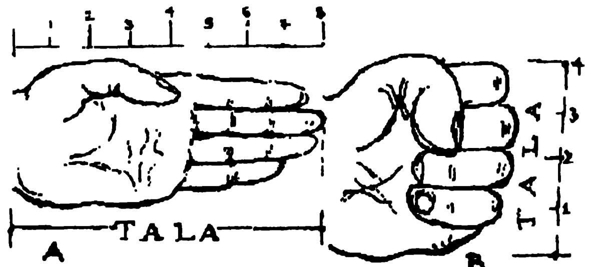
চিত্র 6.3 লেঅনার্দোর স্কেচবুক থেকে মনুষ্যদেহের মাপজোপ

অপরপক্ষে ভারতীয় শিল্পাচার্যের দল দেবদেবীর মূর্তি গড়তে চেয়েছেন 'দিব্যদেহে'—স্থূলতাবর্জিত অপার্থিব ভাবরূপে গড়া অবয়বে। দেহের চতুঃসীমায় দেহাতীত প্রাণস্বরূপের সন্ধানেই তাঁদের অভিযাত্রা। তাই তাঁরা মানবদেহের হুবহু অনুকরণ করতে চাননি। করেননি। ভারতশিল্পের মূলতত্ত্ব : এই প্রপঞ্চময় জড়-চেতন জগতে প্রাণস্বরূপের অন্বেষণ। ভারতশিল্পে শিল্পীর মানসিক উপলব্ধির স্থান জড়বাদী প্রতিরূপায়ণের উর্ধ্বে। শিল্পাচার্য ভেঙ্কটচলনম্ বলছেন:

> "The Indian approach to art, like his approach to life, is more synthetical than analytical, more idealistic than realistic, more vertical than horizontal. Hence his vision and understanding of nature, and therefore, of art as well, is different from those of Western nations. His is the mountain-view of things and, therefore, from a metaphysical plane. He never mistakes the trees for the forest."[2]

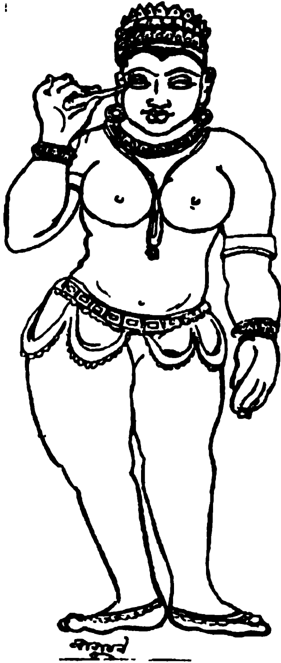
[শিল্পের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি—যেমন জীবনের প্রতিও—মূলত সাংশ্লেষিক, সমন্বয়প্রত্যাশী; বিশ্লেষণধর্মী নয়। সে অভীপ্সা আদর্শবাদীর, বাস্তববাদীর নয়। তা স্বতই উর্ধ্বান্বেষী, সমভূমিক নয়। তাই প্রকৃতির প্রতি এবং শিল্পের প্রতিও তার দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধি পাশ্চাত্যদেশীয়দের থেকে স্বতন্ত্র। জীবনকে সে গরুড়াবলোকনে দেখতে চায়; ফলে তার দৃষ্টি আধিবিদ্যক হতে পারে না। প্রত্যক্ষদর্শনের বৃক্ষরাজী তার 'বৃহদারণ্যক' উপলব্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।]

প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র হাতড়ে মাপজোপের বিষয়ে কোনও শ্লোক উদ্ধার করতে না পারলেও অনায়াসে ধরে নেওয়া যায় যে, মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আনুপাতিক হিসাব সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁদের সৃষ্টিই 'ফলেন পরিচীয়তে'। তাঁরা এই আনুপাতিক মাপজোপকে বলতেন 'প্রমাণ।' গ্রীক ও রোমক শিল্পাচার্যরা কোনো নির্দেশ দিয়ে গেছেন কিনা তাও জানি না। এ বিষয়ে বিশ্বশিল্পে প্রথম গবেষক হিসাবে দেখছি সেই 'মাস্টার অব অল ট্রেডস, জ্যাক অব নান'কে। লেঅনার্দো দ্য ভিঞ্চি (1452-1519)। দণ্ডায়মান মনুষ্যদেহকে তিনি প্রথমে চার *সমান ভাগে বিভক্ত করলেন। দেখিয়ে দিলেন,* নরনারী নির্বিশেষে তার জননেন্দ্রিয়টি সম্মুখদৃশ্যে থাকে অর্ধেক উচ্চতায়। আরও প্রমাণ করলেন—দুদিকে দুই হাত প্রসারিত করে দিলে বাহুদ্বয়ের বিস্তার তার উচ্চতার সমান। উচ্চতার চার ভাগকে যদি এবার সমান আটভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে (1) তার মাথা (চিবুক থেকে সম্মুখদৃশ্যে করোটির শীর্ষবিন্দু) দেহদৈর্ঘ্যের অষ্টমাংশ, (2) তার স্তনবৃন্তদ্বয়ের দূরত্বও তাই (চিত্র 6.3)।



চিত্র 6.4 ভারত শিল্পে তাল ও মান

রেনেসাঁ যুগের অন্যান্য দিকপালেরা এই সূত্রটি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছিলেন। জ্ঞাতসারে, অথবা অজ্ঞাতসারে। পরবর্তী য়ুরোপীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলাও এই নির্দেশের অনুসারী।



চিত্র 6.5 প্রসাধনরতা হস্তিনী/হালেবিড

প্রাচীনযুগে গ্রীক ও রোমক শিল্পে দৈর্ঘ্যের কী একক ছিল জানি না। অনুবাদ-সাহিত্যে তা খুঁজে পাইনি। প্রাচীন ভারতে দৈর্ঘ্যের কী একক ছিল তার হদিস পেয়েছি, অধ্যাপক ব্যাশামের অমূল্য গ্রন্থটি (*The Wonder that was India*) থেকে।

হিসাবটা এই জাতির :

8 যব (যবের দানার বিস্তার) = 1 অঙ্গুলি (প্রায় 19 মিমি)

12 অঙ্গুলি (পূর্ণবয়স্ক মানুষের আঙুলের বিস্তার) = 1 বিতস্তি (বিঘৎ) [প্রায় 23 সেমি]

2 বিতস্তি বা বিঘতে = 1 হস্ত (কনুই থেকে অনামিকার শেষ বিন্দু = 46 সেমি।

4 হস্তে (বা হাত) = 1 দণ্ড (1.44 মিটার)

কিন্তু এ হিসাব শিল্পের নয়। বাজারের। পণ্যবস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শিল্পশাস্ত্রে দৈর্ঘ্যকে সম্পূর্ণ ভিন্ন :কোণ থেকে বিচার করা হয়েছে। ফুট-ইঞ্চি, মিটার, সেন্টিমিটার, বিঘৎ-হস্তের মাপজোপের হিসাবকে শিল্পচার্যরা আদৌ পাত্তা দেননি। তাঁরা নরমূর্তি গড়ার প্রাথমিক চিন্তায় শিল্পবস্তুকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। শিল্পের বিষয়বস্তু, ভাব এবং পরিবেশ্য রসের বিচারে পুরুষমূর্তির সেই পাঁচটি শ্রেণি হল: *নর, ক্রুর, অসুর, বাল* (বালক) *এবং কুমার* (কিশোর)। প্রত্যেক শ্রেণির ভিন্ন ভিন্ন মাপ ও মড়ুল (module) নির্ধারিত করা হল। মাপের একক হল *তাল* আর *মান।* কোনো কোনো শিল্পাচার্যের নির্দেশ শিল্পীর প্রসারিত করমুষ্টির দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক '*তাল।*' এক্ষেত্রে তালকে আটটি সমদৈর্ঘ্যের 'মান'-এ বিভক্ত করা হল। অপর একদল শিল্পগুরুর নির্দেশানুসারে 'এক তাল' হচ্ছে শিল্পীর বদ্ধমুষ্টি। সেক্ষেত্রে চার মানে এক তাল (চিত্র 6.4)।



চিত্র 6.6 প্রসাধনরতা শঙ্খিনী/খাজুরাহো

আরও বলা হল মনুষ্যদেহ বা *নরমূর্তি হবে অষ্টতাল।* ক্ষেত্রবিশেষে দশতাল। *ভৈরবমূর্তি বা নৃসিংহমূর্তিকে* হিংস্রতা বা বীরত্বব্যঞ্জক হতে হবে। তার মাপ হবে দ্বাদশতাল। রাবণ, মহিষাসুর প্রভৃতি *অসুরমূর্তি* আরও বড় হবে: ষোড়শতালের। অপরপক্ষে বামন বা কুমারমূর্তির



চিত্র 6.7 ভাবাবিষ্টা চিত্রিণী/খাজুরাহো

দৈর্ঘ্য হবে স্বল্পতর তালের। শিল্পশাস্ত্রে এ নির্দেশ থাকলেও এবং অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বাগেশ্বরী বক্তৃতায় এ-কথা জানালেও মন্দিরভাস্কর্যে দেখছি এ নির্দেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানা হয়নি। মন্দিরগাত্রে মহিষাসুরের মূর্তি নরমূর্তির দ্বিগুণ মাপের নয়।

নারীমূর্তির তাল-মানের পৃথক নির্দেশ কোথাও পাইনি। তবে রূপ, রস ও ভাবের বিচারে শিল্পাচার্যরা নারীমূর্তিকে নানান শ্রেণিবদ্ধ করেছেন।

ঋষি বাৎস্যায়নের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা হতে পারে :

বাৎস্যায়ন নর ও নারীকে প্রধান চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন— তাদের দেহাকৃতি, স্বভাব, রুচি, যৌন-প্রবণতা প্রভৃতির বিচারে। আমাদের বিশ্বাস বাৎস্যায়নের অনুসরণ করে মন্দির ভাস্কর্যে নারীমূর্তিগুলি গঠিত হয়নি। তারা নিতান্ত ঘটনাচক্রে বাৎস্যায়নের বর্ণনা মোতাবেক। কিন্তু ইদানীংকালের কিছু কিছু শিল্পসমালোচক বলেছেন যে, নাগর ও দ্রাবিড় শিল্পে মন্দির ভাস্কর্যের নারীমূর্তিগুলি *কামশাস্ত্র*-বর্ণিত নারীর চিত্ররূপ। এ প্রতর্কের সপক্ষে ও বিপক্ষে নানান যুক্তির অবতারণা করা যায়। তার পূর্বে বরং *কামসূত্র* বর্ণিত চতুঃশ্রেণির নারীরূপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও সম্ভাব্য আলেখ্য উপস্থাপিত করা দরকার :

(1) **হস্তিনী** : বাৎস্যায়নের বর্ণনা অনুসারে, এ নারী নাতিদীর্ঘ, কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া, ঘটকুচবক্ষা এবং নিবিড় নিতম্বিনী। স্বভাবে ভোজনবিলাসী, অলসপ্রকৃতির এবং শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে 'নাশুতোষ!' বেলুর মন্দিরের এক প্রসাধনরতা হস্তিনীর আলেখ্য পূর্বেই উপস্থাপিত হয়েছে (চিত্র 6.2)। সেটি ছিল ত্রিভঙ্গঠামের। এখানে একটি আভঙ্গঠামের হস্তিনীমূর্তির আলেখ্য দেওয়া গেল (চিত্র 6.5)। নাগর শিল্পে, অর্থাৎ বিন্ধ্যাচলের উত্তরে, এ জাতীয় হস্তিনী মূর্তি সহজলভ্য নয়, অথচ যেকোন কারণেই হোক দাক্ষিণাত্যে এদের যথেষ্ট কদর: বেলুর, হালেবিড, বিজয়নগরে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

(2) **শঙ্খিনী** : দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী, আলুলায়িতকুন্তলা, মধ্যক্ষামা, স্বভাব-চঞ্চলা, চপলা। রক্তবর্ণের পুষ্প ও রক্তিম বস্ত্র এদের প্রিয়। বাৎস্যায়নের মতে শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে



চিত্র 6.8 পদ্মিনী, আলোকচিত্র/কোনার্ক

এদেরও তৃপ্ত করা কঠিন; কিন্তু প্রকৃত প্রেমিকের ধৈর্যের কাছে এরা ধরা দেয়। খাজুরাহোর জগদম্বা মন্দির থেকে যে শঙ্খিনীর মূর্তিটি এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে (চিত্র 6.6) সে যেন নিজের দেহকাণ্ডকে দুই সমকোণে পাক



চিত্র 6.9 পদ্মিনী, রেখচিত্র/কোনার্ক

মেরেছে। হস্তিনীদ্বয়ের তুলনায় এর আভরণ অপেক্ষাকৃত অল্প। বাৎস্যায়নও তাই বলেছেন: শঙ্খিনী নারীর অলঙ্কারে আসক্তি অল্প।

(3) **চিত্রিণী** : এরাও তন্বঙ্গী, তবে শঙ্খিনীর মতো দীর্ঘকায়া নয়। দৃষ্টি প্রশান্ত, অশঙ্কিত। সে হিসাবে চিত্রিণী হচ্ছে এণাক্ষী। খাজুরাহোর নাগর শিল্প থেকে আমরা এখানে যে চিত্রিণীকে উপস্থাপিত করেছি (চিত্র 6.7) তাকে মনে হয় কিছু চিন্তান্বিতা। এর বামহস্তের মুদ্রায় হরিণীর ব্যঞ্জনা। এরা সচরাচর অলঙ্কারপ্রিয়, সঙ্গীত এবং নৃত্যবিদ্যায় পটিয়সী। বিশ্বাসপ্রবণ, মধুরস্বভাবা।

(8) **পদ্মিনী** : অপরূপ রূপবতী এই তিলোত্তমা। প্রতিটি প্রত্যঙ্গ ত্রুটিহীন, মানানসই; চোখ, নাক, মুখ, ভ্রূ, কেশপাশ—বক্ষ, কটিদেশ, হস্তপদাদির মধ্যে কোনো কিছু বেমানান নয়। বাৎস্যায়ন বলছেন—এরা পদ্মগন্ধ। তাদের দেহে পদ্মের সুগন্ধ পাওয়া যায়। সঙ্গীত ও কাব্যপাঠের দিকে আগ্রহান্বিতা। ধর্মপরায়ণা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারিণী।

এতক্ষণ এই চারপ্রকার সুতনুকার গাত্রবর্ণের কথা কিছু বলা হয়নি—প্রস্তরমূর্তিতে সে প্রসঙ্গ অবান্তর। বাৎস্যায়ন যা বলেছেন, এবং গুহাচিত্রে যা দেখেছি—বিশেষ করে অজন্তায়—তা থেকে মনে হয়েছে: হস্তিনীর গাত্রবর্ণ যে কোনো প্রকার হতে পারে, শঙ্খিনী সচরাচর চম্পকগৌরবর্ণা, কিছুটা হরিদ্রাভ-শুভ্রা। চিত্রিণী যদি 'ময়নাপাড়ার' সুতনুকা না হয় তাহলে অন্য কথা, সচরাচর তার কালো হরিণ চোখটাই এত বেশি নজরে পড়ে, যাতে মনে প্রশ্নই ওঠে না : ও ফর্সা না শ্যামলা? আর পদ্মিনী? সে 'দুগ্ধালক্তকবৎ'! তার দেহ থেকে শুধু পদ্মগন্ধই নয় একটা জ্যোতির বিচ্ছুরণ অনুভূত হয়।

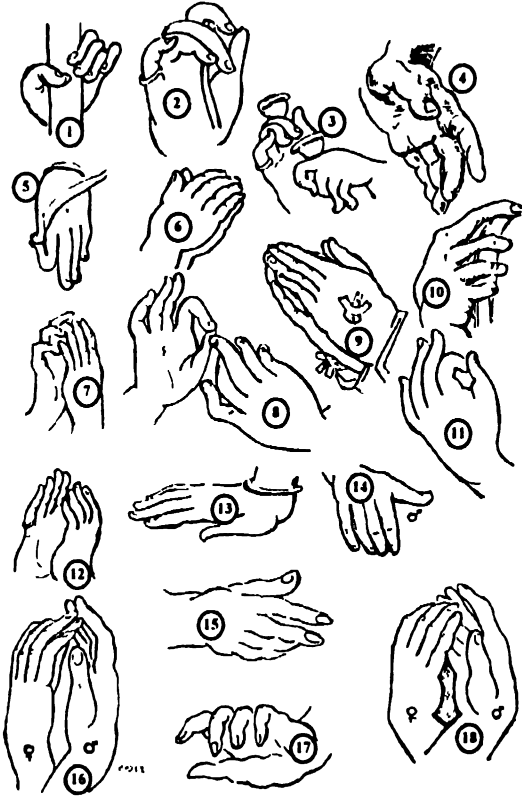
ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে: ব্যতিক্রমই নিয়মের পরিচায়ক। সে রকম দুটি ব্যতিক্রম আমার নজরে পড়েছে অজন্তায়। প্রথম গুহাবিহারে: 'কৃষ্ণা রাজকন্যা' আর সপ্তদশের অলিন্দে 'কৃষ্ণা অপ্সরা।' কালো? তা তারা যতই কালো হোক: দুজনেই পদ্মিনী।

কোনার্ক-সূর্যমন্দিরের পোতালে দণ্ডায়মানা একটি সুতনুকা পদ্মিনীর আলোকচিত্র (চিত্র 6.8) এবং একই নারীর একটি রেখচিত্র (চিত্র 6.9) এখানে দেওয়া গেল। আলোকচিত্রে এর মহিমা ধরা দেবে না ভেবে ঝোলা থেকে স্কেচখাতাখানা বার করেছিলাম। কিন্তু ক্যামেরার লেন্সে যে ধরা দেয়নি অপটু চিত্রকরের খাতাতেও সে ধরা দিল না।

মন্দির ভাস্কর্যে পদ্মিনী-সুতনুকার দর্শন পাওয়া ভাগ্যের কথা। বাস্তব জীবনে তদোধিক। মজা হচ্ছে, সেই সুদুর্লভ পদ্মিনী নারীও কিন্তু—কী মন্দির-ভাস্কর্যে, কী বাস্তব জীবনে—একই ভাবে প্রতীক্ষা করে চলে প্রকৃত সমজদারের। বারে বারে তার কপালে জোটে সমজদারের পরিবর্তে কামার্ত দানব। সীতার ক্ষেত্রে যেমন রাবণ, পদ্মিনীর যেমন আলাউদ্দিন খিলজি, রূপমতীর যেমন আধম খাঁ, রূপমঞ্জরীর যেমন কাশীনরেশ! মনে পড়ে যায় প্রিয় একটি উর্দু শায়েরীর কথা। যা অনেকবার অনেক গ্রন্থে শুনিয়েছি আপনাদের। আবার শোনাই। ক্লাসিকাল কোন কিছুই পুনরুক্তিদোষদুষ্ট হয় না।

"হাজারো সালসে নার্গিস
আপনা বে-নূরীপ্যে রোতি হ্যয়,
বড়ি মুশকিলসে হোতি হ্যয় চ্যমন্‌মে দিদাবর পয়দা।।"

[হাজার বছর ধরে নার্গিস আপন প্রতিবিম্বের পানে চেয়ে কাঁদতে থাকে; কারণ প্রকৃত দরদী সমজদার আসেন সহস্রাব্দে মাত্র একবার।]



চিত্র 6.10A
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পে : হস্ত

কোনো কোনো শিল্পবিশারদের মতে ওই চতুঃশ্রেণির অতিরিক্ত আরও কয়েক জাতির নারীর কথা বলেছেন বাৎস্যায়ন তাঁর *কামশাস্ত্রে।* যথা: ঘোটকী, মৃগী, শশকী ইত্যাদি। কিন্তু তারা কামশাস্ত্রের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হতে পারে, মন্দির ভাস্কর্যের আলোচনায় নয়।

হস্তপদাদির রূপায়ণ :

ভারতীয় শিল্পে, ভাস্কর্যে এবং আলেখ্যে, হস্তপদের রূপায়ণ প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে দুটি স্কেচ আপনাদের সামনে রাখছি। একটি হাতের ও একটি পায়ের নমুনা। দুটিতে মিলিয়ে আছে আঠারো দুগুণে ছত্রিশটি নমুনা। প্রত্যেকটিই কোনো না কোনো বিখ্যাত ভাস্কর্য বা চিত্র থেকে অনুকৃত। শুধু ভারতীয় শিল্প নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের।

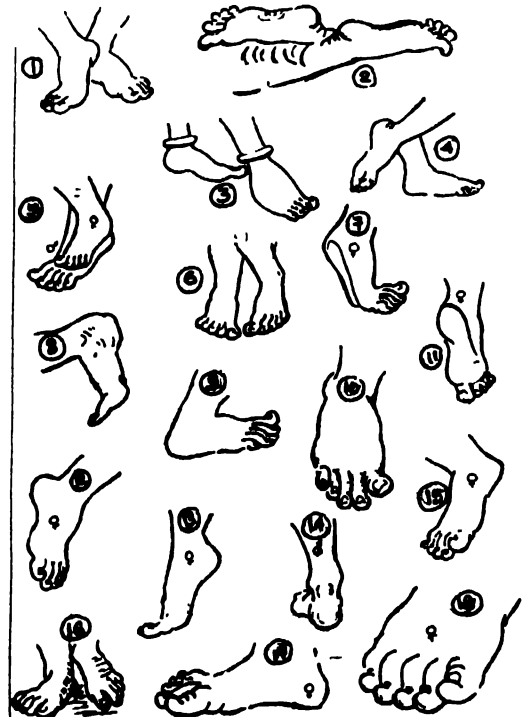
পাশ্চাত্য-দর্শন বলে: Gnothi Seauton অর্থাৎ Know Thyself; প্রাচ্যদর্শনও একই সুরে বলে: 'আত্মানং বিদ্ধি।' সুতরাং আপনি কতটা দক্ষ সমজদার তা প্রথমে সমঝে নিন। ছত্রিশটা স্কেচের মধ্যে যেগুলিকে মনে হবে পাশ্চাত্যশিল্পের অথবা বাস্তব নরনারীর হাত-পা দেখে আঁকা সেখানে একটা টিক্-চিহ্ন (✓) দিন; আর যেগুলিকে মনে হবে ভারতীয় শিল্প থেকে অনুকৃত সেগুলিতে একটা করে তারকাচিহ্ন (*) দিন। (চিত্র 6.10A এবং B)।

সর্বমোট 36টি ছবির মধ্যে আপনি যদি 20টি অথবা তার বেশি সঠিকভাবে চিহ্নিত করে থাকেন তাহলে ধরে নিতে পারেন শিল্প সমজদারিতে আপনি 'পাস' করেছেন। 25 বা তার বেশি পেলে আপনি ফার্স্ট-ক্লাস অনার্স পেয়েছেন। আর ছত্রিশে যদি ছত্রিশ পেয়ে যান? তাহলে আপনি হয়ে যাবেন সহস্রাব্দ-চিহ্নিত সেই দুর্লভ 'দিদাবর'।

যার প্রত্যাশায় পদ্মিনী সুতনুকা প্রতীক্ষমাণা!

[পাঠিকা! মার্জনা করবেন—এটা 'স্ট্যাগ পার্টির' রসিকতা, আপনার জন্য নয়]

লক্ষ্য করলে দেখবেন, পাশ্চাত্য নমুনা বাস্তবানুগ, আলোকচিত্রধর্মী। অপরপক্ষে ভারতীয় নমুনায়



চিত্র 6.10B
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পে : চরণ

কোণাগুলিকে মসৃণ ও মোলায়েম করে দেওয়া হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে এমনও মনে হতে পারে যে, অ্যানাটমিক্যাল ড্রইং-এ ভ্রান্তি হয়েছে। যেমন 6.10B চিত্রে 3 নং উদাহরণটি। এটি অজন্তার সপ্তদশ বিহারে অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত চিত্র: *'প্রসাধনরতা রাজকন্যা'র* চরণ। আমরা হুবহু নকল করার চেষ্টা করেছি চিত্র 6.13-এ। রাজকন্যার কটিদেশের শীর্ণতা দেখে মনে পড়ে যায় কবি কৃত্তিবাসের বর্ণনা: 'মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি!' কাব্যে বা চিত্রেই শুধু এমনটা হয়, বাস্তবে হয় না। তাছাড়া ওর দক্ষিণ চরণের ড্রইং? সেটা যেন শিশুসুলভ চপলতা।



চিত্র 6.11 আচারকারকৃত প্রসাধনরতা রাজকন্যার (অজন্তা) অনুকৃতি



চিত্র 6.12 আলোচ্য ভঙ্গিমায় বাস্তব ন্যুড

এই রাজকন্যারই দুটি চরণ আঁকা হয়েছে চিত্র 6.10B-তে তিন নম্বরে।

বিগত শতাব্দির ত্রিশের দশকে হায়দ্রাবাদ নিজামের অর্থানুকূল্যে অজন্তা চিত্রের বিষয়ে আট খণ্ডের একটি প্রামাণ্য অ্যালবাম ও চিত্র সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেন নিজামের শিল্প-অধিকর্তা ডঃ গুলাম ইয়াজদানি। সেই গ্রন্থে এই চিত্রটির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে ইয়াজদানি বলেন: "স্পষ্টতই মেয়েটির কটিদেশ ও দক্ষিণচরণের রেখাঙ্কনে শিল্পীর অনবধানতায় বিরাট ভ্রান্তি রয়ে গেছে।"



চিত্র 6.13 অজন্তাচিত্রের অনুকৃতি

অনেক পরে মাদ্রাজের (বর্তমান চেন্নাইয়ের) প্রখ্যাত অধ্যাপক শিল্পী আচারকর একটি অপূর্ব চিত্রের অ্যালবাম প্রকাশ করেছিলেন : *রূপদর্শিনী।* তিনি তাঁর গ্রন্থে এই রাজকুমারীর একটি অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কটিদেশের কৃশতা বেশ কিছু কমিয়ে আনেন, এবং দক্ষিণ চরণের তথাকথিত ভ্রান্তিটা সংশোধন করে দেন। অধ্যাপক আচারকরের চিত্রের একটি অনুকরণই আমরা প্রকাশ করেছি চিত্র 6.11-এ। আচারকার অবশ্য স্পষ্টাকারে একথা বলেননি যে, তিনি অজন্তাচিত্রের অনুলিপি করেছেন, কিন্তু রেখাঙ্কন থেকে সে কথা সুস্পষ্ট। পরিবর্তন বা ত্রুটি সংশোধন যেটুকু করেছেন তা জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে তা জানার উপায় নেই।

এরপর যে-কথা বলব, তাতে আপনারা অবাক হতে পারেন: আচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর *ভারতশিল্পে ষড়ঙ্গ*-তে (বিশ্বভারতী প্রকাশনা) বলেছেন অজন্তার ওই বিশ্ববন্দিত চিত্রে রাজকুমারীর কটিদেশ বা দক্ষিণ চরণের রেখাঙ্কনে কোনো ভ্রান্তি নেই। শুধু তাই নয়, তিনি 'ভারতশিল্পে' ওই দক্ষিণ চরণের চিত্রটিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রূপে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর গ্রন্থে অঙ্কিত করেছেন (চিত্র 6.21)।

এ প্রসঙ্গে আমরা পরে ফিরে আসব, কিন্তু তার পূর্বে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সেই গ্রন্থে এবং পরবর্তী বাগেশ্রী বক্তৃতামালায় 'ভারতশিল্পে ষড়ঙ্গ' বিষয়ে যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

ভারতশিল্পে ষড়ঙ্গ :

বাৎস্যায়নের *কামসূত্র*-এর আলোচনা প্রসঙ্গে মধ্যযুগের মহাপণ্ডিত যশোধর একটি শ্লোক শুনিয়েছেন যা শিল্পীমাত্রেই জানেন :

> ''রূপভেদঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
> সাদৃশ্যম্, বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রম্ ষড়ঙ্গকম্।।[4]



চিত্র 6.14 বজ্রপাণি, রুদ্র ও বীভৎস রস, সিকিম

[রূপের বিভিন্ন প্রকারভেদ, বিভিন্ন অংশের মাপ, ভাব, লাবণ্যযোজনা, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ—চিত্রের এই ছয়টি অঙ্গ।]

যশোধর-বর্ণিত এবং অবনীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যাত শিল্পের ওই ছয়টি অঙ্গকে একটু ঘনিষ্ঠভাবে চিনে নেওয়া দরকার:

(1) *রূপভেদ:* 'একবর্ণা' ব্রহ্ম 'বহুধা' হয়ে বিশ্বপ্রপঞ্চে ছড়িয়ে আছেন। প্রতিটি রূপের প্রকাশভঙ্গিমা পৃথক। অঙ্কিত চিত্রে সেই রূপভেদ যেন স্পষ্ট হয়।

(2) *প্রমাণ:* 'রূপভেদ' প্রমাণিত হবে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক আনুপাতিক মাপজোকে। তাকেই বলি : 'প্রমাণ'।

(3) *ভাব:* চিত্রে প্রদর্শিত বিষয়বস্তুর যে ভাবরূপ।

(4) *লাবণ্যযোজনা:* চিত্রবস্তুতে শ্রী, সুষমা অর্থাৎ মাধুর্যের যোজনা।

(5) *সাদৃশ্য:* দর্শনগ্রাহ্য উপমার মাধ্যমে বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা।

(6) *বর্ণিকাভঙ্গ:* শিল্পীর 'এলেম' বা অঙ্কনদক্ষতা।

ভারতশিল্পের এই ছয়টি অঙ্গ হচ্ছে শিল্পচেতনার বুনিয়াদ। ফলে এদের বিষয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা অপরিহার্য।



চিত্র 6.16 পীয়েতা
ক্রুশাবতরণের পর মৃত সন্তান ক্রোড়ে মা-মেরী
মিকেলাঞ্জেলো



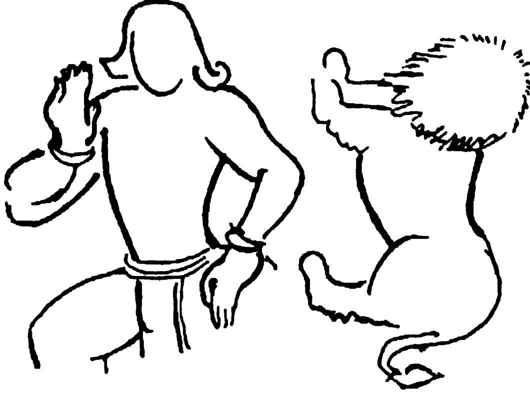
চিত্র 6.15 মহিষমর্দিনী/বৈতাল, ভুবনেশ্বর

আসুন একে একে আলোচনা করা যাক :

(1) **রূপভেদ** : পরিদৃশ্যমান জগতপ্রপঞ্চের একটি বিশেষ অংশ—যে বিষয়বস্তুকে শিল্পী বেছে নিয়েছেন—দর্শক যেন বুঝতে পারেন: সেটা কী? বিড়াল আঁকলে সেটিকে যেন মেষ বা ছাগ বলে ভ্রম হবার অবকাশ না থাকে। নর আঁকলে যেন ভ্রমক্রমে তাকে না মনে হয়: বানর!

(2) **প্রমাণ** : রূপভেদের বুনিয়াদ হচ্ছে প্রমাণ। বিভিন্ন আনুপাতিক মাপজোকের সুষ্ঠু প্রয়োগ। নর ও বানরের পার্থক্য শুধুমাত্র তার পশ্চাদেশের একটি সুদীর্ঘ প্রত্যঙ্গের অস্তি-নাস্তির ওপর নির্ভরশীল নয়। হাত-পা, মুখ, দেহের আপেক্ষিক মাপ থেকেই যেন বুঝে নেওয়া যায়—কোনটি রাম ও কোনটি রামদাসের আলেখ্য।

(3) **ভাব** : চিত্রের বহিরঙ্গের প্রকাশ হল 'রূপভেদ' এবং 'প্রমাণে'। তার অন্তরঙ্গের ব্যঞ্জনার প্রয়োজনে এল: ভাব। ভাবের কিছুটা প্রকাশ তার ভঙ্গিতে। কিছুটা বুঝে নিতে হবে হৃদয় দিয়ে। চিত্রিণীর (চিত্র 6.7) ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় মেয়েটি চিন্তান্বিতা। অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির

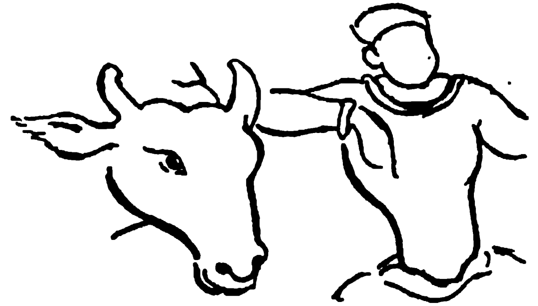


চিত্র 6.17 সাদৃশ্য—'সিংহকটি'

আলেখ্যে (চিত্র 6.19) প্রশান্তির প্রকাশ, আবার বজ্রপাণির চিত্রে (চিত্র 6.14) রুদ্রভাব প্রকট। এসব ভাব সহজবোধ্য। কিন্তু কোনো কোনো শিল্পে একই সঙ্গে দ্বৈতভাব প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। কৃষ্ণনগরে আমার মায়ের পূজার ঘরে একটি অষ্টধাতুর নৃসিংহদেবের মূর্তি ছিল। আমার পিতৃদেব 1894 সালে বিহারের মতিহারীতে একটি সৌধের বুনিয়াদ খননের সময় তিনটি অষ্টধাতুর মূর্তি আবিষ্কার করেন। দুটি প্রদান করেন সাহিত্য পরিষদকে, একটি আমার মাকে। সেই তৃতীয় মূর্তিটি একশ বছরের ওপর আমাদের বাড়িতে পূজিত হচ্ছেন। এটি দ্বাদশ শতাব্দিতে নির্মিত নৃসিংহদেবের হিরণ্যকশিপু বধের দৃশ্য। দেবতার মুখ হিংস্র অথচ শান্ত! তাঁর শ্বদন্ত বিকশিত অথচ মুখে প্রশান্ত হাসি। রুদ্র, ভয়ানক এবং শান্ত রসের সে এক অপূর্ব সহাবস্থান!

ঠিক একই জিনিস পেলাম ভুবনেশ্বরের বৈতাল মন্দিরে। এখানে মহিষমর্দিনীর মূর্তিতে যুগপৎ দ্বৈতভাব। মা মহিষকে বধ করছেন। ফলে ঘাতকের রূপায়ণে ভয়ানক ও রুদ্ররস থাকবেই। কিন্তু তার সঙ্গে একইভাবে ফুটে উঠেছে কারুণ্য এবং শান্ত রস। কারণ মা জানেন, মহিষাসুর সজ্ঞানে তাঁকে শত্রুরূপে ভজনা করতে চেয়েছিল, তাঁর হাতে মরতে চেয়েছিল। তাছাড়া মহিষাসুরের অত্যাচারিত প্রজাবৃন্দকেও মা এভাবে মুক্তি দিচ্ছেন (চিত্র 6.15)।

এই জাতীয় একাধিক রসের একত্র উপস্থাপনা সুদুর্লভ শিল্প। কিন্তু এটাকে ভারতশিল্পের অনন্য বৈশিষ্ট্য বলতে পারি না। পাশ্চাত্য শিল্পেও এমন dichotomy বা দ্বিবিধভাবের সহাবস্থান আমরা দেখেছি। যেমন, মিকেলাঞ্জেলোর অমর শিল্পসৃষ্টি *পিয়েতা।* বর্তমানে সেটি ভ্যাটিকান সিটিতে চার্চের প্রবেশপথে বিরাট বুলেটপ্রুফ কাচের ঘরে সুরক্ষিত! প্রকাণ্ড মর্মরমূর্তি। শিল্পী *'পিয়েতা'* বানাতে পরিকল্পনা ছকলেন: মৃতসন্তানকে ক্রোড়ে নিয়েছেন মা মেরী। শিল্প-ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় সরিক *প্রমাণ* প্রতিবাদ করে: তা গড়া যায় না। সাহিত্যে তা বর্ণনা করা যায়, ভাস্কর্যে নয়। কারণ ক্রুশবিদ্ধ যীশু ত্রিশ বছরের পূর্ণবয়স্ক যুবাপুরুষ, শিশু নন আর। মাতৃক্রোড়ে তাঁকে উপস্থাপিত করা যায় না। মিকেলাঞ্জেলো ভ্রূক্ষেপ করলেন না। সৃষ্টির আনন্দে যা অসম্ভব তাই গড়লেন (চিত্র 6.16)। আশ্চর্য! একটুও বেমানান হল না। মাতৃক্রোড়ে একটুও স্থানাভাব ঘটল না। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। মাতৃমূর্তিতে শিল্পী ফুটিয়ে তুললেন অপূর্ব দ্বৈতভাব। চরমতম আঘাতে করুণরসের সঙ্গে পরমতম মহিমার শান্তরস। মা মেরী জানেন, যীশু বিশ্বমানবের মুক্তির জন্যই প্রাণদান করেছেন। শহিদের সে মৃত্যু মৃত্যুঞ্জয়ী!



চিত্র 6.18 সাদৃশ্য—'গোমুখকাণ্ড'

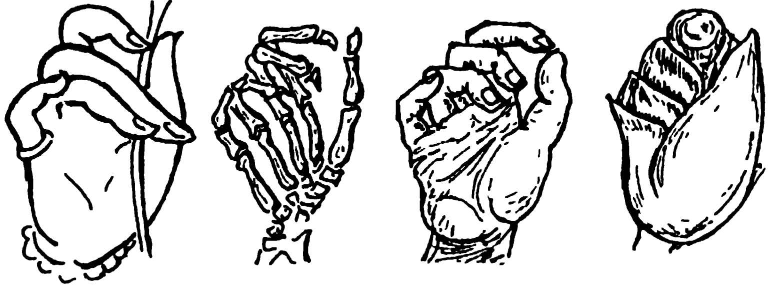
ভাবের প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> "কুটিরটি আধখানা লিখিলাম,* আর আধখানা গাছের আড়ালে ঢাকিয়া দিলাম। কুটিরের ভঙ্গি বা ভাবের প্রকাশের দিকটা

* আচার্য অবনীন্দ্রনাথ 'আঁকিলাম' লেখেননি। তাঁর কাছে তুলি আর কলম সমার্থক। তাই 'লিখিলাম'।

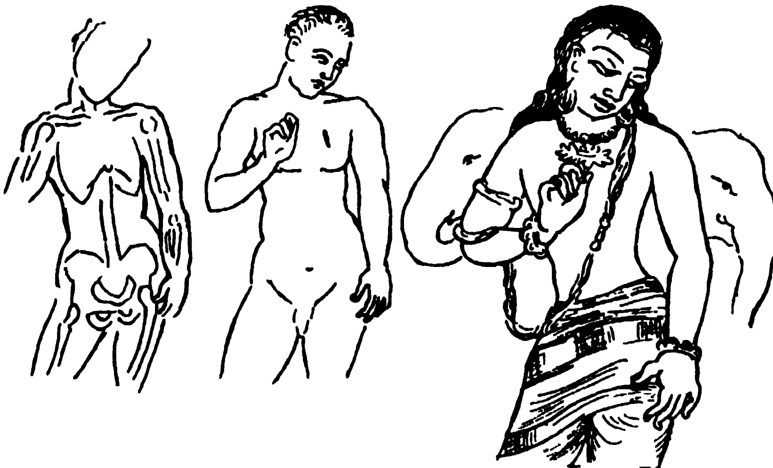
আমাদের প্রত্যক্ষ দেখাইল, আর গাছের আড়ালে ঢাকা কুটিরের প্রচ্ছন্ন অংশটুকু ইঙ্গিতে জানাইতে লাগিল কুটিরের ভিতরের নানাভাব, কুটিরবাসীর নানা লীলা। সেদিকটায় আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি নানা অলিখিত বস্তু।"[5]

এই যে কিছুটা ঢাকা, কিছুটা প্রকাশ্য এখানেই ভাবের রাজ্যে শিল্পীর সঙ্গে দর্শকের ঐকতান। প্রকৃতিও একজন উঁচুদরের শিল্পী। তাই ভাবের রাজ্যে তার অনেক রহস্য আজও দুর্জ্ঞেয়। আর সেজন্যই 'মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর দেখায় বসুন্ধরা।'—সবটা যদি হাট করে খুলে দেখাতো তাহলে আমরা অনেক রহস্য-রোমাঞ্চ থেকে বঞ্চিত হতুম!



চিত্র 6.20 সাদৃশ্য—'চম্পক করমুষ্টি'

(4) **লাবণ্যযোজনা** : লাবণ্যযোজনার প্রকৃত স্বরূপটি প্রকাশিত হয়েছে শ্রীরূপগোস্বামীপাদের একটি শ্লোকে :



চিত্র 6.19 অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি 'করিকুম্ভনিভ ভুজদ্বয়'

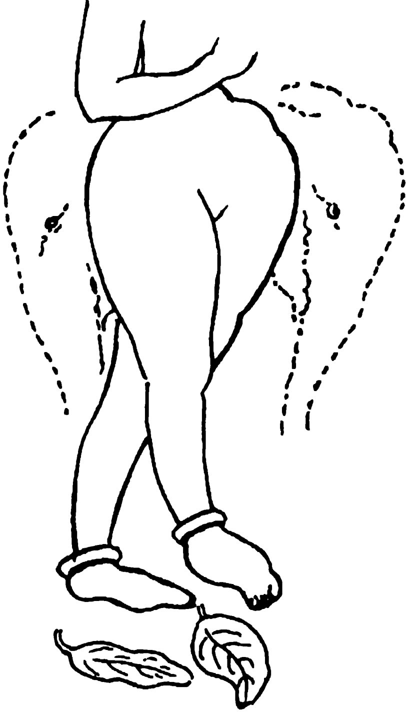
মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে।।

কী অপূর্ব ব্যাখ্যা! শ্রীরূপ বলছেন, নিটোল একটি মুক্তার আকার, আর আয়তন বোঝানো কঠিন কাজ নয়, তার বর্ণের তত্ত্বও তুলিতে ধরা সম্ভব; কিন্তু মুক্তাটির সর্বাঙ্গে যে ঢলঢল তরলিত আভা সেটিকে ধরব কী করে? সেই আভাটি যদি শিল্পী ধরতে পারেন তবেই তাঁর মুক্তা আঁকা সার্থক। সেটাই *লাবণ্যযোজনা।*

কিন্তু লবণ না হলে যেমন চলে না, লবণের আধিক্যও তেমনি সুস্বাদু আহার্যটিকে বিস্বাদ করে দিতে পারে। তাই পরিমিতিবোধ লাবণ্যযোজনার মূলকথা। তুলি-কলমের যাদুকর অবনীন্দ্রনাথ তাই বললেন :

"রূপকে যেমন পরিমিতি দেয় 'প্রমাণ' যথোপযুক্ত এবং যথাযথ মনোহর একটি সীমার মধ্যে আনিয়া, তেমনি লাবণ্য পরিমিতি দেয় ভাবের কার্যকে বা ভঙ্গীকে অদ্ভুত ও উচ্ছৃঙ্খল ভঙ্গী হইতে নিরস্ত করিয়া। ভাবের তাড়নায় ভঙ্গী ছুটিয়া চলিয়াছে উন্মত্ত অশ্বের মতো, অসংযত উদ্দাম অসহিষ্ণু, এমনকি অশোভনরূপে প্রমাণের সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া; লাবণ্য আসিয়া তাহাকে শান্ত করিতেছে নিজের মধুর কোমল স্পর্শটি ধীরে ধীরে তাহার সর্বাঙ্গে বুলাইয়া। ভাবের তাড়নায় রূপ যখন শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানকালে দুর্বাসা ঋষির মতো অপরিমিতরূপে হাত-পা নাড়িয়া, দাঁত মুখ খিঁচাইয়া উদ্দণ্ড ভঙ্গীতে দাঁড়াইতে চাহিতেছে, তখনই আমাদের লাবণ্য আসিয়া বলিতেছে: স্থিরোভব। পাগল হইলে যে!......

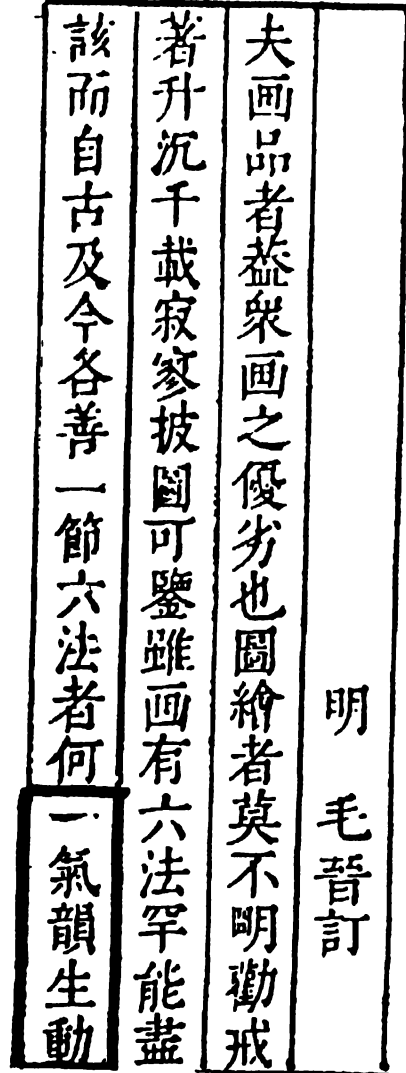
"প্রমাণের বন্ধনে যে কঠোরতাটুকু আছে, লাবণ্যের বন্ধনে সেটুকু নাই; অথচ সেও বন্ধন, সুনিশ্চিত একটি সুকুমার বন্ধন। সে প্রমাণের মতো জোরে রাশ টানিয়ে অশ্বের ঘাড় বাঁকাইয়া দেয় না। কিন্তু তার স্পর্শে অশ্ব আপনি ঘাড় বাঁকাইয়া লয়। ও তালে-তালে পা ফেলিয়া চলে। প্রমাণ



চিত্র 6.21 সাদৃশ্য—'গজগামিনী/পদপল্লব', প্রসাধনরতা রাজকন্যা (অজন্তা)

যেন মাস্টার, বেত মারিয়া সবলে ছাত্রকে সোজা করিতেছে, আর লাবণ্য যেন মা, নানা ছলে ছেলেকে ভুলাইয়া যথেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন।" [6]

(5) সাদৃশ্য : সাদৃশ্য কী? 'সদৃশস্য ভাব ইতি সাদৃশ্য'। কাব্যে যখন কোনো বস্তু বা ব্যক্তির গুণ বিশেষণের দ্বারা প্রকাশ করতে পারা যায় না, তখন আমরা উপমার আশ্রয় নিয়ে থাকি। মেঘান্তরাল থেকে প্রভাতসূর্যের আবির্ভাবে স্কাইলার্কের উচ্ছ্বসিত আনন্দসঙ্গীতের মর্মার্থ বোঝাতে শেলী মালোপোমার সাহায্য নিয়েছিলেন—সূর্যকিরণাহত পূর্ণচন্দ্র, প্রেমবিহ্বলা নায়িকা, অন্ধকারে খদ্যোতের দ্যুতি ইত্যাদি। ভারতীয় শিল্পী—চিত্রকর ও ভাস্কর—একই ভাবে উপস্থাপিত বিষয়ের ওপর উপমার প্রভাব ফেলে থাকেন। তাকেই বলা হয় *সাদৃশ্য*। ভাষায় সাদৃশ্যের সীমারেখা সম্বন্ধে কবি ও পাঠক দুজনেই অবহিত। 'চন্দ্রমুখী' বর্ণনায় পাঠক জানতে চায় না, সে মুখচন্দ্রের ব্যাস কত? ভারতীয় শিল্পীও তেমনি জানেন শিল্পে *সাদৃশ্য* অলঙ্কার ব্যবহার



明 毛晉訂

夫畫品者蓋衆畫之優劣也圖繪者莫不明勸戒
著升沉千載寂寥披圖可鑒雖畫有六法罕能盡
該而自古及今各善一節六法者何一氣韻生動

চিত্র 6.22 শিল্পষড়ঙ্গের চৈনিক ভাষ্য

করলে কোথায় তাকে সীমায়িত করতে হবে। দর্শকও তা জানেন, বোঝেন।

গল্পে শোনা যায় গ্রীক চিত্রকব জেয়ুক্সিস্ (Zeuxis, 500 খ্রিঃ পূঃ) এমন সুন্দর ও বাস্তবানুগ আঙুর এঁকেছিলেন যে, তাঁর ক্যানভাসে পাখি এসে ঠোকর মেরেছিল। বাস্তবের সঙ্গে চিত্রের এই প্রতিরূপকে কিন্তু আদৌ *সাদৃশ্য* বলে না। চাঁদ কখনো চাঁদের উপমান হতে পারে? কিন্তু চিত্রের সুতনুকাব স্থির চোখ দুটি দেখে যদি মনে হয় সে খঞ্জনপাখির মতো চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে, অথবা তা হরিণীর মতো অপাপবিদ্ধ, তাহলেই বলা যাবে চিত্রের মাধ্যমে 'খঞ্জননয়না' বা 'মৃগনয়না'র *সাদৃশ্য* সার্থক।

কাব্যে পুরুষের দেহকাণ্ড-বর্ণনায় *সিংহকটি* বা *গোমুখকাণ্ড* শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ছবি এঁকে দেখালেন চিত্রশিল্পী কীভাবে এই সাদৃশ্যের ব্যবহার করেন। অজন্তা প্রথম গুহা বিহারের বিশ্ববন্দিত অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি চিত্রে একাধিক *সাদৃশ্যের* প্রয়োগ করা হয়েছে। তাঁব স্কন্ধ ও বাহুদ্বয় 'করিকুম্ভনিভ' এবং 'হস্তিশুণ্ডসদৃশ।'



চিত্র 6.23 সোপান পাদমূলে মাদোনা ও যীশু
মিকেলাঞ্জেলো

তাঁর করমুষ্টি 'চম্পককোরকতুল্য'। চিত্র 6 19 এবং 6.20-তে আমরা প্রথম দুটি সাদৃশ্যের রেখব্যাখ্যা দিয়েছি।

অবনীন্দ্রনাথ অজন্তার প্রসাধনবতা রাজকন্যার চিত্রে (চিত্র 6.21-এ) মনশ্চক্ষে দেখেছিলেন 'গজগামিনী' আর 'পদপল্লবের' সাদৃশ্য।

(6) **বর্ণিকাভঙ্গ :**

ষড়ঙ্গের শেষ অঙ্গটি হচ্ছে *বর্ণিকাভঙ্গ।*

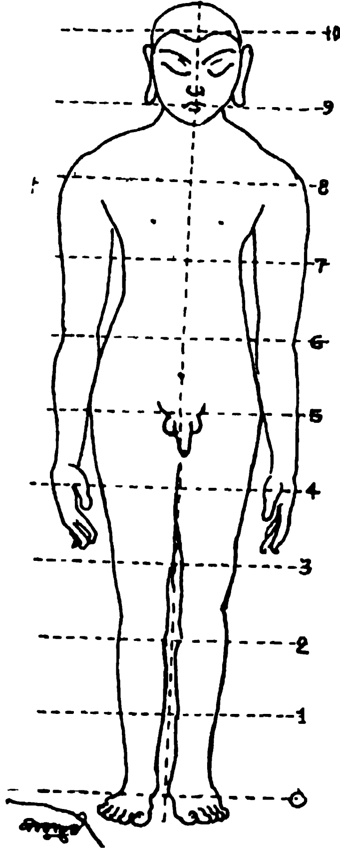
প্রাগ্বর্তী পাঁচটি পাঠই বুদ্ধি দিযে, বোধ দিযে একলব্যের সাধনায় আয়ত্ত করা সম্ভব—তা 'থিওরেটিক্যাল'; কিন্তু শিল্পষড়ঙ্গের এই শেষপাঠ নিতে শিল্পীকে হাতে-কলমে অভ্যাস করতে হবে। ভাস্কর হতে চাইলেঃ ছেনি-হাতুড়ি-পাথর। আর চিত্রশিল্পী হবার বাসনা হলে বঙ, তুলি, ক্যানভাস অথবা পেন্সিল-কলম-কাগজ। ক্রমাগত অভ্যাসে বর্ণিকাভঙ্গের চরিতার্থতা আয়ত্ত কবতে হয।

প্রাচীন চীনা সংস্কৃতিতে — শিল্পষড়ঙ্গ

দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রসঙ্গে পশ্চিমের শিল্পাচার্যরা এ জাতীয় আলোচনা করেননি। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা: চীন মহাখণ্ডে অনুরূপ শিল্পভাবনার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বলা অসম্ভব এ বিষয়ে কে কাকে প্রভাবিত করেছে, কারণ দুটি ভাবনাই প্রায় সমকালীন। এমনও হতে পারে যে চীন ও ভারত পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত না হয়েও সমান্তরাল মৌলিক সিদ্ধান্তে এসেছে। মানবসভ্যতার প্রাগুষাযুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে—অস্ট্রিয়ায়, মিশরে, মেসোপটেমিয়ায়, সিন্ধুনদ উপত্যকায় যেমন পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত না হয়েও আদিম শিল্পীরা মাতৃদেবীর (Mother Goddess) মূর্তি ধ্যানে লাভ করে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন।

খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে দেখছি, চীনা পণ্ডিত শি-হো (Shih-ho) শিল্পশাস্ত্রের ওপর একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ রচনা করেন; *কু-হুয়া-পিন্ লু (Ku-Hua-Pin Lu)*। শি-হো তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, চীনাশিল্পের ছয়টি অঙ্গ, তার ভিতর তিনটি আরোপিত, বাহ্য বা জাগতিক আর বাকি তিনটি শিল্পীর অনুভবে, তার আন্তর প্রতীতিতে জন্মলাভ করে। চিত্র 6.22তে আমরা চীনা পণ্ডিতের গ্রন্থের সেই পৃষ্ঠাটি 'যদৃষ্টং' মুদ্রিত করেছি। 'কেদারের' সংগৃহীত ক্যাশমেমো দেখে *'বৈকুণ্ঠ'* যেমন বলেছিলেন, 'এ যে আদত চীনা ভাষা দেখছি।' আপনারা বুঝুন না বুঝুন আমার মতো তাই

বলবেন এটুকু আশা রাখি। ফরাসী শিল্পসমালোচক অধ্যাপক ডি' মোরান্টস (De' Morants) এই চীনা গ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় অনূদিত করেন এবং জি. সি. হুইলার্স তার



চিত্র 6.24 সমভঙ্গ—জৈন তীর্থঙ্কর দশতালমূর্তি

ইংরেজি অনুবাদ করেন। শেষোক্ত গ্রন্থটি থেকে আপনাদের জন্য চীনা ও ভারতীয় চিন্তার সমান্তরালতার বিষয়ে সামান্য ইঙ্গিত রাখা গেল।

ছয়টি চীনা শিল্প-অঙ্গ যথাক্রমে:

(1) *Kufayangpi* : অঙ্কিত বিষয়বস্তুতে বাস্তব প্রতিচ্ছবি [*রূপভেদ*]

(2) *Ying wu siang hing* : বিষয়বস্তু রূপায়ণের জন্য নির্ভুল মাপজোক [*প্রমাণ*]

(3) *Ki Yun sheng tung* : প্রাণচেতনায় আত্মার প্রকাশ [*ভাব*]

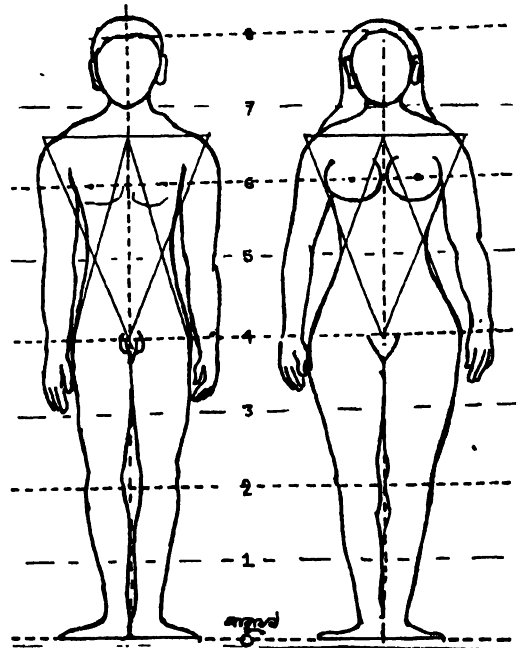
(4) *Sui lei fu tsai* : বর্ণের মাধ্যমে চিত্রের মর্মবিকশন [*লাবণ্যযোজনা* এবং *সাদৃশ্য*]

(5) *King Ying wei Ch'i* : শিল্পানুসারী রেখবিন্যাস [*সাদৃশ্য* এবং *লাবণ্যযোজনা*]

(6) *Ch'um mui Sie* : নির্ভুল প্রয়োগবিদ্যা [বর্ণিকাভঙ্গ]।

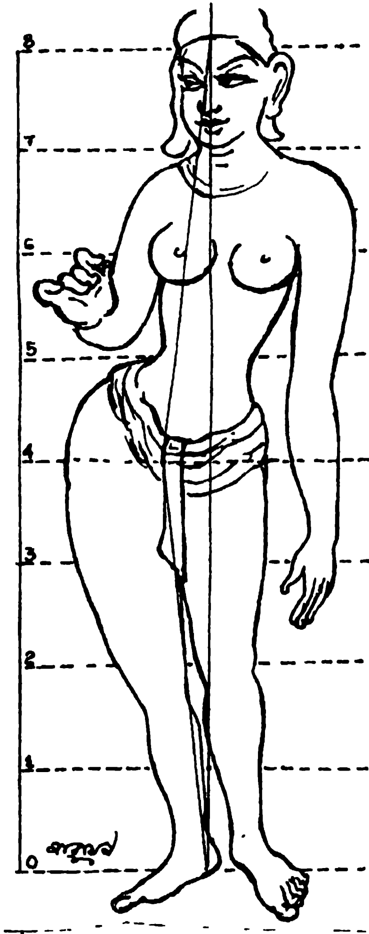
স্বীকার করি, জ্যামিতিক উপপাদ্যের মতো অর্থাৎ দুটি সমবাহু ত্রিভুজের মতো ভারতীয় ও চীনের চিন্তাধারা খাঁজে-খাঁজে মিলে যায়নি। সেটা আমরা প্রত্যাশাও করিনি। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে দুই সমকালীন শিল্পাচার্য যে পৃথকভাবে যথাক্রমে ভারতে ও চীনখণ্ডে বসে শিল্পের ষড়ঙ্গের কথা চিন্তা করেছিলেন এটাই কি যথেষ্ট বিস্ময়কর নয়?

চীনা আচার্য দেখা যাচ্ছে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন বর্ণিকাভঙ্গের ওপর। সম্ভবত সহস্রাব্দের ধারাবাহী চীনা হরফ-কুশলতা বা ক্যালিগ্রাফির জন্যই এই প্রবণতা। অপরপক্ষে ভারতীয় শিল্পাচার্য অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন : সাদৃশ্যে। তার হেতু সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায় যে, যেহেতু যশোধর ছিলেন সংস্কৃত ক্লাসিকাল



চিত্র 6.25 সমভঙ্গে নর ও নারী, অষ্টতাল

যুগের পণ্ডিত, তাই কালিদাস-ভবভূতি-শূদ্রক প্রভৃতির অনবদ্য উপমাগুলি তাঁর শিল্পমনে হয়তো প্রভাব বিস্তার করেছিল। ক্রমে ভারতীয় চিত্রকর ও ভাস্করেরা '*সাদৃশ্য*' অঙ্গটির ওপরেই বেশি জোর দিতে থাকেন। পাশ্চাত্যে এ জাতীয় চিন্তা কোন শিল্পীর অনুভবে কাজ করেনি।



চিত্র 6.26 আভঙ্গঠাম/অষ্টতাল

কিন্তু না। বোধহয় আমাদের এ সিদ্ধান্তটি ঠিক হল না। চিত্র ও ভাস্কর্যের বাস্তব সীমাবদ্ধতা অস্বীকার করে ভাবসমন্বয়ের ক্ষেত্রে পশ্চিমখণ্ডের কোনো কোনো ব্যতিক্রমী শিল্পী '*সাদৃশ্য*' অলঙ্করণকে অপূর্ব দক্ষতায় রূপায়িত করেছেন। একাধিক ক্ষেত্রে এবং সজ্ঞানে। এগুলি 'অ্যাকসিডেন্টাল আর্ট' হতে পারে না। পশ্চিমী শিল্পসমালোচকেরা শিল্পের এই ষড়ঙ্গের বিষয়ে সম্যক অবহিত না থাকায় সমালোচনা গ্রন্থে এই গুণময়তার যথাযথ প্রতিফলন অনুপস্থিত। উদাহরণস্বরূপ কিশোর মিকেলাঞ্জেলোর গড়া একটি অর্ধোৎকীর্ণ ভাস্কর্যের কথা বলা যেতে পারে। শিল্পী তাঁর ভাষায় এটির নামকরণ করেছিলেন : Madonna della scala। বঙ্গানুবাদে যা : '*সোপান সীমান্তে মাদোনা*' (চিত্র 6.23)। সম্ভবত এটিই 'মাস্টার' (উভয় অর্থেই) মিকেলঞ্জেলোর প্রথম শিল্পসৃষ্টি। তাঁর বয়স তখন ষোলো।

বাস-রিলিফে মাদোনা সিঁড়ির পাদমূলে একটি বেদীর ওপর বসে আছেন। তাঁর ক্রোড়ে শিশু যীশু মাতৃদুগ্ধ পানরত। সিঁড়ির কয়েকধাপ ওপরে বালক জন 'ব্যালাসট্রেড' ধরে খেলা করছে। নিতান্ত ঘরোয়া কম্পোজিশন। জীবনের এই প্রথম শিল্পসৃষ্টিতে কিশোর ভাস্কর একাধিক প্রতীকময়তার আশ্রয় নিয়েছেন। শিল্পরাজ্যে কয়েকটি অনুদ্ঘটিত দ্বারও উন্মোচন করে দিয়েছেন। প্রথম কথা, শিশু-যীশুকে দেখছি পশ্চাৎদৃশ্যে। সম্ভবত সমগ্র শিল্পের ইতিহাসে লক্ষ লক্ষ যীশুমূর্তির ভিতর এটাই প্রথম 'ব্যাক-ভিয়ু'। শুধু প্রথম কেন? একমাত্রও হতে পারে! আমি তো আমার অভিজ্ঞতায় অন্য কোনো মহারথীর গড়া যীশুর পশ্চাৎদৃশ্যের কথা মনে করতে পারছি না। দ্বিতীয় কথা, বালক জনের দুই হাত। তাঁর দেহ এবং সিঁড়িঘরের একটি সোপান মিলিতভাবে ক্রস্ বা ক্রুশচিহ্নের প্রতিরূপ সৃজন করেছে! আর মনে হচ্ছে—মা মেরী যেন তাঁর ডানহাতের কনুই দিয়ে ক্রসটিকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন।

যীশুজননী শিশুকে স্তনদানকালে তো প্রফুল্লই থাকবেন, কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে তিনি ওই প্রতীক ক্রুশচিহ্নটির দিকে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে আছেন। মা-মেরী কি কোনো অলৌকিক ক্ষমতায় তিনদশক পরের কোন মর্মান্তিক ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রত্যেক্ষ করছেন? যেভাবে প্রসাধনরতা রাজাকন্যার বামচরণ 'অ্যানাটমি'কে অস্বীকার করছিল প্রায় সেভাবেই শিশু যীশুর ডান হাতের 'বাইসেপ' মাংসপেশী বাস্তবতাকে অস্বীকার করছে। মাতৃদুগ্ধপানে অভ্যস্ত শিশুর 'বাইসেপ' অমন পরিপুষ্ট হয় না। কিশোর ভাস্কর কি ইঙ্গিতময়তার মাধ্যমে জগত্রাতার মানসিক ক্ষমতার পরিচয় দিতে এমন তির্যক একটি পথ বেছে নিলেন? চতুর্থত, যীশু এখনো জগত্রাতা হয়ে ওঠেননি।

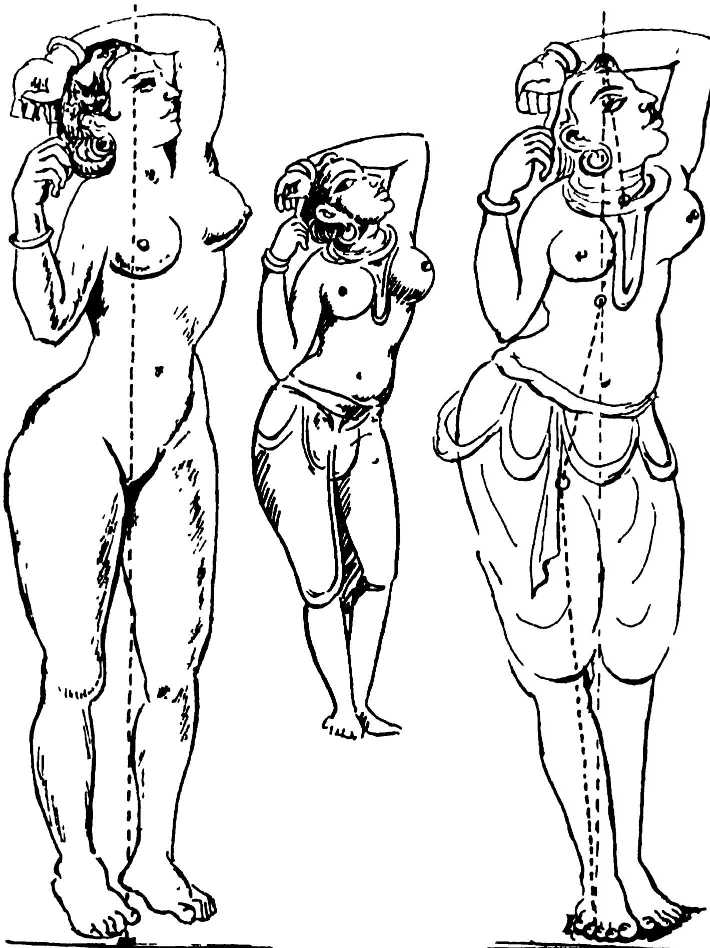
তিনি শিশুমাত্র। যেদিন শিশু 'যীশু' হবেন সেদিন মা-মেরীও হয়ে যাবেন জগজ্জননী। সেদিন তাঁর মাথায় দেখা দেবে রত্নচ্ছটা বা 'হ্যালো'। শিল্পী কি সেই ঘটনার একটা পূর্বাভাস দিয়েছেন মায়ের ঘোমটায়—যা পুরোপুরি এখনো 'হ্যালো' হয়ে ওঠেনি!

স্বীকার করি, এ সবই হয়তো আমাদের কল্পনা—এমনকি আপনারা একটা বিশেষণ যোগ করে বলতে পারেন 'কষ্ট'কল্পনা! কিন্তু দর্শক হিসাবে আমাদেরও তো শিল্পের কিছুটা গড়বার অধিকার আছে? তাই কেন স্বীকার করে নেব কিপ্‌লিঙের সেই 'সিনিক্যাল ম্যাক্সিম' : দ্য টোয়েন শ্যাল নেভার মীট!

শিল্পের জগতে, দর্শনের রাজ্যে এবং নন্দনতত্ত্বে পুব আর পশ্চিম বারে বারে একাত্ম হয়েছে, মিলিত হয়েছে—বুদ্ধে, প্লেটোয়, যীজাসে, ম্যাক্সমূলারে, বিবেকানন্দে, রোমা রোলাঁয়, রবীন্দ্রনাথে, অরবিন্দে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে 'মাদার গডেস্‌' অনুভাবনায়। এমনকি কিপলিঙও শেষমেশ প্রত্যাশা করতে বাধ্য হয়েছিলেন : প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মননরাজ্যে একাত্ম হয়ে যাবে।

মন্দিরভাস্কর্যে সুতনুকার শ্রেণিবিভাগ :

বাৎসায়ন রচিত কামশাস্ত্রে নায়িকাদের শ্রেণিবদ্ধতা অনুসারে আমরা মন্দিরে একক নারী-ভাস্কর্যের কিছু আলোচনা ইতিপূর্বেই করেছি। কিন্তু সে আমাদের আরোপিত চিন্তাধারা। শিল্পশাস্ত্রে এই সুতনুকা-মূর্তির ভঙ্গি, ঠাম, ইত্যাদির নির্দেশ ও বর্ণনা আছে, অথচ তাদের শ্রেণিবদ্ধভাবে সজ্জিত হতে দেখিনি। কিন্তু এজাতীয় নির্দেশ নিশ্চয় কোথাও না কোথাও ছিল, কারণ ভারতের বিচ্ছিন্ন দূরতম প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন যুগে একই জাতের, একই ভঙ্গির, একই চিন্তাধারায় জারিত মূর্তি রূপায়িত হতে দেখেছি। একই পরিকল্পনায়। যেমন: *শালভঞ্জিকা, অলসকন্যা, প্রসাধনরতা* প্রভৃতি। হাজার মাইল এবং হাজার বছরের দূরত্বে একই পরিকল্পনা!



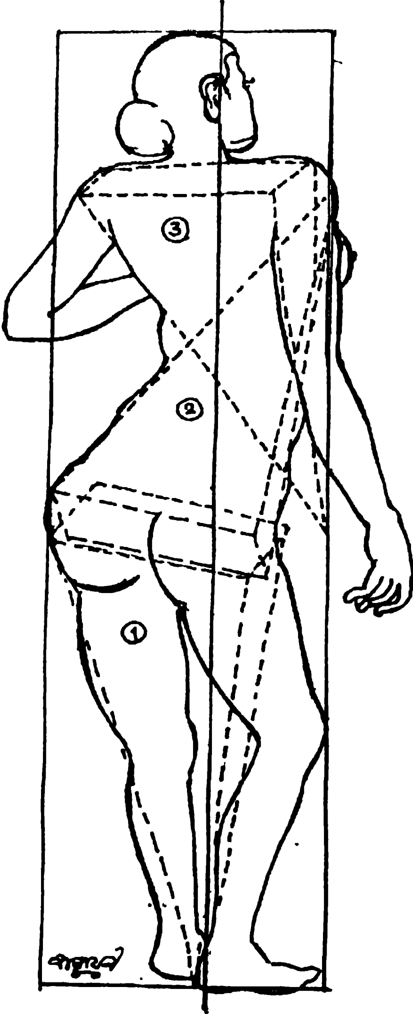
চিত্র 6.27 ত্রিভঙ্গঠাম

অবনীন্দ্রনাথ মূর্তির বিভিন্ন 'ভঙ্গ' বা 'ভঙ্গির' বিচার করেছেন। সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব; কিন্তু তার পূর্বে এই জাতের একক সুতনুকা-মূর্তিগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা অপরিহার্য :

(1) একক পুরুষের তুলনায় একক নারীমূর্তির সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। ক্ষেত্রবিশেষে—যেমন কোনার্কের নাটমন্দির—প্রতিটি পুরুষের অনুপাতে অন্তত বিশটি স্ত্রীলোকের মূর্তি!

(2) সুতনুকা-মূর্তির উপস্থাপনের উদ্দেশ্য প্রায় সর্বত্রই নারী সৌন্দর্যের প্রতি শ্রদ্ধা বা আসক্তি। এগুলি কোনো ধর্মীয়

নির্দেশ বা শাস্ত্রীয় অনুশাসনে গড়া হয়নি। আশ্চর্যের কথা: পশ্চিমখণ্ডে রেমব্রান্ট যে অনুভাবনায় তাঁর প্রৌঢ়া পরিচারিকার ন্যুড এঁকেছেন (চিত্র 5.33) অথবা রোদ্যাঁ যে শিল্পচিন্তায় অশীতিপরা বৃদ্ধার ন্যুড গড়েছেন (চিত্র 5.34) তেমন কোনো চিন্তা ভারতীয় ভাস্করকে দেড় দু-হাজার বছরের ভিতরে একবারও উদ্বুদ্ধ করেনি! দেবদাসীরা বৃদ্ধা হয়ে গেলেও মন্দিরে আশ্রয় পেত, পেনশন পেত, তাদের বলত 'জোগতি'। তারা পরবর্তী জমানার যৌবনবতী দেবদাসীদের রূপসজ্জায় সাহায্য



চিত্র 6.28 জটিল ত্রিভঙ্গ (ত্রিমাত্রিক মূর্তিতে)

করত, ফুল তুলত, মালা গাঁথত, মন্দির মার্জন করত। তেমনি কোনো প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা 'জোগতি'র মূর্তি কোনো



চিত্র 6.29
কবরীবন্ধনরতা
খাজুরাহো



চিত্র 6.30
নূপুরনিষ্কাশণরতা
খাজুরাহো

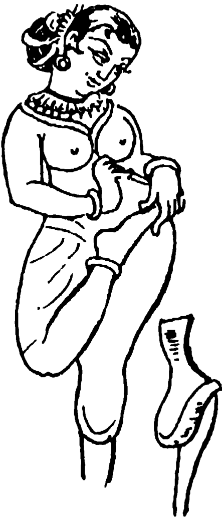
ভাস্কর কোথাও গড়েছেন বলে জানি না। ভারতীয় শিল্পীর এই ব্যর্থতায় ব্যথা পেয়েছি।

(3) লক্ষ্য করে দেখা গেছে, একক নারীমূর্তির অধিকাংশই—প্রায় নব্বই শতাংশ—দণ্ডায়মানা। শয়নে তারা অভ্যস্তা নয়, এমনকি বসতেও যেন জানে না! প্রেমপত্র রচনাকালে, প্রসাধনকালে, চুল বাঁধার সময়ে তারা বসে না। এমনকি পায়ে কাঁটা ফুটলেও তারা বকের মতো এক পায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে অপর পায়ের কণ্টক উন্মোচন করে। এই বৈশিষ্ট্যের একটি সম্ভাব্য হেতুর আলোচনা আমরা কোনার্ক মন্দির পরিক্রমাকালে করব।

(4) সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে নবরসের উল্লেখ আছে। শিল্পীরা তার যে কোন একটি বা কয়েকটি রস নির্বাচন করতেন। কাব্যে, সাহিত্যে এই নবরসের নানান শিল্পসৃষ্টি ভারতীয় নান্দনিক অনুভাবনায় প্রতিফলিত। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি সুতনুকার দল বাদবাকি আট-রকমের রসের প্রতি আদৌ আকৃষ্ট নয়। লাঞ্ছিত ভ্রমর

যেমন মুদ্রিত পদ্মের চারপাশে ক্রমাগত ঘুরঘুর করে, মন্দির ভাস্কর্যে সুতনুকার দল তেমনি ক্রমাগত আদিরসের পরিক্রমা করে গেছে। দোষ তাদের নয়, তাদের স্রষ্টাদলের। সম্ভবত স্রষ্টাদেরও নয়, যারা তাঁদের নিয়োগ করেছেন সেই নিয়োগকর্তাদলের।

(5) শৃঙ্গার রসের শেষপ্রান্তে যে মাতৃত্বভাব অনিবার্যভাবে প্রত্যাশিত, মনে হয় সে বিষয়েও ভাস্করদলের অতি সামান্য অংশই সচেতন। শৃঙ্গাররতামূর্তির তুলনায় স্তনদায়িনী মূর্তি নিতান্ত দুর্লভ। শতকরা দুটি বা একটি!



চিত্র 6.31
কণ্টকমোচনরতা
খাজুরাহো



চিত্র 6.32
পত্রলেখিকা
খাজুরাহো

ভঙ্গ-বিচারে শ্রেণিবিভাগ :

অবনীন্দ্রনাথ নরনারী-নির্বিশেষে ভারতীয় ভাস্কর্যে চারপ্রকারের ভঙ্গি বা ভঙ্গের কথা বলেছেন :

(1) **সমভঙ্গ** : মূর্তি যদি দু-পায়ে সমান ভর দিয়ে কেন্দ্রীয় আলম্ব রেখায় দু-পাশে একটুও না হেলে দাঁড়ায়, তবে তাকে বলি সমভঙ্গ। ভারতীয় ভাস্কর্যে বৃহত্তম সমভঙ্গ মূর্তিটি আছে শ্রবণবেলগোলায়। তীর্থঙ্কর গোমতেশ্বর। আমরা চিত্র 6.24-এ একটি দশতাল সমভঙ্গ মূর্তির উদাহরণ দিয়েছি। এটিও এক দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্করের আলেখ্য। চিত্র 6.25-এ দুটি সম উচ্চতার পুরুষ ও নারীর চিত্র দেওয়া হয়েছে। তারা অষ্টতাল, সমভঙ্গে দণ্ডায়মান। চিত্র 6.24-এর সঙ্গে চিত্র 6.25-এর পুরুষ মূর্তিদুটি তুলনা করলেই বুঝবেন দশতাল ও অষ্টতাল হওয়া সত্ত্বেও তাদের



চিত্র 6.33 নর্তকী—ইন্দোনেশিয়া (ম্যুরাল)

অঙ্গপ্রতঙ্গের আনুপাতিক মাপ—প্রোপোর্শান—একই রকম। উভয়েরই জননেন্দ্রিয় দেহদৈর্ঘ্যের অর্ধ-উচ্চতায়, দুজনের স্তনবৃন্ত দুটি একতাল দূরত্বে।



চিত্র 6.34 নর্তকী—অজন্তা প্রথমগুহা (ম্যুরাল)

কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে চিত্র 6.25-এ নর-নারী মূর্তির পার্শ্ববিস্তার ভিন্নপ্রকার। উভয়ের জননেন্দ্রিয়ই ভূতল থেকে চারতাল উচ্চতায়, উভয়ের স্তনবৃন্তই একতাল দূরত্বে, হাঁটু প্রায় দুইতাল উচ্চতায়; কিন্তু



চিত্র 6.35 নর্তকী—খাজুরাহো, ভাস্কর্য

মেয়েটির নিতম্বদেশ সম্মুখদৃশ্যে পুরো দুইতাল, পুরুষটির 1.75 তাল। অপরপক্ষে, পুরুষটির হাতের দৈর্ঘ্য স্ত্রীলোকটি হাতের দৈর্ঘ্যের অপেক্ষা বেশি। এটি সৃষ্টিকর্তার কেরামতি, ভাস্কর বা শিল্পাচার্যের নয়। হেতুটা এই যে, সৃষ্টিকর্তা জানেন: মেয়েটি একদিন জননী হবে। সন্তানকে জঠরে ধারণ করতে হবে; এবং পুরুষটিও স্ত্রী ও সন্তানদের হাত বাড়িয়ে রক্ষা করবে।

(2) **আভঙ্গ** : দুই পায়ে সমানভাবে ভর না দিয়ে মূর্তি যদি একটু হেলে দাঁড়ায় তবে তাকে বলি : আভঙ্গঠাম। এক্ষেত্রে যে পায়ে ভর দেওয়া হয়নি তা ভূস্পর্শ নাও করতে পারে, করলেও বোঝা যায় যে, সে পায়ে দেহভার রক্ষিত হচ্ছে না। মূর্তি একদিকে কতটা হেলবে তার কোনো সুনিশ্চিত নির্দেশ নেই। মোটামুটি তালার্ধ থেকে তালের একচতুর্থাংশ। চিত্র 6.26-এ স্কেল দিয়ে যদি মেপে দেখেন তবে বোঝা যাবে মেয়েটির কটিদেশ (ভূতল থেকে চারতাল উচ্চতায়) একতালের অর্ধেক পরিমাণ হেলেছে। যেহেতু সে অষ্টতাল, তাই বলা যায় তার 'বাঁক'-এর পরিমাণ উচ্চতার ষোড়শাংশ এবং সেই বঙ্কিমতা দেহদৈর্ঘ্যের ঠিক অর্ধেক উচ্চতায়। তার 'ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্স' শিল্পীর কল্পনায় বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে—নিতম্ব এবং দক্ষিণ-উরুর বঙ্কিমতায় গজকুম্ভের সাদৃশ্য আনতে এটা ঘটেছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মূর্তি অর্ধ-উচ্চতায় যতটা হেলেছিল সেটা সে শুধরে নিয়েছে দেহের বাকি অংশে। আভঙ্গ মূর্তির ভ্রূ-মধ্যস্থল সচরাচর পুনরায় কেন্দ্রীয় আলম্বরেখায় প্রত্যাবর্তন করে।

আভঙ্গঠামে মূর্তির সুষমা ও মাধুর্যের বৃদ্ধি ঘটে। সমভঙ্গ যদি 'অ্যাটেনশান', তাহলে আভঙ্গ 'স্ট্যান্ড-অ্যাট-ইজ'। শান্তরস পরিবেশনের পক্ষে আভঙ্গঠাম শিল্পীদের প্রিয়। দাক্ষিণাত্যে অসংখ্য পার্বতীমূর্তির আভঙ্গঠাম পাওয়া গেছে। সারা ভারতে অবলোকিশ্বের মূর্তি সচরাচর আভঙ্গ ঠামে।

(3) **ত্রিভঙ্গ** : ত্রিভঙ্গ-ঠামে সম্মুখদৃশ্যে মূর্তি দুবার বাঁক নেয়, যাতে দেহ সর্বমোট তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়।



চিত্র 6.36 বাদিকা—ঢোলক (আলোকচিত্র) কোনার্ক পোতাল

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ত্রিভঙ্গ-ঠামে মূর্তি মৃণালদণ্ডের মতো অথবা অগ্নিশিখার মতো সাবলীল ভঙ্গিতে বঙ্কিমতাপ্রাপ্ত হয়।'

ত্রিভঙ্গ-ঠামে প্রথম বঙ্কিমতা অর্ধ-উচ্চতায়। দ্বিতীয় বঙ্কিমতা গ্রীবাভাগে। এবার কিন্তু মূর্তির ভ্রূমধ্যস্থল সবসময়ে কেন্দ্রীয় আলম্ব রেখায় প্রত্যাবর্তন করে না। চিত্র 6.27-এ খাজুরাহো মন্দিরের এক সুতনুকাকে দেখা যাচ্ছে। দেখে বোঝা যায় সে দাঁড়িয়েছে unstable equilibrium-এ। বাস্তবে ওভাবে দাঁড়ানো যায় না। আমরা একটি বাস্তব নারীর ন্যুড এঁকেছি। সে ওই ত্রিভঙ্গ ঠামের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার দেহের ভারকেন্দ্র থেকে আলম্ব রেখা টানলে দেখা যাবে যে তা আছে দুই পায়ের মাঝখানে। সে দাঁড়িয়েছে, stable equilibrium-এ।

(4) **অতিভঙ্গ** : অতিভঙ্গ ঠামে মূর্তি দুইএর অপেক্ষা বেশিবার বঙ্কিমতাপ্রাপ্ত হয়। এমন মূর্তি অপেক্ষাকৃত বিরল। চোল-শিল্পের নটরাজ-মূর্তি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। অবনীন্দ্রনাথ বাগেশ্বরী বক্তৃতায় যে ভঙ্গ বা ঠামের বিচার করেছেন তা চিত্রশিল্প এবং অর্ধোৎকীর্ণ (alto-releivo) চিত্রপ্রতিম ভাস্কর্যেই সীমিত। ত্রিমাত্রিক মূর্তির ক্ষেত্রে 'ভঙ্গ' তৃতীয় মাত্রায় (third dimension-এ) হতে পারে। অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক মূর্তি (free-standing statue) যেমন ডাইনে-বামে বাঁকতে পারে তেমনি পারে সামনে-পিছনেও। সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা মূর্তি সম্মুখদৃশ্যে সমভঙ্গ বলে প্রতীয়মান হবে। একে আমরা বলেছি জটিল-ত্রিভঙ্গ ঠামের মূর্তি (চিত্র 6.28)।



চিত্র 6.37 বাদিকা—করতাল (আলোকচিত্র)
কোনার্ক পোতাল

এখানে সম্মুখদৃশ্যে মনে হতে পারে মূর্তিটি সমভঙ্গের। বাস্তবে তৃতীয় মাত্রায়—অর্থাৎ সামনে-পিছনে—মূর্তিটি তিনবার বাঁক নিয়েছে। তত্ত্বটা সহজবোধ্য করতে আমরা তিনটি পিরামিড ওর দেহাবয়বের ওপব প্রক্ষিপ্ত করেছি। প্রতিটি পিরামিডেরই 'বেস' চতুষ্কোণ আয়তক্ষেত্র এবং তুলনামূলকভাবে পিরামিডের উচ্চতা অনেক বেশি। প্রথম পিরামিডের শীর্ষবিন্দু মূর্তির পদতলে, সেটি শেষ হয়েছে নিতম্ব অঞ্চলে। দ্বিতীয়টি নিতম্ব থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে স্কন্ধে, এবং তৃতীয়টি প্রায় মধ্য-উচ্চতা থেকে গ্রীবা অঞ্চলে।

ভাবানুসারী শ্রেণিবিভাগ :

ইতিপূর্বেই বলেছি যে, মূর্তির ভাব বা পরিবেশিত রসের বিচারে মন্দির-ভাস্কর্যের একক মূর্তিগুলির—বিশেষ করে নারীমূর্তির বা 'সুতনুকার'—শ্রেণিবিন্যাসের উল্লেখ শিল্পশাস্ত্রে পাই না। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে, বস্তুত 1970 সালে, দুজন গবেষক, শ্রীসদাশিব নাথ রথ ও শ্রীমতী অ্যালিস বোনার, যৌথভাবে দাবী করেন যে, তাঁরা এ বিষয়ে একটি প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র আবিষ্কার করেছেন। তালপাতার পুঁথি, সংস্কৃতে লিখিত। লেখক অষ্টাদশ শতাব্দীর। নাম : রামচন্দ্র কৌলাচারী। রামচন্দ্র লিখেছেন যে, তিনি পূর্বাচার্যদের রচিত একাধিক পুঁথির সারমর্ম সঙ্কলিত করে তাঁর শিল্পশাস্ত্রটি লিপিবদ্ধ করেছেন। রামচন্দ্রের দাবি তাঁর গ্রন্থের বুনিয়াদ একাদশ শতাব্দীতে রচিত একটি তালপাতার পুঁথি—*শিল্পপ্রকাশ।* ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু হরফ দেবনগরী নয়, স্থানীয় লেখ। গবেষকদ্বয় দাবি করেছেন, তালপত্রের পুঁথিখানি তিনভাগে, তিনটি স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি পুরী মন্দিরের সংগ্রহশালায়। বাকি দুটি অন্ধ্রপ্রদেশে। প্রথমটি ওড়িয়া এবং বাকি দুটি তেলেগু হরফে রচিত কিনা তা বলা হয়নি। অ্যালিস বোনার তাঁদের গবেষণা গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে মূল ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে পারিনি, তবে শ্রীমতী বিদ্যা দাহিজা তাঁর ভারতীয় মন্দির ভাস্কর্য সম্বন্ধে লিখিত গবেষণা গ্রন্থে অ্যালিস বোনারের গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে দেখছি, মূল পুঁথিতে *একক নায়িকাদের* (সুতনুকাদের) ভাবানুষঙ্গ-বিচারে পঞ্চদশভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। যথা :

(i) *তোরণ* : যেখানে মূর্তির পশ্চাতে আছে খিলান
(ii) *মুগ্ধা* : মোহিত হয়ে যাওয়া কিশোরী
(iii) *মানিনী* : অভিমান করেছে যে নায়িকা
(iv) *পদ্মগন্ধা* : পদ্মফুল হাতে নায়িকা
(v) *দর্পণা* : দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখছে
(vi) *দলমালিকা* : পুষ্পমাল্যহস্তা প্রতীক্ষমাণা
(vii) *বিন্যাসা* . চিন্তাযুক্তা, ভাবাবেশে বিহ্বল
(viii) *কেতকীভরণা* : কেতকীপুষ্পে সজ্জিতা



চিত্র 6.38 বাদিকা—করতাল (রেখচিত্র) কোনার্ক-পোতাল

(ix) *মাতৃমূর্তি* : সন্তানক্রোড়ে জননীমূর্তি বা স্তনদায়িনী
(x) *চামরহস্তা* : চামরব্যজনরতা
(xi) *গুণ্ঠনা* : অবগুণ্ঠিতা
(xii) *শুকসারিকা* : পোষা পক্ষীর সঙ্গে ক্রীড়ারতা
(xiii) *নর্তকী* : নৃত্যরতা
(xiv) *নূপুরপাদিকা* : পায়ে নূপুর পরিধান করছে
(xv) *মৃদঙ্গিকা* : মৃদঙ্গবাদিকা

আমরা কিন্তু এই শ্রেণিবিন্যাসে আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারিনি। এই শ্রেণিবিন্যাসে যুক্তিগ্রাহ্য পরিকল্পনার একান্ত অভাব। দ্বিতীয়ত, কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বহুলব্যবহৃত ভাবের আদৌ উল্লেখ নেই। তৃতীয়ত, লেখক কয়েকটি মূর্তির ভাবরূপের গভীরে প্রবেশ করতেই পারেননি। যেমন, *নূপুরপাদিকা।* এই মূর্তির ব্যঞ্জনা পায়ে নূপুর পরিধান করছে নয়, বরং নূপুর খুলে রাখছে। যেমন *পদ্মগন্ধা।* তার অর্থ নায়িকার হাতে পদ্মফুল নয়, সুতনুকার শরীর থেকে পদ্মগন্ধ নির্গত হওয়া। চতুর্থত শুধু মৃদঙ্গ কেন, বাঁশি-খঞ্জনি-করতাল যারা বাজাচ্ছে তারাও কি 'মৃদঙ্গিকা'? কোন্ যুক্তিতে?

আমরা আমাদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে এই নারীমূর্তিগুলির শ্রেণিবিন্যাসের চেষ্টা করেছি।

আমরা প্রাথমিকভাবে মূর্তিগুলিকে দু-ভাগে বিভক্ত করতে চাই :

(A) সংশ্লেষভিত্তিক (Based on Association)
(B) মানসভাবভিত্তিক (Based on Moods)

প্রথমভাগে সাতটি উপভাগ :

(A.1) *প্রসাধনরতা,* (A.2) *অভিসারিকা,* (A.3) *কুসুমপ্রিয়া,* (A.4) *পত্রলেখিকা,* (A.5) *নর্তকী* ও *বাদিকা,* (A.6) *শুকসারিকা,* (A.7) *সন্তানবৎসলা।* নামেই এদের পরিচয়। তবু উদাহরণ সমেত আমরা পরে এর কিছু ব্যাখ্যা দেব।

দ্বিতীয়ভাগে আটটি উপভাগ :

(B.1) *মুগ্ধা* : মোহিত হয়েছে এমন কিশোরী বা তরুণী, প্রথম প্রেমের আঘাতে।

(B.2) *প্রতীক্ষারতা* : বিরহী নায়িকা। দয়িতের প্রতীক্ষায়। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে *শালভঞ্জিকা,* শালশাখায় হাত রেখে প্রতীক্ষারতা;

(B.3) *সেবাব্রতা* : চামরবাদিনী বা পাখা হাতে ব্যজনরতা,

(B.4) *আশ্লেষশয়না* : শায়িতা মূর্তি। অপেক্ষাকৃত বিরল কম্পোজিশন;

(B.5) *মানিনী* : প্রেমিকের ব্যবহারে আহতার অভিনয়। নায়কের বাস্তব অথবা কল্পিত বীতরাগে,



চিত্র 6.39 বাদিকা—খঞ্জনী

(B.6) *অভিমানিনী* : মানিনীভাবে সে অভিনয় করছিল; অর্থাৎ নায়কের ব্যবহারে সে বাস্তবে আহতা হয়নি। এক্ষেত্রে সে সত্যই মর্মাহতা।

(B.7) *সঞ্চারিকা* : ইংরেজিতে যাকে বলে coquettish—অর্থাৎ, বার্নার্ড শ-এর ভাষায় 'a woman who rouses passions she has no intention of gratifying—প্রেমে পড়ার অভিনয় করছে মাত্র;

(B.8) *খণ্ডিতা* Jilted অর্থাৎ দয়িতের বিশ্বাসঘাতকতায় যে বাস্তবে মর্মান্তিকভাবে আহতা।

স্থানাভাবে প্রত্যেকটির নমুনা দেওয়া গেল না, তবু কয়েকটির ব্যাখ্যা করতে কিছু রেখচিত্র দাখিল করা গেল।

প্রসাধনরতা : ইতিপূর্বে পরিবেশিত চিত্র 6.5, 6.6 প্রভৃতি প্রসাধনরতার উদাহরণ। চিত্র 6.11 অজন্তার প্রসাধনরতা রাজকন্যার চিত্রটি অতিবিখ্যাত। চিত্র 6.29-এর দর্পণধারিণীও প্রসাধনরতা। চিত্র 6.29-এ খাজুরাহোর সুতনুকাকে দেখলে মনে পড়ে *শ্যামলীর* পংক্তি—'বাঁধছিল চুল বেণী পাকিয়ে পাকিয়ে কাঁটা বিঁধে বিঁধে'। শৃঙ্গাররতা বিচিত্রঠামে প্রায় একশো আশি ডিগ্রি পাক মেরেছে।

অভিসারিকা : চিত্র 6.30 একটি বিচিত্র উদাহরণ। শ্রীমতী বোনার যাকে *'নূপুরপাদিকা'* বলেছেন আমরা



চিত্র 6.40 বাদিকা—ফ্লুট

তাকে *নূপুরনিষ্কাশনরতা* বলতে চাইছি। লক্ষ্য করে দেখুন, ওর এক পায়ে নূপুর আছে, অন্য পায়ে নেই।

এ মূর্তির একটি বিরাট পশ্চাদপট কাহিনি আছে যা শ্রীমতী বোনার ধরতে পারেননি। ইতিপূর্বে মেয়েটি তার 'ননদিনী রায়বাঘিনী'র প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল। তাই ও অভিসার যাত্রার পূর্বে নিঃশব্দে নূপুর খুলে রাখছে। সে যখন অর্ধপথে তখন ভাস্কর তাঁর মন-ক্যামেরার শাটারটা মুহূর্তের জন্য খুলেছিলেন। তাই ওর এক পায়ে নূপুর! 'একপায়ে-নূপুর' যতগুলি মূর্তি দেখেছি প্রত্যেকটির পশ্চাতে এই অকথিত কাহিনির ব্যঞ্জনা। একমাত্র ব্যতিক্রম ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজমন্দিরের পার্শ্বদেবী 'নিশা-পার্বতী'। তাঁর ক্ষেত্রে কেন একপায়ে নূপুর সে উপকথা *আমার কারুতীর্থ কলিঙ্গে* বলা হয়েছে।

চিত্র 6.31—অভিসারের পরবর্তী পর্যায়ের ঘটনা। এখানে সুতনুকা তার অভিসার-অন্তে *কণ্টকমোচনরতা।* পায়ে কাঁটা বিঁধলে কিছু ব্যথা লাগা স্বাভাবিক। এখানে কিন্তু সেই বেদনার আভাস নেই। মেয়েটি বরং সুখস্মৃতিতেই বিভোর।



চিত্র 6.41 বংশীবাদিনী—খাজুরাহো

নর্তকী : জীমারের *The Art of Indian Asia* থেকে আমরা তিনটি নৃত্যরতা ভামিনী মূর্তির অনুলিপি দিয়েছি। প্রথমটি ইন্দোনেশিয়া থেকে, দ্বিতীয়টি অজন্তা এবং তৃতীয়টি খাজুরাহো থেকে সংগৃহীত (চিত্র 6.33-6.35)।

বাদিকা : কোনারক মন্দিরের দেয়ালে নানান বাদ্যযন্ত্র



চিত্র 6.42 পশ্চাদ্‌দৃশ্য—অজন্তা, বাস্তব, গ্র্যাবাচ

বাদনরতা সুতনুকার মূর্তি সাজিয়ে দেওয়া গেছে চিত্র 6.36 থেকে চিত্র 6.40তে। এগুলির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

চিত্র 6.41 বিষয়ে একটি মন্তব্য করা চলে। ভারতীয় চিত্রে ও ভাস্কর্যে পিছন থেকে আঁকা দৃশ্য বা back-view নিতান্ত দুর্লভ। খাজুরাহোর এই *বংশীবাদিকা* সে হিসাবে একটি ব্যতিক্রমী ভাস্কর্য। এটি অর্ধোৎকীর্ণ ভাস্কর্য (alto-releivo), ফলে এ মূর্তিটিকে সামনে গিয়ে দেখার সুযোগ নেই।

এই সঙ্গে পেছন থেকে আঁকা অজন্তার একটি নারীর রেখচিত্র দেওয়া গেল। মেয়েটি বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনছে। তার দক্ষিণহস্তের মুদ্রায় বিস্ময়ের অভিব্যক্তি। পাশাপাশি আচারকরের *রূপদর্শিনী* থেকে একটি কপি দিয়েছি। একই ভঙ্গিতে J. R. Grabach-এর আঁকা একটি স্কেচও সাজিয়ে দেওয়া গেছে (চিত্র 6.42)।

গ্র্যাবাচের পিছন ফেরা ন্যূডটি দেখলে মনে হয় শিল্পী যেন খণ্ডমুহূর্তের জন্য তার স্ন্যাপশট নিয়েছেন। মেয়েটি পিছন ফিরে আছে বটে কিন্তু যেকোনো মুহূর্তেই সে এ-পাশে ফিরতে পারে। অপরপক্ষে অজন্তাসুন্দরীর পিছন-ফেরা ভঙ্গিটি যেন স্থাবর। মনে হয় যে, একই ভঙ্গিতে প্রহরের পর প্রহর সে প্রভুর উপদেশ শুনতে প্রস্তুত। মাঝখানে আঁকা আচারকারের বাস্তব ন্যূড চিত্রটি দেখলে বোঝা যায় অজন্তাশিল্পী কীভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোণগুলিকে উপেক্ষা করে তার তনুদেহটি মোলায়েম করে তুলেছেন।

* * *

মুসলমান অধিকারের পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষে মন্দির-ভাস্কর্যে ভাঁটা পড়ে। নিভৃত রচনার অবকাশে চিত্রশিল্প এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পায়—বিশেষ করে মুঘল জমানায়—মিনিয়েচার পেন্টিংস। যেসব অঞ্চল মুসলমান অধিকারে আসেনি সেখানে ভারতশিল্প প্রাকমুসলিম যুগের ধারাটি রক্ষা করে চলেছিল—ভাস্কর্যে এবং চিত্রশিল্পে। অন্যত্র হিন্দু ও মুসলমান শিল্পীদের 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'র ভারতীয় ঐতিহ্য রূপায়িত হয়ে ওঠে।

কিন্তু সে সব ইতিবৃত্ত আমাদের আলোচনার পরিধির বাইরে। আমরা বরং শেষ উদাহরণের, অর্থাৎ *খণ্ডিতা* সুতনুকার, একটি চিত্র পরিবেশন করে এই পরিচ্ছেদের যবনিকাপাত ঘটাই (চিত্র 6.43)।

এটি রাজপুত ঘরানার একটি মিনিয়েচার। খণ্ডিতা নায়িকার। শ্রীমতী শুধু ভালবাসেনি, নিখাদ ভালবাসা পেয়েছে বলেও তার বিশ্বাস জন্মেছিল। তারপর অকস্মাৎ সে জানতে পারে, 'আমারই বঁধুয়া আনবাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া।'

অপমানিতা সুতনুকা এসে উপস্থিত হয়েছে, নীল যমুনার তীরে। তার মনে গুঞ্জরিত হচ্ছে ভানুসিংহ পদাবলীর সেই অনবদ্য পংক্তিটি—

'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।'

দেখছি, শ্রীমতী একে একে খুলে ফেলছে তার নিষ্ফলা অঙ্গাভরণ—কেয়ুর, কঙ্কণ, কর্ণাভরণ, মুক্তাহার। সব কিছুই লুটাচ্ছে তার চরণপ্রান্তে। যেমন লুটিয়ে পড়েছে গাছের ঝরে-পড়া ফুল। সাদা-কালো ছবিতে দেখাতে পারিনি, রঙিন চিত্রটিতে আছে—কালো মেঘে পূর্ণচন্দ্র ঢাকা পড়েছে। সেই মেঘে-ঢাকা চন্দ্র কি চন্দ্রাননীর প্রতীক? কালোমেঘ ঘনশ্যামের? হয়তো শিল্পী বলতে চেয়েছিলেন, ঘন মেঘের ভিতর দিয়ে প্রেমচন্দ্র স্বয়ম্প্রকাশ। ভানুসিংহের মতো এই রাজস্থানী শিল্পী হয়তো শ্রীরাধিকাকে বলতে



চিত্র 6.43 খণ্ডিতা—রাজপুত চিত্র

চেয়েছেন—মৃত্যুর চেয়ে প্রেমই বড়:

ভানুসিংহ কহে—ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসে
অব তুঁহু দেখ বিচারি। ❑

চিত্র সমাধান

চিত্র 6.10A

অজন্তা ম্যুরাল 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13 ড্যুরার 19; লেওনার্দো 6, 14; মিকেলাঞ্জেলো 7, 15 রাফায়েল 4; রোঁদা 16/18; তিজিয়ানো 17; সারনাথ 18

চিত্র 6.10B

ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্র থেকে সংগৃহীত: 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18.

য়ুরোপীয় চিত্র, ভাস্কর্য ও মডেলের অনুলিপি : 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শাক্ততন্ত্র, বজ্রযান, চীনাচার ও মিথুনাচার



চিত্র 7.1 মহাকালী



তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'কেন মিথুনাচার' আলোচনার সময় লীসন-এর অষ্টম যুক্তিটি ছিল : 'তন্ত্রের নির্দেশ'। আমরা তখন বলেছিলাম, 'নির্দেশ' না বলে যদি লীসন 'তন্ত্রের প্রভাব' বলতেন তাহলে যুক্তিটি আমরা গুরুত্ব দিয়ে বিচার কবতে রাজি। বর্তমান পরিচ্ছেদে সেই তত্ত্বটাই আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব : মিথুনাচারের উপর শাক্ততন্ত্র, বজ্রযান এবং চীনাচার কি কোনও প্রভাব বিস্তার করেছে?

স্বীকার্য যে, শক্তি-উপাসকদের একটি বিশেষ শাখা—'তান্ত্রিকেরা', এবং বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনধারার শেষ ধাপ 'বজ্রযানী' সম্প্রদায় যৌনমিলনকে সাধনার অঙ্গীভূত বলে মনে কবতেন। কিন্তু তাঁদের যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড সংঘটিত হতো একান্ত গোপনে। গুরুভাইদের সঙ্গোপন সাধনচক্রে। তাঁরা ছিলেন গোপনতায় দৃঢ় বিশ্বাসী। ফলে, তাঁদের নির্দেশে মৈথুনরত মূর্তি মন্দিরগাত্রে নির্মিত হয়েছিল একথা গ্রাহ্য হতে পারে না।

তান্ত্রিক সাধকদের মূল প্রতিপাদ্য—বাস্তব অনুষ্ঠানের কথা বলছি না, বলছি তত্ত্বকথা—বৈদিক অনুশাসনের পরিপন্থী নয়। বৈদিক অনুশাসনে এবং পরবর্তীকালের সংহিতায় সস্ত্রীক ধর্মাচরণের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। গৃহীর ক্ষেত্রে। গার্হস্থ্যাশ্রমে গৃহিণীর ভূমিকা সহধর্মিণীর।

শাস্ত্রতন্ত্রের প্রামাণ্য গবেষক স্যার জন উড্রফ বলছেন, According to the sublime *notions* of *Sruti* the union of man and wife is a veritable sacrificial rite—a sacrifice in fire (*Homa*) wherein she is both the hearth (*Kunda*) and fire *(Agni)* — and he who knows this as *Homa* attains liberation [see *mantram* 13 of *Homaprakarana* of *Brihadaranyaka Upanisad and* Edward Carpenters remarks on what is called the 'Obscenity of the Upanisads'']¹

[শ্রুতির পবিত্র নির্দেশ : পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন যজ্ঞাচরণের এক অবশ্যকৃত্য—হোমাগ্নিতে আহুতিদান। সেখানে প্রকৃতি একাধারে কুণ্ড এবং অগ্নি। এই মৈথুনকৃত্যের মর্মকথা যিনি অনুধাবনে সক্ষম তিনি অন্তিমে মুক্তিলাভ করেন। (*বৃহদারণ্যক উপনিষদের* 'হোমপ্রকরণ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)]

তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে সাধকদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা : *পশ্বাচারী, বীরাচারী* এবং *দিব্যাচারী।* প্রত্যেকের সাধনমার্গ বিভিন্ন। সেগুলি যথাক্রমে : *তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক।* প্রথমটি সাধারণের জন্য, দ্বিতীয়টি ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ ও অভিজাত শ্রেণির এবং শেষোক্তটি শুদ্ধাচারী সাত্ত্বিক জিতেন্দ্রিয়ের পক্ষে প্রযোজ্য। একে অপরের সাধনপথ অবলম্বন করতে পারেন না। একমাত্র রাজসিক শ্রেণির ভক্তের জন্য তন্ত্র এই পঞ্চমকারের বিধান নির্দিষ্ট করেছেন—পশ্বাচারীর পক্ষে তা ক্ষতিকারক, দিব্যাচারীর পক্ষে তা নিষ্প্রয়োজন। পঞ্চমকার—বলাবাহুল্য : *মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা এবং মৈথুন।*

আদ্যাশক্তিকে জগন্মাতারূপে স্বীকৃতি দিতে হলে যুক্তিগ্রাহ্য প্রথম শর্ত : তাঁকে 'মা' হতে হবে। জননীত্বলাভের জন্য একটি প্রাগ্বর্তী কর্মকাণ্ড অনস্বীকার্য। তন্ত্রশাস্ত্রকার এই অস্বস্তিকর যুক্তিনির্ভর প্রশ্নটি আধিভৌতিক ক্ষেত্রে অস্বীকার করেন না। জাগতিক পরিমণ্ডলেও সেই আবশ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডটিকে—যাকে অস্বীকার করলে জীবজগতের অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী—গ্রহণ করেন। শাস্ত্রমতে এ কার্যটি আদৌ হীন, কদর্য বা বর্জনীয় নয়। তান্ত্রিক সাধক আদিপুরুষ এবং আদ্যাশক্তির এই মহামিলনকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করেন :



চিত্র 7.2 দশমহাবিদ্যা—কালী

অলিপিশিতপুরাণদ্ধিভোগপূজাপরোহম্।
বহুবিধকুলমার্গারম্ভ— সম্ভাবিতোহম্।।
পশুজনভিমুক্তোহম্ ভৈরবীমাশ্রিতোহম্।
গুরুচরণরতোহম্ ভৈরবোহম্ শিবোহম্।।

[আমি সেই পূজাপদ্ধতি অনুসরণ করি যাতে অন্যান্য অনুপানসহ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পথে কুলাচারপ্রবৃত্ত আমি ভৈরবীর আশ্রিত। আমি গুরুচরণাশ্রিত, আমি ভৈরব। —আমি স্বয়ং শিব।]

সাধারণের কাছে ঈশ্বরোপাসনার সঙ্গে মদ্যপান এবং মাংস-মৎস্য ভক্ষণ তথা স্ত্রী-সম্ভোগ—ভদ্রভাষায়



চিত্র 7.3 দশমহাবিদ্যা—তারা

সম্পর্কবিযুক্ত, স্পষ্টভাষায় নির্লজ্জভাবে বিরক্তিকর। কারণ দেবার্চনা এইসব জাগতিক ক্রিয়াকর্ম থেকে সহস্র যোজন দূরে। তাঁরা বলবেন : 'স্বীকার করি, জীবনধারণের জন্য আমরা পানাহার করে থাকি। সন্ন্যাসী অথবা ব্রহ্মচারী ব্যতিরেকে প্রজাতির স্বার্থে, এবং নিজ নিজ প্রবৃত্তিবশে আরও কিছু ক্রিয়াকর্ম করে থাকি। কিন্তু তার সঙ্গে উপাসনার কোনো সম্পর্ক নেই।' স্যার জন উড্রফ তাঁদের বলছেন, "এ জাতীয় ধারণার মূলে আছে দুই প্রকারের ভ্রান্ত বিশ্বাস। প্রথমত : সৃষ্টি এবং স্রষ্টা যে অবিচ্ছেদ্য এবং অভিন্ন এই তত্ত্বটা অস্বীকার করা, দ্বিতীয়ত : যাবতীয় প্রাণবন্ত ও জড়বস্তু সম্বন্ধে কিছু ভ্রান্ত হীন ধারণার বশবর্তী থাকা। উপরোক্ত তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির সঙ্গে ভারতীয় একেশ্বরবাদিতার কোনো বিরোধ নেই। .... মানবমাত্রেই তার অন্তর্নিহিত সত্তায় এবং উপাদানে দেবত্বমণ্ডিত; বিশ্বাত্মার সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত। তার দেহ, মন এবং যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডে স্বভাবের প্রকাশ। প্রাকৃতিক কোনো কিছুকে কদর্য মনে করার অর্থ স্রষ্টাকে অসম্মান করা। আপুরীষ যাবতীয় তথাকথিত বর্জ্য পদার্থেও তাঁর পবিত্র অবস্থান। বর্জ্য পদার্থের যে হীনতা, মলিনতা বা কদর্যতা তা আমাদের মানসিক ধারণায় আরোপিত—বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণ বা দোষ তাদের নয় (স্মর্তব্য . 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে')। .... তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে, সুপ্রযুক্ত মৈথুনকর্মও প্রকারান্তরে যোগ (vide Masson—Ourpel's *Historic de le Philosophic Indienna* pp. 231-233) যে মুহূর্তে সেই পরমপুরুষকে এই জগতের মূলীভূত নিমিত্তকারণ হিসাবে দৃঢ় প্রতীতি জন্মাবে সেই মুহূর্ত থেকে দেহ এবং দেহের যাবতীয় কর্ম তার মুক্তির অন্তরায় হয়ে থাকবে না।"[2]

তন্ত্রশাস্ত্রে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে এখানেই যবনিকা টানা যাক। তামসিক ক্রিয়াকলাপের বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, সাত্ত্বিক সাধনমার্গও আমাদের আলোচনার বাইরে। পঞ্চমকারের প্রথম চারটি উপাদান এবং তার প্রয়োগবিধি সম্বন্ধেও আমাদের আগ্রহ নেই। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে পঞ্চমকারের শেষ 'ম'-টির গুরুত্বই সমধিক।

তন্ত্রশাস্ত্রের একাধিক আগমতত্ত্বে সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে, রাজসিক তন্ত্রসাধক ভৈরবীচক্রে সস্ত্রীক উপস্থিত হবেন। যেমন *কৌলিকার্চন দীপিকা* গ্রন্থে সর্বদা 'পত্নী' 'সহধর্মিণী' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'স্ত্রীজাতীয়া' বা 'প্রকৃতি' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। সহধর্মিণীই তার স্বামীর কাছে আদ্যাশক্তির বাস্তব প্রতিনিধি। সাধনচক্রে প্রত্যেকটি পুরুষ নিজ নিজ ধর্মপত্নীকে নিয়ে উপস্থিত হবেন। যদি কোনো সাধকের স্ত্রী না থাকেন অথবা জাগতিক হেতুতে তিনি যদি চক্রে উপস্থিত হতে না পারেন, কিংবা দেহধর্মের মাসিক হেতুতে যদি তিনি সেইরাত্রে 'অনধিকারিণী' হয়ে পড়েন, একমাত্র তখনই চক্রাধিপতি সেই সাধকের জন্য ভিন্ন 'শক্তির আধার'কে গ্রহণ করার অনুমতি দেবেন। চক্রে পদার্পণের

পূর্বেই সেই ভক্ত চক্রাধিপতিকে পরিস্থিতিটি ব্যাখ্যা করে সাময়িক 'প্রকৃতি' গ্রহণের অনুমতি গ্রহণ করবেন। এখানে বলা যেতে পারে যে, *কৌলিকাচরণ দীপিকা* স্পষ্টভাষে জানিয়ে দিয়েছেন যে, চক্র-পরিমণ্ডলের বাহিরে সেই ভক্ত ওই নারীতে কোনোক্রমেই উপগত হতে পারবে না।

তন্ত্রশাস্ত্রের নির্দেশে এবং চক্রাধিপতির আদেশে গোপন চক্রে ভক্তের দল নানা মন্ত্রপাঠ করেন। তার সঙ্গে চলতে থাকে মদ্য, মাংস ও মৎস্যের ব্যবহার। 'মুদ্রা' শব্দটি দ্বর্থ্যবোধক। আঙুলের 'মুদ্রা' এবং মুশুরির 'ডাইল'। সবশেষে আসে পঞ্চমকারের পূর্ণাহুতির কার্যক্রমটি : মৈথুনকার্য।

যতদূর জানা যায় এই পর্যায়ে প্রত্যেকটি পুরুষ তার নিজস্ব প্রকৃতিকে নিয়ে শক্তি আরাধনায় এক নিভৃত সাধনকক্ষে আশ্রয় নেয়। অন্যান্য ভক্তের দৃষ্টির আড়ালে।

স্যার জন উড্রফ আরও বলছেন,

> "একথা অনস্বীকার্য যে, শাক্ততন্ত্র একটি ধর্মীয় সাধনমার্গ। তাতে অন্যায়, অধর্ম এবং নৈতিক বিধির পরিপন্থী কোনো নির্দেশ থাকার কথা নয়। আত্মিক উন্নতিকল্পে সাধনপথে যৌন অমিতাচার কি প্রবেশ করতে পারে? তবে এ-কথাও স্বীকার্য যে, কিছু কিছু ভ্রাম্যমাণ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এবং তাদের দলের স্ত্রীলোকবৃন্দ এই অজুহাতে কোনো কোনো অঞ্চলে যৌন-ব্যভিচারকে ধর্মের নির্মোকে আবৃত করত। এভাবেই তারা সমাজের একাংশকে প্রভাবিত করেছিল।"[3]



চিত্র 7.4 দশমহাবিদ্যা—ভুবনেশ্বরী

* * *

আর এখানেই আমাদের আলোচ্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মন্দির ভাস্কর্যে তন্ত্রের প্রসঙ্গ উত্থিত হচ্ছে। কোনো কোনো সামন্ত শাসক এবং তাদের অনুগ্রহভাজক নিজেদেব ব্যভিচারী জীবনকে একটা ধর্মের মোড়কে সমাজে সহনীয় করে তুলতে চেয়েছিল। তন্ত্রসাধনায় তাদের কাম্য উপকরণ সবই পাওয়া যাচ্ছে—মদ্য, মাংস, মৎস্য এবং চক্রাধিপতির অনুমতিসাপেক্ষে পরদারগমন। শেষোক্ত অনুপানটির জন্য যথাযোগ্য কাঞ্চনমূল্যে 'দক্ষিণামিদং' দিলেই কখনো কখনো ব্যবস্থা হয়ে যায়। এভাবে অর্থবান, অভিজাত মেকি-তান্ত্রিকদের পক্ষে চক্রাধিপতির অনুমতিসাপেক্ষে পরকীয়া ভজনা অসম্ভব থাকত না। ধর্মের মোড়ক না থাকলে হয়তো সেই বিশেষ রমণী ধনীসাধকের বিরংসায় অপ্রাপ্যই থেকে যেত। এই জাতীয় ব্যভিচারী ভূম্যধিকারী এবং ধনকুবের ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ক্লেদাক্ত জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত করাবার আয়োজন করে থাকতে পারে। কিন্তু এটা সমগ্র ভারতব্যাপী একটা সাধারণসূত্র হতে পারে না।

মিথুনাচারে চৈনিক প্রভাব

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভারতবর্ষে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বহু দেবদেবীর মূর্তি পরিকল্পনায় চৈনিক প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মতে হিন্দু দেবতা শিব এবং তাঁর শক্তিস্বরূপা পার্বতীর মূর্তি মহাযান ধর্মের ভৈরব ও তারার প্রতিচ্ছায়া। তিনি আরও বলেছেন, তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ চৈনিক চীনাচার থেকে সংগৃহীত।[4] অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভীর মতে হরপ্রসাদ বর্ণিত তারাতন্ত্রের ব্যাখ্যায় যেসব দেবদেবীর বর্ণনা আছে সেগুলি নেপাল, তিব্বত এবং চীনের কিছু আরাধ্য দেবদেবীর রূপান্তরমাত্র।[5] তাঁর মতে পঞ্চমকারের ধারণাটা এসেছে চীনদেশ থেকে। একই কথা বলেছেন ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, তাঁর গবেষণা গ্রন্থে।[6] তিনি আরো

বলেছেন যে, এই চীনাচার 'জাহ্নবী'কে ভারতে আনয়নের ভগীরথ হচ্ছেন বশিষ্ঠ মুনি। রামায়ণের বশিষ্ঠ নন, সপ্তম শতাব্দীর সাধক বশিষ্ঠ। '*তারা-বশিষ্ঠের উপাখ্যান*' এই অভ্যুপগমের মূল উৎস।

উপাখ্যানটি একাধিক তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। যথা : *তারা-রহস্য, রুদ্র-যামল, মহাচীনচরিত্রম, চীনাচার-প্রয়োগবিধি* প্রভৃতি। সামান্য পাঠান্তর সত্ত্বেও বিভিন্ন পুঁথিতে মূল কাহিনির কাঠামোটা একই রকম :

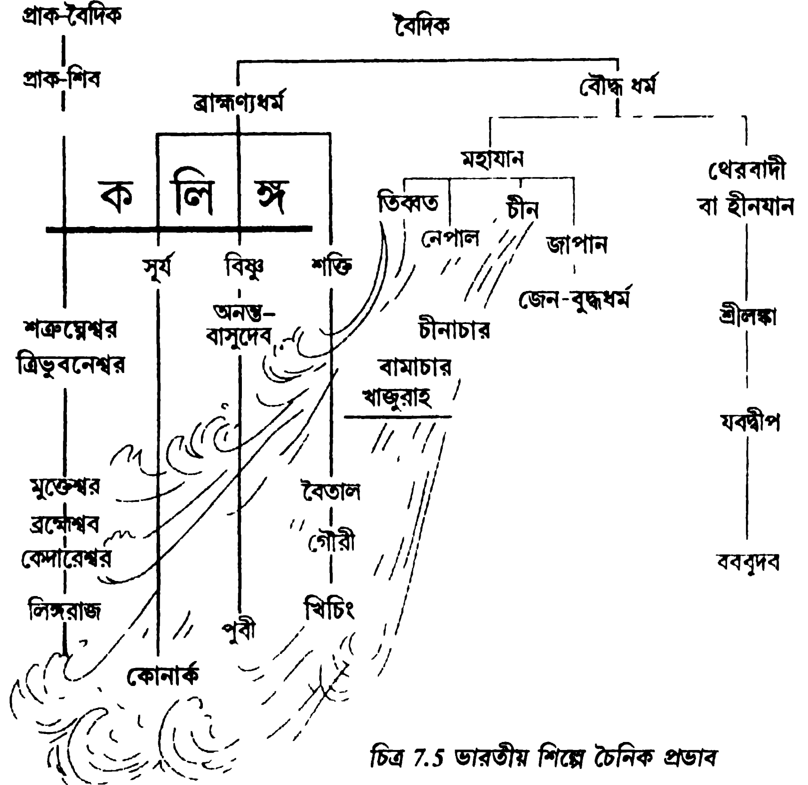
শাক্ত-সাধক মুনি বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল কামদা-কামাখ্যা মন্দিরের অদূরে এক উপলবন্ধুর পার্বত্য নির্ঝরের স্নেহচ্ছায়ায়। দীর্ঘদিন কঠোর তপস্যা করেও তিনি চরম সিদ্ধিলাভ করতে পারলেন না। অবশেষে আরাধ্য দেবী কামাখ্যা তাঁর তপস্যায় প্রীত হয়ে একদিন গভীর রাত্রে ভক্তের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'তুই মূর্খের মতো এতদিন শুধু দক্ষিণাচারে শক্তিসাধনা করছিস। কিন্তু এ পথে তো তোর সিদ্ধিলাভ হবে না। তোকে বামাচারী তান্ত্রিক হতে হবে।'

দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বশিষ্ঠ বললেন, 'আমি যে বামাচার পূজাপদ্ধতির কিছুই জানি না, মা। তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও।'

কামাখ্যা হেসে বলেন, 'পাগল ছেলে! আমি যে 'মা'! আমি তা তোকে কেমন করে শেখাব? জম্বুদ্বীপে কেউ ওই বামাচার সম্বন্ধে অবহিত নয়। তুই বরং মহাচীনখণ্ডে চলে যা। গিয়ে দেখবি, স্বয়ং বুদ্ধদেব চীনাচারে নিরত। তাঁর কাছ থেকে বামাচার সাধনমার্গের ক্রিয়াকলাপ শিখে আয়। জম্বুদ্বীপে তা প্রচার কর।'

কাহিনি অনুসারে বশিষ্ঠ অতঃপর মহাচীনখণ্ডে গমন করেন। তুষারশুভ্র হিমালয়ের ওপারে তিনি অবশেষে উপনীত হলেন চীনাচারী বুদ্ধদেবের সঙ্ঘারামে। সেখানে দেখতে পেলেন অসংখ্য লোকেশ্বরসেবিত স্বয়ং বুদ্ধদেব চীনাচার পদ্ধতিতে তন্ত্রসাধনায় রত।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বশিষ্ঠমুনি। দেখলেন, বুদ্ধদেব অসংখ্য 'নায়িকা' বেষ্টিত। এই নায়িকার দল যৌবনবতী, অপরূপা, কামোদ্দীপিনী, সালাঙ্কারা, কিন্তু সম্পূর্ণ নগ্নিকা। ব্রহ্মচারী বশিষ্ঠ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। যাইহোক,



চিত্র 7.5 ভারতীয় শিল্পে চৈনিক প্রভাব

কাহিনি অনুসারে অন্তিমে মুনি বশিষ্ঠ কামাখ্যামায়ের আশীর্বাদে বামাচারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। কামাচরণের মাধ্যমেই কামজয়ী হয়ে ওঠেন বামাচারী। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে জম্বুদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন। এই নূতন পদ্ধতির প্রচার শুরু করেন।

কাহিনি এই পর্যন্তই। কিন্তু এর কতখানি যুক্তিগ্রাহ্য ? বশিষ্ঠকে কি ইতিহাসের চৌহদ্দিতে গণ্ডিবদ্ধ করা সম্ভব?

আসামের রাজধানী গুহাহাটিতে অবস্থিত কামাখ্যা মন্দিরের অদূরে বশিষ্ঠের আশ্রম বর্তমানেও একটি 'টুরিস্ট স্পট'। এই অঞ্চলেই ছিল প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজধানী। যদিও বশিষ্ঠের নাম কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থে বা

শিলালেখে পাওয়া যায়নি তবু তাঁকে তির্যকপথে ইতিহাসের সাল-শতাব্দীর নিরিখে আনা অসম্ভব নয়।

ইতিহাসে পাচ্ছি : প্রাগজ্যোতিষপুরের নৃপতি ভাস্করবর্মা তাঁর সভাপণ্ডিতদের মাধ্যমে একটি চীনাগ্রন্থ—'*তাও-তে-চিঙ্*'—সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়েছিলেন। এইটিই ভারতের যে-কোনো ভাষায় অনুবাদিত বামাচার সংক্রান্ত প্রথম চীনা গ্রন্থ। ভাস্বরবর্মা সপ্তম শতাব্দীর ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি চীনা পর্যটক হিউয়েন-ৎসাঙ, বঙ্গাধিপতি গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক এবং উত্তরখণ্ডের রাজা হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। লক্ষণীয়, এই সময়েই ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে সর্বপ্রথম মৈথুনরত-মিথুনের আবির্ভাব ঘটে। একশ বছরের ব্যবধানে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন এলাকায়—যথা বাতাপী, আইহোল, পাট্টাদকল। এগুলি সবই চালুক্যরাজ্যে, যেখানে নৃপতি দ্বিতীয় পুলকেশী এই চৈনিক পর্যটককে বেশ কিছুদিন তাঁর অতিথি-আবাসে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

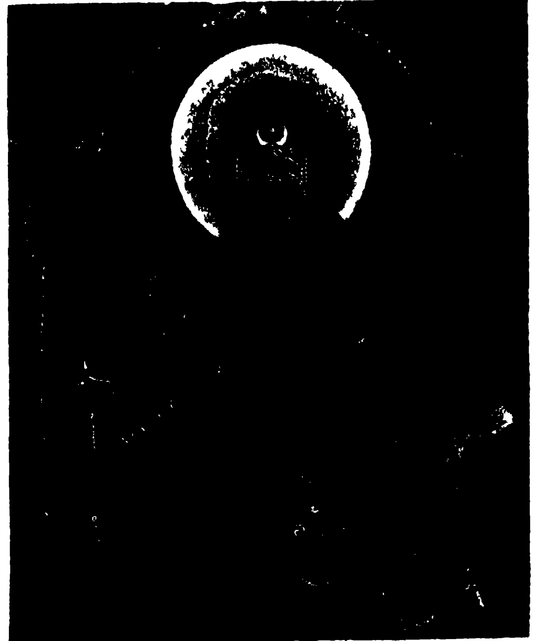
দ্বিতীয়ত : কামাখ্যা মায়ের বিশেষণ : 'কামরূপী'।

অপর এক তির্যক পথেও হয়তো ইতিহাসের রাজ্যে আমরা মুনি বশিষ্ঠের পদচিহ্ন রেখা লক্ষ্য করতে পারি। দেখা যাচ্ছে, দশম শতাব্দিতে রচিত একটি চীনা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, চীন সম্রাট শী-মেঙ চীঙ-এর রাজসভায় একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এসেছেন, ধর্মতত্ত্বের তুলনামূলক বিচারমানসে। এই গ্রন্থটির ইংরেজি নাম *The Golden Lotus* (স্বর্ণকমল)। লেখক দশম শতাব্দীর চৈনিক ঔপন্যাসিক চিঙ-পিঙ-মেঈ।[7] উপন্যাস বর্ণিত চীনাসম্রাট ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় সেই সোপানে অবস্থিত যেখানে আমরা ইতিপূর্বে বর্ণিত ভাস্করবর্মার কালকে দেখেছিলাম।

অবশ্য একটি প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কী কারণে জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী গৌতম বুদ্ধকে এই কাহিনির ভিতরে টেনে আনা হল?

এই প্রসঙ্গে চীনের প্রাচীন ধর্মীয় ইতিহাসে চীনাচারের আদিমতম গুহ্যাচারের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ভারত সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পূর্বযুগেই, অর্থাৎ ভারতখণ্ডের থেরবাদী বৌদ্ধদের সম্বন্ধে অবহিত হবার পূর্বেই, চীনা পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করতেন যে জীবজগত সৃষ্টির মূলীভূত হেতু : ইয়াঙ (অথবা ইয়াব) এবং ঈন্ (পাঠান্তরে য়্যাম্)—এই দুই লোকাতীত বিপরীত সত্তার মিলনে। ঈন্ হচ্ছেন আদি-পুরুষ; এবং ইয়াঙ আদ্যাশক্তি অর্থাৎ আদিপ্রকৃতি। ফলে, প্রথম যুগ থেকেই তত্ত্বটি চীনা দার্শনিকেরা প্রাচীন ঐতিহ্যের জারকরসে জারিত করে গ্রহণ করেছিলেন। ভাষান্তরে তাঁরা থেরবাদের ইন্দ্রিয়-সংযম এবং প্রাচীন চীনাচারের 'ইয়াঙ-ঈন' তত্ত্বের একটি সমন্বয় গড়ে তোলেন—যা থেকে কালে উদ্ভূত হয় চীন-জাপানের 'জেন-বুদ্ধিজম্' (Zen-Buddhism—সংস্কৃত 'ধ্যান'→ জ্ঞান'→জেন)। পরবর্তীকালে ভারতীয় বৌদ্ধ পর্যটকের দল—কাশ্যপমাতঙ্গ, কুমারজীব, বোধিধর্ম, বোধিক্ষেম প্রভৃতিরা চীনদেশে গিয়ে এক চীন-ভারত সমন্বয়ী বৌদ্ধধর্মের সাক্ষাত পান। ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণেরা অব্যতিক্রমভাবে ব্রহ্মচারী এবং সেই অর্থে সন্ন্যাসী। অথচ একাধিক বৌদ্ধ-সঙ্ঘারামে ওই পর্যটকেরা বিভিন্ন শতাব্দীতে চৈনিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন সেই মন্ত্রে : 'সস্ত্রীকধর্মমাচরেৎ'। চীনের বৌদ্ধ-বিহারে ভিক্ষুরা আছেন জোড়ায়-জোড়ায়। এক এক পরিবেশে এক জোড়া সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী।

বস্তুত চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশের অনেক পূর্বকাল থেকেই চীনা-দার্শনিকেরা মুক্তির মাধ্যম হিসাবে গুহ্য যৌনাচারকে অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ডঃ ভ্যান গুলিক্-এর মতে চৈনিক ধর্মাচরণে



চিত্র 7.6 দশমহাবিদ্যা—ভৈরবী

যৌনাচার গৃহীত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দির পূর্বযুগে।[৬]

অধ্যাপক যোসেফ নীডহ্যামের মতে[৭] তাও-দর্শনে নির্বাণ, নিব্বান বা মুক্তি (চীনা-প্রতিশব্দটি হচ্ছে *'শীয়েন'*) লাভের জন্য ছয়টি গুহ্যাচার আবশ্যিক :

(i) সূর্যপ্রণাম
(ii) শ্বাস-সংযম
(iii) হঠযোগ
(iv) রাসায়নিক দ্রব্যাদির সঠিক ব্যবহার
(v) খাদ্যবিচার
(vi) মৈথুনকার্য।

এই ছয়টি প্রক্রিয়ার তিনটি—প্রথম, দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠটি—চীনের নিজস্ব অবদান। বাকি তিনটি—তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমটি বুদ্ধভূমি থেকে আহরিত। ডঃ নীডহ্যাম আরও বলেছেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে চীনখণ্ডই সর্বপ্রথমে এই তত্ত্বটা প্রতিষ্ঠা করে : ধর্মাচরণের সঙ্গে মৈথুনক্রিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত।

* * *

শাক্ত পূজাবিধির আদিযুগের কথা আমাদের বুঝে নিতে হবে : কেন এই বহির্ভারতীয় চীনাচার ভারতীয় তান্ত্রিকদের কাছে শুধু গ্রহণীয় নয়, আদরণীয় মনে হল।

প্রথম যুগ থেকেই সৃষ্টির মূলে প্রকৃতি ও পুরুষের যৌথ অবদানের তত্ত্বটি স্বীকৃত। *ঋগ্বেদের* নাসদীয় সূক্তে সৃষ্টির মূলীভূত হেতুরূপে আদিম পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের কথা বলা হয়েছে। কামদেব ধনাত্মক অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিলেন মাত্র। উপনিষদে আদিমতম পুরুষপ্রকৃতিকে বলা হয়েছে 'অজ' এবং 'অজা'। পৌরাণিক যুগে তাঁরা হয়েছেন শিব ও পার্বতী। স্মর্তব্য : অজ এবং অজা হচ্ছেন আদিমতম নরনারী। অপরপক্ষে শিবপার্বতী অনন্তকালের সত্তা।

বৈদিক যুগে কোনো প্রভাবশালী 'দেবী' মূর্তির সন্ধান পাই না। রুদ্রাণী, ব্রহ্মাণী, ভবানীরা বেদে আছেন, কিন্তু তাঁদের খুব কিছু গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মহাকাব্যের যুগে দেখা যাচ্ছে নারীজাতির প্রতি সেই আদিম উপেক্ষার অবসান ঘটেছে। শ্রীরামচন্দ্রকে দেখছি লঙ্কা অভিযানের পূর্বে মা দুর্গাকে অকালবোধন করতে। মহাভারতেও দেখা যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন—কর্ণের বিরুদ্ধে দ্বৈরথ সমরে অবতীর্ণ হবার পূর্বে শিবানীর পূজা করতে। দুই মহাকাব্যেই কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বনিয়ন্ত্রার পূর্ণ অবতাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দুটি উপাখ্যানে দেখা যাচ্ছে দেবী শক্তিকে তাঁদের ওপরে রাখা হয়েছে।

মহাশক্তি—যিনি বৈদিক যুগ থেকে তাঁর পদমর্যাদা অনুসারে গুরুত্বলাভ করেননি, এখন তিনি নানাভাবে পূজিতা হতে থাকেন। মহিষমর্দিনী, দুর্গা, চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী, চণ্ডী, কাপালী, চামুণ্ডা ইত্যাদি। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষাশেষি—অর্থাৎ চৈনিক প্রভাবের পূর্বযুগেই—এই মাতৃপূজা বা শক্তিপূজা ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ করতে থাকে। সমকালে শক্তি-উপাসনার নানা গ্রন্থ রচিত হয়। তার ভিতর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ***শ্রীশ্রীচণ্ডী।***

বাঙালি পাঠককে চণ্ডীর আখ্যানবস্তু নতুন করে বলা বাহুল্য। প্রতি বৎসর মহালয়ায় তা আমরা 'ভদ্রকণ্ঠে' শুনে থাকি। এই কাব্যগ্রন্থে সকল দেবদেবীকেই দেখি চণ্ডীর আরাধনা করতে। সেই অনুচ্ছেদটি কাব্যমাধুর্যে অনবদ্য। তাতে মাতৃশক্তিকে সকল দেবদেবীর ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে। এমনকি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তিন আদিদেবতাকেও দেখা যায় আদ্যাশক্তিকে আরাধনা করতে। *মহানির্বাণতন্ত্রেও* তারই প্রতিচ্ছায়া।

তান্ত্রিক যোগসাধনার সংক্ষিপ্ত স্বরূপ

তন্ত্রমতে আমাদের মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে সুষুম্না সুরঙ্গপথে দুইপ্রকার স্নায়ুরজ্জু প্রবাহিত : পিঙ্গলা এবং ইড়া। মতান্তরে সুষুম্না পথ নয়, একটি নাড়ি। অর্থাৎ মানবদেহে তিনটি নাড়ি : পিঙ্গলা, ইড়া এবং সুষুম্না মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তে, গুহ্যদেশের সন্নিকটে মূলাধার পদ্ম অবস্থিত। সেখানেই স্বয়ম্ভুলিঙ্গের অবস্থান এক ত্রিকোণাকৃতি চক্রে। একে বলে ত্রিবেণী চক্র, কারণ এখানেই ওই তিনটি নাড়ির সংযুক্ত অবস্থান। ওই স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বামাবর্তে বেষ্টন করে নিদ্রিত আছেন কুণ্ডলিনী মহাশক্তি।

সাধকের কৃত্য হচ্ছে ওই নিদ্রামগ্ন কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করে মেরুদণ্ডপথে ঊর্ধ্বগামী করা। দেহস্থিত বিভিন্ন চক্র অতিক্রম করে সেই সর্পিল পথে যদি কুণ্ডলিনী শক্তি মস্তকস্থিত শেষতীর্থ সহস্রারে উপনীত হতে পারে তবেই সাধক সিদ্ধকাম। কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধার থেকে

সহস্রারে পরিচালিত করাই যোগীর মূল কৃত্য। কুণ্ডলিনী শক্তি যতই ওপরে উঠবে, একে একে ষট্‌চক্র ভেদ করে সহস্রার পথে উন্নীত হবে, ততই যোগীর মানসিক ক্ষমতার বিকাশলাভ ঘটবে। তাঁর চেতনার উন্মেষ হতে থাকবে। যখন সেই শক্তি মস্তিষ্কে অবস্থিত শেষতীর্থ সহস্রারে উপনীত হবে তখন তিনি দেহমনের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন। তাঁর দিব্যজ্ঞান লাভ হবে এবং তিনি তুরীয় আনন্দময় সত্তায় পরিণত হবেন।

মানবদেহের বিভিন্ন পদ্মের অবস্থান সংলগ্ন চিত্রে (চিত্র 7.7) প্রদর্শিত হয়েছে। ষট্‌চক্রের নামরূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে সন্নিবেশিত হল :

1. **মূলাধার** : মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তে গুহ্যদ্বারের নিকটবর্তী। ত্রিকোণাকৃতি

2. **স্বাধিষ্ঠান** : লিঙ্গমূলের সন্নিকটস্থ। এর ছয়টি পাপড়ি বা দল

3. **মণিপুর** : নাভিমণ্ডলের পশ্চাদ্ভাগে, দশটি দলবিশিষ্ট পদ্ম

4. **অনাহত** : দ্বাদশদলবিশিষ্ট এই পদ্মের অবস্থান হৃদ্‌মণ্ডলে

5. **বিশুদ্ধ** : কণ্ঠমূলে ষোড়শ-দল বিশিষ্ট পদ্ম

6. **আজ্ঞাচক্র** : দ্বিপক্ষবিশিষ্ট বিহঙ্গমপ্রতীক এ পদ্ম ভ্রূমধ্যে।

মূলাধার যেমন যুক্ত-ত্রিবেণী তেমনি আজ্ঞাচক্রটি যুক্ত ত্রিবেণী। সংক্ষেপে বলা যায়, মূলাধারে অবস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারে মিলিত করাই যোগীর মূল কৃত্য—এই মিলনই পঞ্চমকারের শেষতম 'ম'। মৈথুনের প্রকৃত নির্গলিতার্থ।

* * *

ধ্যানযোগের এই মূল সাধনতত্ত্ব শুধু শাক্ত নয়, সকল হিন্দু সন্ন্যাসীই স্বীকার করেন। প্রভেদ এই যে, অন্যান্য মতাবলম্বীরা মূলাধারে অবস্থিত সর্পস্বরূপা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করেন ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে অর্থাৎ শাসনে বশ করে। তাকে সংযত করে সহস্রারের পথে পরিচালিত করেন। অপরপক্ষে তান্ত্রিক সাধক সেই একই কাজ করেন ইন্দ্রিয় বঞ্চনার মাধ্যমে নয়। মনকে তার অসারতা সম্বন্ধে অবহিত করে, পরিতৃপ্তির মাধ্যমে। উভয়ে একই তীর্থপথের যাত্রী, শুধু পথ বিভিন্ন। যত মত তত পথ।

তান্ত্রিক তাঁর চক্রানুষ্ঠানের জন্য স্থান নির্বাচন করেন মহাশ্মশানে। ইন্দ্রিয়াসক্ত ভোগীর পক্ষে এমন একটি পটভূমি নির্বাচন করা সম্ভব? মহাতান্ত্রিক কারণবারি পান করেন নরকপালে। কেন? তার চেয়ে তৃপ্তিদায়ক পানপাত্রের কি অভাব? তান্ত্রিকের সাধনার আসন : গলিত শবদেহ! হেতু ?

তান্ত্রিকের বক্তব্য : লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, তিন থাকতে নয়!

তন্ত্রসাধনার তান্ত্রিক বিচার এবং পদ্ধতি যুক্তিবর্জিত এমন কথা বলা চলে না। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সর্বযুগে এমন তান্ত্রিক সাধকের সন্ধান পাওয়া যায় যিনি সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয়। চক্রনির্দিষ্ট সাধনসঙ্গিনী ব্যতিরেকে নারীমাত্রেই তাঁর দৃষ্টিতে মাতৃস্বরূপা।

তান্ত্রিক সাধকেরা চক্রে নানারূপের প্রতীকচিহ্ন অঙ্কিত করেন। সেই চক্রচিহ্নগুলির তাৎপর্য অধিকারী-ব্যতীত সাধারণের বোধগম্য নয়।

এ তত্ত্বকথা নিতান্তই 'গুরুমুখী বিদ্যা'। তবু যেহেতু চিত্রগুলি নয়নগ্রাহ্য শিল্পবস্তু, তাই নন্দনতত্ত্বের বিচারে তার বহিরঙ্গ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা চলে।

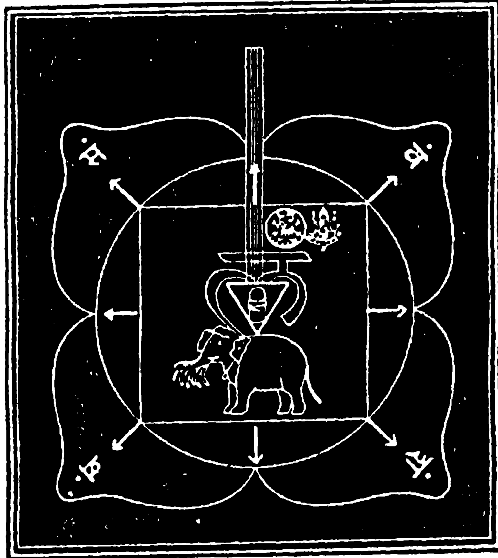
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর '*তন্ত্রতত্ত্ব প্রবেশিকা*' গ্রন্থে[10] কুলকুণ্ডলিনীর সৃষ্টি উৎস মূলাধার চক্রের একটি রেখচিত্র পরিবেশন করেছেন (চিত্র 7.8)



চিত্র 7.7 যোগীদেহে ষট্‌চক্রের অবস্থান

দেখছি, চতুর্দল পুষ্পের কেন্দ্রস্থলে একটি বৃত্তের ভিতর এক বর্গক্ষেত্র। চার পাপড়িতে চারটি অক্ষর : বং, শং, ষং, এবং সং। কেন্দ্রস্থলে একটি সমবাহু ত্রিভুজ—যা নাকি মূলাধারের মূল প্রতীক। তার ভিতর গৌরীপট্ট-বিহীন এক শিবলিঙ্গ। ঊর্ধ্বলোক থেকে একটি ত্রিশূল নেমে এসে বর্গক্ষেত্রে-বিধৃত একটি ষড়দন্তবিশিষ্ট হস্তীর পৃষ্ঠদেশে আঘাত করছে। ওই ত্রিশূলের মধ্যস্থিত ফলকটিই মূলাধারের ত্রিকোণ। ত্রিশূলের দণ্ডমধ্যে একটি ঊর্ধ্বমুখী তীরচিহ্ন। এ পর্যন্ত চিত্রের বর্ণিত অংশটি— শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রতিসাম্যমূলক। কিন্তু সেই ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছে 'বং' অঞ্চলে অঙ্কিত দুটি মূর্তিতে। নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে দুটি চিত্র ত্রিশূলের দুই পাশে অঙ্কিত হলে ভারসাম্য রক্ষিত হত, কিন্তু তা করা হয়নি। হয়তো তন্ত্র নির্দেশে। তা হোক, এ পর্যন্ত অনধিকারীর দৃষ্টিতে শিল্পবস্তুটি বুদ্ধিগ্রাহ্য। কেন্দ্রস্থ ত্রিকোণাকৃতি ত্রিশূল ফলকটি মাতৃত্বের প্রতীক। তাই শিবলিঙ্গটি গৌরীপট্ট-বিবর্জিত। কিন্তু ত্রিশূলটি যে ষড়দন্তবিশিষ্ট গজের পৃষ্ঠে আঘাত করছে তার কী ব্যঞ্জনা?

নন্দনতত্ত্বের শিক্ষার্থী হিসাবে আমরা বলতে বাধ্য যে, কোনো হিন্দু মন্দিরে স্থাপত্য-ভাস্কর্যে, চিত্রে বা পটে আমরা এই ষড়দন্তবিশিষ্ট গজের প্রতিচ্ছায়া দেখিনি। আন্দাজ করেছিলাম—গজটি মানবমনের প্রতীক, আর তার ছয়টি



চিত্র 7.8 মূলাধার চক্র

দাঁত ষড়-রিপুর প্রতিরূপ। আদ্যাপীঠের মহাসাধিকা ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবীকে দূরভাষণে আমার এই অনুপপত্তিটি পেশ করে জানলাম আমার অনুমানটি সত্য।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের শিল্পে ষড়দন্তবিশিষ্ট গজের প্রতিরূপ অন্যত্র না দেখলেও বৌদ্ধ জাতকে তার উল্লেখ আছে। অজন্তার একাধিক গুহাবিহারে (দশম, ষোড়শ ও সপ্তদশ) ষড়দন্ত-জাতকের উপাখ্যান বিচিত্রিত। চিত্র 7.9-এ আমরা দশম-গুহা বিহারের চিত্রটির অনুলিপি দিয়েছি। এটি অজন্তায় খ্রিস্টজন্মের প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্বে অঙ্কিত। বর্তমানে এ চিত্রটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমরা গ্রিফিথের মহাগ্রন্থ থেকে অনুলিপি করেছি।

এ প্রসঙ্গে আরও বলব, শাক্ততন্ত্রমতে গজের (মানবমনের) ওই ছয়টি দন্ত হচ্ছে শত্রু—ষড়রিপু; কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রমতে ষড়দন্ত-গজরাজের সেই ছয়টি দন্ত মহাসম্পদ। সেনাপতি সোনুত্তরকে দান করার পরেই গজরাজ মৃত্যুবরণ করেন।

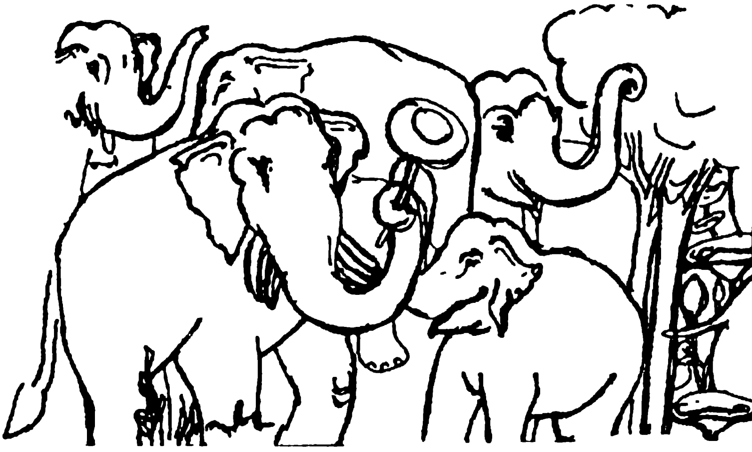
আমাদের অনুমান : ষড়দন্ত গজের এই প্রতীকটি তান্ত্রিক এবং স্থবিরবাদী বৌদ্ধ সাধকেরা নিজ নিজ মননে লাভ করেছেন—কেউ কারও দ্বারা প্রভাবিত হননি।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের গ্রন্থে আরও দুটি 'যন্ত্রে'র চিত্র আছে—যথাক্রমে 'কালীযন্ত্র' এবং 'শ্রীযন্ত্র'।

তন্ত্রসাধকের পক্ষে এদের ব্যবহার এবং ব্যঞ্জনা নিয়ে আমরা কোনো আলোচনা করছি না—সে অধিকারই আমাদের নেই। আমাদের কাছে এ-দুটি দৃষ্টিনন্দন শিল্পমাত্র। দুটি চিত্রেই প্রতিসাম্য সুরক্ষিত। জ্যামিতিক অঙ্কন বিদ্যায় দক্ষতা না থাকলে সাধারণ সাধকের পক্ষে এ যন্ত্রের আলিম্পন অসম্ভব। কালীযন্ত্রে (চিত্র 7.10) অষ্টদল-বিশিষ্ট পুষ্পের কেন্দ্রে একটি ত্রিকোণাকৃতি নক্‌শা—সম্ভবত লিঙ্গের প্রতীক। তার ভিতর পুনরায় দুটি ত্রিভুজ—একের ওপর অপরটি এমনভাবে আরোপিত যাতে ছয়টি চূড়াকোণ উৎপন্ন হয়েছে। বৃহৎ ত্রিভুজটি এবং ভিতরের দুটি ত্রিভুজদ্বয়ের কোনোটিই সমবাহু ত্রিভুজ নয়। যদিও স্ত্রীযন্ত্র হিসেবে আমরা সর্বত্র সমবাহু ত্রিভুজই দেখে থাকি। ভিতরের দুটি ত্রিভুজ যদি দ্বিসমবাহু ত্রিভুজ না হয়ে সমবাহু ত্রিভুজ হতো তাহলে আমরা সেই প্রতীকের সঙ্গে 'জুডাইজম' (ইহুদি) ধর্মের একটি সমান্তরাল ভাবনাকে যুক্ত করতে পারতাম। ইহুদি ধর্মের আদি প্রবক্তা ডেভিড (যিনি গোলিয়াথ দৈত্যকে বধ করেছিলেন এবং যাঁর

অনবদ্য মর্মরমূর্তি গড়েছেন মিকেলাঞ্জেলো)-এর ঢালে এই চিহ্নটি অঙ্কিত। এটি বস্তুত ইহুদিধর্মের প্রতীক।

শ্রীযন্ত্রে (চিত্র 7.11) যে পুষ্পটি, তার বহিরঙ্গে দেখছি ষোলোটি দল। আর ভিতরের অংশে আটটি দল। কেন্দ্রস্থলে বহুসংখ্যক সমবাহু ত্রিভুজের সমাহার। জ্যামিতিক অঙ্কনপদ্ধতিতে যথেষ্ট পারদর্শিতা না থাকলে এ নকশাটি রচনা করা রীতিমতো কঠিন। অথচ লক্ষ্য করেছি—আপনারাও হয়তো দেখেছেন—তামিলনাড়ু অঞ্চলে গৃহলক্ষ্মীরা প্রতিদিন তাঁদের ভদ্রাসনের সম্মুখভাগ ধৌত করে এ জাতীয় নক্‌শা আঁকেন।



চিত্র 7.9 ষড়দন্তজাতক-চিত্র, অজন্তা, দশমগুহা

* * *

দৃষ্টিনন্দন চক্রগুলির শৈল্পিক বিচারে ক্ষান্ত দিয়ে অনধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তন্ত্রমতের তত্ত্বকথা কিছুটা বুঝবার চেষ্টা করা যাক। কারণ দেখা যাচ্ছে ভারতে তান্ত্রিকদের অভ্যুত্থান এবং মন্দির-ভাস্কর্যে মৈথুনরত মিথুনের আবির্ভাব প্রায় সমকালের। দুটি সম্ভাব্য অভ্যুপগম স্বীকার্য। এক : এ দুটি ঘটনা কাকতালীয়। দুই : মন্দিরভাস্কর্যে তান্ত্রিক প্রভাব পড়েছে। এবার সেটাই আমরা যাচাই করে দেখব। সৃষ্টিতত্ত্বের আদি পর্যায়ের বর্ণনা *বৃহদারণ্যকে* এবং তন্ত্রমতে সমান্তরাল। *বৃহদারণ্যক* বলছেন; একমেবাদ্বিতীয় পরমপুরুষ প্রাণসৃষ্টির 'লীলা'য় স্বয়ং এবং স্বেচ্ছায় দ্বিধাবিভক্ত হলেন। তাঁর একটি অংশ হল· পরমপুরুষ—সম্ভাবনাময় বীজের মূলাধার; অপর অংশটি হল জগন্মাতা: বীজকে প্রাণবন্ত করা তথা লালনকরার ধারকাঙ্গ।

আশ্চর্যর কথা : বিভিন্ন সভ্যতায় পণ্ডিতেরা একে অপরের প্রভাব ব্যতিরেকে একই সিদ্ধান্তে এলেন : পরমপুরুষ অকর্মক অথচ জগন্মাতা শক্তিস্বরূপিণী, সকর্মক। তান্ত্রিক মতবাদেও সেই একই সিদ্ধান্তের প্রতিফলন : পরমপুরুষ নির্গুণ বা গুণাতীত নিষ্ক্রিয় (স্বরূপ) অথচ তাঁর পরিপূরক মাতৃসত্তা সগুণ, সক্রিয়, শক্তিস্বরূপা। শক্তি উপাসকেরা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দ থেকে এই মূল ধারণার বশবর্তী হয়ে নানান ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে মুক্তিসন্ধানী। কিন্তু এ বিষয়ে লিখিত পুঁথি পাওয়া যাচ্ছে নবম শতাব্দীর পরবর্তীকালে। তন্ত্রসাধকেরা নানান গুহ্য ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে, চক্রসাধনায়, বিচিত্র সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহারে, নিজ নিজ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে আত্মনিমগ্ন ছিলেন। মন্দিরগাত্রে সর্বসমক্ষে সেসব গুহ্যবার্তা প্রকাশে তাঁদের ছিল শুধু অনীহা নয়, ঘোরতর আপত্তি।

ক্রমে তন্ত্রসাধনার তিনটি স্তর দেখা দিল। সর্বোচ্চস্তরে তান্ত্রিকসাধকদের মূল লক্ষ্য শক্তিস্বরূপিণীতে বিলীন হওয়া, শুদ্ধাভক্তির পথে মুক্তি লাভ করা। দ্বিতীয় স্তরে — রাজন্যবর্গ ও ক্ষত্রিয় অভিজাতদের লক্ষ্য : পার্থিব লাভ, ক্ষমতা, অর্থ, ভোগ্য দ্রব্য : 'রূপং দেহি, ধনং দেহি, জয়ং দেহি'—ইত্যাদি।

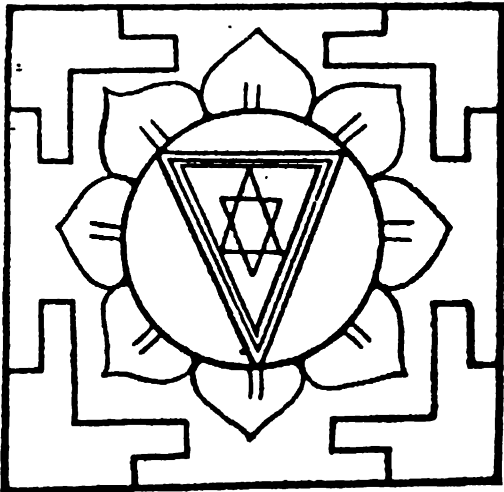
সর্বনিম্নস্তরে সাধারণ মানুষ তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে নানান প্রার্থনা জানায় মাকে : রোগমুক্তি, ব্যবসায়ে লাভ, শত্রুর মুণ্ডপাত, মামলায় জয়লাভ। প্রয়োজনে জোড়া পাঁঠা মানত করে। ফলে তান্ত্রিকের লক্ষ্য হয়ে গেল সুদূরপ্রসারী : পরামুক্তি থেকে অপরা ভোজবিদ্যা। শুদ্ধাত্মা তান্ত্রিকের কাছে যা নাকি প্রতীকচিহ্ন তাই হয়ে গেল তামসাচারীর দৃষ্টিতে স্থূল যৌন-ক্রিয়া!

চীনের ধারাবাহিকতায় আমরা একই দৃশ্য দেখতে পাই। লাও-ৎসে (570-500 খৃঃ পূঃ) ছিলেন কন্‌ফুশিয়াসের (550-480 খৃঃ পূঃ) চেয়ে দুই দশকের অগ্রজ এবং গৌতমবুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক। তিনিই 'তাও-দর্শনের' প্রবক্তা। তাঁর মূল ধর্মগ্রন্থটির নাম '*তাও-তেঈ-চিঙ্*' অর্থাৎ "*তাও ও তেঈ-এর সন্দর্ভ*"। 'তাও' চৈনিক শব্দটির অর্থ : 'মহান—The Great' এবং তেঈ-শব্দের অর্থ তেজ। তাও = ব্রহ্ম, তেঈ = শক্তি।

স্যার জন উড্রফের বক্তব্য, অনুবাদে : তাও ধর্মমতানুসারে সৃষ্টির আদিতে, বর্তমানে এবং অনন্ত ভবিষ্যৎকালে নিরবধিকাল ছিলেন, আছেন ও থাকবেন এক অনন্ত সত্য (Reality)। তাঁকে বলা হয় হুয়ান (*Huan*) অর্থাৎ তা চিররহস্যাবৃত। কোনো পার্থিব ভাষার মাধ্যমে তাঁর স্বরূপ ব্যাখ্যার অতীত। তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর। 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ/ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।।'

স্যার উড্রফ তাওদর্শন থেকে যে তত্ত্বকথা শুনিয়েছেন অর্থাৎ চীনা দার্শনিকের পরমপুরুষ সম্বন্ধে যে ধ্যানধারণা, তার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলে যায় উপনিষদের সূত্রগুলি। তাও-দর্শনের সমান্তরালে যখন পাঠ করি ঈশোপনিষদের শ্লোক তখন বিশ্বাস করা কঠিন হয় যে, চৈনিক দার্শনিক এবং ভারতীয় ঋষি কেউ কাউকে চিনতেন না, জানতেন না। ঈশোপনিষৎ বলছেন :

"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।"

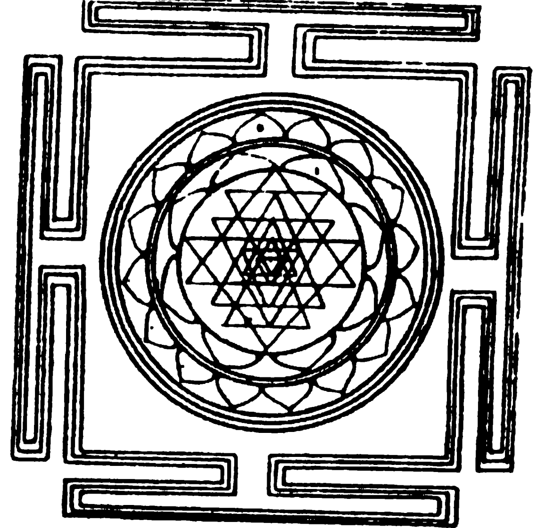


চিত্র 7.10 কালীযন্ত্র

[পূর্ণ থেকে পূর্ণকে বিয়োগ দিলে অবশিষ্ট থাকবে : পূর্ণ। অঙ্কশাস্ত্রমতে ∞ − ∞ ≡ ∞]

লাও-ৎসে তাঁর *তাও-তেঈ-কিং* ধর্মগ্রন্থে বলছেন :

তাও একমেবাদ্বিতীয়ম্, শাশ্বত, অনন্ত, স্বয়ম্ভু, সর্বত্র বিরাজমান, অপরিবর্তনশীল এবং পূর্ণ।



চিত্র 7.11 শ্রীযন্ত্র

কোনোও খণ্ডমুহূর্তে (আমাদের বোধগম্য ভাষায়—কারণ তত্ত্বটা সময়ের অতীত) তাও নিজ সত্তা থেকে তাঁর শক্তি 'তেঈ'কে নির্গত করেন। সেই শক্তি পর্যায়ক্রমে দ্বিবিধ সত্তায় বিকশিত হন। তাঁদের সংজ্ঞা 'ঈন' (Yinn) এবং য়্যাঙ (Yang) এবং ওই দ্বৈতভাবের ঘনীভূত সত্তায় সৃষ্ট হল স্বর্গ ও মর্ত্য। তার মাঝখানে পটাকাশ। ক্রমে সৃষ্ট হল প্রাণবন্ত জীবসমূহ। .... ঈন হলেন স্থিতি (নিবৃত্তি)। পরন্তু য়্যাঙ হচ্ছেন গতি বা কর্ম। ফলে তা নিবৃত্তির বিপরীতধর্মী। তা বিকাশমুখী (প্রবৃত্তি)।[11]

স্যার উড্রফের মতে তাও-দর্শন ও তান্ত্রিক ধর্মের মূল তত্ত্ব অভিন্ন। তন্ত্রসাধকের প্রতীতি নিজেকে শিবের (ঈন-এর) সঙ্গে একীভূত মনে করা; তাঁর সহধর্মসাধিকাকে শক্তিস্বরূপার (য়্যাঙের) সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য কল্পনা করা। ফলে মৈথুনকার্য হয়ে ওঠে এক মহাযজ্ঞ। নরনারীর সাধারণ সঙ্গমের সঙ্গে তা সম্পর্ক বিরহিত।

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রসার ও মন্দির-ভাস্কর্যে তার প্রভাব

ঋষি বশিষ্ঠ আহৃত বামাচার, যা তন্ত্রশাস্ত্ররূপে ভারতে প্রতিষ্ঠা পেল, তার সূচনা হয়েছিল খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে। মাত্র দুই শতকের ভিতর তা সমগ্র ভারতে প্রসারলাভ করে। অষ্টম শতকে রচিত *হেবজ্রতন্ত্রে* চারটি তন্ত্রপীঠের উল্লেখ পাই। প্রধান তান্ত্রিক পীঠস্থান—যা আশা করা গিয়েছিল –প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের কামাখ্যায়। বাকি তিনটি : জলন্ধর (পাঞ্জাব), ওডায়ন (কলিঙ্গ) এবং পূর্ণগিরি (বিজাপুরের কাছে)।

ডঃ দেবাঙ্গনা দেশাই তাঁর গবেষণা-গ্রন্থে বলছেন :

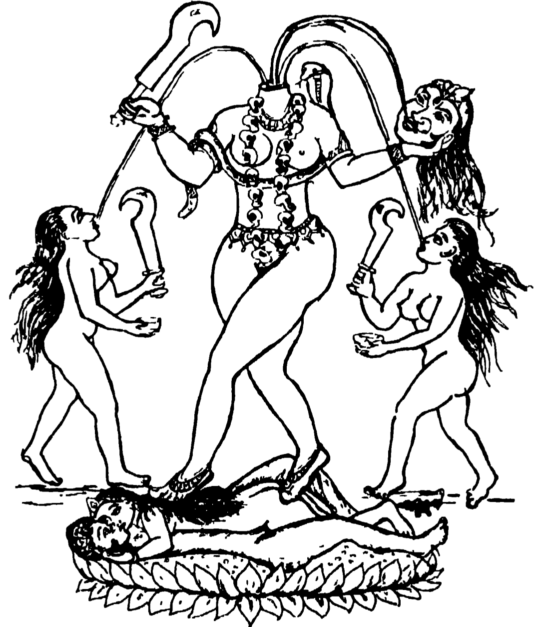
> প্রথম পর্যায়ের চারটি তন্ত্রপীঠ ক্রমে প্রসারিত হল সাতটিতে, পরে দশটিতে এবং অনতিবিলম্বে একান্নপীঠে।....*রুদ্রযামলতন্ত্রে*—আমাদের অনুমান যা 1052 খ্রিস্টাব্দের পূর্বে রচিত—তাতে মাত্র দশটি পীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলি : (i) কামরূপ, (ii) জলন্ধর, (iii) পূর্ণগিরি (উড়িয়্যা) (iv) উডয়ন (উড়িষ্যা), (v) বারাণসী, (vi) জ্বলন্তি (জ্বালামুখী) (vii) মায়াবতী (হরিদ্বারের কাছে), (viii) মধুপুরী (মথুরা), (ix) অযোধ্যা, (x) কাঞ্চীপুরম।
>
> এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, অশ্লীল ভাস্কর্য বিষয়ে বিখ্যাত/কুখ্যাত স্থানের উল্লেখ এই তালিকায় নেই। খাজুরাহো, খর্জুরবাহ বা জেজাকভুক্তির নাম এই তালিকায় নাই। একই ভাবে দেখছি, অন্যান্য মন্দিরগুলি, যেখানে অশ্লীলমূর্তি বর্তমান, তাও তালিকাভুক্ত করা হয়নি, যথা মধেরা, সূণক, মোহ্‌তাপ, ভাবকা, গলতেশ্বর, দাবই, বেলুড়, হালেবিড, এমনকি সূর্যক্ষেত্র অর্থাৎ কোনার্ক-কেও তালিকাভুক্ত করা হয়নি।[12]

এ প্রশ্ন শ্রীযুক্তা দেশাই কেন তুলেছেন তা আমাদের বোধগম্য হয়নি। কারণ *হেবজ্রতন্ত্র* অথবা *রুদ্রযামল* রচিত হবার পরবর্তীকালেই তো এইসব মন্দিরে মিথুনাচারের প্রাবল্য লক্ষিত হয়। যথা খাজুরাহো, কোনার্ক, মোধেরা, মোহ্‌তাপ, বেলুড়, হালেবিড প্রভৃতি। ফলে এ প্রশ্ন তো অবান্তর। অবশ্য পরবর্তী তালিকায় লক্ষ্য করছি কিছু স্থানের নাম সংযোজিত হয়েছে, তান্ত্রিক পীঠ হিসাবে, যেখানে মিথুনাচার মন্দিরভাস্কর্যে সাদরে স্বীকৃত। যথা : একাম্রক্ষেত্র (ভুবনেশ্বর), পুরুষোত্তমক্ষেত্র (পুরী), এল্লাহ্‌পুরা (ইলোরা), দ্বারাবতী (দ্বারকা), বারাণসী, কাঞ্চিপুরম ও নৈপাল (নেপাল)।

আমরা এ-কথা বলছি না যে, তান্ত্রিক প্রভাবেই নান্দনিক মিথুনমূর্তির হংসশোভিত নির্মল জলাশয়ে বকরূপী মৈথুনরত মূর্তিগুলি উড়ে এসে জুড়ে বসল। আমাদের অনুমান তন্ত্রশাস্ত্র যেহেতু মৈথুনকে স্বীকৃতি দিল তাই হয়তো এ-জাতীয় মিথুনমূর্তি মন্দিরগাত্রে উপস্থিত হবার সুযোগ পেল। তান্ত্রিকের ধর্মাচরণ গুহ্যসাধনা, তাঁরা কোনোদিনই তাঁদের কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যে আনতে চাননি, বা চান না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে : তান্ত্রিক প্রভাবেই যদি ধর্মসাধনার সঙ্গে মৈথুনকার্য প্রথম যুক্ত হয়ে থাকে তাহলে মন্দির-ভাস্কর্যে কেন তা প্রথম দেখা গেল কলিঙ্গে? কেন নয় তান্ত্রিকদের আদিপীঠ কামরূপী কামাখ্যায়? অথবা মহাযান বৌদ্ধধর্মের সে-কালীন সঙ্ঘারামগুলিতে। আমরা এ প্রশ্নের অনুমাননির্ভর প্রত্যুত্তর করতে পারি মাত্র।

তন্ত্রসাধনা সর্বভারতীয় স্বীকৃতিলাভের পূর্বযুগেই মহাযান ধর্মের একটি শাখা—বজ্রযান, দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় কোন কোন অঞ্চলে—তিব্বতে, নেপালে, ক্রমে গৌড়ে, বিক্রমশীলায়, হয়তো বা নালন্দায়। প্রায় সমান্তরালে, হয়তো সামান্য আগুপিছু, গ্রহণ করছে তান্ত্রিক



চিত্র 7.12 দশমহাবিদ্যা—ছিন্নমস্তা

বামাচারীরা। সেকালীন বৌদ্ধ-সঙ্ঘারামগুলি ছিল পূর্বভারতে—নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, রত্নগিরি, ললিতগিরি প্রভৃতি। যদিও সমকালে দেখা যাচ্ছে, তিব্বত-ভূটান বা নেপালে সংঙঘারাম-প্রাচীরে যৌনকর্মের নগ্নরূপ অঙ্কিত হয়েছে, তবু ভারতে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার-চৈত্যে তা আদৌ প্রতিফলিত হয়নি। গত শতাব্দীর শেষাশেষি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি USESCO-র সহযোগিতায় একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেন : 'তন্ত্রায়ন-আর্ট। সেই অ্যালবামে 270টি আলোকচিত্রে মহাযান-ভাস্কর্যের নমুনা পাই। অবলোকিতেশ্বর, তারা, ভৈরব, জম্ভল, মঞ্জুশ্রী, প্রজ্ঞাপারমিতা, হেবজ্র, মাবিচী, হারিতী প্রভৃতির মূর্তি। অধিকাংশই এককরূপে উপস্থিত, যুগলে নয়।



চিত্র 7.13 দশমহাবিদ্যা—ধূমাবতী

ভূমিকায় অধ্যাপক সবসীকুমার সরস্বতী লিখেছেন :

> চিত্র-সংকলনে একটি তত্ত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সংকলনে মিথুনাচারের কোনও প্রভাব পড়েনি। অথচ যেখান থেকে এই মূর্তিব আলোকচিত্র সংগৃহীত সেইসব শিল্পতীর্থের সাহিত্যে এবং ধর্মাচরণে মিথুনাচাবের প্রভাব অনস্বীকার্য। অবশ্য সেইসব শিল্পতীর্থের শেষ পর্যায়েই তা যথেষ্টভাবে প্রতিফলিত।... দেবদেবীর মূর্তিনির্মাণ-রীতিব (iconic forms) সমকালেই দেখা যায় নেপাল, তিব্বত ও চীনদেশের শিল্পপরিকল্পনায় যৌনাচারের প্রতিফলন। সম্ভবত ওইসব অঞ্চলের চিন্তাধারা ও বাতাবরণ ছিল এ জাতীয় প্রকাশভঙ্গিমার সহায়ক।[13]

বজ্রযান ও তান্ত্রিক শিল্পে চৈনিক প্রভাব

য়্যাঙ-ঈন দ্বৈতবাদ ভাবতেব দুটি ধর্মমতকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমত বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান, দ্বিতীয়ত ব্রাহ্মণ্যধর্মের শাক্ততন্ত্র। কিন্তু প্রভাবের প্রতিফলন হল ভিন্ন ভিন্ন রূপে। এতক্ষণ আমরা দার্শনিক ও তাত্ত্বিক বিচারে নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলাম। এবার বরং মন্দিরভাস্কর্যে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যাক :

মধ্যযুগে কোনো শাক্তমন্দিরেব ভাস্কর্যে মিথুনাচার প্রবল অথবা প্রকটরূপে প্রতিফলিত হয়নি। বস্তুতপক্ষে এ-কথা সর্বযুগের মন্দিব-ভাস্কর্য সম্বন্ধেই বলা চলে। একমাত্র ব্যতিক্রম ভুবনেশ্বরেব বৈতাল দেবদেউল। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের বামাচাব তাঁদেব মণ্ডলে বা চক্রেই আবদ্ধ ছিল—মন্দির-ভাস্কর্যে তার প্রতিফলন হয়নি।

বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে প্রভাবটা ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ কবল। এ-কথা অনুমান করা যায় যে, মহাযান ধর্মমত থেকে বজ্রযানের উদ্ভব হয়, চীনাচারের প্রভাবে। থেরবাদী (হীনযান) সন্ন্যাসীর মূল লক্ষ্য ছিল : 'নিব্বান'; মহাযানীদের : 'বুদ্ধত্বলাভ' এবং বজ্রযানীব 'বজ্রসত্ত্বলাভ'—অর্থাৎ দৈবক্ষমতায় 'বিভূতিলাভ'।

সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, এশিয়া মহাদেশের এই দুই প্রাচীন প্রাচী—উপবৃত্তাকার এশীয় সংস্কৃতির দুই নাভি, চীন ও ভারতবর্ষ — পরস্পরের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয় 221 খ্রিঃ পূর্বাব্দে। চীনের সিংহাসনে তখন সম্রাট শী হুয়াঙ তি । সম্ভবত মৌর্যসম্রাট অশোক প্রিয়দর্শী কয়েকজন থেরবাদী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে চীনদেশে প্রেরণ করেছিলেন।

"যদিও সঠিক তারিখ বলা যায় না, তবে এ-কথা মনে করা সঙ্গত যে, এশিয়ার এই দুই প্রাচীনতম মহান সভ্যতা ইতিহাসের উষাযুগ থেকেই একে অপরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিল। চীন সম্রাট চ'ঈন এবং মৌর্যসম্রাট



চিত্র 7.14 দশমহাবিদ্যা—বগলা

অশোকের আমলে তাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। ইতিহাস সরকারীভাবে বলে : বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রথম প্রবেশ করেছিল 2 খ্রিঃ পূর্বে। কিন্তু চীনা-ইতিহাসে পাওয়া যায় একটি তথ্য : খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দিতে চীনসম্রাট একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজককে কারারুদ্ধ করেছিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেইসব প্রথম যুগের বৌদ্ধ পরিব্রাজকের দল কোন্ পথে হিমালয় অতিক্রম করে মহাচীনে গিয়েছিলেন? পরবর্তীকালেই বা কোন্‌পথে এসেছিলেন চীনা পরিব্রাজকের দল?"[14]

না, ভারত ভূখণ্ডের পূর্বপ্রান্ত দিয়ে নয়। তিব্বতের পথেও নয়। স্থলপথে বহির্ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের তিনটি সড়কই ছিল উত্তর পশ্চিমে—খাইবার এবং বোলান গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে। তিনটি পথই প্রায় সমান্তরালে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত (চিত্র 7.18)। প্রথমটি উত্তরতম গিরিপথ। সমরকন্দ, তাশখন্দ, অতিক্রম করে তিয়েনশান পর্বতমালার উত্তর দিক বরাবর চলে গেছে পশ্চিমে। চীনের প্রবেশদ্বার তুনহুয়ানে। পথে পড়বে ইস্‌ক্কুল হ্রদ, লবণর, উমরুচি, তুরফান। দ্বিতীয় সড়কটি পামীরগ্রন্থী অতিক্রমণে তারিম নদীর অববাহিকা ধরে চলে গেছে পূর্ববর্তী সড়কের সমান্তরালে। এ পথে পড়বে মরুপান্থশালা—খাশগড়, বামিহান, তুরফান। তৃতীয় গিরিপথটি তারিম নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর—খোটান, চারচান, মীরান স্পর্শ করে। সহস্রাব্দচিহ্নিত এ-পথকে ইতিহাস বলেছে রেশম-সড়ক। পথে কোনও 'সাইন-বোর্ড' নেই, কিন্তু সার্থবাহের দল কখনো পথভ্রষ্ট হত না। সমস্ত সড়কেই মানুষ আর উটের কঙ্কাল ছড়ানো। তারাই পথ দেখায়। ইসলামের অভ্যুত্থানের পর এই মরুপথগুলি ক্রমশ বন্ধ হয়ে যায়। দুটিমাত্র মরুপান্থশালা হয়তো আপনাদের পরিচিত। প্রথমটি তাশখন্দ—সেখানে ইন্দো-পাক যুদ্ধে বিজয়ী লালবাহাদুর শাস্ত্রীজি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দেবার পর পরলোকগমন করেন। দ্বিতীয়টিকেও হয়তো চিনবেন : বামিহান। যেখানে ছিল পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা অতি বিশাল কিছু বুদ্ধমূর্তি। তালিবানী ধর্মান্ধ কিছু অশিক্ষিত বর্বর যে মূর্তিগুলিকে সম্প্রতি বোমা মেরে ভেঙে ফেলেছে। মূর্খ বর্বরগুলো এটুকুও বুঝল না যে, এই মূর্তিগুলি নির্মাণ করেছিলেন তাদেরই আফগান পূর্বপুরুষ। তারা 'কাফের' ছিল কি না এ প্রশ্ন অবান্তর; কারণ মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছিল হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী যুগে।

আমরা এতকথা বলছি শুধুমাত্র বোঝাতে যে, চীনাচার চীনদেশ থেকে ভারতবর্ষে এসে থাকতে পারে কিন্তু রেশম-সড়কের ধারে ধারে শত-শত মরুপান্থশালায় যে সহস্র-সহস্র চৈত্য-বিহার নির্মিত হয়েছিল এবং সে গুলিতে যে লক্ষ লক্ষ মূর্তি খোদিত হয়েছিল, তার কোনো একটিতেও কিন্তু 'মিথুনাচার' উৎকটরূপে প্রতিভাত হয়নি। অথচ এই পথেই যাতায়াত করেছেন অতীশ দীপঙ্কর, এসেছে মহাযান ধর্মমতের সম্প্রসারণে বজ্রযানী চিন্তাধারা—এসেছে পঞ্চ-মকারের পঞ্চম-মকার।

থেরবাদী (হীনযানী) যুগে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণের অনুমতি ভাস্করদলকে দেওয়া হয়নি। বুদ্ধদেব স্বয়ং মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করতেন না; কিন্তু কালাপাহাড়, সাভোরানালা বা তালিবানী বর্বরদের মতো তিনি মূর্তিবিদ্বেষী বা শিল্পবিরোধীও ছিলেন না। জীবিতকালে তিনি যে সম্মান

পেয়ে গেছেন সারা বিশ্বে তেমন নিরঙ্কুশ শ্রদ্ধাসম্মান অন্যকোনো ধর্মপ্রবর্তক লাভ করেননি। তিনি ছিলেন অসামান্য বুদ্ধিমান। আশঙ্কা করেছিলেন যে, তাঁর তিরোধানের পর ভক্তের দল বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করে পূজা-অর্চনা করতে চাইবে। তাই নিজের মূর্তি গড়ায় কঠোর নিষেধ আরোপ করেছিলেন। শিল্পে তাঁকে চিহ্নিত করতে হলে ভাস্করদল কতকগুলি প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করতেন : শ্বেতহস্তী, স্তূপ, ধর্মচক্র, শূন্য-সিংহাসন, পদচিহ্ন, বোধিবৃক্ষ (অশ্বত্থগাছ) প্রভৃতি।

বুদ্ধদেবের প্রথম মূতিটি নির্মিত হয় মহাযানী আমলে। সম্ভবত গান্ধার শিল্পে। মহাপরিনির্বাণের অন্তত তিনশ বছর পরে।

শরদিন্দুর অনবদ্য কাহিনি *চন্দনমূর্তি* ভাস্কর্য এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক যুগের প্রাচীনতম মূর্তি-নিদর্শন বোধকরি ভুবনেশ্বরের অনতিদূরে ধৌলী পর্বতের পাদদেশে। সম্রাট অশোক নির্মিত অযুত-নিযুত মূর্তির ভিতর এইটিই প্রথম—কলিঙ্গ যুদ্ধের অবসানে অশোক প্রিয়দর্শী নির্মিত প্রথম শিলালেখের পাশে। (চিত্র 7.19) স্থানীয় একটি নাতিবৃহৎ বালিপাথর খোদাই করে প্রায় দেড় মিটার উচ্চতায় গড়া এটি হস্তীর সম্মুখভাগ। বলা বাহুল্য, এটি গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবসূচক। কারণ তিনি মাতৃগর্ভে প্রবেশ করার অব্যবহিত পরে তাঁর জননী স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, একটি শ্বেতহস্তী তাঁর উদরদেশের বামভাগে প্রবেশ করছে!

তারপর প্রায় চারশ বছর ধরে থেরবাদী বৌদ্ধ শিল্পীর দল নানা তীর্থস্থানে অযুত-নিযুক্ত ভাস্কর্য গড়ে চলেন—ত্রিমাত্রিক এবং অর্ধোৎকীর্ণ (alto-relievo) : ভারহুত, বুদ্ধগয়া, সাঁচি, অজন্তা, কার্লে, ভাজা, কাহ্নেরি, নাসিক, প্রভৃতি। সেখানে কিছু-কিছু দাতাদম্পতির ভাস্কর্য আছে—তারা মিথুনাচারের অঙ্গ নয়। 'কৃতজ্ঞতাচারের' অঙ্গীভূত। ভারতের ভাস্কর্য-ইতিহাসের প্রথম অর্ধ-সহস্রাব্দকালে যুগলমূর্তি ব্যতিরেকে মিথুনাচারের দেখাই পাওয়া যায় না। মূর্তিগুলি প্রেমাবেগমণ্ডিতও নয়, অর্থাৎ তাদের রোম্যান্টিকও বলা যায় না।

তখনও বৌদ্ধ দেবদেবীরা—ভৈরব-তারা, জম্ভল, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতিরা অনাগত। তাঁরা আসবেন মহাযানী যুগে। ফলে দেবদেবীদের যৌথ উপস্থিতিও অসম্ভব ছিল সে যুগে।

তারপর এলেন মহাযানীরা। স্থবিরবাদীদের (থেরবাদী = হীনযান) বিতারিত করে বৌদ্ধধর্মের দখল [illegible] মহাসঙ্ঘিকের (মহাযানী) দল। [illegible]দেবের মহাপরিনির্বাণের প্রায় শতবর্ষ পরে বৈশালী[illegible] [illegible] ধর্মমহাসভায়। মহাথের রেবতের সভাপতিত্বে এই সভা



চিত্র 7.15 দশমহাবিদ্যা—মাতঙ্গী

আহূত হয়েছিল। তারপর তৃতীয় মহাসভাটি অনুষ্ঠিত হয় পাটলীপুত্রে, সম্রাট অশোকের আমলে। আসতে থাকেন মহাযানী দেবদেবীরা দু-একশ বছরের ভেতরেই।

হিন্দু প্রস্তরশিল্পীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ক্রমে মহাযানী ভাস্করেরাও তাদের দেবদেবীর যুগল মূর্তি গড়তে শুরু করল। বলা বাহুল্য তন্ত্রায়ন-শিল্পে সেটা প্রায়শই প্রচ্ছন্ন; বজ্রযানী শিল্পে ক্ষেত্রবিশেষ যথেষ্ট প্রকট এবং নিরাবরণ। প্রথমোক্ত শিল্পে সাধারণ দর্শক যা বোঝে, তত্ত্বজ্ঞানীরা বোঝেন তার চেয়ে কিছু বেশি। দ্বিতীয়োক্ত শিল্পে শিল্পীর বক্তব্য সকলে সহজেই বুঝে নিতে পারেন—অন্তর্নিহিত তত্ত্বকথা ব্যতিরেকেও। হয়তো বক্তব্যটা কিছু জটিল হয়ে গেল—উদাহরণের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা হতে পারে।

তান্ত্রিক দেবী : মহাকালী এবং দশমহাবিদ্যা

শাক্ত এবং তান্ত্রিকদের প্রধান উপাস্য দেবী হচ্ছেন কালিকা বা মহাকালী। তাঁর দশটি বিশেষ রূপ আছে, যাকে বলা হয় : দশমহাবিদ্যা।



চিত্র 7.16 দশমহাবিদ্যা—কমলা

তালিকার সর্বপ্রথমে আছেন : মহাকালী।

বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তবু সংক্ষেপে ধ্যানমূর্তির বিবরণ দিই : মা চতুর্ভুজা। দক্ষিণাঙ্গে দুই হস্তে উপরে-নিচে যথাক্রমে অভয়মুদ্রা এবং বরদামুদ্রা। উপরের বামহস্তে রক্তাক্ত খড়্গ এবং নিচের হাতে অসুরের ছিন্নমুণ্ড। গাত্রবর্ণ : নিকষ মসীবর্ণা থেকে শান্ত শ্যামল; কখনো বা স্নিগ্ধ নীলাভ। আলুলায়িত কুন্তলা। কণ্ঠে নৃমুণ্ডমালার শতনরী। কালিকাপুরাণ অনুসারে অসুরনিধনে মগ্নচৈতন্য থাকায় অজ্ঞাতসারে তাঁর পতি শিবের বক্ষে চরণপাত করেছেন। খণ্ডমুহূর্তে চেতনা ফিরে পেয়ে সেজন্য লজ্জিতা হয়েছেন। তাঁর নির্গত জিহ্বার সেটাই নাকি ব্যঞ্জনা (চিত্র 7.1)।

শিল্পদৃষ্টির নান্দনিক বিচারে বলা যায়, এ মূর্তিতে একাধিক 'রস'-এর সমন্বয় ঘটেছে। যথা : রুদ্র, ভয়ানক, অদ্ভুত, কারুণ্য এবং শান্ত।

কিন্তু এ ছাড়াও মহাকালীর ধ্যান মূর্তিতে তন্ত্র-সাধনার একটি গূঢ় ব্যঞ্জনা নিহিত। তাতে উপরোক্ত পঞ্চরসের অতিরিক্ত আরও কিছুর আভাস যেন পাওয়া যায়।

সে-কথা আলোচনার পূর্বে মায়ের অপর নয়টি বিদ্যার নাম, এবং ধ্যানরূপের উল্লেখ করা প্রয়োজন :

তারা : এই ধ্যানমূর্তিটি মহাযানী বৌদ্ধরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রধান দেবীরূপে।

ষোড়শী : ষোলোটি বসন্তের সমাহারে মায়ের প্রস্ফুটিত সৌন্দর্যই এখানে প্রধান্য লাভ করেছে।

6. **ছিন্নমস্তা** : স্বহস্তে নিজ মস্তকটি দেহচ্যুত করে স্বীয় রক্তপানরতা। রক্ত ত্রিধারায়। একটি ছিন্নমস্তা স্বয়ং পান করছেন, অপর দুটি পানরতা তাঁর দুই সহচরী . ডাকিনী ও বর্ণিনী (চিত্র 7 12)।

7. **ধূমাবতী** : বিগতর্ভতা। বৃদ্ধা। স্তনবসিতবপু। সূর্পসহযোগে ধান ঝাড়ছেন (চিত্র 7.13)।

8. **বগলা** : দ্বিভুজা। পীতাম্বরা। রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা। শত্রু নিধনের জন্য ইনি পূজিতা (চিত্র 7.14)।

9. **মাতঙ্গী** : শ্যামাঙ্গী। মস্তকে অর্ধশশীকলা। ত্রিনয়না। সিংহাসনে উপবিষ্টা। চতুর্ভুজা। আয়ুধ : খড়্গ, ঢাল, পাশ ও অঙ্কুশ (চিত্র 7.15)।

10. **কমলা** : শান্ত লক্ষ্মীশ্রী। সুবর্ণ কান্তি। পদ্মের ওপর পদ্মাসনে অথবা ললিতাসনে উপবিষ্টা। দুই দিকে দুটি, কখনো চারটি হস্তী স্বর্ণকলস থেকে তাঁর দেহে জলসিঞ্চন করছে (চিত্র 7.16)।

কালিকাপুরাণ মতে দাম্পত্যকলহের হেতুতে মহাদেবকে স্বমতে আনতে দেবী এই দশরূপ ধারণ করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে কাহিনীটি ছন্দবদ্ধপদে সুবিন্যস্ত।

এই দশরূপ ব্যতিরেকেও মায়ের আরও কিছু নামরূপ আছে। যথা : মহিষমর্দিনী, চামুণ্ডা, চণ্ডী প্রভৃতি। সে-কথা আপাতত থাক।

দশমহাবিদ্যার রূপাবলীর সঙ্গে নান্দনিক-বিচারে শিল্পরসের একটা সাযুজ্য আছে বলে আমাদের ধারণা। স্বীকার্য, এ-ধারণার পশ্চাদপটে কোনো পুঁথির নির্দেশ দিতে আমরা অপারগ। শিল্পাচার্যরাও এ-কথা বলেননি। ফলে, এ আলোচনা আমাদের বাতুলতা বা দৃষ্টিবিভ্রম বলে পণ্ডিতে অগ্রাহ্য করলে আমাদের কোনো প্রতিবাদী প্রামাণ্যে নজির নেই।

আমাদের ধারণা : শিল্পশাস্ত্রে যে প্রধান নয়টি 'রস'-এর কথা বলা হয়, তার যেন প্রতিরূপ ঘটেছে এই দশমহাবিদ্যার ধ্যানমূর্তিগুলিতে। স্বতই প্রশ্ন হবে : সেক্ষেত্রে কেন 'দশ' মহাবিদ্যা? কেন নয় 'নয়'-মহাবিদ্যা? এ বিষয়েও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমে দশমহাবিদ্যার ধ্যানমূর্তির সমান্তরালে নান্দনিক মূল রসটির উল্লেখ করি :

1. **কালী** : দশটি ধ্যানমূর্তিতে একমাত্র কালীকেই দেখতে পাচ্ছি তাঁর পতিদেবতার সঙ্গে। অপর নয়টি দেবীমূর্তি একক। হিন্দুদেবী তারা অবশ্য শিবসহ উপস্থিত। কিন্তু মহাযানী তারা মূর্তিতে শিব অনুপস্থিত। আমরা কালী মূতির্তে আরোপ করতে চাই : **আদিরস**। শুধু দশমহাবিদ্যায় আদিস্থান গ্রহণ করার জন্য নয়। সে আলোচনা পরে করা যাবে।

2. **তারা** : শব্দটি 'তারিণী' থেকে উদ্ভূত। এঁর মূল ব্যঞ্জনা ভক্তের শত্রুনিধন। ভক্তকে রক্ষা করা। এ মূর্তি বীরাঙ্গনা। ফলে পরিবেশ্য রস : **বীর**।

3. **ভুবনেশ্বরী** : এ মূর্তিতে মাতৃত্ব ভাবের প্রাধান্য। 'মা', যাঁর অপার শুভ্র করুণা মানবজীবনে প্রভাতসূর্যের মতো কিরণ দেয়, বিতরণে কার্পণ্য করে না, প্রতিদান চায় না, শুধু উন্মুখ উদার আগ্রহে মাতৃস্নেহ বিতরণ করে যায়—এই সেই জগজ্জনীর মূর্তি : **কারুণ্য**রসে পূর্ণ।

4. **ভৈরবী** : ভৈরবের শক্তিস্বরূপা ইনি রুদ্রাণী। এঁর রস : **রুদ্র**।

4. **ছিন্নমস্তা** : নিঃসন্দেহে **বীভৎস** রসের ব্যঞ্জনায় আপ্লুতা।

মহাভাগবৎ পুরাণে জানা যায়, একবার দক্ষরাজ কী একটা উৎসবে তাঁর কন্যা-জামাতাকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে যান। স্বেচ্ছাকৃত সজ্ঞান বিস্মরণ। প্রতিশোধ নিতে। কারণ শিব নাকি ইতিপূর্বে তাঁকে যথোচিত সম্মান জানাতে বিস্মৃত হয়েছিলেন। সদাশিবের স্বভাবগত হেতুতে। ভবানী অনিমন্ত্রিতারূপেই পিতৃগৃহে যেতে চাইলেন। শিব তাঁকে নিষেধ করেন। দুরন্ত অভিমানে প্রতিবাদ জানাতে শিবানী নিজমুণ্ড ছেদন করে রক্তপান করতে থাকেন।

গৃহিণী আত্মহননেচ্ছু হলে সব কর্তাই যা করেন, শিব তাই করলেন। অনুমতি দিলেন। শিবানী বাপের বাড়ি গেলেন। শিব যা তাঁর ধ্যানে আশঙ্কা করেছিলেন তাই ঘটল : পতিনিন্দায় ভবানী এবারে সত্যই আত্মঘাতিনী হলেন।

এ তো গেল সাধারণ্যে পরিবেশ্য কাহিনি। ধ্যানমূর্তির মূল বক্তব্যটা কী? আমরা কালীঘাট পটের একটি চিত্রের (উনবিংশ শতাব্দীর) অনুলিপি দাখিল করছি। চিত্রে (চিত্র 7.12) দেখা যাচ্ছে মায়ের দুই সহচরী,— ডাকিনী ও বর্ণিনী সম্পূর্ণ বিবস্ত্রারূপে তাঁর দু-পাশে দণ্ডায়মানা।



চিত্র 7.17 দশমহাবিদ্যা—ষোড়শী

তাঁরাও মাতৃরক্ত পানরতা। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় : উনবিংশ শতকের পটকার কিন্তু নিখুঁত পাশ্চাত্য 'ন্যূড' এঁকেছেন। সহচরীদ্বয়ের কটিদেশে বস্ত্রের চিহ্নমাত্র নেই এবং সর্বাঙ্গে নেই অলঙ্কারের কোনো আভাস। আমাদের ধারণা : এটা সম্ভব হয়েছে ইংরেজের প্রভাবে, ভারতীয় শিল্পীরা পাশ্চাত্য ন্যূডের সঙ্গে পরিচিত হবার হেতুতে। কারণ ইতিপূর্বে নিরাভরণা কোন ভারতীয় নগ্ন নারীর চিত্র বা ভাস্কর্য আমরা দেখিনি।

কালী-তারার মতো ছিন্নমস্তা চতুর্ভুজা নন, দ্বিভুজা। আরও একটি বৈশিষ্ট্য এ মূর্তিতে দর্শককে বিচলিত করে :

ছিন্নমস্তার পদতলে বিপরীত-রমণরত এক মিথুন। তাঁরা হচ্ছেন : মদন ও রতি। এই বিপরীত-রতির পরিকল্পনার জন্য উনবিংশ শতকের শিল্পীকে কিন্তু দায়ী

করা যাবে না। কয়েক শতাব্দী পূর্বে রচিত ছিন্নমস্তার ধ্যানরূপের দ্বিতীয় পংক্তিতে সে কথা আছে :

> সদাষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
> বিপরীতরতাসক্তৌ ধ্যায়েৎ রতিমনোভবৌ।।
>
> ডাকিনী-বর্ণিনীযুক্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ।
> দেবী গলোচ্ছলদ্‌রক্তধারাপানং প্রকুর্বতীম্।।

সাধকশিল্পীর বক্তব্য : তন্ত্রসাধনার শেষ 'ম'-কারটিকে অন্তিমে পদদলিত করাই তন্ত্রসাধনার শেষ শিক্ষা। প্রয়োজনে আত্মহননের মাধ্যমে। তবেই মুক্তির প্রত্যাশা করতে পার।

দশমহাবিদ্যার বাকি পাঁচটি ধ্যানরূপের আলোচনা পূর্বে এখানে অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক মুজতবা আলীর একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলি। এটি তাঁর কোনো রচনায় পড়েছি অথবা কোনও আড্ডায় শুনেছি, ভুলতে পারিনি—তা এখন ঠিক মনে পড়ছে না।

মুজতবা তখন তরুণ মাত্র। শান্তিনিকেতনের আবাসিক ছাত্র। একদিন কবির সঙ্গে কী নিয়ে যেন আলোচনা করছেন স্যার জগদীশচন্দ্র। বালক মুজতবাকে ঘুরঘুর করতে দেখে কবি জিজ্ঞেস করেন, কী রে? কিছু চাস্?

মুজতবা কুণ্ঠিতভাবে তাঁর অটোগ্রাফ-কেতাবখানা বাড়িয়ে ধরলেন বিজ্ঞানাচার্যের সামনে। জগদীশচন্দ্র স্বাক্ষরদানের পূর্বে উপদেশ হিসাবে লিখে দিলেন :

Know thyself.

আলী সুযোগ বুঝে এবার খাতাখানা বাড়িয়ে ধরেন কবির দিকে।

তিনি খাতাখানা নিয়ে দেখলেন। বিজ্ঞানাচার্য কী লিখেছেন তা পড়লেন। তারপর পরপৃষ্ঠায় স্বাক্ষরের পূর্বে লিখে দিলেন :

'Forget thyself!'

আপাতদৃষ্টিতে দুটি উপদেশ বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত বক্তব্য অভিন্ন : আত্মার স্বরূপকে

চিত্র 7.18 চিন-ভারত রেশম সড়ক

উপলব্ধি করতে হলে আত্মবিস্মৃত হওয়া প্রয়োজন। অহংবোধের মোহজাল থেকে উত্তরণই আত্মোপলব্ধির প্রথম পদক্ষেপ।

এ প্রসঙ্গে পারস্যের কবিদার্শনিক রুমির একটি উপাখ্যানও মনে পড়ছে। সেটি বাগদাদের এক আমীরের কিস্‌সা। আমীরের প্রাসাদে একটি মহাপণ্ডিত তোতাপাখি ছিল। সে শুধু কথা বলতেই পারত না, প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের মতো নানা উপদেশ দিতেও সক্ষম। আমীর প্রতিবার বাণিজ্যযাত্রার প্রাক্কালে তার তোতাবন্ধুর উপদেশ শুনে যেত—কোথায় কীদরে কোন্ বেসাতি কিনবে এবং কোথায় তা বেচবে। তোতার উপদেশে প্রতিবারই সে লাভবান হয়েছে।

একবার হিন্দুস্থাঁতে বাণিজ্যে যাবার আগে আমীর তার তোতা-ইয়ারের কাছে জানতে চাইল সে তার জন্য কী তোফা, মানে সওগাৎ, নিয়ে আসবে।

তোতা বলে, প্যারে দোস্ত্! তুমি আমার সব সুখের বন্দোবস্তই তো করে দিয়েছ—সোনার খাঁচায় থাকতে দিয়েছ, বাজারের সেরা আঙুর-আখ্‌রোট-পেস্তা-মেওয়ার ইন্তেজাম করেছ। আর কী চাইতে পারি আমি?

আমীর নাছোড়বান্দা। শেষে তোতা বললে, ঠিক আছে প্যারে-মন, তোমার বদান্যতায় আমি তো সব কিছুই পেয়েছি, শুধু একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষিত ধনের নাগাল পাইনি। এই স্বর্ণপিঞ্জর থেকে মুক্তি! তা তুমি তো হিন্দুস্তাঁতেই যাচ্ছ, সেখানে আমার বড়াভাই আছেন। তিনি মুক্তপক্ষ, মহাপণ্ডিত। হিমালয়ের বাসিন্দা। তাঁর সাক্ষাৎ যদি পেয়ে যাও তাহলে শুধিও—কীভাবে আমি মুক্তি পেতে পারি।



চিত্র 7.19 ধৌলী পর্বতের পাদদেশে হস্তিমূর্তি

আমীর বলে, তা কেমন করে হয়? আমি কিছুতেই তোমাকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দেব না। কক্ষনো না!

—দিও না। এটা তো একটা 'অ্যাকাডেমিক ডিস্‌কাশান'—মুক্তির উপায়। বড়দা কী বলল তা তো তোমার মাধ্যমেই জানব আমি। তাই না? তুমি আমাকে মুক্তি দিও না।

আমীর বলে, সহি বাৎ! এটা ন্যায্য কথা।

দীর্ঘ উপাখ্যান সংক্ষেপ করে বলি। দেশে ফেরার পথে আমীরের সঙ্গে বেমক্কা দেখা হয়ে গেল সেই জ্ঞানী বড়দা তোতার। আমীরকে দেখে গাছের ডালে-বসা বড়দা-তোতা বললে, আমীরভায়া! তুমি তো পারস্যদেশ থেকে আসছ? আমার ছোটভাইটিকে চেন? সে ওই বাগদাদেই থাকে।

আমীর বলে, আরে বড়দা! তোমার ভাই তো এখন আমার প্রাসাদেই আছে।

—'প্রাসাদে' মানে? খাঁচায় বন্দি?

—আলবৎ। তবে মামুলী খাঁচায় নয়। স্বর্ণপিঞ্জরে!

বড়দা-তোতা আর্তনাদ করে উঠল! হায় আল্লাহ্। ভাইটি বন্দি? খাঁচায় থাকে! মুক্ত নীলাকাশ তার কাছে থেকে কেড়ে নিয়েছ তুমি! This is the most unkindest cut of all!

শেক্সপিয়রের ওই ব্যাকরণ-বহির্ভূত 'মনোলগই' তার শেষ কথা। বড়দা-তোতা ধ্রাশ্ করে পড়ে গেল গাছের ডাল থেকে। পাথরের ওপর। আমীর ছুটে এল ধরে তুলতে। কী কাণ্ড! দুঃসংবাদে বড়দা-তোতা হার্টফেল করেছে।

আমীর স্তম্ভিত। অপ্রস্তুতের একশেষ!

দেশে ফিরে আমীর তার পোষা তোতার সামনে আসতেই পারে না। কিন্তু তোতা ছাড়বার পাত্র নয়। দিনরাত সে হাঁকাহাঁকি করতে থাকে। শেষমেশ আমীর একদিন এসে সবকথা তার বন্ধুকে খুলে বলতে বাধ্য হল। কাহিনি শেষ হতেই তোতা বললে, কী বললে? তুমি আমার বড়দাকে মেরে ফেলেছ?

—না না! আমি কেন মারব? আমি তাঁকে ছুঁইনি পর্যন্ত!

—লেকিন তুমহারি বাৎ শুন কর...Oh ! This is the most unkindest cut of all !

সেই ব্যাকরণ না-মানা ডবল-সুপারলেটিভ্! আমীর এবারেও ছুটে এল। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ! খাঁচার ভেতর মরে পড়ে আছে তোতার প্রাণহীন দেহটা!

এবার আর স্তম্ভিত নয়, বজ্রাহত হয়ে গেল আমীর!

খিদমদগার খাঁচা থেকে বার করে আনল মৃত পাখিটাকে। একটা রূপার পাত্রে শুইয়ে দিল। ফুলে ফুলে ঢেকে গেল তোতার শব। আমীর বললে, মীর মুন্‌শিকে বোলাও। দোস্তের জন্য আমি বাগদাদের সবসে উমদা মক্‌বারা বানিয়ে দেব।



চিত্র 7.20 নাগ রাজারানী, অজন্তা

সবাই যখন ইতিউতি ব্যস্ত তখন ফুড়ুৎ করে তোতা উড়ে গিয়ে বসল বারান্দার রেলিঙে।

আমীর আগেই বজ্রাহত হয়েছে। এখন আর কী হবে? বোকার মতো বলে, দোস্ত! তুমি মরনি?

—না দোস্ত! আমার বড়দাও মরেনি। সে তোমার মারফত আমাকে পালাবার কায়দাটা শিখিয়ে দিয়েছিল শুধু! তাহলে চলি বন্ধু!

আমীর বুঝেছে তোতাকে আর ধরা যাবে না। ধরতে গেলেই ফুড়ুৎ! তাই বললে, ঠিক আছে! তবে যাবার আগে আমাকে কিছু আখরি তওবা দিয়ে যাও! তোমার অন্তিম উপদেশ!

তোতা বলে, বেশ শোন! তুমি নিজে যদি কোনোদিন তোমার এই ভোগৈশ্বর্যের সোনার খাঁচা থেকে মুক্তি পেতে চাও তাহলে মৃত্যুর আগেই তোমাকে মরতে হবে। কামনা-বাসনার উর্ধ্বে উঠতে হবে—মৃতবৎ নিরাসক্ত হতে হবে। মুক্তির ওই একটাই পথ!

সম্ভবত মা ছিন্নমস্তাও আমাদের সেকথাই বলতে চান!

* * *

দশমহাবিদ্যার শেষার্ধের বর্ণনা এবার দাখিল করি :

6. **ধূমাবতী** : ধূমাবতী বিবর্ণা, চঞ্চলা, দীর্ঘাঙ্গী এবং সহজে রুষ্টা। বেশবাস মলিন, কেশকলাপ বিবর্ণ, তৈল-তৃষিত, রুক্ষ। দন্তহীনা, বিগতভর্তা, কাকধ্বজরথে আরূঢ়া। স্তনদ্বয় আর 'স্তোকনম্র' নয়, বিলম্বিত পয়োধর। এটি তাঁর ধ্যানমূর্তির আক্ষরিক অনুবাদ।

"বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিবর্ণ-কুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা।।
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা।
সূর্পহস্তাতিরক্তাক্ষী সূর্পহস্তা বরান্বিতা।।

বুঝুন! সেই ত্রিভুবনেশ্বরীর কী প্রচণ্ড বিবর্তন! অথচ তিনি জগন্মাতা। কুলোয় করে ধান ঝাড়ছেন, বুড়ি-মা। উপায় কী? বাছাদের দুবেলা দু-মুঠো খেতে দিতে হবে তো? জগদ্ধাত্রীর এর চেয়ে হাস্যকর পরিকল্পনা আর কী হতে পারে!

7. **বগলা** : ভয়ঙ্করী মূর্তি। সুখসাগর মধ্যে মণিময় মণ্ডপে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা দেবী শত্রুপীড়ন করছেন। কীভাবে? বামহস্তে শত্রুর জিহ্বাগ্র আকর্ষণ করেছেন এবং দক্ষিণ হস্তে ক্রমাগত ডাণ্ডশ চালাচ্ছেন!



চিত্র 7.21 অর্ধোৎকীর্ণ মিথুন, অজন্তা

"জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং
বামেন শত্রুন্ পরিপীড়য়ন্তীম।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন
পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি।।

নমামি তো বটেই। ভক্তিতে না হলেও ভয়ে। বগলামুখীর রস : **ভয়ানক**।

8. **মাতঙ্গী** : মাতঙ্গী মহাবিদ্যার রস : **অদ্ভুত**। *পুরশর্মার্ণবের* নবম তরঙ্গে তাঁর অভিধা : 'উচ্ছিষ্টা চণ্ডালী'! মানে কী? জানি না। চণ্ডালী বুঝি। কিন্তু এ তো কোন খাদ্যদ্রব্য নয়! তাহলে 'উচ্ছিষ্টা' হয় কী করে? এ তো এক অদ্ভুত মূর্তি-কল্পনা! আবার তাঁর ধ্যানমূর্তিতে বলা হচ্ছে তিনি শ্যামাঙ্গী, চন্দ্রশেখরা, ত্রিনয়না, সিংহাসনারূঢ়া। ইনি চতুর্ভুজা—খড়্গ, ঢালিকা, পাশ ও অঙ্কুশ তাঁর আয়ুধ। তা তো বুঝলাম। কিন্তু দেবীমূর্তি 'উচ্ছিষ্টা চণ্ডালী' হয় কী করে? পরিকল্পনাটা অদ্ভুত নয়?

9. **কমলা** : আদি মহাবিদ্যা মহাকালীর মতো কমলারও একাধিক নামরূপ দেখতে পাচ্ছি। শাস্ত্রীয় সমর্থন দেখাতে পারছি না, কিন্তু আমাদের অনুমান বাকি আটজনের তুলনায় এই প্রথম ও শেষজনের (কমলা বস্তুত শেষ মহাবিদ্যা—আমরা 'ষোড়শী'কে বাদ দিয়ে আলোচনা করে এসেছি বলে এ তালিকায় তাঁর ক্রম হয়ে গেছে নবম) মূর্তি-পরিকল্পনা অতি প্রাচীন। আর সেজন্যই কালীর নানান রকম ধ্যানমূর্তি—সেকথা আগেই বলেছি। অনুরূপভাবে কমলাও নানা নামরূপে বর্ণিতা : কমলা, কমলাত্মিকা, লক্ষ্মীবিদ্যা, মহালক্ষ্মী—ইনিই বৌদ্ধযুগে 'গজলক্ষ্মী'; লোকায়ত শিল্পে; কমলেকামিনী।



চিত্র 7.22 ম্যুরালে মিথুন, অজন্তা

তন্ত্রসারে কখনো বলা হয়েছে তিনি বালার্কবর্ণা, কখনো স্বর্ণপাত্রে প্রতিফলিত সূর্যালোকরশ্মির মতো উজ্জ্বল, কখনো তুষারাবৃত পর্বতের মতো শুভ্রা। আবার কখনো সৌদামিনীর মতো তাঁর দেহকান্তি। সকলের বর্ণনাতেই তাঁর চার হাত; কিন্তু আয়ুধ বর্ণনায় যথেষ্ট প্রভেদ। কারও



চিত্র 7.23 শিবোপরি উপবিষ্টা কালী

বর্ণনায় বরাভয় ও যুগল পদ্ম, কেউ বা ধ্যানে দেখছেন : ধানের মঞ্জরী, পদ্ম, কৌস্তুভমণি। সকল বর্ণনাতেই দেবী ত্রিনয়না, হাস্যময়ী, সর্বালঙ্কারভূষিতা এবং 'পৃথুলোত্তুঙ্গ-স্তনোদ্ভাসিনী'। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই তিনি সরোবর মধ্যে প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর আসীনা এবং দুই (কারো মতে চারজন) শ্বেতহস্তী স্বর্ণকলস থেকে তাঁর বরাঙ্গে গঙ্গাজল সিঞ্চন করছে।

নান্দনিক বিচারে এই কমলামূর্তির ধারাবাহিকতা বিস্ময়কর। অপর নয় মাতৃমূর্তির (মহাকালীসহ) ভাস্কর্য আমরা পাচ্ছি অনেক পরবর্তী যুগে। ধূমাবতী, মাতঙ্গী, বগলার প্রস্তরমূর্তি তো আমরা আদৌ খুঁজে পাইনি। *তন্ত্রসার*-গ্রন্থে (বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত) এবং কালীঘাট পটের বাইরে তন্ত্রসাধকদের ধারণা ছাড়া তাঁরা প্রায় অস্তিত্বহীনা।

অপর পক্ষে এই কমলামূর্তি আমরা পেয়েছি ঐতিহাসিক ভারতের একেবারে আদি যুগে। থেরবাদী বৌদ্ধ শিল্পীদের গড়া—ভারহুত, সাঁচি, বুদ্ধগয়ায়—যখন

স্বয়ং বুদ্ধদেবের মূর্তি নির্মাণের অনুমতি ছিল না। সাঁচিতে প্রাপ্ত কমলা বা গজলক্ষ্মীর আলোচনা আমরা অন্যত্র বিস্তারিত করেছি।



চিত্র 7.24 মহাযান পরিকল্পনায় তারা

বজ্রযান-পরিকল্পনায় মিথুনাচার

একথা অনস্বীকার্য যে, হিন্দু ভাস্কর দেবদেবীর পরিকল্পনায় 'সপ্তম সর্গেই' সমাপ্তি রেখা টেনেছেন। বজ্রযানী-ভাস্কর কিন্তু 'অসমাপ্ত গানে' থামতে নারাজ। খাজুরাহো, কোনার্ক এবং আরও অনেক-অনেক শিল্পতীর্থে হিন্দু-ভাস্কর পার্থিব নরনারীকে নিয়ে মিথুনাচারের হদ্দমুদ্দ করেছেন। মৈথুনরত মিথুনের নানান আসন অতিক্রম করে মুখমেহন, কাকলি এবং যৌথযৌনাচারে তাঁরা উত্তাল। কিন্তু স্বীকৃত দেবদেবীর মূর্তিতে উত্তেজিত মিথুন পর্যায়েই তাঁরা থেমে গেছেন। তন্ত্রসাধকেরা তাঁদের গোপন সাধনচক্রে দেব-দেবীর মূর্তি পরিকল্পনায় আরো কিছুটা অগ্রসর হয়েছিলেন কিনা জানা যায় না।

মহাযান-ভাস্কর দল একই ধারণার অনুসারী।

দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় দেবীমূর্তি 'তারা' হচ্ছেন মহাযান ধর্মের প্রধান উপাস্য। শৈবদের যেমন শিব, বৈষ্ণবদের যেমন শ্রীকৃষ্ণ, শাক্তদের যেমন কালী। মহাযানীদের তেমন তারা। তাদের অন্যান্য অনেক দেবীমূর্তি, যেমন মঞ্জুশ্রী, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি তারারই বিভিন্ন প্রকাশ।

মহাযান এবং বজ্রযান মতে তারা মূর্তি দুই প্রকারের। হরিতবর্ণা তারার আটটি ধ্যানমূর্তি। দ্বিতীয়ত একবিংশতি তারার পাঁচটি রূপ। বৌদ্ধ তারা-মায়ের সাতটি নয়ন। হিন্দু-তারার ত্রিনয়নের অতিরিক্ত বৌদ্ধ তারা-মায়ের আছে দুই করতলে ও দুই পদতলে অতিরিক্ত চারটি নয়ন (চিত্র 7.24)।

মহাযান থেকে যখন বজ্রযানধর্ম বিবর্তিত হল, তখন বজ্রসত্ত্বকামীরা মিথুনাচারের এক নতুন ব্যঞ্জনা উপস্থিত করল তাদের ধ্যানমূর্তির ভেতর। এটির নাম : 'যুগনদ্ধ'। মৈথুনরত দেবতা ও দেবীর মূর্তি (চিত্র 7.25, 7.26)। বজ্রযানী সাধক বলছেন :

> The concept of the Goddess as both Mother Goddess and Consort Goddess is not contradictory to the believer; as a true devotee does not need any physical meaning into the Yuganadha icon.[15]



চিত্র 7.25 যুগনদ্ধ মূর্তি, সিকিম

[আরাধ্য দেবীকে যুগপৎ জননী ও জায়ারূপে কল্পনা করার ভেতর কোনো দ্বন্দ্ব নেই; অন্তত প্রকৃত ভক্তের কাছে। কারণ প্রকৃত ভক্ত জানে যে, 'যুগনদ্ধ' মূর্তির ধ্যানে বাস্তব যাথার্থ্য সন্ধান নিরর্থক।]

স্বীকার করতেই হবে, মানবসভ্যতায় এটা একটা নতুন কথা। পাশ্চাত্য সভ্যতায় রাজা ওয়াদিপাউসের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এবং ভারতে কোন যুগেই কোনো ভক্ত জননী ও জায়াকে একই দেহধারীরূপে কল্পনা করতে পারেননি। এই পাঁচ-ছয় সহস্র বৎসরে সারা পৃথিবীতে কখনো কোনো 'প্রকৃত ভক্ত' জন্মগ্রহণ করেননি সেকথাই বা মানি কি করে?

সে যাইহোক, এই 'যুগনদ্ধ' মূর্তি পরিকল্পনাতেই বজ্রযান ধর্মমতে মিথুনাচারকে দেবলোকে নিয়ে আসা হল। সিকিমে, তিব্বতে, নেপালে, ভূটানে এ পরিকল্পনা বহুলব্যবহৃত। সে অঞ্চলে এঁর অভিধা দেক্বগ্ (Dechog)। চীনের য়্যাং-ঈন চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ প্রভাব এখানে লক্ষ্য করা যায়। বজ্রযান শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় এ যুগের পণ্ডিত মার্কো পোলিস্ লিখেছেন :

দেবতার পদতলে মহাকাল পিষ্ট; কারণ দেবতা কালজয়ী। ভক্তজনের তিনি অনন্তকালের রক্ষাকর্তা। তাঁর বঙ্কিম বামপদতলে এক কৃষ্ণাসুর দলিত-মথিত...কটিদেশ একখণ্ড ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত। এবার তাঁর শক্তিস্বরূপা নায়িকার কথা বলি : তিনি রক্তাভ, দ্বিভুজা...একহস্তে নিত্যসত্য, অর্থাৎ আপাতসত্য বিধৃত, অপরহস্তে অনন্তসত্য...তদুপরি দক্ষিণহস্তে পার্থিব কামনা-বাসনা-অজ্ঞানতাকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রয়োজনে জ্ঞান-খড়্গ বিধৃত। দেবী বিবসনা। কারণ তিনি বি-বাসনা। বামহস্তে তিনি তাঁর অভিকর্তাকে সুদৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করছেন...এই মৈথুনরত দেবমিথুন চির-অবিচ্ছেদ্য...যুগনদ্ধমূর্তির পশ্চাদপটে দেখছি লেলিহান অগ্নিশিখা, কুজ্ঝটিকা-আবৃত ধূম্রজাল...যাবতীয় পার্থিব অমঙ্গলকে এই অগ্নিশিখা দহন করে।[16]

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যে-কয়টি যুগনদ্ধ-মূর্তি দেখেছি তাঁরা সকলেই মন্দিরের মূল পাদপীঠে অধিষ্ঠিত। ভক্তরা প্রকাশ্যে এই মৈথুনরত দেবদেবীকে সপরিবারে দর্শন





চিত্র 7.26 যুগনদ্ধ মূর্তি, তিব্বত

করেন, পূজা দেন। ওঁদের বক্তব্য : সৃষ্টিকর্তা জীবসৃষ্টির লীলায় নিজ সত্তাকে যদি দ্বিধাবিভক্ত করে থাকেন, এবং তাঁদের মিলনেই যদি এই প্রপঞ্চময় জীবজগত প্রাণিত হয়ে থাকে তবে সেই মিলনকে শিল্পে অস্বীকার করার কী অর্থ? কেন সেই নিত্যসত্যকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে হবে?

হেনরিখ্ জীমার তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থে (The Art of Indian Asia) তিব্বতের একটি মন্দির থেকে সংগৃহীত যুগনদ্ধ মূর্তির দুটি আলোকচিত্র দিয়েছেন। একটি সামনে থেকে, একটি পিছন থেকে (চিত্র 7.26)। জীমারের মতে দেবতা হচ্ছেন বজ্রসত্ত্ব এবং দেবী প্রজ্ঞাপারমিতা। আমাদের মতে নায়িকামূর্তিটি প্রজ্ঞাপারমিতার নয়, হেবজ্রের। সে যাইহোক, মিলনের আসনটি বাৎস্যায়ন বর্ণিত 'আসতক উপবিষ্টাসন।'

সম্ভবত জীমারের ফটোগ্রাফার দুটি প্রায় একই রকম অথচ ভিন্ন মূর্তির আলোকচিত্র নিয়েছিলেন। কারণ মায়ের হাতে ঘট একবার আছে দক্ষিণ, একবার বাম করতলে।

আমার অনুজপ্রতিম সহকর্মী ডক্টর দিলীপ ভট্টাচার্য তাঁর ভুটান ভ্রমণকালে কিছু স্কেচ এঁকেছিলেন। তার ভিতর একটি ছিল ভূটানী যুগনদ্ধমূর্তি। তাঁর স্কেচের একটি অনুলিপি দেওয়া গেছে চিত্র 7.27-এ।

এখানে বজ্রসত্ত্বের বামহস্তধৃত আয়ুধটি : বজ্র।

দেবতার ক্রোড়ে উপবিষ্টা শক্তি। তিনি জানুদ্বয়ে বেষ্টন করে ধরেছেন স্বামীর কটিদেশ। সিকিম ও তিব্বতে দেবীমূর্তির আয়ুধ ছিল খড়্গ, এখানে দেখছি শঙ্খ। এক্ষেত্রেও মিলনটি 'আসতক' পর্যায়ের।

সিকিম (চিত্র 7.25) এবং ভুটান (চিত্র 7.27) থেকে সংগৃহীত যুগনদ্ধ মূর্তিদ্বয়ের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। কম্পোজিশন, রেখাঙ্কন, এবং শৈল্পিক প্রতিবেদনে সমান্তরাল ভাবনা। প্রথমটি যদিও দণ্ডায়মান ভঙ্গিতে এবং দ্বিতীয়টি উপবিষ্ট অবস্থায়, তবু তাদের উপস্থাপনের শৈলী অভিন্ন। উভয়ক্ষেত্রেই নায়িকা পার্শ্বচিত্রে মুখটি উঁচু করে আছেন, তিনি নিঃসন্দেহে চুম্বনতৃষিতা। অথচ নায়কের মুখখানি দেখা যাচ্ছে সম্মুখদৃশ্যে। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে প্রেমবিহ্বল বলে মনে হয় না!



চিত্র 7.25 যুগনদ্ধ মূর্তি, ভুটান

গঙ্গাযমুনা থেকে কৃষ্ণা কাবেরীর বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক সমতলভূমিতে কি আমরা 'নিকটদৃষ্টি'তে ভুগছিলাম? হংসমিথুন, ক্রৌঞ্চমিথুন থেকে যাত্রা শুরু করে কাল্পনিক গন্ধর্ব-কিন্নরের মিলনদৃশ্য গড়বার পর স্নাতাকোত্তর পর্যায়ে নর-নারীর মিলনেই থেমে গেলাম? আর তাঁরা? তুষারাবৃত হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায়, সমতলবাসীর ক্ষুদ্রদৃষ্টির আড়ালে, এক অতি বিস্তৃত পার্বত্য-ভূখণ্ডে— সিকিমে, নেপালে, অরুণাচলে, ভুটানে, চীনখণ্ডে গড়ে গেছেন দেবদেবীর মিলনমূর্তি? শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে?

আমরা থেমে যেতে বাধ্য হলাম সপ্তম সর্গের 'অসমাপ্ত গানে' :

ওঁরা আঁকলেন পরবর্তী সর্গে, পরবর্তী স্বর্গর আলেখ্য :

'পানিপীড়নবিধেরনন্তরং শৈলরাজ-দুহিতুর্হরং প্রতি...।।'[17] ❑

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মিথুন : প্রথম স্তর : যুগল—উত্তেজিত—শৃঙ্গাররত



মিথুনাচারকে আমরা ছয়টি শ্রেণিভুক্ত রূপে দেখিয়েছিলাম চতুর্থ পরিচ্ছেদে (পৃ. 70)। সেই শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছিল মূর্তিগুলির যৌনতা ও অশ্লীলতার বিচারে—দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গিতে। আমরা ধরে নিয়েছিলাম কয়েকটি প্রান্তিক ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হলেও, কতকগুলি পূর্বনির্ধারিত স্বীকৃত সংজ্ঞানুসারে সেগুলি ছয়টি সুস্পষ্ট শ্রেণিতে বিভক্ত করা সম্ভব।

বিষয়বস্তুকে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনে এ পরিচ্ছেদে আমরা যাবতীয় মিথুনাচারের ভাস্কর্যকে তিনটি মূল বিভাগে বিভক্ত করতে চাইছি। আমাদের হিসাবে : প্রথম স্তরে আছে তিনটি শ্রেণি; দ্বিতীয় স্তরে চারটি এবং তৃতীয়ে তিনটি শ্রেণি। এই তিনটি স্তরভুক্ত মিথুনগুলিকে আমরা অষ্টম, নবম এবং দশম পরিচ্ছেদে আলোচনা করতে চাই। এই মৌলিক স্তরগুলি নির্ধারিত হয়েছে যৌনতা ও অশ্লীলতার মিলিত মানদণ্ডের ক্রমবৃদ্ধি অনুসারে যাকে আমরা বলেছি : *ইরটিকা-*

অষ্টম পরিচ্ছেদে আলোচ্য **প্রথম স্তর**

1. **যুগল মূর্তি**
2. **উত্তেজিত মিথুন**
3. **শৃঙ্গাররত মিথুন**

বহু সংখ্যক যাত্রী, দর্শক, শিল্পানুরাগী প্রভৃতির সঙ্গে মত বিনিময় করে আমরা দেখেছি এবং মন্দির-ভাস্কর্য বিষয়ে বক্তৃতাদানকালে শ্রোতাদের ভোট সংগ্রহ করেও দেখেছি—শতকরা প্রায় শতভাগের মতে এই তিন শ্রেণির মিথুনমূর্তির মধ্যে কোনোটাই অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ নয়। নয়নগ্রাহ্য শিল্পবস্তুর যে নান্দনিক স্বীকৃত সীমারেখা তা কোনোটিই অতিক্রম করে না। তাই এই তিন শ্রেণির মিথুনকে প্রথম স্তরভুক্ত রূপে চিহ্নিত করে বর্তমান পরিচ্ছেদে আলোচনা করা গেছে।

নবম পরিচ্ছেদে আলোচ্য **দ্বিতীয় স্তর**

4. **সমকামী**...homosexuals & lesbians
5. **আত্মরত্যাতুর**...হস্তমৈথুন (masturbation), প্রদর্শনবাদী (exhibitionism) ও দর্শনকামী (voyeurism)
6. **মৈথুনরত মিথুন**...couples-in-coitus
7. **আনুষঙ্গিক যৌনাচার**...মুখমেহন (cunnilingus, fellatio & kakali)।

সমীক্ষায় দেখা গেছে দর্শকদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের মতে এই স্তরের চার-শ্রেণির মিথুন অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ ও কদর্য। বাকি অর্ধেকের অভিমত তা নয়। নবম পরিচ্ছেদে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচিত।

দশম পরিচ্ছেদভুক্ত **তৃতীয় বিভাগ**

8. **অস্বাভাবিক যৌনাচারী**... বলাৎকার, পশুমৈথুন (bestiality), পায়ুমৈথুন (sodomy)
9. **অসামাজিক যৌনাচারী** অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি
   - A. Polygamy .... পুরুষের পক্ষে একইকালে একাধিক নারীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক
   - B. Polyandry ...নারীর পক্ষে একই কালে একাধিক পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক
   - C. Bacchanalia...যৌথযৌনাচারী অর্থাৎ তিনের অধিক ব্যক্তির একত্রে যৌথযৌনাচার
10. **অবাস্তব যৌনাচারী** ....Absurdity, অর্থাৎ বাস্তব-অস্বীকৃত যৌনাচার।

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের প্রায় শতকরা শতভাগের অভিমত এই তিন শ্রেণির মূর্তি চূড়ান্ত অশ্লীল, পর্নোগ্রাফির পর্যায়ভুক্ত এবং আদৌ শিল্পপদবাচ্য নয়। অবশ্য এগুলিকে ধ্বংস করার কথাও কেউ আমাদের বলেননি।

প্রথম শ্রেণি : যুগল মূর্তি

ভারতীয় ভাস্কর্যের ঐতিহাসিক যুগের উষাকালেই এরা উপস্থিত হয়েছে। ভারহুত, বুদ্ধগয়া অথবা সাঁচিতে। ক্রমে তারা ছড়িয়ে পড়ল নানান শিল্পতীর্থে। বৌদ্ধ ও জৈন গুহামন্দিরে : অজন্তা, কার্লে, উদয়গিরি, প্রভৃতি। সম্ভবত এর প্রথম প্রেরণা প্রতিসাম্য : জোড়া-জোড়া নকশা। একজোড়া ফুল, ফল, পাখি, নকশা। যুগলমূর্তি তার কিছু

বেশি তৃপ্তি দিতে শুরু করল। যুগল বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবেশ কবল একটা বৈপরীত্যের অনুভাবনা। শুধু নয়নগ্রাহ্য দর্পণ-প্রতিবিম্বই নয়, স্বভাবগত বৈপরীত্য। যা দেখা যায়নি ইতিপূর্বে--জোড়া জোড়া ফুল-পাখি নকশায়। এই নবাগত বৈপরীত্যেব পশ্চাদপটে আছে একটা নতুন সম্ভাবনা। যেমন দেখা যায় ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক বিদ্যুতের তারে -তাদের মিলনে দেখা দেয় বৈদ্যুতিক দীপ্তি, যেমন চুম্বকের দুই প্রান্ত—তাবা পবস্পরকে আকর্ষণ কবে। একে অপরের দিকে ছুটে যেতে চায়। তারা পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতীক।



চিত্র 8.1 যুগলমূর্তি, ভারহুত

এই যুগলমূর্তি যদিও সমকালের বিষয়বস্তু, সমপর্যায়ের শিল্পসৃষ্টি, তবু তাদের প্রথম আবির্ভাব বিরাট ভৌগোলিক দূরত্বে। ভিন্ন ভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে, ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়ামে। তা সত্ত্বেও এই যুগলমূর্তিগুলির গঠনশৈলী, উপস্থাপনা, আবেদনে একটা বিস্ময়কর সৌসাদৃশ্য। শুধু কম্পোজিশনে নয়, পোশাকে, অলঙ্কারে, ভঙ্গিমায় তারা একসুরে বাঁধা।

উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে তিন জোড়া যুগলমূর্তি পরিবেশন করছি : ভারহুত (চিত্র 8.1), সাঁচি (চিত্র 8.2) এবং উড়িষ্যার উদয়গিরি (চিত্র 8.3) থেকে। তিনটিই খ্রিস্টাবির্ভাবের শতবর্ষ আগে-পিছে গড়া। এঁরা মন্দির-ভাস্করের কাছে যুগলে এসে ধরা দিয়েছেন। তাঁদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগঘন আচরণকে শাশ্বত করতে, ঠিক যে উদ্দেশ্যে মিশরের ফারাও (চিত্র 1.9) অথবা সেকেন্দারশাহ্ (চিত্র 1.10) সস্ত্রীক উপস্থিত হয়েছিলেন।



চিত্র 8.2 যুগলমূর্তি, সাঁচি তোরণ

এরপর যেদুটি যুগলমূর্তিকে উপস্থাপন করা হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন প্রকার। তারা প্রতিকৃতি নয়, অলঙ্করণ। 'পোট্রেট' নয়, 'ইলাস্ট্রেশন'। এই মহাউপদ্বীপের দুই প্রান্তে দু-জন ইলাস্ট্রেটরের ওপর একই বিষয়বস্তুর দুটি



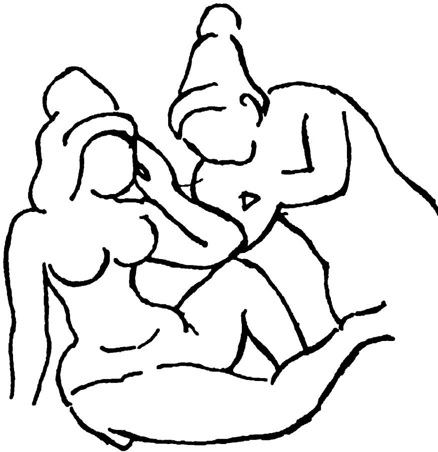
চিত্র 8.3 যুগলমূর্তি, উদয়গিরি, কলিঙ্গ

শিল্প গড়ার আদেশ হয়েছিল : রানী অভিমান করেছেন এবং রাজা তাঁর মান ভাঙাবার চেষ্টা করছেন। কাহিনি



চিত্র 8.4 অভিমানী রানী ও রাজা, অজন্তা দশম গুহা

অভিন্ন; কিন্তু 'মিডিয়াম' পৃথক। একজন অজন্তা শিল্পী—রঙতুলির কারবারি, অপরজন ছেনি-হাতুড়ি-হাতে উদয়গিরির ভাস্কর। দু-জনে দুজনের অপরিচিত—দূরত্ব কয়েক হাজার কিলোমিটার। প্রথমজনের পৃষ্ঠপোষক বৌদ্ধধর্ম, দ্বিতীয়র জৈন। অথচ দেখুন দুই মহান শিল্পী কী অদ্ভুতভাবে একই চিন্তাভাবনায় দোলায়িত হয়েছেন (চিত্র : 8.4 এবং 8.5)।



চিত্র 8.5 অভিমানী রানী ও রাজা, উদয়গিরি

খ্রিস্টজন্মের একশ বছর আগে-পিছে বর্তমান মহারাষ্ট্রের নাসিককে কেন্দ্র করে একে একে গড়ে উঠেছিল অনেকগুলি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম। বলাবাহুল্য সবগুলি স্থবিরবাদী বৌদ্ধদের, অর্থাৎ হীনযানীদের : অজন্তা, কার্লে, ভাজা, কান্হেরি, কন্ডেন প্রভৃতি।

সেইসব গুহাচৈত্যের প্রবেশদ্বারের দুপাশে খোদিত হয়েছে একাধিক যুগলমূর্তি—দাতা এবং তাঁর ধর্মপত্নীর। কার্লে গুহা-চৈত্যের একটি যুগলমূর্তি আমরা



চিত্র 8.6 দাতা দম্পতি, কার্লেচৈত্য

উদাহরণস্বরূপ পেশ করছি (চিত্র 8.6)। সমকালীন বা প্রাগ্বর্তী বহির্ভারতীয় যুগলমূর্তির সঙ্গে এদের একটি প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। অন্যদেশে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রকৃতিকে দেখা যায় সমভঙ্গে। মিশরে, মেসোপটেমিয়ায় পারস্যে। ভারতে কিন্তু প্রথম যুগ থেকেই তারা আভঙ্গ ঠামে।

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর পরবর্তীকালে কলিঙ্গে যুগল মূর্তি গড়ার একটি পৃথক উদ্দেশ্য অনুভূত হয়। দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর অতিরিক্ত। সেকথাও আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। কলিঙ্গে—বিশেষ করে একাম্রক্ষেত্রে অর্থাৎ ভুবনেশ্বরে—প্রথমযুগের সব মন্দিরই ছিল শিবের। শাস্ত্র বলেছেন শৈবমন্দির গড়তে হলে নিম্নলিখিত ভাস্কর্য আবশ্যিক : সর্প, মঙ্গলচিহ্ন, পাখি, বিল্ববৃক্ষ, স্বস্তিকচিহ্ন এবং মিথুন। *বৃহৎ-সংহিতায়* এই শ্লোকটি রচনা করেছিলেন বরাহমিহির।

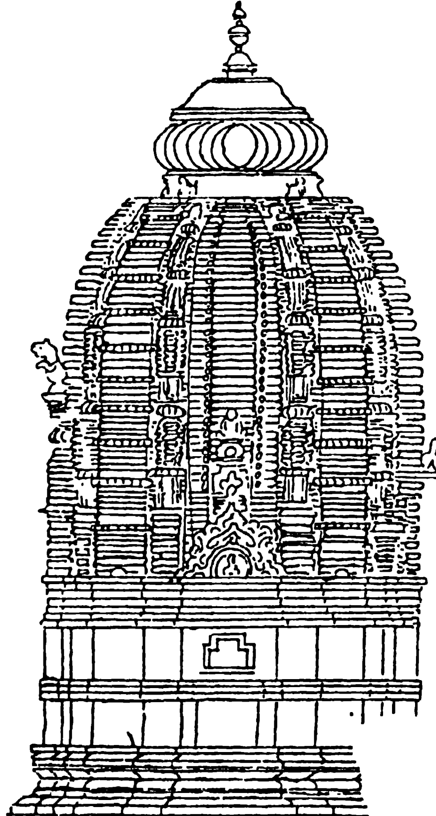
ভাস্করদল নরনারীর যুগলমূর্তির সমান্তরালে জীবজন্তু, পক্ষী, মৎস্য এবং কল্পলোকের যথা কিন্নর-গন্ধর্ব মিথুনও যথেষ্ট পরিমাণে উৎকীর্ণ করেছেন। স্বামী এবং স্ত্রীর পারস্পরিক অবস্থান বিষয়েও নিশ্চয় শাস্ত্রীয় নির্দেশ ছিল। কারণ আমরা লক্ষ্য করি, বৌদ্ধ-শিল্পশৈলীতে সর্বত্র স্ত্রী আছেন স্বামীর দক্ষিণে। অথচ ব্রাহ্মণ্যধর্মের মন্দিরে—যা আজও হিন্দু দম্পতি ফটো তোলার সময়ে মেনে চলেন—স্ত্রী থাকেন স্বামীর বামভাগে। যে-কোনো মন্দিরে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসে দেবতাকে অর্ঘ্য দিতে গেলে আজও এই নির্দেশটি দুজনকেই মানতে হয়, পাণ্ডাজির নির্দেশে।

ভাস্কর্যের পরিমণ্ডল ত্যাগ করে যুগলমূর্তি গড়ার একটি বিচিত্র প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে কলিঙ্গের নাগর শিল্পে। কলিঙ্গ স্থাপত্যে মন্দির তিন শ্রেণির : পুরুষ-প্রতীকী, প্রকৃতি-প্রতীকী এবং ক্লীব-প্রতীকী। ধারণাটি কীভাবে বিবর্তিত হল তা আমরা বিচার করে দেখতে পারি।

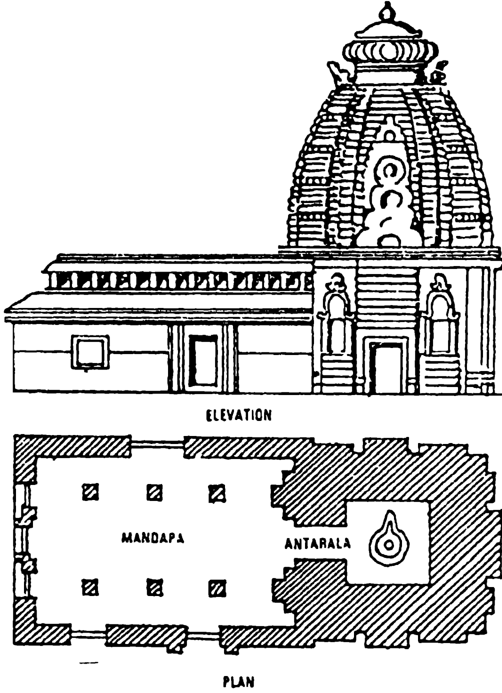
আদি যুগে কলিঙ্গে, অর্থাৎ ভুবনেশ্বরে—নির্মিত হয়েছে শুধুমাত্র শৈবদেউল। এগুলি একক-মন্দির। অনিবার্যভাবে রেখ-দেউল। স্থপতিবিদের কল্পনায় গোটা মন্দিরটি লিঙ্গ-প্রতীকী। শিবলিঙ্গের ছায়া দিয়ে গড়া। এটি পুরুষ মন্দির। তার তিনটি প্রধান অংশ : বাড় (পদযুগল থেকে নাভিমণ্ডল), গণ্ডী (আ-নাভি স্কন্ধ), এবং মস্তক (কণ্ঠ থেকে শিরোধৃত কলস)। চিত্র ৪.7-তে তার একটি রেখচিত্র দেওয়া হয়েছে। কলিঙ্গ স্থাপত্যানুসারী রেখ-দেউলের বিভিন্ন অংশের নামও চিত্রে উল্লেখিত।

মন্দির নির্মাণের আদিযুগের প্রথম দুই-এক দশক ধরে গড়ে উঠেছিল শুধুমাত্র শিবমন্দির। প্রতিটিই ছিল একক রেখ-দেউল। বিবর্তনের দ্বিতীয় ধাপ দেখা গেল সপ্তম শতাব্দীতে। পরশুরামেশ্বর মন্দিরে। ইতিমধ্যে যাত্রীসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে। তাই স্থানাভাবজনিত হেতুতে দেউলসম্মুখে একটি মণ্ডপ নির্মাণের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সহজ সমাধান করা হল মন্দিরসম্মুখে একটি মণ্ডপ নির্মাণ করে। স্তম্ভের ওপর 'আর্কিট্রেভ' বা বীম অর্থাৎ কড়ি পেতে তার ওপর গড়া হল সমতল ছাদ-কড়ি-বড়গা আর পাথরের টালি পেতে (চিত্র ৪.৪)। শেষ চালুক্য-যুগের আইহোল (Aihole)-এ এ জাতীয় যাত্রীমণ্ডপ ইতিপূর্বেই নির্মিত হয়েছে। আইহোল কলিঙ্গের সন্নিকটে, দক্ষিণে। শুধু তাই বা কেন? এ পদ্ধতি হাজার হাজার বছর পূর্বে মহেন-জো দরোতে অনুসৃত। সেখানে কাঠের বীম-বড়গা আর রোদে-শোকানো পোড়া মাটির টালি পেতে এ জাতীয় ছাদ নির্মিত হয়েছিল। সে খবর অবশ্য কলিঙ্গ-স্থপতি জানতেন না। ফলে এটাকে আইহোলের অনুকরণ বলা যেতে পারে।

কিন্তু কলিঙ্গ-স্থপতি অনুকরণে তৃপ্ত হতে নারাজ। তাই অচিরেই গঠিত হল অন্য এক ধাঁচের দেউল। তার নাম দেওয়া হল জগমোহন। সেটি স্ত্রী-প্রতীকী। যেন পুরুষপ্রতীকী পীড়দেউলের জন্য এতদিনে একটি সঙ্গিনীর



চিত্র ৪.7 কলিঙ্গ রীতিতে পুরুষ প্রতীকী রেখ-দেউল



চিত্র 8.8 পরশুরামেশ্বর দেউল, ভুবনেশ্বর

রেখ-দেউলের চূড়াই বা গড়া যাবে কোন আক্কেলে? এতদিন সেই রেখ-দেউলগুলি গড়া হয়েছে শুধুমাত্র যাত্রীদের মাথা-গোঁজার আশ্রয়স্থল হিসাবে। সে জাতীয় দেউলে মাতৃমূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করাও সুরুচিসম্মত নয়। বাধ্য হয়ে শক্তি মন্দিরের চূড়া নির্মাণের জন্য কলিঙ্গ স্থপতি আশ্রয় নিলেন এক অভিনব পরিকল্পনার : কাখর-দেউল।

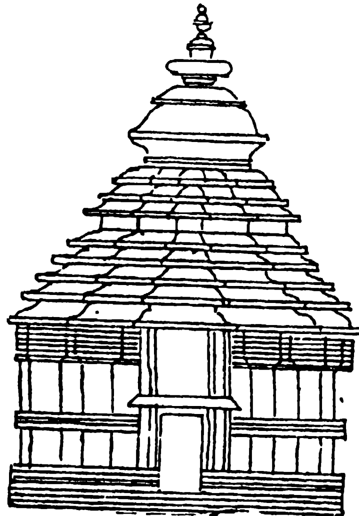
অনেকগুলি পরিবর্তন করা হল। শুধু সম্মুখদৃশ্যেই নয়, মন্দির চূড়াতেই শুধু নয়, ভূমি-নকশাতেও। এতদিন রেখ এবং পীড় দেউলের প্ল্যান বা ভূমি-নকশা ছিল বর্গক্ষেত্র। কাখর দেউলে তা করা হল আয়তক্ষেত্র। প্রবেশপথটি নির্দিষ্ট হল দীর্ঘতর এক প্রাচীরে। কলিঙ্গ-মন্দিরমাত্রেই যেহেতু পূর্বমুখী তাই বলা যায় কাখর-দেউলের দীর্ঘতর দুটি প্রান্ত উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত। মন্দিরের চূড়াটি বিচিত্র ঢঙের—যেন একটির ওপর আর একটি নৌকা উপুড় করে বসানো।

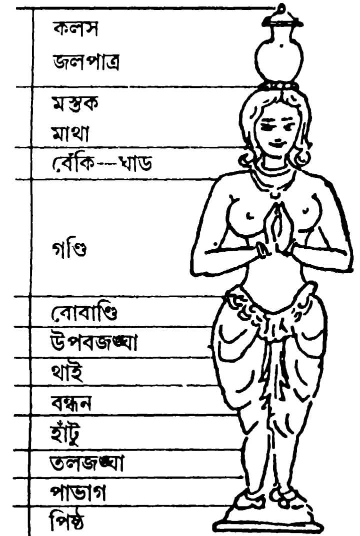
সুযোগ পেয়ে আমি একবার আমাদের তদানীন্তন জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমারকে প্রশ্ন করেছিলাম, কাখর মন্দির-চূড়ার এমন বিচিত্র পরিকল্পনার ব্যঞ্জনাটি কী? তিনি বলেছিলেন, নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। কোনো শাস্ত্র-নির্দেশ তিনিও খুঁজে পাননি। কিন্তু নামকরণের মধ্যে পরিকল্পনার একটি তির্যক ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায় : ওড়িয়া

ব্যবস্থা করা হল। চিত্র : 8.৬-এ লিঙ্গরাজ মন্দিরের জগমোহন এবং তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

বিবর্তনের তৃতীয় ধাপটির প্রয়োজন হয়ে পড়ল যখন পুরোহিততন্ত্র স্থির করলেন যে, মূলমন্দিরে শিবের পরিবর্তে অধিষ্ঠাত্রী হবেন শিবানী। যেমন বৈতালদেউলে মূল উপাস্য হলেন : মহিষমর্দিনী।

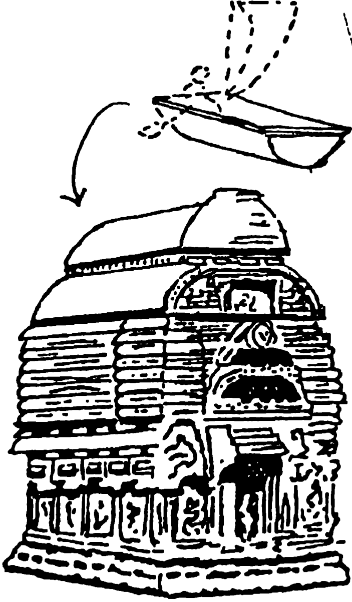
স্থপতিবিদেরা এবার বিপদে পড়লেন। নিদারুণ সমস্যা। মায়ের মন্দিরের ওপর পুরুষ-প্রতীকী রেখ-দেউল নির্মাণ করা সুরুচিসম্মত নয়। তেমনি মাতৃমন্দিরের বিমানে—অর্থাৎ গর্ভগৃহের ওপর—স্ত্রীপ্রতীকী





চিত্র 8.9 স্ত্রীপ্রতীকী পীড়দেউল, কলিঙ্গরীতি

ভাষায় 'বৈঠা কখারু' শব্দের অর্থ খেয়াতরী—পারানি ঘাটের নৌকা। 'কাখর' শব্দটি সেই 'কখারু' শব্দের অপিনিহিত রূপ। যেহেতু নৌকা তার গর্ভে যাত্রীদের বহন করে তাই নৌকা বা 'কখারু' স্ত্রীপ্রতীকী। তাছাড়া আরও একটা কথা—খেয়ানৌকার কাজ যাত্রীদের পারাপার



চিত্র 8.10 কাখর দেউল, কলিঙ্গরীতি

করানো। মাতৃমন্দিরও ভক্তদের ইহজীবনের পাপ-তাপ থেকে দিব্যজীবনে উত্তরণের খেয়াতরী। কিন্তু সেক্ষেত্রে দুটি নৌকা কেন? একটি খেয়াতরীই তো ভক্তের আত্মাকে বৈতরণীর ওপারে নিয়ে যেতে পারে! প্রশ্নটা আমি আচার্য সুনীতিকুমারকে করিনি। মনগড়া একটা সমাধান মেনে নিয়েছি। রেখ-দেউলের ক্ষেত্রে স্থপতিবিদ তার সঙ্গিনীর ব্যবস্থা করেছেন পীড়-দেউলে, তাহলে কাখর-দেউলের ক্ষেত্রে ওই মন্দির চূড়ার নৌকাটি সঙ্গিনী পাবে কোথায়? স্থপতি হয়তো সে জন্যেই একটিমাত্র নৌকা না গড়ে, গড়েছেন নৌকার মিথুন (চিত্র 8.10)।

স্বীকার করা ভাল, এই 'কাখর-দেউল' নির্মাণের যেকথা এখানে বলা হল সে বিষয়ে পূর্বাচার্যদের কোনো নির্দেশ আমরা খুঁজে পাইনি। এ আমাদের অনুমান-নির্ভর নিজস্ব মতামত। আর্কিওলজিস্ট শ্রীমতী দেবলা মিত্র তাঁর গ্রন্থে শুধু বলেছেন : "There are only five kakhara-deuls at Bhubaneswar all of which are dedicated to *Shakti-worship*—a fact difficult to explain away as mere coincidence."[1]

যুগলমন্দির-যুগে আমরা দেখেছি, কলিঙ্গ স্থপতি রেখ ও পীড়-দেউলকে এমন মাপে এমন অবস্থানে গড়েছেন যে, মনে হয়, ওরা যুগলে অগ্নিদেবকে যজ্ঞান্তে পূর্ণাহুতি দিচ্ছে (চিত্র 8.11)। এমনকী বধূকে বেষ্টন করা বরের করমুষ্টির প্রতীক হিসাবে এক 'ঝাম্পান-সিংহ'ও গড়া হয়েছে।

* * *

পরবর্তী শ্রেণির মিথুনের আলোচনার পূর্বে আরও একটি তথ্য জানানো প্রয়োজন। যে সময়ে মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছিল তখন বহুবিবাহপ্রথা ছিল বহুলপ্রচলিত। যেসব রাজন্যবর্গ বা দাতার অর্থানুকূল্যে মন্দিরগুলি নির্মিত তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন বহুপত্নিক। মন্দিরভাস্কর্যে কিন্তু তার প্রতিফলন নজরে পড়ে না। মিশরের ফারাও যে ভঙ্গিতে দুই রানীকে দু-পাশে নিয়ে দণ্ডায়মান (চিত্র 1.9) ভারতীয় ভাস্কর তা করেননি। ব্যতিক্রম হিসাবে ক্বচিৎ দুই প্রকৃতির মাঝখানে পুরুষকে দেখা যায়। বৈয়াকরণিক আপত্তি করলেও আমরা তাকেও যুগলমূর্তি বলেছি।

আরও একটি তথ্য এখানে প্রাসঙ্গিক। সে বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ঋষি বাৎস্যায়ন



চিত্র 8.11 রেখ-পীড় মিথুন, কলিঙ্গরীতি

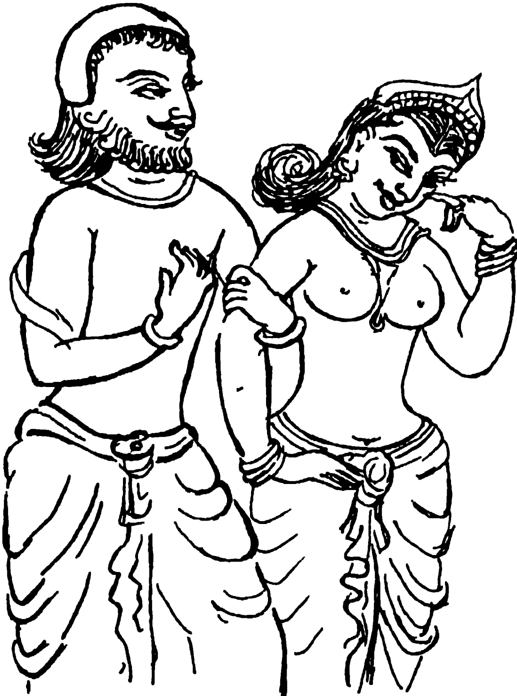
স্পষ্টাক্ষরে তাঁর বহুপত্নিক পাঠককে নির্দেশ দিয়ে গেছেন : কোনো পুরুষ তার দুইজন ধর্মপত্নীকে নিয়ে এক শয্যায় রাত্রিযাপন করবে না। পরবর্তী রাত্রে সে তার শয্যাসঙ্গিনীর পরিবর্তন করতে পারে। ঠিক যেমন আজও পারেন কোন সমকালীন ভারতীয় পাঠক, তাঁর প্রাগবর্তী পত্নীর সঙ্গে আইনত বিবাহবিচ্ছেদ সম্পন্ন করে।

দ্বিতীয় শ্রেণি : উত্তেজিত মিথুন

দ্বিতীয় শ্রেণির মিথুন, আমাদের সংজ্ঞানুসারে :

যেখানে দুজনে পরস্পরকে স্পর্শ করেছে—আলিঙ্গনাবদ্ধ, চুম্বনোদ্যত, অথবা অন্য কোনো ভাবে একে অপরকে আদর করছে—যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মূল নিম্ন যৌনাঙ্গ অপ্রকাশ।

প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা জেনেছি যে, যুগলমূর্তি থেকে উত্তেজিত মিথুনে রূপান্তরিত হতে বরবধূর বেশ কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছিল। কীভাবে বিবর্তনধারায় প্রথমোক্ত যুগলমূর্তি দ্বিতীয়োক্ত উত্তেজিত মিথুনে বিবর্তিত হল—তক্ষশীলা, নাগার্জুনকোন্ডা, অমরাবতী, বা মথুরায়—তা আমরা দেখেছি।



চিত্র 8.12 উত্তেজিত মিথুন, ব্রহ্মেশ্বর, ভুবনেশ্বর

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, একই শ্রেণিযুক্ত বিভিন্ন মিথুনে প্রেমের গাঢ়তা বা যৌনতার প্রকাশ একই রকম। সে-কথা কিন্তু সত্য নয়। এ তথ্য উত্তেজিত-মিথুন



চিত্র 8.13 উত্তেজিত মিথুন, ব্রহ্মেশ্বর, ভুবনেশ্বর

সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ আমরা পরপর চারটি (চিত্র 8.12-8.15) উত্তেজিত মিথুনমূর্তির আলেখ্য এখানে উপস্থাপিত করছি—সংজ্ঞানুসারে তারা একই শ্রেণিভুক্ত; কিন্তু নায়ক-নায়িকা প্রেমলীলায় একই ঘাটে আবদ্ধ নয়; প্রথম ঘাট থেকে তাদের মিলনতরী অনেক-অনেকটা এগিয়ে গেছে। এই চারখানি স্কেচ আমাদের আঁকবার সৌভাগ্য হয়েছিল যখন আমি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী ইন্দ্র দুগার এবং শিল্পসমালোচক দ্বিজেন্দ্রলাল মৈত্রর সঙ্গে একত্রে কলিঙ্গ পরিক্রমা করতে গিয়েছিলাম। প্রায় তিন দশক পূর্বে (1976)। উপস্থাপিত দুটি চিত্র ইন্দ্র দুগারের আঁকা, বাকি দুটি বর্তমান লেখকের।

ব্রহ্মেশ্বর-মন্দিরের শ্মশ্রুমণ্ডিত যুবকটি (চিত্র 8.12) তার প্রেমিকার দক্ষিণ বাহুমূল গ্রহণ করে আকর্ষণ করছে। নায়িকার বিপরীত দিকে মুখ ফেরানোর ভঙ্গিমায় মনে পড়ে যায় পদকর্তার নির্দেশ : 'নাহি নাহি বোলবি,

মোড়য়িবি গীম!' তবু মেয়েটির বামহস্তের মুদ্রায় এবং ভাবব্যঞ্জনায় অনুমিত হয় তার প্রকাশ্য আপত্তিতে অন্তরের সায় নেই।



চিত্র 8.14 উত্তেজিত মিথুন, লিঙ্গরাজ, (ইন্দ্র দুগার অঙ্কিত)

একই মন্দিরের দ্বিতীয় উত্তেজিত মিথুনে (চিত্র 8.13) নায়িকার সম্মতি আরও সোচ্চার। দক্ষিণহস্তটিতে সে দয়িতের স্কন্ধদেশ বেষ্টন করেছে। যদিও তার মুখ এখনো ভিন্ন দিকে ফেরানো এবং সে তার প্রেমিকের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। কিন্তু তার আন্তর-সম্মতি যেন বক্ষদেশের যুগ্মজয়স্তম্ভের উচ্ছ্বাসে স্বীকৃত।

তৃতীয় উদাহরণটি লিঙ্গরাজ মন্দিরের। এঁকেছেন ইন্দ্র দুগার। এখানে নায়িকা অপরূপ দেহভঙ্গিমায় তার আত্মসমর্পণের সর্বাঙ্গ-সম্মতি জানিয়েছে। তার বাহুদ্বয় উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত—নর্তকীর নৃত্যভঙ্গিমায়। দয়িতকে সে স্পর্শ করেনি, না করুক—বিকচকলাপ ময়ূরের মতো লীলায়িত উচ্ছ্বাসেই তার আন্তর আকুতি সোচ্চার (8.14)।

চতুর্থ উদাহরণটি ইন্দ্র দুগার এঁকেছিলেন কোনার্ক জগমোহন থেকে (চিত্র 8.15)। এক্ষেত্রে নায়িকা রীতিমতো রত্যাতুরা। ভারতচন্দ্রের ভাষায় 'লাজের মাথায় হানিয়া বাজ' নায়িকা সবলে আলিঙ্গন করেছে তার প্রেমাস্পদকে। দুই হাতে তার মস্তক আকর্ষণ করছে নিজ বিম্বাধরের দিকে। শেক্সপীয়ারের ভাষায় ভেনাস যেন অ্যাডনিস্‌কে বলছে :

> 'O, pity,'gan she cry, 'flint-hearted boy!
> 'Tis but a kiss I beg, why art thou coy?'
> ['হা হতোস্মি!' কহিলা কামিনী,
> 'কুলীশ-কঠোর-বুক!
> চেয়েছি তো শুধু চুম্বন তাহে
> লাজে রাঙা কেন মুখ?']

চারটি উদাহরণে চার নায়িকাব উত্তেজনা নিঃসন্দেহে ক্রমবর্ধমান। ফলে, প্রথম লাজনম্রা তরুণীর সঙ্গে শেষোক্ত রত্যাতুরার উত্তেজনায় প্রভেদ আকাশ-পাতাল, তবু আমাদের নির্দেশিত সংজ্ঞানুসারে এই মিথুন চতুষ্টয় সমশ্রেণির : উত্তেজিত-মিথুন।



চিত্র 8.15 উত্তেজিত মিথুন, কোনার্ক (ইন্দ্র দুগার অঙ্কিত)

অজন্তা এবং ইলোরার মিথুনাচার

ধারাবাহিক আলোচনায় এই অনুচ্ছেদটি আপাতদৃষ্টিতে প্রক্ষিপ্ত মনে হতে পারে। তাই প্রথমেই তার প্রাসঙ্গিকতার কৈফিয়তটা দাখিল করি :

এ গ্রন্থে মিথুনাচারের পর্যালোচনায় আমরা মূলত উত্তর, মধ্য এবং পূর্বভারতের ভাস্কর্যের আলোচনা করেছি। কারণ মন্দিরভাস্কর্যে মিথুনাচার সেই অঞ্চলেই বিশেষভাবে বিকশিত। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের পর্যালোচনায় অজন্তা এবং ইলোরা শৈলীর মূল্যায়ন না করা হলে সে গবেষণা অসম্পূর্ণ। এই পর্যায়েই সে আলোচনা করার বিশেষ কারণও আছে :

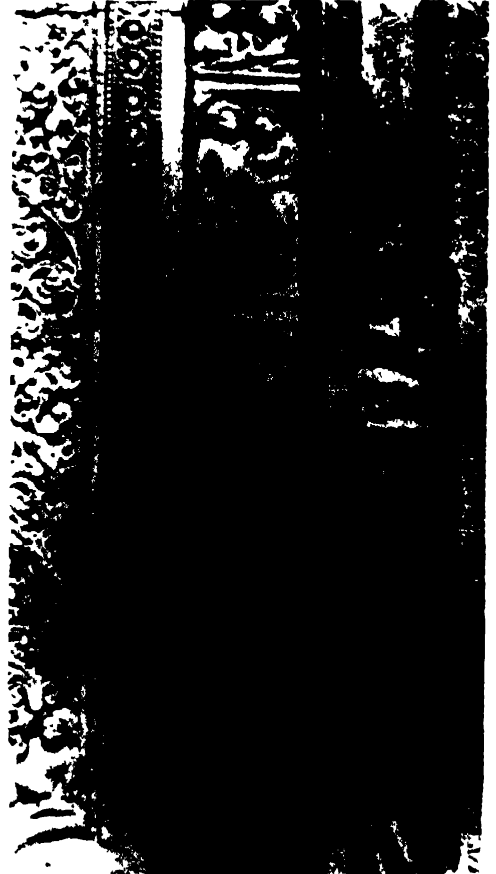
সেই দুই মহান শিল্পপীঠে মিথুনাচারকে অস্বীকার করা হয়নি আদৌ, কিন্তু বৌদ্ধ মহাঅর্হতেরা যেন রাজা ক্যানিউটের মতো মিথুনাচারকে আদেশ করেছিলেন : 'Thus far shalt thou go, and no further'। 'যুগল-মূর্তি'তে তার সূচনা এবং 'উত্তেজিত মিথুনে' তার পরিসমাপ্তি। পরবর্তী পর্যায়ের মিথুন অজন্তার দীর্ঘ নয় শতাব্দীব্যাপী বিশাল পটভূমিতে একবারও দেখা দেয়নি। সমুদ্র রাজা ক্যানিউটের আদেশ মানেনি, কিন্তু মিথুনাচার নতমস্তকে মেনেছিল অজন্তার শিল্পাচার্যদের নির্দেশ।

এই কথাগুলি বলা প্রয়োজন হয়েছে আরও একটি বিশেষ হেতুতে। একাধিক শিল্পসমালোচক অস্পষ্ট এবং দ্বর্থ্যবোধক বিশেষণ ব্যবহার করে অজন্তা ও ইলোরার শিল্প সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকার অন্তরে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে গেছেন। ধরুন গবেষিকা ড. দেবাঙ্গনা দেশাই-এর কথা। আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার এই কৃতি অফিসারটি—যিনি পুরাতত্ত্ব বিষয়ে একাধিক মনোজ্ঞ গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন—তিনি বলছেন :

> "**Erotic motifs** can also be seen in the Buddhist Caves at Ajanta, Ellora and Aurangabad, which are almost contemporaneous with the Brahminical Caves at Badami. This shows that the depiction of **erotic motifs** was a convention independent of sectarian influence in this period. **Erotic motifs** at the Buddhist Caves are mainly confined to the door-frames, lintels,... The mithunas are in various amorous attitudes as on the Deoghar door."[2]

["অজন্তা, ইলোরা এবং ঔরঙ্গাবাদের বৌদ্ধগুহাগুলিতেও **যৌনাচারী শিল্পনিদর্শন** দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি বাদামীতে অবস্থিত ব্রাহ্মণ্যসম্প্রদায়ের গুহামন্দিরগুলির সমকালীন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সমকালে এই **যৌনাচারী শিল্প** গড়ে উঠেছিল সম্প্রদায়-নিরপেক্ষভাবে। অবশ্য বৌদ্ধগুহায় **যৌনতামণ্ডিত শিল্পগুলি** দেখতে পাওয়া যায় শুধু দরজার সর্দালে (ফ্রেমে), অথবা লিন্টেলে।...এই মিথুন মূর্তিগুলি যৌনক্রীড়ার বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত, যেমন দেখা যায় দেওঘর দ্বারের দুপাশে।"]

উল্লিখিত দেওঘর দ্বারের (বিহারের দেওঘর নয়, এ মন্দির খাজুরাহোর কাছাকাছি, মধ্যপ্রদেশে) আংশিক চিত্র এখানে দেওয়া গেল (চিত্র 8.16)। এখানে পাঁচ-জোড়া

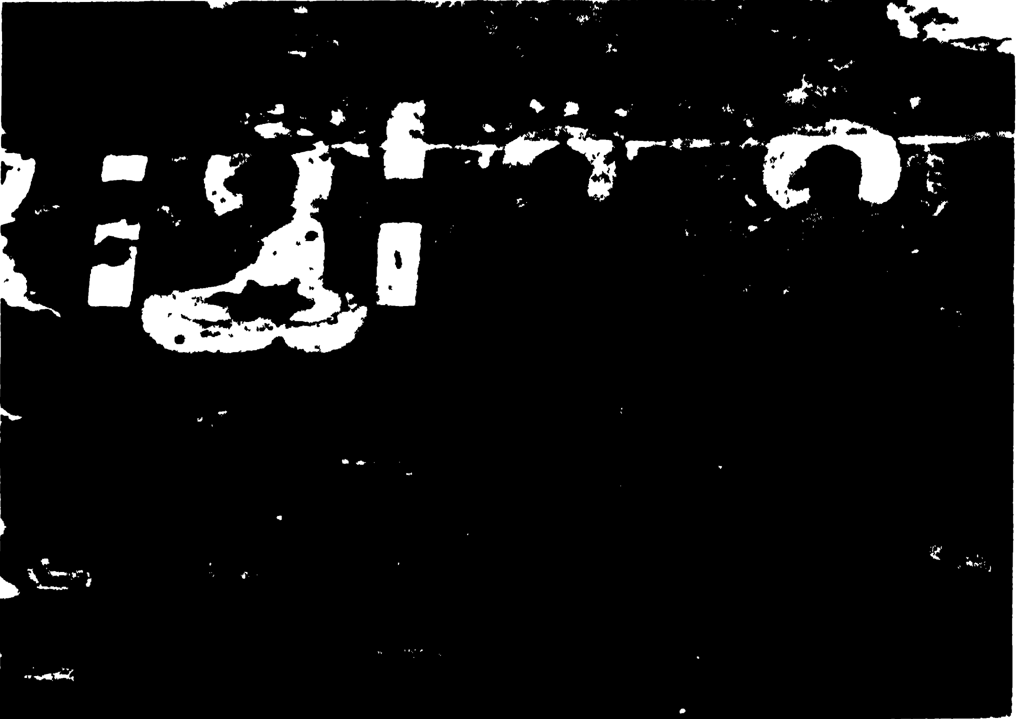


চিত্র 8.16 দেওঘর মন্দিরের প্রবেশদ্বার, আইহোল

মিথুন দেখা যাচ্ছে। তিন-জোড়া স্থূলকায় গন্ধর্ব-মিথুন। তারা পাশাপাশি বসে আছে মাত্র। তাদের যুগলমূর্তিই বলা উচিত। তাছাড়া দেখছি দুটি মিথুন—তাদের নিম্নযৌনাঙ্গ প্রকট নয়—ফলে তারা উত্তেজিত-মিথুন মাত্র। আমরা অন্য গবেষণা গ্রন্থে দেওঘর দ্বারের সম্পূর্ণ আলোকচিত্র দেখেছি—সবগুলি মিথুনই হয় অনুত্তেজিত যুগল-মূর্তি অথবা উত্তেজিত-মিথুন। জানি না ডক্টর দেশাই কেন তাদের erotic motif (যৌনতামণ্ডিত শিল্পকর্ম) বললেন! তাহলে তো *কড়ি ও কোমল*, *মানসী*, *সোনার তরী* বা *ক্ষণিকার* প্রেমের কবিতাগুলিকে erotic verses বলতে হয়। আমরা পাঠক-পাঠিকাকে পিকাসোর আঁকা প্রেমিকযুগলের চিত্রটি (চিত্র 1.8) পাতা উল্টে আর একবার দেখতে অনুরোধ করব। পিকাসো কি সেখানে erotic motif এঁকেছিলেন?

স্বীকার্য, অজন্তায় শত শত—সহস্র-সহস্র মিথুনের মূর্তি ও মূর্যাল আছে। কিন্তু তার একটিতেও—না, ব্যতিক্রম হিসাবে একটিমাত্র শিল্পেও—তিলমাত্র যৌনতা নেই, eroticism সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অজন্তায় মিথুনাচারের শেষ সীমান্ত : উত্তেজিত-মিথুন! শৃঙ্গাররত (নিম্নাঙ্গ-প্রদর্শিত) অথবা মৈথুনরত মিথুন অজন্তা নির্মাণকালের নয়টি শতাব্দীর ভেতর একটিমাত্রও আঁকা হয়নি বা গড়া হয়নি।

পুনরুক্তি দোষ সত্ত্বেও আবার বলি : বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রীসংসর্গ করতেন না—প্রত্যেকেই ছিলেন ঊর্ধ্বরেতা—কিন্তু জীবজগতের পুরুষ-প্রকৃতির পারস্পরিক আকর্ষণ বা প্রেমকে তাঁরা জীবজগতের আবশ্যিক সত্যরূপে, তত্ত্বগতভাবে, অস্বীকার করেননি। অন্তত শিল্পের পরিমণ্ডলে। তাঁরা যে হিন্দু দেবদেবী কামদেব ও রতিকে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে সপ্তদশ গুহাবিহারের প্রবেশপথে, ওপরের লিন্টেলে। সেখানে পাশাপাশি আটজন মানুষী বুদ্ধের আলেখ্য অঙ্কিত—বিপাশ্যিন্, শিখিন্, বিশ্বভু, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ, শাক্যমুনি, মৈত্রেয়। এই আট মানুষীবুদ্ধের ঠিক নিচে-নিচে আটটি চৌখুপিতে আটটি নকশা আঁকার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা আঁকলেন আটজোড়া মিথুন।



চিত্র 8.17 অজন্তা সপ্তদশ বিহারে গর্ভমন্দিরের প্রবেশদ্বার

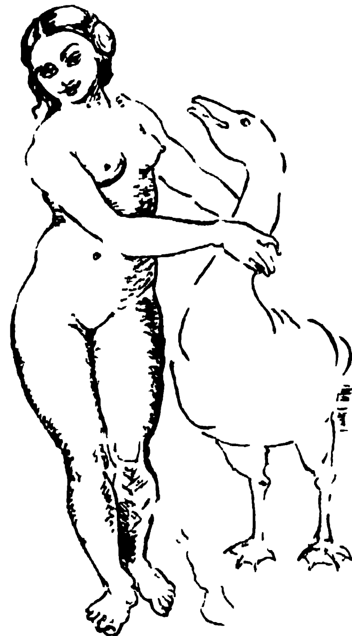
প্রত্যেকটি উত্তেজিত-মিথুন (চিত্র 8.17)। আমরা অবাক হয়ে ভাবি—কেন? ফুল, ফল, পাখি, বা জ্যামিতিক নকশাকে বর্জন করে বীতকাম সন্ন্যাসীর দল প্রতিটি বুদ্ধের নিচে একজোড়া মিলনোন্মুখ উত্তেজিত মিথুন আঁকলেন কী কারণে?

এই একই শালীনতাবোধ পরিলক্ষিত হয় অন্যান্য বৌদ্ধ শিল্পক্ষেত্রেও—ইলোরা, ঔরঙ্গাবাদ, নাসিক, কাহ্নেরি, ভাজা প্রভৃতি স্থানে। ইলোরাতে—সুধীজন মাত্রেই জানেন—পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল তিন ধর্মের গুহামন্দির : বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মেব। শেষোক্ত ধর্মের গুহামন্দিরে অবশ্য কিছু কিছু মৈথুনরত অথবা আরও উগ্র পর্যায়ের মিথুন বর্তমান, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের গুহামন্দিরে সে-জাতীয় মিথুন আমরা একটিও খুঁজে পাইনি। দুঃখের বিষয় পূর্বাচার্যদের রচনায় এ তথ্যটা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। বরং কেউ কেউ পাঠককে রীতিমতো ভ্রান্তপথে পরিচালিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চেন্নাই-এর সুবিখ্যাত প্রকাশক তারাপোরেওয়ালা কর্তৃক 1962 সালে প্রকাশিত একটি বৃহৎ গ্রন্থের কথা—*Ajanta, Ellora & Aurangabad Caves*—লেখক সর্বশ্রী আর. এম. গুপ্তা এবং বি. ডি. মহাজন। সেই গ্রন্থে একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ রচিত হয়েছে "The Mithuna in Indian Temples।" অজন্তা-ইলোরার ওপর আমি বিশ-পঁচিশখানি ইংরেজি গ্রন্থ দেখেছি—কেউ কোথাও মিথুনতত্ত্বের আলোচনা করেননি। কিন্তু এই দুই পণ্ডিত ইলোরার ব্রাহ্মণ্যমন্দির থেকে দুই ডজন আর্ট প্লেটে-মুদ্রিত সাদাকালো চিত্রসহ স্থূলশৈলীতে মৈথুনরত মিথুনের অলটো-রিলিভো চিত্র পরিবেশন করেছেন। কোথাও বলা হয়নি যে, তার একটিও বৌদ্ধ বা জৈন গুহা থেকে সংকলিত হয়নি। ফলে পাঠকের ভ্রান্ত ধারণা হয় যে, ইলোরার যাবতীয় মন্দিরেই বুঝি ওই-জাতীয় অশ্লীল মূর্তি ছড়ানো। আমরা আগেই বলেছি : বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরে ওই-জাতীয় উৎকট মিথুনমূর্তি একটিও নেই এবং ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দিরে কয়েক সহস্র—সম্ভবত লক্ষাধিক— ভাস্কর্যের ভেতর হয়তো চব্বিশখানিই আছে, যা সর্বশ্রী গুপ্তা ও মহাজন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বহু গবেষণা করে সঙ্কলিত করেছেন!

হিন্দু দেবদেবীর ভাস্কর্যে মিথুনাচার

আমরা এতক্ষণ নর-নারী, গন্ধর্ব, কিন্নর প্রভৃতির ভেতরেই মিথুনাচারের সীমাবদ্ধ আলোচনা করেছি। নেপাল, সিকিম, তিব্বত, ভুটান প্রভৃতি রাজ্যে বজ্রযানী দেবদেবীর মিথুনাচার প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি এবং সেই প্রসঙ্গে কিছু শাক্ত বা তান্ত্রিক মূর্তির প্রসঙ্গও এসেছে। এখানে আমরা বাকি ব্রাহ্মণ্যসম্প্রদায়ের হিন্দু দেবদেবীর ভাস্কর্যে মিথুনাচারের আলোচনা করতে বসেছি।

প্রথমেই স্বীকার্য : হিন্দু-দর্শনে এবং আদি ধর্মশাস্ত্রে দেবদেবীদের যে স্বরূপ আমরা দেখেছি পৌরাণিক ও মহাকাব্যের যুগে তার বেশ কিছু ক্রম-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পুরাণের যুগে ও মহাকাব্য রচনার কালে দেখেছি দেবদেবীরা ক্রমশ মানবিক দোষগুণের অধিকারী হয়ে পড়ছেন। ষড়রিপুর তাড়নায় তাঁরা যে আচরণ করছেন তা বৈদিকযুগে তাঁদের কাছে ছিল অচিন্তণীয়। ঠিক একই অবস্থা হয়েছিল গ্রীক দেবদেবীদেরও। দেবত্বমণ্ডিত পরমপুরুষ থেকে তাঁদের পতন হয়েছিল সাধারণ মানুষের স্তরে। শুধু তাই নয়, অমানবিকতায়। ধরুন · জিয়ুস। গ্রীক দর্শনের ঊষাকালে তাঁর উদয় হয়েছিল আদিত্যবর্ণের জ্যোতিতে : স্বয়ম্ভু, সর্বশক্তিমান, মহাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, অমর। কিন্তু পরবর্তী গ্রীক কবি ও নাট্যকারদের পাল্লায় পড়ে—এস্‌কাইলাস, সফোক্লিস, অথবা ইউরিপিডিসের



চিত্র 8.18 হংসের ছদ্মবেশে জিয়ুস ও লীডা (লেঅনার্দো)

কলমের খোঁচায়—জিয়ুস রূপান্তরিত হয়ে গেলেন এক পার্থিব রাজা-গজায়! দাম্ভিক, পরশ্রীকাতর এমনকি পরস্ত্রীকাতর, ইন্দ্রিয়াসক্ত, মানবিক এবং অমানুষিক দোষ-সম্পন্ন। তখন দেখি তিনি মরাল-হংসের ছদ্মবেশে সুন্দরী লীডার কৌমার্য হরণে লালায়িত (চিত্র 8.18)। প্রাগ্বর্তী গ্রীকদর্শনের জিয়ুস তলিয়ে যান জাগতিক পাপপঙ্কে। একই অবস্থা আফ্রোদিতের। প্লেটোর Venus Coelestes ছিলেন অপাপবিদ্ধা। সেই সৌন্দর্যের দেবী রূপান্তরিতা হলেন এথেন্স বা আলেকজেন্ড্রিয়ার 'হেটেরা'য়। একাধিক দেবতার সঙ্গে তাঁর যৌনসম্পর্ক!

হিন্দু দেবদেবীদের ক্ষেত্রেও অবস্থা অনেকটা একই রকম। হুবহু এক নয়; কারও কারও ক্ষেত্রে দেবত্ব শৃঙ্গ থেকে মানবিকতার উপত্যকায় অবতরণ ঘটেনি, ঘটেছে উত্তরণ—যেমন মহাদেব। তাঁর কথায় পরে আসছি। প্রথমে ধরা যাক দেবরাজ ইন্দ্রকে। বৈদিক যুগে তিনি ছিলেন জিয়ুস্-এর প্রতিরূপ। দেবতাদের দলপতি—'অজর, অমর, বজ্রপাণি মহাশক্তিধর!' পৌরাণিক যুগে তাঁর পতন হয় ইন্দ্রিয়াসক্ত এক পার্থিব নৃপতির সমতলে। ক্রমাগত সুন্দরী যৌবনবতীর সন্ধানে মৃগয়া করে চলেন। অধবা, সধবা, বিধবা—কোনো বাছবিচার নেই। সধবা কুন্তীকে উপহার দিলেন অর্জুনের মতো সন্তান; সতী অহল্যাকে গৌতমের ছদ্মবেশে ধর্ষণ; ঋষি বশিষ্ঠের ধর্মপত্নী অরুন্ধতীর কাছে 'ল্যাক্‌ল্যাক' করতে গিয়ে হলেন অপমানিত, ঋষি গৌতমের আশ্রমে পেলেন চরম শাস্তি : সহস্রলোচন!—সারা দেহে রতিজরোগের চিহ্ন!

কোনো ভারতীয় দেবী অবশ্য কবিদের পাল্লায় পড়ে আফ্রোদিতের মতো সর্বজনভোগ্যা হয়ে ওঠেননি। কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেবের বিবর্তনটি বড়ই মনোগ্রাহী।

আদিযুগে তিনি ছিলেন পশুপতি। যোগীমহারাজ। এমনকি পঞ্চম শতাব্দীর কবি কালিদাস *রঘুবংশের* প্রথম শ্লোকে শিব ও পার্বতীর মিলন বর্ণনা করেছেন 'বাগর্থে'র মতো সম্পৃক্ত, অবিচ্ছেদ্য, একীভূত। ক্রমে দেখছি, সেই একই কবির লেখনীতে শিব ও পার্বতীর বিবর্তন হচ্ছে। যাঁরা ছিলেন 'বাগর্থের' মতো অচ্ছেদ্য, তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটল। তারপর দেখুন *কুমারসম্ভবের* সপ্তম সর্গে, গন্ধমাদন পর্বতের শিখরে মিলন। 'শৈলরাজ দুহিতার' 'পাণিপীড়নান্তে' মধুচন্দ্রিমা রাত্রে শিব ও পার্বতী অষ্টম সর্গে যে কাণ্ড করলেন তা ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দরের* নায়কনায়িকার সঙ্গে পাল্লা-দেওয়া। এখানেই কিন্তু শিবের বিবর্তন শেষ হল না। *অন্নদামঙ্গলে* দেখছি সেই শিবই হয়ে গেছেন আমাদের খুব কাছের মানুষ—'নুন-আন্তে-পান্তা-ফুরানো' নাস্তিদলের প্রতীক! মালিকচাষী যেমন জমিদারের অত্যাচারে ভাগচাষী, মজুরচাষীর বিবর্তন পথে শেষমেশ হয়ে পড়ে ভিক্ষাজীবী, শিবেরও হল সেই হাল। লোটা-ত্রিশূল হাতে জীবনসঙ্গিনীর নতুন ঢঙে পাণিপীড়ন করে বার হলেন ভিক্ষায়!

বেচারি দেবাদিদেব! ভারতচন্দ্রের মতো 'জমিদারে'র হাতে পড়ে তাঁর নির্যাতনের চূড়ান্ত। যথেষ্ট ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে না পারায় সেই কৈলাশপতি মহাদেবকে শুনতে হচ্ছে ঘরণী অন্নপূর্ণার তিরস্কার! তা হোক। আদি যুগে শিব-পার্বতী ছিলেন অমর। বাস্তবে কিনা জানি না, কবি এবং অন্তত দ্রষ্টাদের কল্পনায়। কিন্তু এই নাস্তিদলের আপনজন ভিক্ষাজীবী শিব-পার্বতী বাঙালী জনসাধারণের অন্তঃকরণে আক্ষরিক অর্থে চিরন্তন। যুগে-যুগে নানাভাবে—যাত্রায়, কথকতায়, ছৌ-নাচ, লোকগীতিতে, আগমনী গানে তাঁরা অমরত্ব লাভ করেছেন। অষ্টাদশ শতকের একটি দুর্লভ কালীঘাটের পটের অনুলিপি দেবার চেষ্টা করেছি (চিত্র 8.19)। আমরা ভিক্ষুক-দম্পতিকে দেখছি খরমধ্যাহ্নে বিশ্রামরত অবস্থায়। মা অন্নপূর্ণা ক্লান্তিতে ভূশয্যালীনা। নির্লিপ্ত শিব তাঁকে পাহারা দিচ্ছেন।



চিত্র 8.19 ভিক্ষাজীবী শিবপার্বতী, কালীঘাটের পট

প্রসঙ্গত বলা যায় শিব-পার্বতীর এই নিরন্ন ভিক্ষুক-দম্পতির রূপ বাঙালী মানসে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় তার পরেও প্রবাহিত। এমনকি আমাদের সমকালেও। 1943 সালে অবিভক্ত বাঙলায় যে মহাদুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ নরনারী প্রাণ দেয়। তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বলি। এ অঞ্চলে উৎপন্ন সমস্ত শস্য ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনীর জন্য অধিগ্রহণ করাতেই এই মহামৃত্যুর বীভৎস লীলা। তদানীন্তন বাঙালী তরুণ শিল্পীর দল—জয়নাল আবেদিন, খালেদ চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, গোপাল ঘোষের দল—কলকাতার পথে-ঘাটে স্কেচ এঁকে চলেছেন—এই অত্যাচারের এক ঐতিহাসিক দলিল নির্মাণ করতে। এর মধ্যে জয়নাল আবেদিনই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর সেই স্কেচগুলি বর্তমানে মৈমনসিংহ-সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত। একমাত্র ব্যতিক্রম আচার্য অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য আচার্য নন্দলাল। তিনি দুর্ভিক্ষের রূপরেখার শাশ্বত দলিল তৈরি করলেন ঘরে বসেই। ভারতচন্দ্রের বর্ণনার অনুসরণে আঁকলেন শীর্ণকায়, কঙ্কলসার মহাদেব এবং মৃতপ্রায়া পার্বতীকে—দোরে-দোরে তাঁরা ভিখ্ মাঙছেন : 'মা-রে, টুক ফ্যান দিবা?' চাল নয়। চাল সব ঘরেই 'বাড়ন্ত'! তাই : ফ্যান! নন্দলাল সে ছবির নিচে চিত্র-পরিচিতি হিসাবে তেতাল্লিশের মন্বন্তরকে চিরন্তন করে রাখলেন *অন্নদামঙ্গলেরই* একটি পংক্তিতে : *"অন্নপূর্ণা যার ঘরে/সেও আজি ভিক্ষা করে!"*



চিত্র 8.20 বিষ্ণুলক্ষ্মী, খাজুরাহো

এই ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যখন মন্দির-ভাস্কর্যের দিকে তাকাই তখন অবাক হয়ে যাই। ভাস্করদল চিত্রশিল্পী বা কবিকুলের মতো দেবদেবীদের কোনো বিবর্তন হতে দেননি। শতাব্দীর পর শতাব্দি মূর্তিগুলি একই ভঙ্গিমায়, একই আয়ুধ সম্বল করে আত্মঘোষণার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন। কারও হস্তধৃত আয়ুধ—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম—বরদা-অভয় মুদ্রা বা বাহন ঠাঁই বদল করেনি। কুবেরের স্ফীতোদর, অগ্নির শ্মশ্রু, সূর্যের বুট-জুতো শতাব্দীর পর শতাব্দী অপরিবর্তিত। অধিকাংশ দেবতা বা দেবী ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হন একাই। ভাস্করদল যেন বিশ্বাসই করতে পারেন না—কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বায়ু, অগ্নি, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবদেবীরা বিবাহিত! অষ্টদিকপাল কখনো সস্ত্রীক উপস্থিত হন না। মা-দুর্গার চালচিত্রে-মহাদেবের একান্ত উপেক্ষিত অবস্থিতি ব্যতিরেকে—আর, ও হ্যাঁ কাঠামোর বাইরে গণপতির অবগুণ্ঠনবতী কলা-বৌ ব্যতিরেকে—সবাই বে-জোড়!

মানছি, ভাস্করদের দোষ দেওয়া বৃথা। তাঁরা শিল্পগুরুদের নির্দেশানুসারে ক্রমাগত ছেনি-হাতুড়ি চালিয়ে গেছেন। কিন্তু সে কৈফিয়তেই তো আমাদের অভিযোগের খণ্ডন হচ্ছে না। আমাদের মূল প্রশ্ন : শিল্পাচার্য গুরুকুলই বা এমন সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে থাকলেন কেন? তাঁরা তো নিশ্চয় পড়তেন কালিদাস, ভবভূতি, ভাস, শূদ্রক? আরও পরবর্তীকালে জয়দেব, বিদ্যাপতি, তুলসীদাস? কবিকুল যখন বারে বারে 'ককুন'-এর বেড়া ভেঙে প্রজাপতির মতো ফুলে ফুলে মধু খেতে খেতে উড়তে পারলেন তখন ভাস্করগুরুরা কেন এমন বদ্ধমূল সংস্কারে মগ্নচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলেন? শতাব্দীর পর শতাব্দী?

মাত্র কয়েকজন দেবতাকে সর্বসমক্ষে সস্ত্রীক উপস্থিত হবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল : রাম-সীতা, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, ব্রহ্মা-ব্রহ্মাণী। রাধা ও কৃষ্ণ—যদিও শেষোক্ত যুগল অগ্নিসাক্ষী-স্বামীস্ত্রী নন—একটি ব্যতিক্রম। বৈষ্ণবতীর্থে কৃষ্ণের বিবাহিত পত্নীদের চেয়ে শ্রীরাধিকাকেই শ্রীকৃষ্ণের পাশে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এঁরা সবাই অব্যতিক্রম : যুগলমূর্তি।

দেবকুলে সে হিসাবে একমাত্র ব্যতিক্রম : শিব-পার্বতী! অন্যান্য ক্ষেত্রে দেবতার বামে পৃথগাসনে তাঁর

সহধর্মিণীকে দেখা যায়—দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট অবস্থায়। শুধুমাত্র শিবের ক্ষেত্রে শিবানী উপবেশন করেন স্বামীর বামজানুর ওপর। একমাত্র শিব-পার্বতী মূর্তির ক্ষেত্রেই যাবতীয় দেবকুলে যুগল-মূর্তি থেকে উত্তরণ ঘটেছে উত্তেজিত-মিথুনে। দু-একটি ব্যতিক্রম, তীর্থক্ষেত্রে (!), এমনকি শৃঙ্গাররত মিথুনেও!



চিত্র 8.21 শিব পার্বতী/পরশুরামেশ্বর/কলিঙ্গ

আমরা এখানে পর পর কয়েকটি দেবদেবীর মিথুনমূর্তি সাজিয়ে দিচ্ছি, আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে। চিত্র 8.20 সংগৃহীত হয়েছে খাজুরাহো থেকে। বিষ্ণু-লক্ষ্মীর এক যুগল-মূর্তি। আভঙ্গ ঠামে তাঁরা দণ্ডায়মান। পরবর্তী উদাহরণটি আমরা দাখিল করছি ভুবনেশ্বরে অবস্থিত পরশুরামের মন্দির থেকে (চিত্র 8.21)। এটিকে শৃঙ্গাররত মিথুনের পর্যায়ভুক্ত করতে হচ্ছে। কারণ শিল্পী হরের লিঙ্গটি সুস্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ করেছেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খাজুরাহোর বিষ্ণু-লক্ষ্মী বা শিব-পার্বতীর মূর্তি নির্মিত হয়েছিল পরশুরামেশ্বর মন্দির নির্মাণের অন্তত পাঁচ শতাব্দী পরে। ফলে, একথা বলা যাবে না যে, শিব-পার্বতী কালীক বিবর্তনে উত্তেজিত-মিথুন থেকে শৃঙ্গাররত মিথুনে বিবর্তিত হলেন। হেতুর মূল অন্যত্র নিহিত।

শিবের ক্ষেত্রে এক-এক স্থানের ভাস্করদলের গুরুকুল এক-এক চিন্তাধারায় পরিচালিত হয়েছেন। মিথুনাচারে খাজুরাহো কলিঙ্গের সব মন্দিরকে (কোনার্ক ব্যতিরেকে) পিছনে ফেলে গেছে; কিন্তু তা শুধুমাত্র নর-নারীর ক্ষেত্রে। দেব-দেবীর মিথুনমূর্তিতে কলিঙ্গের অসংখ্য মন্দির খাজুরাহোর তুলনায় অধিকমাত্রায় যৌনাচারী। খাজুরাহোর কোনো মন্দিরে—লক্ষ্মণ, বিশ্বনাথ, চিত্রগুপ্ত, জগদম্বা, কাণ্ডারীয়, চতুর্ভুজ (925 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1050 খ্রিঃ)—আমরা একটিও শৃঙ্গাররত দেবদেবীর মিথুনের সন্ধান পায়নি। সহস্রাধিক দেব-দেবীর মিথুনমূর্তিতে তাঁদের নিম্ন যৌনাঙ্গ আবৃত। অপরপক্ষে কলিঙ্গে পরশুরামেশ্বরে (8.21) বৈতালের 'ভো'-তে (চিত্র 8.22) এবং খিচিং-এর একাধিক হর-পার্বতীর মূর্তিতে শিবের সমুত্থিত লিঙ্গটি পরিদৃশ্যমান।

উড়িষ্যার প্রাক্তন ময়ূরভঞ্জ স্টেটে অবস্থিত খিচিং-এ প্রত্যেকটি শিবপার্বতী-মিথুনে দেখেছি শিবের লিঙ্গটি



চিত্র 8.22 শিব পার্বতী/বৈতাল/ভুবনেশ্বর

সমুত্থিত। খিচিং সংগ্রহশালায় প্রবেশপথের দক্ষিণে অবস্থিত প্রদর্শনী কক্ষে পর পর চারটি অতি বৃহদাকার হরপার্বতীর মিথুনমূর্তি আছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শিবের লিঙ্গ সমুত্থিত (চিত্র 8.23)।

সম্ভবত খিচিং শিল্পগুরুর বক্তব্য : যে-দেবতার প্রতীকমূর্তি হচ্ছে গৌরীপট্টবিধৃত শিবলিঙ্গ, তাঁকে

নরদেহীরূপে কল্পনা করতে হলে তাঁর লিঙ্গটিকেও গড়তে হবে। গ্রীক শিল্পাচার্যরা দেবদেবীর নিম্ন যৌনাঙ্গ খোদিত করেছিলেন বাস্তবতার বোধ থেকে। যাকে ইংরেজিতে বলে verisimilitude; তাই জিয়ুস, অ্যাপোলো, মার্কারি—ওদিকে আফ্রোদিতে, ভেনাস, ডায়েনা কেউই হিসাব থেকে বাদ যাননি। অপরপক্ষে ভারতীয় শিল্পাচার্যরা বিপরীত-সিদ্ধান্তে এসেছেন। তারই একমাত্র ব্যতিক্রম হয়েছেন শিব। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ এমনকি মদনও নয়। অন্যদিক থেকে স্ত্রীজাতীয়ার ক্ষেত্রে—দেবীদের ক্ষেত্রে, ব্যতিক্রম হিসাবেও সেটা আমাদের নজরে পড়েনি।

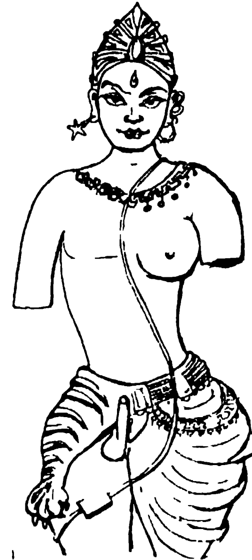
বরং বলতে পারি, মধ্যবর্তী অবস্থানের একটি মূর্তিতে তা আমাদের নজরে পড়েছে। খিচিং-এর অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে। সম্ভবত শিল্পী বলতে চেয়েছেন : যেহেতু দেবী স্বেচ্ছায় তাঁর অর্ধসত্তা পুরুষায়িত করেছেন তাই তাঁর জননীত্বের প্রতীক-চিহ্নটির আধখানা উৎকীর্ণ করা উচিত।



চিত্র 8.23 শিব পার্বতী/খিচিং সংগ্রহশালা/কলিঙ্গ

এই অর্ধনারীশ্বর মূর্তিটি অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ্র সংগ্রহ করে রেখেছিলেন খিচিং সংগ্রহশালায়। আজও তা সুরক্ষিত (চিত্র 8.24)।

এইখানে স্বীকার করে যাই—হর-পার্বতী ব্যতিরেকে দেবদেবীর ক্ষেত্রে একটিমাত্র শৃঙ্গাররত মিথুনের সন্ধান পেয়েছি। এটি আমি স্বচক্ষে দেখিনি—অস্পষ্ট একটি আলোকচিত্রমাত্র দেখেছি। তবে শ্রীযুক্তা দেবাঙ্গনা দেশাইয়ের গবেষণাগ্রন্থে এর সবিশেষ বর্ণনা পেয়েছি। মূর্তিটি আছে দক্ষিণভারতে, কুম্ভকোনমে। নাগেশ্বর মন্দিরে। গণেশ এবং কলাবউয়ের শৃঙ্গাররত মিথুন।



চিত্র 8.24 অর্ধনারীশ্বর/খিচিং সংগ্রহশালা/কলিঙ্গ

কলাবউ এখানে রমণীমূর্তিতে আবির্ভূতা। তাঁর ভঙ্গি আড়ষ্ট। কিন্তু গণেশ মূর্তিটি রসোত্তীর্ণ। বিশেষ তাঁর দৃষ্টিতে, যৌনানুভূতিতে। দেখা যাচ্ছে গণেশের নায়িকা গণপতির লিঙ্গটি দক্ষিণহস্তে গ্রহণ করেছেন এবং গণেশও লড্ডুক থালিকার পরিবর্তে অন্য কোনো মাধুর্যের সন্ধানে প্রসারিতশুণ্ড (চিত্র 8.25)।

এই জাতীয় যৌনাচারী শৃঙ্গাররত ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবদেবীর মূর্তি সারা ভারতে আমরা দ্বিতীয় একটি খুঁজে পাইনি।

তৃতীয় শ্রেণি : শৃঙ্গাররত মিথুন

শৃঙ্গাররত মিথুন, অর্থাৎ *ঘনিষ্ঠতর প্রাকসঙ্গম শৃঙ্গারে রত—যখন শিল্পী তাদের মূল নিম্ন-যৌনাঙ্গ আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত করেছেন।*

নন্দনতত্ত্বের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মিথুনাচার সার্থকতার গৌরীশৃঙ্গে উঠেছিল দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শ্রেণির মিথুনে সংক্রমণ-মুহূর্তে; অর্থাৎ 'উত্তেজিত মিথুন' যখন 'শৃঙ্গাররত মিথুন'-এ বিবর্তিত হচ্ছে। তার একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকাও আছে। সময়টা ছিল গুপ্তসাম্রাজ্যের স্ফুরণ মুহূর্তের স্বর্ণযুগ। সেই সময়

'রোম্যান্টিসিজম্'-এর বাঁধভাঙা জলোচ্ছ্বাসে উত্তাল হয়ে উঠেছিল উত্তর ও মধ্যভারতের যাবতীয় ললিতকলা : শিল্প-সাহিত্য-চিত্র-স্থাপত্য-নাট্যকলা। ভাস্কর্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। ভবভূতি, কালিদাস-ভাস-এর কালজয়ী কাব্যে, শূদ্রকের নাটকে, উন্মোচিত হয়ে গেল এতদিনের অবরুদ্ধ দ্বার। তবু যেহেতু দেবদেউলের মিথুন ভাস্কর্য হচ্ছে দৃশ্যকাব্য তাই প্রথম যুগেই ভাস্কর অতটা স্পষ্টবাদী হতে পারলেন না। যেন সরমে বাধল, সঙ্কোচে মাঝপথে থামতে হল। সমাজ তখনো এজন্য প্রস্তুত নয়, দর্শকমন তৈরি হয়নি। সম্পূর্ণ ধরা দেবার পূর্বমুহূর্তটিতে যেন



চিত্র 8.25 গণেশ ও নায়িকা/কুম্ভকোনম্/দাক্ষিণাত্য

দ্বিধাচরণজড়িত নায়িকা। কালিদাসের কলম যখন *মেঘদূতে* অসঙ্কোচে রচনা করতে পারছে, 'বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুম্ সমর্থঃ?' তখন ছেনি-হাতুড়ি হাতে মন্দির-ভাস্কর ভাবছেন : 'ছি! ওভাবে কি শিল্পে জৈবিক সত্যপ্রকাশ সম্ভব?'

নিশ্চয় তাই ভেবেছিলেন। এ আমার কবিকল্পনা নয়। ভারতীয় ভাস্করের সহস্রাব্দব্যাপী শিল্পীজীবনে অমন মুহূর্ত বারে বারেই এসেছে : যদিও আজকের দিনের দর্শক সত্যটা অনুধাবন করেন না। কারণ সহস্রাব্দকালের শিল্পসম্পদ আমরা পাশাপাশি দেখে যাই। তাদের কালীক দূরত্বটা আমাদের অনুভবে ধরা দেয় না। আমাদের কাছে অজন্তার দশ নম্বর গুহামন্দির থেকে সপ্তদশের দূরত্ব সংখ্যার বিচারে সাত, ভৌগোলিক দূরত্বে আশি মিটার; ভারতীয় শিল্পের বিবর্তন ইতিহাসে তারা আছে আট-শতাব্দির ব্যবধানে। মিথুনাচারে যৌনতার বিকাশ যদি বিবর্তনের পথে ধীরে ধীরে না আসত, তাহলে আমরা প্রথম যুগ থেকেই মৈথুনরত মিথুন ভাস্কর্য দেখতে পেতাম। ডক্টর মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্ প্রমুখ ভারত শিল্পবিশারদেরা সবজাতের এবং সবকালের মিথুনকে একই পাল্লায় তৌল করে—ভারহুত, সাঁচি, খাজুরাহো ও কোনার্কের মিথুনকে একই অনুচ্ছেদে বিচার করে—আমাদের বিভ্রান্ত করেছেন। বরং বলা যায়, বিপথে পরিচালিত করেছেন! এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা।

চালুক্যযুগের শেষাশেষি এবং গুপ্তযুগে—বস্তুত পঞ্চম শতাব্দীর এপাশ-ওপাশ—একটা সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণির অভ্যুত্থান ঘটেছিল। যা প্রাগ্বর্তী নৃপতিকেন্দ্রিক 'নাগরক' জীবনযাত্রার স্থান দখল করে নিল। শিল্পের পৃষ্ঠপোষক রাজদরবারের বাহিরে কিছুটা বিকেন্দ্রিকৃত হল। ছোট ছোট সামন্ত রাজা, ভূম্যধিকারী, অভিজাত শ্রেণির ধনবানেরা নানান পূর্তকর্মে আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকেন। ধর্মের কারণে। জলাশয় খনন, পান্থশালা নির্মাণ, সড়ক নির্মাণ এবং মন্দির তৈরির কাজে। তাতে শিল্পস্ফুরণেরও কিছুটা বিকেন্দ্রিকরণ ঘটল। দেবাঙ্গনা দেশাই তাঁর গবেষণা গ্রন্থে বলছেন[3] :

> ধর্মের বিচারে বৌদ্ধদের তখনো সাহায্য করে চলেছেন উত্তর, মধ্য ও পূর্বভারতের রাজন্যবর্গ। কিন্তু এই যুগ থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মও সামন্ত রাজগণের অনুগ্রহ লাভ করতে শুরু করে। ফলে পুরাণগ্রন্থগুলি ভূর্জপত্রে সংকলিত এবং পুনর্লিখিত হতে থাকে। গুপ্তযুগ থেকে—বিশেষ করে হূণ দলপতি মিহিরকুলের দেহাবসানের পর—অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল থেকে হল হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান। নির্মিত হতে থাকে নানান দেবদেউল... সামন্ত রাজারা মন্দির নির্মাণের জন্য ভূদান এবং অর্থদান করতে আগ্রহী হন।...এই সময় থেকেই ভোজবিদ্যা ও ধর্মের সংমিশ্রণে শিল্পে কিছু ধর্মীয় অনুচিন্তার ছাপ পড়তে শুরু করে। অপরপক্ষে ভোগবাদীরা যৌনাচারে হয় নিমগ্ন।

শিল্পীর এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভাবটি যেন অনুরণিত হয়েছে গুপ্তযুগের প্রথম পর্যায়ের মিথুনগুলিতে। শেষ চালুক্য

যুগের গুপ্ত-প্রভাবিত আইহোল-এর লাদখান-মন্দিরে একটি মিথুন মূর্তিতে পড়েছে তার প্রভাব (চিত্র 8.26)। দেখছি, নায়ক তার প্রেমাস্পদার কটিদেশে বস্ত্রগ্রন্থিটি উন্মোচনে সফলকাম হয়েছে। সলজ্জ নায়িকা আড়ষ্ট বামহস্তে বস্ত্রখণ্ড ধরে রেখেছে। আরও দেখছি : নায়ক



চিত্র 8.26 শৃঙ্গাররত মিথুন/লাদখান/আইহোল

দক্ষিণহস্তে চেপে ধরেছে নায়িকার দক্ষিণ মণিবন্ধ—অর্থাৎ বাধাদানে বাধা দিচ্ছে। নায়িকার ত্রিভঙ্গ-ঠাম। তার দক্ষিণহস্তের আড়ষ্টভঙ্গিমা এবং সবার ওপরে তার সম্মতিসূচক আপত্তির দ্বৈতভাবটি অনবদ্যভাবে রূপায়িত হয়েছে। এই লাজনম্রা রত্যাতুরার দ্বৈতভাব আমাদের স্মরণে এনে দেয় সমকালীন কবির বর্ণনায় *মেঘদূতের* সেই সুন্দরীকে :

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু।।
অর্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্।
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ।।[4]

অর্থাৎ "বিম্বাধরা নায়িকা যখন দেখলো যে, নায়ক তার কটিদেশের বস্ত্রগ্রন্থী উন্মোচনে সিদ্ধকাম হয়েছে তখন অন্ধকারে আশ্রয়লাভের উদ্দেশ্যে সে রত্নপ্রদীপের দিকে ছুঁড়ে মারল কিছু প্রসাধনচূর্ণ! কিন্তু বেচারির মনস্কামনা সিদ্ধ হল না। হবে কেমন করে? অন্ধকারেও তার আনন্দঘন সম্মতি ভাস্বর হয়ে উঠল যে!"

আমাদের পূর্বস্বীকৃত সংজ্ঞানুসারে এটি তৃতীয় শ্রেণির মিথুন—'শৃঙ্গাররত' পর্যায়ের, কারণ নিষ্করুণ শিল্পী নায়িকার একান্ত গোপনাঙ্গ আংশিকভাবে প্রকট করেছেন। কী জানি, হয়তো কালিদাসের 'বিফলপ্রেরণা' শব্দটির অনুরোধে। এবার এই নায়িকার সঙ্গে তুলনা করুন ব্রহ্মেশ্বরের রতিমন্দিরে মিথুনদ্বয়ের সঙ্গে (চিত্র 8.12 এবং চিত্র 8.13)। পরিকল্পনা অভিন্ন। মেঘদূতের যক্ষপ্রিয়ার পরিবর্তে সেবার যেন দেখেছিলাম *কুমারসম্ভবম্*-এর উমা-মহেশ্বরের শৃঙ্গার। নরলোকের মধুমিলন দেবলোকে উত্তরণ ঘটার জন্য রসের কোনো পরিবর্তন হয়নি। হয়েছে রুচির। সেই আদিমতম আদিরসই; তবু শালীনতাবোধেই যেন জগজ্জননীর একান্ত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপে শিল্পী দ্বিধাগ্রস্ত! যেন সপ্তমসর্গের অসমাপ্ত গানের অ-শেষ সমাপ্তি :

"নাভিদেশনিহিতঃ সকম্পয়া শঙ্করস্য রুরুধে তয়া করঃ।
তদ্দুকুলমথ চাভবৎ স্বয়ং দূরমুচ্ছ্বসিত নীবিবন্ধনম্।।[5]

[শঙ্কর যখন কটিদেশের বন্ধনগ্রন্থী উন্মোচন মানসে উমার নাভিদেশে করসঞ্চালনে প্রবৃত্ত হলেন, তখন পার্বতীর সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগল; তিনি বাধা দিতে গেলেন, কিন্তু তার পূর্বেই হৃদয়ের অত্যুচ্ছ্বাসনিবন্ধন দেহকম্পনে তাঁর নীবিবন্ধের গ্রন্থী আপনিই উন্মোচিত হয়ে গেল।"]

কার্য-কারণ সম্পর্ক যাই থাক, যেহেতু ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের নায়িকাদ্বয়ের নিম্ন গোপনাঙ্গ ছিল আবরিত, তাই সেক্ষেত্রে আমরা মিথুন দুটিকে 'উত্তেজিত' শ্রেণিভুক্ত করেছিলাম—আইহোল মিথুনকে 'শৃঙ্গাররত' শ্রেণিভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছি।

আর একটি কথা। পরিসংখ্যান তত্ত্ব থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, 'শৃঙ্গাররত মিথুন' কলিঙ্গ-শিল্পীর কল্পনায় এসেছিল 'মৈথুনরত-মিথুনের' পরবর্তীকালে। কারণ প্রথমোক্তকে আমরা পেয়েছিলাম

রাজারানী, গৌরী ও ব্রহ্মেশ্বরে— একাদশ শতাব্দীতে; অথচ 'মৈথুনরত মিথুন' খোদিত হয়েছে তার পূর্বযুগে বৈতাল দেউলে—নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি। তথ্যটি সঠিক হলেও অনুসিদ্ধান্তটি ঠিক নয়। আমাদের সংজ্ঞানুসারে সপ্তম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ যক্ষমিথুনকেই বা 'শৃঙ্গাররত মিথুন' বলা যাবে না কেন? ভুবনেশ্বর সংগ্রহশালায় রক্ষিত এই যক্ষের জননেন্দ্রিয় তো সুস্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান! যদিও তা অনুত্তেজিত।

শেষ-চালুক্য ও গুপ্তযুগে প্রায় একই সঙ্গে 'শৃঙ্গাররত' ও 'মৈথুনরত' মিথুন নির্মিত হয়েছিল আইহোল এবং দেওঘর অঞ্চলের মন্দিরে। ডক্টর দেবাঙ্গনা দেশাই তাঁর গবেষণা গ্রন্থে বলেছেন :

> "বাতাপী-মন্দিরের প্রথম গুহার লিন্টেলে (দ্বারশীর্ষের খিলানে) মৈথুনরত একটি মিথুন আছে। এটি শিবের গুহা। মিথুন মূর্তিতে দুজনেই কামশাস্ত্রীয় সম্মুখীন আসনে মিলিত হয়েছে। আইহোলের আর একটি মন্দিরের খিলানে (লিন্টেলে) পাশাপাশি নয়টি মিথুন। তাদের যৌনতার পরিমাপ বিভিন্ন (having various amorous attitudes)। বাতাপীর তিন মাইল দূরে মহামুক্তেশ্বর মন্দিরে দণ্ডায়মান এবং উপবিষ্ট অবস্থায় নানান ধরনের যৌনতামণ্ডিত মিথুন (erotic couples in various poses, sitting and standing) বর্তমান। এটি চালুক্য রাজাদের নির্মিত ষষ্ঠ/সপ্তম শতাব্দীর মন্দির।"[6]



চিত্র 8.27 কোনার্ক-মিথুন

মিথুনাচারের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার প্রসঙ্গ পরিহার করে আমরা বরং এ জাতীয় কিছু নমুনার নান্দনিক আনন্দলাভের চেষ্টা করি।

চিত্র 8.27-এর মিথুনটি কোনার্ক জগমোহন থেকে সংগৃহীত। এ মিথুনমূর্তিতে যৌনতার কোন স্থান নেই। এটিকে আমরা 'উত্তেজিত' শ্রেণিভুক্ত করতে পারি। নায়িকার মধ্যে শিল্পী একটি অপূর্ব দ্বৈতভাব ফুটিয়ে তুলেছেন। মনে হয় : সে অন্যমনা, যেন কোনো বিস্মৃতপ্রায় প্রথম তারুণ্যের অতীত-নায়কের কথা তার স্মরণপথে ফিরে আসছে। যদিও বর্তমানকে সে অস্বীকার



চিত্র 8.28 উত্তেজিত মিথুন/কোনার্ক

করেনি—দক্ষিণ হস্তের আলিঙ্গনে সে বর্তমানকে স্বীকার করে নিয়েছে, অথচ তার বামহস্তের করলগ্নকপোল-মূর্ছনায় যেন কী একটা ইঙ্গিত! সে যেন কৈশোরকালের প্রথম প্রেমের বিস্মৃতপ্রায় এক অনুভূতির অনুরণনে মগ্নচৈতন্য! শাশ্বত নারী-হৃদয়ের এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য— 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না'-র এক বিচিত্র ব্যঞ্জনা। অতীত ও বর্তমানের মাঝখানে দোলকের মতো দোদুল্যমান চিররহস্যময় নারীহৃদয়।

এবার লক্ষ্য করুন একই মন্দিরের পার্শ্ববর্তী প্যানেলের এক মিথুনকে (চিত্র 8.28)। আমার তো মনে হয়েছিল

একই শিল্পীর হাতের কাজ। শুধু তাই নয়, একই মডেলকে অবলম্বন করে গড়া। দুটি নায়িকার মুখাবয়বে 'ফোটোজেনিক' সাদৃশ্য। নায়কও তাই, যদিও পূর্ববর্তী উদাহরণে তাকে দেখছি 'প্রোফাইলে', পরবর্তীতে প্রায় সম্মুখদৃশ্যে। নায়িকার দক্ষিণ হস্তের সংস্থাপন অভিন্ন, বামহস্তের মুদ্রায় পার্থক্য থাকলেও ব্যঞ্জনা একই রকম। এ সব বাহ্যিক দিক নয়, আমরা ওই দুটি ভাস্কর্যের অন্তর্নিহিত রসটি—নায়িকার ভঙ্গি ও ভাবব্যঞ্জনার পার্থক্যটি—তৌল করতে বলব। প্রথম নায়িকা অপেক্ষাকৃত গম্ভীর, সে ছিল অন্যমনা,—স্মৃতির সরণী বেয়ে যেন সে উজান পথে অন্তর্লীন চিন্তায় আত্মমগ্না। তুলনায় দ্বিতীয়া সুখাবেশে আবিষ্টা। তার ওষ্ঠপ্রান্তে সেই অনুভূতির প্রকাশ।

বাস্তবিকপক্ষে উপস্থাপনের চাপল্যে আমরা পাঠককে বিপথে পরিচালিত করেছি। চিত্র 8.28-এ আংশিক প্রতিবেদনে ভাস্করের মূল বক্তব্যটা গোপন করা হয়েছিল। মূল নাট্যকার এ দৃশ্যে যতটা আদিরস ঢালতে চেয়েছেন খণ্ডচিত্রে তা বোঝা যাচ্ছে না। তাই কিছুটা দূরে সরে গিয়ে এটিকে পুনরায় এঁকে দেখাতে হল (চিত্র 8.29)।

এখন বোঝা যাচ্ছে, নায়িকার সুখানুভূতি নিতান্ত ইন্দ্রিয়জ। অবশ্য দেহ আর মন অসম্পৃক্ত নয়। দেহজ



চিত্র 8.29 পূর্ববর্তী মিথুন কিছু দূর থেকে/কোনার্ক

সুখানুভূতিই প্রতিফলিত হয়েছে ওর মুখের ভাবব্যঞ্জনায়। দূরে গিয়ে আঁকার সময় বুঝতে পারছি এটি উত্তেজিত মিথুন নয়। শৃঙ্গাররত মিথুন। এই প্রসঙ্গে উঠে পড়ছে আর একজাতের তাত্ত্বিক প্রশ্ন : পূর্ণসত্য সম্বন্ধে অবহিত হবার পরে—অর্থাৎ দূরে গিয়ে সমস্ত ভাস্কর্যটি দেখার পরে, দর্শক জ্ঞানবৃক্ষের যে ফলাস্বাদন করলেন তাতে কি শিল্পদর্শনের নান্দনিক তৃপ্তি ঘনীভূত হল, না রসাভাস ঘটল? আদম-ঈভের মতো আমরা কি ঈডেনের নিকষিত হেম রাজ্য থেকে বিতাড়িত হলাম? এ প্রশ্নের জবাব আমি জানি না—আপনারা দেবেন।

মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমরা দাঁড়িয়ে আছি একবিংশ শতাব্দীর বিচারকের আসনে, আসামী সাত শতাব্দীর দূরত্বে এক কাঠগড়ায়। এখানে বিচার একটা প্রহসন মাত্র! নয়? বিচারক কি পারবেন সাত শতাব্দীর উজান ঠেলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঘাটে নৌকা ভেড়াতে? তদানীন্তন সমাজবোধের নিরিখে এই শিল্পকর্মের বিচার করতে?

কোনার্ক-জগমোহনে এই ধরনের অসংখ্য মিথুনমূর্তি আছে—কোনো-কোনোটি মানুষের চেয়ে আকারে বড়—যার ওপরের আধখানা দর্শকেব মনে একজাতের অনুভূতি জাগায়, যাদের নিম্নার্ধের আবেদন সম্পূর্ণ অন্য জাতের। অস্বীকার করার উপায় নেই—তারা দর্শকের মনে কিছুটা যৌন-অনুভূতির উদ্রেক করবেই। সপরিবারে সেগুলি দর্শন করা আজকের দিনে অনেক দর্শকের কাছে নিতান্ত বিড়ম্বনা। বিশেষ—যদি বালকপুত্র জিজ্ঞেস করে বসে, 'মা, ওরা অমন করছে কেন?' উপনিষদের শ্লোক আউড়ে, আধ্যাত্মিকতার ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে এই মূর্তিগুলিকে জাতে তোলার চেষ্টা হাস্যকর। সহজ, সরল সত্যটা—অস্বস্তিকর অথচ উপভোগ্যে তথ্যটা— এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এ নিয়ে দুই পাশ্চাত্য পণ্ডিত—দার্শনিক আলেকজান্ডার এবং স্যার কেনেথ ক্লার্কের বক্তব্য নিয়ে আমরা অন্যত্র বিচার করেছি। আপাতত, আসুন, আরও কয়েকটি শৃঙ্গাররত মিথুনের রসাস্বাদন করি।

চিত্র 8.30-তে দৃষ্ট মিথুনটি কারো কারো মতে কোনার্কের শ্রেষ্ঠ চুম্বনরত মিথুন। এই মিথুনমূর্তিটির 'লাবণ্য-যোজনা' আমাদের স্মরণ পথে এনে দেয় বাংলা সাহিত্যের আর এক অনন্যা 'লাবণ্যে'র কথা :

> "সেইখানে পশ্চিমের দিকে মুখ করে দুজন দাঁড়ালো। অমিত লাবণ্যের মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার মুখটি উপরে তুলে ধরল। লাবণ্যের চোখ

অর্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানো পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে, যেখানে দেহ নেই, শুধু আনন্দ আছে সেই অমর্ত্যলোকের অব্যক্তধ্বনি জাগাচ্ছে।"[7]

বিশ্বাস করুন, কোনো আলোকচিত্র দেখে নয়, বাস্তবে—অস্তসূর্যউদ্ভাসিত কোনার্কের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে মহাকালের পরুষহস্তে নির্যাতিত ওই প্রেমিকযুগলের ঐকান্তিক মিলনদৃশ্যটি দেখতে দেখতে *শেষের কবিতার* সেই দেহাতীত অনুভূতিতেই আপনি অভিভূত হয়ে যাবেন! অমর্ত্যলোকের 'প্লেটনিক ল্যভ'-এর এক নিকষিত-হেম স্বর্ণাভায়। কিন্তু মুশকিল এই যে, কোনার্ক শিল্পী তা মানতে রাজি নন। প্রেম আছে, অথচ দেহ নেই—মিলনের আনন্দ আছে, অথচ উপাদান নেই,—এ তত্ত্বটা তিনি স্বীকার করেন না। তা প্লেটো থেকে রবীন্দ্রনাথ যাই বলে গিয়ে থাকুন না কেন! দেহ-দেহলিতেই তিনি শোনাতে চান : অমর্ত্যজগতের অব্যক্ত ধ্বনি। আর 'দেহ' অর্থে 'অধরোষ্ঠ' নয়—সর্বাবয়ব!

এই বাস্তব সত্যটা *শেষের কবিতার* কবিও জানতেন। এবং মানতেন। কিন্তু তাঁর ঊনবিংশ শতাব্দির যুগচেতনায়, সমকালীন শিল্পবোধের নিরিখে, আকৈশোর যে ব্রাহ্মসমাজের নীতিবোধে তিনি নিঃশ্বাস নিয়ে এসেছেন তারই প্রভাবে তিনি চুম্বন-তৃষিতের আংশিক চিত্রই শুধু এঁকে গেছেন তাঁর কাব্যে :

"দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।
ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা।।[8]

কিন্তু কবি নিঃসন্দেহে জানতেন, এ চিত্র আংশিক। এ আলেখ্য অসমাপ্ত; এ শুধু সূচনাই। সমাপ্তি নয়। এ প্রস্তাবনা, পরিসমাপ্তি নয়। ফলে পরমপ্রাপ্তিও নয়। আর তাই বলছেন :

"দুখানি অধর হতে কুসুম চয়ন
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর শয়ন।।

তফাৎ এখানেই : বিংশশতাব্দির কবি শুধু কুসুমচয়নেই থেমেছেন, মালিকা গাঁথা দৃশ্যটা রেখেছেন প্রচ্ছন্ন। 'মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর'-এর ইঙ্গিতেই থেমেছেন।—বাকিটা 'বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।' আর কোনার্ক-ভাস্কর যখন আদিরসসমুদ্রে অবগাহন করেন তখন তাঁর কাছে ঘর-বার একাকার। তিনি অনায়াসে ওই রত্যাতুরা নায়িকার কামাবেগকে উৎকীর্ণ করলেন তার দক্ষিণ জানুর উৎক্ষেপে।

চুম্বন :

চুম্বন শৃঙ্গারের এক আবশ্যিক পর্যায়। যদি বলেন : প্রাথমিক পর্যায়, তবে বলব, কামশাস্ত্রের বর্ণপরিচয় পর্যায়ে আটকে আছেন আপনি। কারণ মিলন-নাটকে এই চপল কুশীলবটি কোন দৃশ্যে কখন চুপিসারে আসবেন তা বোধকরি নাট্যকারও জানেন না। প্রথম দৃশ্যেও তিনি স্বাগত, চরম মুহূর্তে প্রত্যাশিত এবং যবনিকাপাতের পরেও তিনি ফিরে এলে কেউ দোষ ধরে না!

ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে এই কুশীলবটিকে বারে বারে দেখা গেছে। অনবদ্য নিদর্শন আছে : কোনার্কে, ভুবনেশ্বরে, খাজুরাহোতে এবং অন্যত্রও। বাৎস্যায়ন চুম্বনের ষোড়শপ্রকার ভেদ করেছেন—দেহের বিভিন্ন অঙ্গের এবং অধরোষ্ঠ-জিহ্বার সঞ্চালন পারম্পর্যে। ঋষি বাৎস্যায়ন বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায় সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করে



চিত্র 8.30 চুম্বনরত মিথুন/কোনার্ক

গেছেন—তাতে 'অ্যানাটমি' আছে, 'নিউরলজি' আছে, 'সাইকলজি' আছে, 'অর্গাজম'-এর প্রসঙ্গও আছে, নেই 'রোমান্স'! শেষোক্তের সন্ধান পাবেন কল্যাণমল্লের *অনঙ্গ রঙ্গে* অথবা কালিদাস-ভবভূতি-ভাস থেকে জয়দেব—যাবতীয় কবির কলমে। শুধু প্রাচ্যের নয় প্রতীচ্যেরও। কাব্যে, চিত্রশিল্পে এবং ভাস্কর্যে।

ভারতীয় ভাস্কর সেই রোম্যান্টিক ভাবটাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কোনার্ক জগমোহনের এই নিবিড়ঘন চুম্বনদৃশ্যটি (চিত্র 8.30) একটি অনবদ্য উদাহরণ। এর সার্থকতায় শিল্পীর যতখানি দান, বোধকরি ততখানিই দিয়েছেন : মহাকাল! কোনার্ক পরিভ্রমণকালে যদি মূর্তিটি খুঁজে পান তাহলে বুঝবেন কেন ওকথা বলেছি। শিল্প ত্রয়োদশ শতাব্দীর। একটি বিশেষ খণ্ড মুহূর্তকে মহাকালের হাত থেকে ছিনিয়ে শাশ্বত করে রেখে যেতে চেয়েছিলেন ভাস্কর। শিল্পী বনাম মহাকাল! সুদীর্ঘ অষ্ট শতকের সামুদ্রিক লবণাক্ত বাতাসে প্রেমিক-যুগল তিল-তিল করে হারিয়েছে তাদের সুচিক্কণ মসৃণতা— তাদের পেলবতা, তাদের যৌবন, তাদের সৌন্দর্য। তবু তারা দুজন হার মানেনি! মহাকালের নিষ্ঠুর 'ক্ষয়রোগ' থেকে ওরা সেই ক্ষণিক মিলনমুহূর্তটিকে আজও সজীব রেখেছে। মৃত্যুঞ্জয়ী তাদের প্রেম :

"অধরের কানে যেন অধরের ভাষা



চিত্র 8.31 চুম্বনোদ্যত মিথুন/কোনার্ক

দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে—
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সংগমে।"৭

অথবা দেখুন আর একটি চুম্বনতৃষিত মিথুনকে (চিত্র 8.31)। নিঃসন্দেহে এটিও অনবদ্য। কিন্তু যেকথা বারে বারে বলেছি আবার তাই বলতে হচ্ছে। একটু দূরে সরে গিয়ে যদি এই চুম্বনরত মিথুনকে দেখি তবে বোঝা যাবে যে, এটি আদৌ শৃঙ্গাররত মিথুন নয়—মৈথুনরত মিথুন। যা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করব।

যদি বলেন, চিত্র দেখার পর শিল্পের নান্দনিক মূল্যায়নে



চিত্র 8.32 পূর্ববর্তী মিথুন কিছু দূর থেকে/কোনার্ক

আপনি আহত হয়েছেন—যদি মনে পড়ে যায় সেই ইংরেজি প্রবাদ বাক্য : Where ignorance is bliss, it is folly to be wise—তাহলে বলব আরও গভীরভাবে নিজেকে যাচাই করুন। নিজের বিবেককে, নিজের রসবোদ্ধা সত্তাকে। না—আপনার এই একবিংশ শতাব্দীর বিবেককেও নয়, যে-কথা আগেও বলেছি—আপনার সেই জাতিস্মর ত্রয়োদশ শতাব্দীর হারিয়ে যাওয়া রসবোধকে।

কী? পারলেন? কিছু উত্তর পেলেন? ❑

নবম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় স্তরের মিথুন

সমকামী, আত্মরত্যাতুর, মৈথুনরত এবং আনুষঙ্গিক যৌনাচার



বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা যে চার শ্রেণির মিথুনমূর্তির আলোচনা করতে বসেছি তার প্রথম আবির্ভাব চালুক্য এবং গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে। ততদিনে সমগ্র ভারতবর্ষে একাধিক শক্তিশালী রাজত্ব গড়ে উঠেছে—কেন্দ্রীয় শাসন বলে কিছু নেই। বলা যায়, নবম-দশম শতাব্দী থেকে। ললিতকলার এই স্বর্ণযুগের সমাপ্তি হল যখন কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা দখল করল কিছু বহিরাগত ভাগ্যান্বেষীর দল।

এর পরেই এল ইন্দো-ইসলামী নূতন দৃষ্টিভঙ্গি। স্ফুরণ হল সঙ্গীতের, গজদন্ত-কারুকৃতির, মিনিয়েচার ড্রইং-এর। স্থাপত্যে এল নতুন তিন ম-কারান্ত প্রভাব—'মসজিদ, মকান ঔর মক্‌বারা'। ভাস্কর্যে ভাঁটা পড়ল, মন্দির ভাস্কর্য তো বটেই। তবু যে-সব অঞ্চলে কেন্দ্রীয় আফগান-পাঠান-মোগল শাসনের প্রভাব পড়েনি সেখানে প্রাগ্বর্তী ভাস্কর্য-ধারা একই ভাবে বইতে থাকে। মধ্যভারতের খাজুরাহো, কলিঙ্গে এবং দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়-স্থাপত্যে গোপুরমে।

দ্রাবিড়-স্থাপত্য সংলগ্ন মন্দির-ভাস্কর্যে মিথুনাচারের প্রভাব অতি অল্প—বস্তুত নেই বললেই চলে। শোভনতা এবং শ্লীলতার প্রশ্নে স্বীকার করতেই হবে যে, উত্তর, মধ্য এবং পূর্বাঞ্চলের মিথুন-ভাস্কর্যে প্রাগ্বর্তীকালে যে সুষমা, সাবলীলতা, মাধুর্যবোধ ছিল, দ্বিতীয় বিভাগের মিথুনে তা যেন ক্রমশ অস্তাচলগামী। এই যুগেই দ্বিতীয় বিভাগভুক্ত মিথুনমূর্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে শুরু করে। এ বিভাগের নবাগত মিথুন-ভাস্কর্যের 'রূপভেদ' অথবা 'প্রমাণ' হয়তো চলনসই, কিন্তু 'ভাব' ও 'লাবণ্যযোজনা'র বিচারে বেশ কিছুটা অবক্ষয় নজরে পড়ে। দু'একটি স্থানীয় শিল্পস্ফুরণে—যেমন খাজুরাহো বা কোনার্ক—মাঝে মাঝে এমন ভাস্কর্য-নিদর্শন নজরে পড়ে যেগুলি নান্দনিক-মূল্যায়নে প্রাগ্বর্তী যুগের সঙ্গে তুলনীয় কিন্তু সামগ্রিকভাব ভারতীয়-ভাস্কর্য যে সাফল্য লাভ করেছিল— বিশেষ করে 'মিথুন-ভাস্কর্য'—তার সমকক্ষ এরা হতে পারেনি।

আমাদের হিসাব মতো মৈথুনরত মিথুনের প্রথম সুস্পষ্ট আবির্ভাব ভুবনেশ্বরের 'বৈতাল' দেউলে। নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি। তার পূর্বে এই দ্বিতীয় বিভাগের চার শ্রেণির মিথুন মন্দির-ভাস্কর্যে নজরে পড়ে না। কেন এ-যুগে এ জাতীয় মিথুন-গড়ার জোয়ার এল তা আমরা ইতিপূর্বেই বুঝে নেবার চেষ্টা করেছি। বর্তমানে এই চার শ্রেণির কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

চতুর্থ শ্রেণি : সমকামী

লিঙ্গভেদে সমকামী আবশ্যিকভাবে, দুই জাতির : পুরুষ ও নারী। পুরুষ যদি পুরুষের প্রতি স্বভাবগতভাবে আসক্ত হয়, এবং নারী কোনো নারীর প্রতি, তখনই আমরা সেই ব্যতিক্রমী যৌনচেতনার মানুষকে বলি : সমকামী। তত্ত্বটা গ্রীক পণ্ডিত হোমারের জানা ছিল—এবং অবহিত ছিলেন ভারতের কামশাস্ত্রীয় পণ্ডিত বাৎস্যায়ন। উভয়েই এই প্রবণতাকে অন্যায়, সৃষ্টিছাড়া এবং 'পাপ' বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণায় ধারাবাহিক ভাবে এই তথ্যটা আদিযুগ থেকে মধ্যযুগ অতিক্রম করে বর্তমান যুগে চলে এসেছে।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই তত্ত্বটাকে নিয়ে আলোচনার সূচনা করেন জার্মান পণ্ডিত অধ্যাপক ওয়েস্টফল। তিনি বার্লিনে মানসিক রোগাক্রান্তদের চিকিৎসা করতেন। সময়টা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। অধ্যাপক ওয়েস্টফলের মতে এই সমকামিতার প্রবণতা বংশানুক্রমিক। রোগীর স্বেচ্ছা-আহরিত নয়। ফলে এটাকে 'পাপ' বলে চিহ্নিত করা অন্যায়। তাঁর মতে : বংশানুক্রমিক রোগের প্রভাবে স্নায়বিক হেতুতে কোনো কোনো মানুষ নিজ লিঙ্গের অন্য মানুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। এজন্য তাকে বিকৃতমস্তিষ্ক মনে করা ভুল। এ একটা মানসিক ব্যাধি। এর চিকিৎসা সম্ভব :

> **The man, however, who more than anyone else, brought to light the phenomena of sexual inversion had not been concerned either with the medical or the criminal aspect of the matter. Karl Heinrich Ulrichs (b. 1825) who for many years expounded and defended**

> homosexual love,....was a Hanoverian legal officer, and himself a sexually inverted person.[1]
>
> যৌনাচারের প্রকার হিসাবে সমকামিতার প্রসঙ্গটা প্রকাশ্যে নিয়ে আসার কাজে একজন আইনজীবীর অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তিনিই প্রথম এ বিষয়ে জনসাধারণকে সম্যকভাবে অবহিত করেন। নিজে তিনি না ছিলেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত, না অপরাধ বিজ্ঞানের। তিনি জার্মানির হ্যানোভার অঞ্চলের একজন আইনজীবী। কার্ল হেইনরিখ্ উলরিষ (জন্ম 1825)। এ বিষয়ে তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করেন এবং সমকামীদের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। ...প্রসঙ্গত, তিনি নিজেও ছিলেন একজন সমকামী।

আমরা হ্যাভলক এলিস থেকে এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে বাধ্য হযেছি কৈফিয়ৎ হিসাবে—অর্থাৎ কী-কারণে এই প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ সমকামীদের শেষ পর্যায়ভুক্ত করা হয়নি। এরা অবাস্তব আদৌ নয়। মাবাত্মকভাবে বাস্তব। এরা অ-স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু অ-প্রাকৃত নয়। মঙ্গোলয়েড সন্তান বা জন্ম-প্রতিবন্ধীর মতো। ফলে এটা প্রকৃতির মূলধারার অনুসারী না হলেও অপ্রাকৃত কোন কিছু নয়। অনেক প্রগতিশীল বিদেশী সমাজ এটাকে অসামাজিকও মনে করে না, যতক্ষণ না সমাজের মূলধারায় এরা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

পুরুষ সমকামিদের দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। তাদের সমকামিতার বাস্তব কার্যবিধি অনুসারে। যৌন তৃপ্তিলাভের জন্য একদল মুখমেহন (fellatio) করায়, অপর দল 'পায়ুমৈথুন' (anal congress)-এ প্রবৃত্ত হয়।

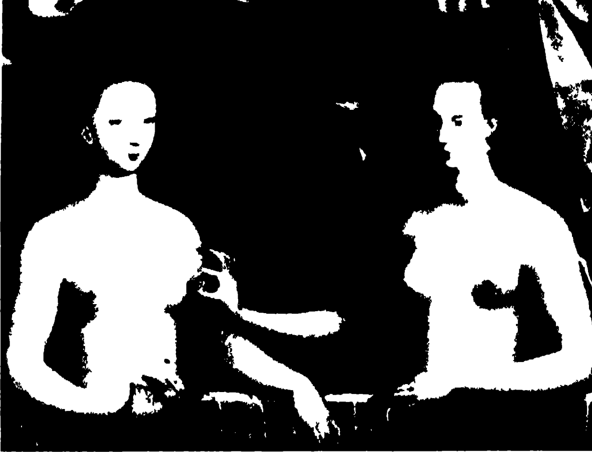
এই দুইজাতির কামাচারীদের তির্যক কামতৃপ্তির প্রয়াসের বিষয়ে বিভিন্ন সভ্যদেশ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আইন প্রণয়ন করেছে। ভারতীয় পেনাল কোডের (আই. পি. সি.) সপ্তদশ পরিচ্ছেদ (যেখানে মানবদেহের বিরুদ্ধে কৃত নানান ধরনের অপরাধের কথা আলোচিত) প্রথমোক্ত অপরাধের বিষয়ে—অর্থাৎ পুরুষাঙ্গের মুখমেহনের (fellatio) বিষয়ে—খুব বেশি কড়া বলে মনে হয় না। দুইজন পুরুষ যদি পরস্পরের সম্মতিসাপেক্ষে পরস্পরের মুখমেহনে যৌন তৃপ্তির সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করে আইন তখন অন্যদিকে ফিরে থাকে। এমনকি যৌনতৃপ্তির ব্যাপারটা যদি একপক্ষের হয়, অপর পুরুষটি যদি 'যথাবিহিত কাঞ্চনমূল্যে' এ-কাজে স্বীকৃত হয়, তাহলেও আইন রে-রে-করে তেড়ে আসে না। লালবাতি-জ্বলা এলাকায় সুন্দরী রূপোপজীবিনীদের কনুইয়ের গোঁত্তা মেরে এক শ্রেণির 'লালিমা পালেরা' সেই বিশেষ জাতের খদ্দেরকে কব্জা করে।

কিন্তু দ্বিতীয় জাতির যৌনতৃপ্তি-সন্ধানীর বিরুদ্ধে, অর্থাৎ পায়ুমৈথুনকামীদের বিরুদ্ধে, আইন অত্যন্ত কঠোর। আই. পি. সি.র ওই সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ধারায় বলা হয়েছে .

> Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or an animal shall be punished with imprisonment for life, or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine.[2]
>
> প্রাকৃতিক নিয়মকে অস্বীকার করে যদি কেউ অপর কোনো পুরুষ, স্ত্রীলোক, অথবা পশুর সঙ্গে তার সম্মতিসাপেক্ষেও অস্বাভাবিক মৈথুনকার্যে রত হয় তবে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে, অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কিংবা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। তদতিরিক্ত তার জরিমানাও হতে পারবে।

এখানে কয়েকটি ইংরেজি শব্দ বিশেষভাবে লক্ষ্য করার। প্রথম কথা, অপরাধীর লিঙ্গ সুনির্দিষ্ট নয়—'whoever' অর্থাৎ 'যদি কেউ' ব্যক্তিটি নর-নারী দুইই হতে পারে। দ্বিতীয় কথা, 'against the order of nature' (প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনকার্য) শব্দসমষ্টির সুনির্দিষ্ট অর্থ কী? তৃতীয়ত, carnal শব্দের কোন অর্থ গ্রাহ্য? এই অনুচ্ছেদটি সমকামী পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ফলে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ বলতে পায়ুমৈথুন, এবং fellatio উভয়কেই বোঝাতে পারে। এর কোনটাই প্রজনন প্রক্রিয়ার প্রাকৃতিক আবশ্যিক যৌন ক্রিয়া নয়। কিন্তু কোনো যৌনোন্মাদ কখনো তার পোষা কুকুর, গরু বা হাতির সঙ্গে fellatio-য় লিপ্ত হবার কথা দুঃস্বপ্নেও চিন্তা করতে পারে না। ফলে এ আইনের প্রয়োগক্ষেত্র শুধু মাত্র পায়ুমৈথুন বা sodomy সংক্রান্ত। অর্থাৎ আইনে যে শাস্তির মেয়াদ তা শুধু মাত্র পায়ুমৈথুনকারী পুরুষের প্রতি প্রযোজ্য। একমাত্র তারাই (সম্মতিসাপেক্ষে হোক-না-হোক) তার বিবাহিতা স্ত্রী, উপপত্নী, বারবনিতা, ভৃত্য বা পরিচারিকা, এমনকি কিছু পোষা জন্তুকেও পায়ুমৈথুনে বাধ্য করতে পারে। আইন বলছেন—অর্থমূল্যে অন্যান্য

পাত্র-পাত্রীর সম্মতি লাভ করলেও এবং ধর্মপত্নী লিখিত অনুমতি স্ট্যাম্প কাগজে সই করে লিখে দিলেও প্রমাণিত ক্ষেত্রে পায়ুমৈথুনকারীর যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।



চিত্র 9.1 লেসবিয়ান ভগ্নীদ্বয়/ক্লোয়েট (Clouet)

পায়ুমৈথুন তাই আমরা অস্বাভাবিক মিথুন পর্যায়ে রেখেছি।

* *

ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে সমকামী পুরুষ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। স্বীকার করি, আমি ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই—আমি কোনো স্নাতকোত্তর সম্মানলাভের উদ্দেশ্যে গবেষণা করিনি—কিন্তু অর্ধশতাব্দীর ওপর সারা ভারতের মন্দির দেখে বেড়িয়েছি—অরুণাচল থেকে দ্বারকা, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা। এমন কি সিকিম, আর নেপাল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি : মন্দির ভাস্কর্যে পুরুষ-পুরুষে সমকামী মিথুন ব্যতিক্রম হিসাবেও কোথাও দেখিনি। পশুমৈথুন বা নারীর পায়ুমৈথুনের দুটি কি তিনটি ব্যতিক্রম উদাহরণ সারা ভারতে আমাদের নজরে পড়েছে। এবং সেগুলি অব্যতিক্রমভাবে অতি নিম্নমানের শিল্প। একটিও রসোত্তীর্ণ নয়।

* * *

বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে অবস্থাটা কিন্তু ভিন্ন প্রকার। সমকামী স্ত্রীলোকের মিথুন অনেকগুলি দেখেছি। আমাদের নান্দনিক বিচারে তার প্রায় প্রত্যেকটিই রসোত্তীর্ণ!! এ তথ্যটা পূর্বাচার্যরা আমাদের কখনো জানাননি। এইসব শিল্পের প্রতি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি, এমনকি সেই অনন্য শিল্পের বিচারই করা হয়নি। তাই আমরা এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি।

সমকামী স্ত্রীলোকদের বিষয়ে ভারতীয় সাহিত্য, পুরাণ এবং কামশাস্ত্র অত্যন্ত সংযতবাক। পাশ্চাত্যে কিন্তু তা নয়। সেখানে তত্ত্বটা আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারেও প্রাপ্তব্য। ইতিহাসে প্রথম সমকামী রমণী হিসাবে বিখ্যাতা হচ্ছেন . মহিলা কবি সাফো (জন্ম আ 650 খ্রিঃ পূঃ)। খ্রিস্টপূর্ব যুগের বিশ্বে তিনি শ্রেষ্ঠা মহিলা কবি। তাঁব জন্মস্থান ঈজিযান সাগবেব একটি দ্বীপে--দ্বীপেব নাম 'লেস্‌বস'। কবি সাফো ছিলেন বিবাহিতা। একটি কন্যার জননীও। তাঁর '*প্রেমগাথা* অসাধাবণ। কিন্তু তিনি সর্বদা পরিবৃতা হয়ে থাকতেন কিছু মহিলা ভক্তবৃন্দের দ্বারা। তাদের অনেকের সঙ্গে তাঁব নাকি সমকামী যৌন সংসর্গ ছিল। কবি সাফোব জন্মস্থান থেকেই ইংরেজি ভাষায় চয়িত হয় একটি শব্দ Lesbian; যার অর্থ 'সমকামী স্ত্রীলোক'। বাংলায় তার প্রতিশব্দ নেই, নেই সংস্কৃতেও। ফলে বারে বারে 'সমকামী স্ত্রীলোক' না বলে আমরা ওই ইংরেজি শব্দটি বাংলা বানানে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি 'লেস্‌বিয়ান'।

কী প্রাচ্যে, কী প্রতীচ্যে লেসবিয়ান স্ত্রীলোকেরা আত্মগোপন করে থাকার চেষ্টা করত এবং করে। কারণ সর্বকালেই সমাজের চোখে এই যৌনক্রিয়া অন্যায়,



চিত্র 9.2 দুটি লেসবিয়ান রমণী/কুর্বে (Courbet)

প্রকৃতিবিরুদ্ধ, অসামাজিক এবং পাপ! ইউরোপীয় চিত্রকলার ইতিহাসে সমকামী মহিলার উদাহরণ নিতান্ত বিরল। এমনকি পম্পাই বা হারকিউলেনিয়াম্-এ অবস্থিত

সুপ্রাচীন Erotica Museum-এও তা আমার নজরে পড়েনি। ক্ষেত্রবিশেষে লেসবিয়ান মহিলাদের সমকামিতা-মণ্ডিত শিল্পকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে জাতে তোলার চেষ্টা হয়েছে। ক্লোয়েতের একটি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকে আমরা আমাদের বক্তব্যের প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে পারি। চিত্রকর তাঁর শিল্পের নামকরণ করেছিলেন এইভাবে. "Gabrielle d'Estrees and her sister, the Duchess of Villars." এঁদের প্রথম জন ফরাসি নৃপতির উপপত্নী. দ্বিতীয় জন সেই মহিলার ভগিনী—ধরা যেতে পারে মহারাজের মধুর শ্যালিকাশ্রেণিভুক্তা।

দেখছি, দুজনে একই বাথটবে যৌথ নগ্ন স্নান করছেন। দর্শকের স্বতই মনে হবে এরা দুজন 'লেসবিয়ান'। কিন্তু সমালোচকেরা তা মানতে প্রস্তুত নন। Deirdre Robson একজন প্রখ্যাত চিত্র সমালোচক। তিনি এই চিত্রটির ব্যাখ্যায় লিখছেন :

> "A very rare nude which does not seem to hark back either to Classical or Biblical sources, this painting is thought to represent the French King's mistress, Gabrielle d'Estrees, accompanied in the unusual half-length pose, by her sister. The Duchess of Villars, touches the breast of Gabrielle in allusion to the impending birth of the ... King's son'."[3]

> "একটি অতিদুর্লভ 'ন্যূড'। কোনো ক্লাসিকাল বা বাইবেলের প্রাচীন সূত্র অবলম্বন করে এটি আঁকা হয়নি। আলোচ্য চিত্রে দেখা যাচ্ছে ফরাসি নৃপতির উপপত্নী গাব্রিয়েল দ্য এসট্রিসকে। তিনি ও তাঁর ভগিনী ভিলারের ডাচেস একটি অপ্রচলিত ভঙ্গিতে পাশাপাশি বসেছেন। ডাচেস্ তাঁর ভগিনীর স্তনবৃন্ত স্পর্শ করেছেন—ইঙ্গিতে জানাতে চাইছেন যে, সম্রাটের সন্তান আসন্ন।"

ভগিনীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে, সেটি অবশ্যই এক আনন্দবার্তা। কিন্তু সেটি বিজ্ঞাপিত করতে দুই বোনকে কি নগ্নিকা অবস্থায় একই বাথটবে উপবেশন করতে হবে? শিল্পী যে সত্যটা তুলির মাধ্যমে বলতে পারলেন সমালোচক তাঁর কলমের মাধ্যমে সেকথা বলতে পারলেন না : ওঁরা দুই ভগিনী সাফোপন্থী! লেসবিয়ান।

ভারতে সাম্প্রতিককালে একটি বিচিত্র মামলা আদালতে উঠেছিল। একটি হিন্দি ছায়াছবিকে প্রাচীনপন্থীরা অশ্লীল বলে ঘোষণা করার দাবী করলেন। চার্জশীটের অন্যতম বিষয়টি ছিল একটি গান : চোলিকা পিছে ক্যা হ্যয়?"

চিত্রপরিচালকের তরফে আইনজীবী বললেন, য়োর-অনার! বাদীপক্ষের উকিল একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ করেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তাঁর যদি জানা না থাকে তাহলে আদালতে না এসে তাঁর কোনো 'গাইনি'র কাছে যাওয়া উচিত ছিল। ডাক্তারবাবু বা ডাক্তার দিদিমণি ওঁকে সহজেই বুঝিয়ে দিতেন 'ব্রা'-এর পিছনে আছে দেহচর্ম। তার সঙ্গোপনে আছে—আজ্ঞে না মাংস-রক্ত-মজ্জা



চিত্র 9.3 অভিদের রূপান্তর/রোদ্যাঁ

নয়—একটি প্রেমবিহ্বল বিরহিণীর হৃদয়—স্রেফ মহব্বৎ। স্বয়ং শেক্ষপীয়রও বলেছেন সেখানে থাকে 'the milk of human kindness!'

—অবজেক্শান!—গর্জে ওঠেন বাদীপক্ষের উকিল।

—ওভাররুল্ড—ফয়শালা করে দেন ধর্মাবতার।

বিচারে ছবির মালিক জয়ী হলেন। মাসের পর মাস ফুল-হাউস!

সে-আমলে নাকি কোনো অজ্ঞাত ছড়াপ্রেমিক রচনা করেছিল :

> গলি-গলি মে শোর হ্যায়
> চোলিকা পিছে কুছ ঔর হ্যয়
> আগর পুছো তো ক্যা 'ঔর' হ্যয়?
> ম্যায় বলুঙ্গা জোরি দিল্‌তোড় হ্যয়।।

আলোচ্য চিত্রেও সমালোচকের মতে গেব্রিয়েলের চোলিকার পিছে সঞ্চিত আছে আগন্তুক রাজপুত্রের জন্য milk of human kindness! সেটাই বলতে চাইছেন তাঁর ভগিনী স্তনবৃন্তে চুমকুড়ি দিয়ে!!

আরও একটি উদাহরণ দেওয়া গেল। উনবিংশতি শতাব্দির চিত্রকর গুস্তাভ কর্বে (Courbet 1819-

1877)-র এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা—লেসবিয়ান বিষয়বস্তুর। সমালোচক বলছেন :

> Here, for private consumption only, is a portrayal of the staple male erotic fantasy, the aftermath of abandoned lesbian love (note the broken pearl necklace)—or at least what a man might imagine it to be! Above all the emphasis is upon the flesh painting and ... contrast between the pearly translucency of the sleeping blonde and the warm olive flesh tones of the foreground brunette, the figures intertwined carefully around the other in a way which artfully ensures that all the erotic signs are carefully presented to view.[4]

তৈলচিত্রটি আঁকার জন্য শিল্পী কর্বে মোটা বায়না পেয়েছিলেন এক বিখ্যাত শিল্পসংগ্রাহকের কাছ থেকে। তিনি হচ্ছেন সেন্ট পিটার্সবার্গের দরবারে নিযুক্ত তুর্কিস্তানের অ্যাম্বাসাডার পাশা খলিল বে। শিল্পী তাঁর সৃষ্টির নামকরণ করেন *Le Someil,* শেষপর্যন্ত ধনকুবের পাশা খলিল বে বায়নার অর্থটা গচ্চা দিয়ে, ছবিখানা সংগ্রহ না করেই তুর্কিস্থানে ফিরে যান। তখনো কিন্তু কামাল পাশা তুর্কিস্তানে 'কামাল' করেননি। পাশা খলিল বে'র আশঙ্কা হয়, বোরকা-ঢাকা তুরস্কের কট্টর মোল্লার দল এই 'লেসবিয়ান চিত্র'টি সহ্য তো করবেই না, ছবির মালিককে তুর্কিনাচন নাচিয়ে ছাড়বে!



চিত্র 9.4 অরফিউস —গ্রিক পরিকল্পনায়

পাশ্চাত্য শিল্প-ইতিহাসে আর একটি বিচিত্র এবং বিতর্কিত শিল্পের কথা আলোচনা করেই ভারতীয় মন্দির ভাস্কর্যে আমরা প্রত্যাবর্তন করব। আলোচ্য শিল্পটি অগুস্তে রোদ্যাঁর গড়া একটি অনবদ্য ভাস্কর্য। শিল্পী ফরাসি ভাষায় কী নামকরণ করেছিলেন জানি না। দিল্লিতে এবং কলকাতার রোদ্যাঁ প্রদর্শনীতে ইংরেজিতে নামকরণ করা হয়েছিল : Daphnis & Lycenion (1886)।

কলকাতা এবং দিল্লি—উভয় প্রদর্শনীতেই এই এক্সিবিট-এর ক্রমিক সংখ্যা ছিল 50; উভয় প্রদর্শনীর অফিশিয়াল ক্যাটালগেই সাধারণ দর্শকের স্বার্থে ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয়েছে .

> This statue of two women embracing actually illustrates an episode in the famous Greak pastoral by Longus in which one of the protagonists is a man. It betrays Rodin's lack of attention to the sexual appearance of the figures in this amorous group.

[এ ভাস্কর্যে দেখা যাচ্ছে আলিঙ্গনাবদ্ধ দুটি রমণীকে। এটি লঙ্গাস বিরচিত একটি প্রখ্যাত লোকগাথা অনুসরণে নির্মিত। সেই কাহিনিতে মিলনদৃশ্যে একজন ছিল পুরুষ। মিথুন-ভাস্কর্যে মূর্তির যৌনাঙ্গ-বিষয়ে রোদ্যাঁ যে কী পরিমাণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন এ ভাস্কর্যে তারই প্রমাণ।]



চিত্র 9.5 অরফিউস —রোদ্যাঁ

স্তম্ভিত হয়েছিলাম শিল্প-জগতের সেই বরেণ্য পণ্ডিত-সমালোচকের এই মন্তব্যে। কারণ এ ভাস্কর্য নির্মিত হবার পর ত্রিশ বছরের বেশি রোদ্যাঁ জীবিত ছিলেন। তবু তাঁর কোনো শিষ্য তো কখনো বলেনি, 'মেৎর! আপনি অন্যমনস্ক হয়ে পুরুষ মূর্তির বুকে নারীস্তন গড়েছেন।'

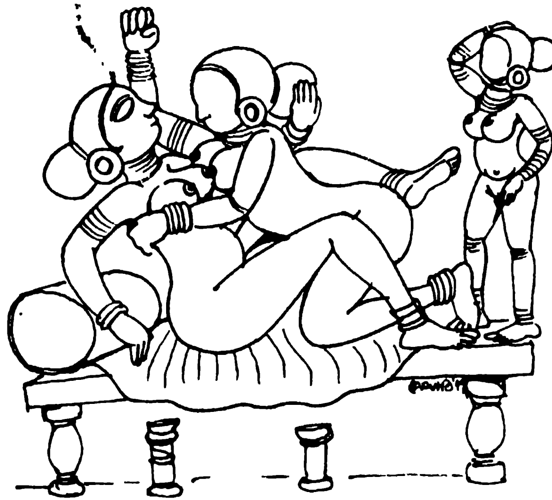
নাকি তিন-দশক ধরে রোদ্যাঁ স্কুলের সবাই ভুগছিলেন ওই 'lack of attention to the sexual appearence of the figures'—ব্যাধিতে?

রোদ্যাঁর ওপর যে কয়খানা গ্রন্থ যোগাড় করতে পেরেছি তাতে এ ধাঁধার সমাধান হয়নি। অগত্যা স্মারক পুস্তিকার নির্দেশ মতো সন্ধান করতে বাধ্য হলাম। প্রদর্শনীতে এটির নামকরণ করা হয়েছিল : Daphnis & Lycenion. জানা গেল লঙ্গাস্ তৃতীয় শতাব্দীর এক প্রখ্যাত গ্রীক লেখক। গদ্যে রচনা করেছিলেন Daphnis and Chloa কাহিনি। ডাফ্‌নি (অ্যাপোলো-তাড়িতা

হতভাগিনী Daphne, যে বৃক্ষে রূপান্তরিতা হয়েছিল সে নয়, এ পুরুষ : Daphnis) সিসিলির একজন মেষচারক। Chloa হচ্ছেন ডিমিটার, গ্রীক শস্যদেবী—গ্রীক-ইন্দ্র জিয়ুস-এর ভগিনী তথা পার্সিফোন-এর জননী। লঙ্গাস-এর রচনা আমি পড়িনি; আন্দাজ করছি Lycenion ঐ কাহিনির অপর কোনো চরিত্র! সে যাই হোক, দেখা যাচ্ছে 'লঙ্গস্'-কাহিনিতেও আছে একটি পুরুষ ও একটি রমণী—দুটিই নারী নয়।

অথচ লক্ষ্য করছি, ফাইডন প্রকাশনা এ ভাস্কর্যের নাম দিয়েছেন (প্লেট 52) 'The Metamorphosis of Ovid'; নিউ ইয়র্ক এর 'দ্য মডার্ন লাইব্রেরি' রোদ্যাঁর ওপর যে প্রামাণিক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন সেখানে প্রখ্যাত ভাষ্যকার Louis Weinberg ও এ ভাস্কর্যের নাম দিয়েছেন 'Metamorphoses According to Ovid', ফরাসি ভাষায় মূল নামকরণ কী করা হয়েছিল জানি না। যাই হোক এবার ঐ সূত্র ধরে অগ্রসর হওয়া গেল।

অভিদ (43 B.C—17 A.D.) লাতিন কবি; তাঁর Metamorphoses (রূপান্তর) পঞ্চদশখণ্ডে রচিত এক বিরাট কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যের উপজীব্য অরফিউস্ এবং ইউরিদিকের মর্মন্তুদ বিরহ!



চিত্র 9.6 দুটি লেসবিয়ান রমণী/কোনার্ক

অরফিউস রাজপুত্র। স্বভাবকবি, সঙ্গীতপাগল। কবিপত্নী ইউরিদিকে অকস্মাৎ নিহত হলেন সর্পাঘাতে। অরফিউস অরণ্য-পর্বতে বীণা বাজিয়ে কেঁদে কেঁদে ফেরে। অরণ্যচারী পশুপক্ষীরা ছুটে আসে মুগ্ধ হয়ে, আসে না শুধু একজন, যাকে ও খুঁজছে। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং যমরাজ পর্যন্ত আর সইতে পারলেন না। কবির কাছে এসে বললেন, কবি! মৃতুরাজ্য থেকে তুমি কবি প্রিয়াকে ফিরিয়ে আনতে পার; কিন্তু একটি শর্ত আছে : পাতালরাজ্য থেকে সস্ত্রীক প্রত্যাবর্তনের পথে তুমি চোখ খুলবে না। আমার প্রহরীরা তোমাকে হাত ধরে নিয়ে আসবে। মৃত্যুরাজ্যের স্বরূপ মরমানুষকে দেখতে নেই। অরফিউস তো এককথায় রাজি—এ আর শক্ত কী? কিন্তু হায় রে মানুষের মন! মৃত্যুরাজ্যের রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহলে নয়, ভিন্ন কারণে ক্ষণকালের জন্য সে বিস্মৃত হল প্রতিশ্রুতির কথা। অরফিউসের পিছন পিছন আসছিল ইউরিদিকে। হঠাৎ আরফিউসের মনে হল : কই, পিছনে তো তার পদশব্দ শোনা যাচ্ছে না!

দুস্তর উৎকণ্ঠায় সে পিছন ফিরে তাকালো। আর তখনই ঘটল চরম সর্বনাশ! পাতালরাজ্যের অমোঘ আকর্ষণে তিল তিল করে মেয়েটি দ্বিতীয়বার তলিয়ে গেল মৃত্যুগহ্বরে! অতলান্তিক অন্ধকার থেকে শুধু ভেসে এল একটা আর্ত প্রশ্ন : আর দু-দণ্ড সবুর সইল না?

তারপর কবি বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় শুনুন :

"পাতাল থেকে সন্তপ্ত চিত্তে পৃথিবীতে ফিরে অর্ফিয়ুস আর তিন বছর বেঁচেছিলেন। এই তিন বছরে, বহু রমণীর যাচনা সত্ত্বেও, তিনি কোনো স্ত্রীসংসর্গ করেননি, দ্বিতীয় দারগ্রহণও তাঁর পক্ষে অচিন্ত্যনীয় ছিলো। এ-সময়ে তাঁর প্রণয়পাত্র ছিলো শুধু বালকেরা—থ্রেশীয়দের তিনি বোঝাতেন যে, সেটাই 'শ্রেয়তর পথ'।...কিন্তু এই উপেক্ষা-অপমান থ্রেশীয় নারীদের পক্ষে অসহ্য হলো, ক্রোধে ও লালসায় উন্মাদ হয়ে তারা দল বেঁধে নিষ্ঠুরভাবে অর্ফিয়ুসকে বধ করল।"

রাইনের মারিয়া রিলকের কাব্যগ্রন্থ থেকে অভিদ-বর্ণিত এই অংশটির স্বচ্ছ এবং ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ করেছেন কবি বুদ্ধদেব বসু। রল্‌ফ্ হামফ্রিজ-এর ইংরেজি অনুবাদ থেকে। শেষ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে অরফিউস নির্জন অরণ্যপর্বতে একদিন বীণা বাজিয়ে গান গাইছে; বৃক্ষ, শিলা, সিংহ ও পশুপক্ষীরা তন্ময় হয়ে শুনছে। সহসা দূর থেকে তাকে দেখতে পেল ঐ প্রত্যাখ্যাতা রমণীর দল। প্রতিহিংসায় উন্মত্তা হয়ে তারা সদলবলে কবি অরফিউসকে আক্রমণ করল :

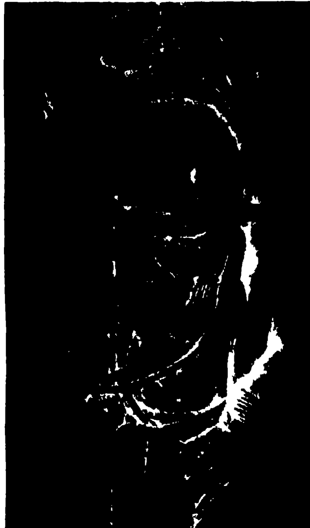
"কেউ ছুঁড়লো মাটির ঢেলা,
কেউ পাথর,
কেউ বা ভেঙে নিলো গাছের ডাল,...
...গেলো ডুবে তার মধ্যে বীণাধ্বনি,
আর তাই অবশেষে পাথরগুলো—
রক্তে লাল, গায়কের রক্তে লাল—"

কবি অরফিউস প্রতিরোধের চেষ্টাই করল না। প্রতিবর্তী-প্রেরণায় "বিনতিতে হাত বাড়িয়ে দিলো কবি, মুখটা ঢাকলো"। যৌথ নিষ্ঠুর আক্রমণে কবি অরফিউস প্রাণ দিল বিনা প্রতিবাদে—আর তারপর :

"তার জন্য অশ্রুপাত করলো পাখিরা,
আর জন্তুর পাল,
আর কঠিন শিলা, আর যত বৃক্ষ চলে আসত
তার গান শুনতে
—সকলে হলো শোকার্ত।
যেমন নারীরা চুল ছেঁড়ে মনের দুঃখে
তেমনি পাতা ঝরিয়ে দিলো বৃক্ষেরা,
নদীরা স্ফীত হলো অশ্রুধারায়, বনদেবী ও
জলকন্যারা
হলো কৃষ্ণ বেশে শোকময়ী।" (বুদ্ধদেব বসু)

আপাতত যুক্তির খাতিরে ধরে নিন 'ফাইডন প্রেস'ই ঠিক বলেছেন, দিল্লি প্রদর্শনীর স্মারক-গ্রন্থের সংকলক তাঁর lack of attention-এ (অনবধানতায়) এটিকে lack of attention (অনবধানতা) বলেছেন। তাহলে কী দাঁড়ালো?

রোদ্যাঁ কাব্য-কাহিনি 'রূপান্তর'-কে ভাস্কর্যে রূপান্তরিত করতে প্রয়াসী। সেক্ষেত্রে দুটি শিল্পগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তাঁকে। প্রথম কথা, একাধিক প্রতিহিংসা-পরায়ণার মূর্তি ভাস্কর্যে জটিলতার সৃষ্টি করবে—দৃশ্যকাব্য হিসাবে 'গ্রুপ' এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় নয়! এ সমস্যার সমাধান সহজ : নিষ্ঠুরা রমণীকুলের প্রতীক হিসাব একটি মাত্র রমণীমূর্তি নির্মাণ করা। সে হবে বলশালিনী 'আমেজন'-স্বরূপা! দ্বিতীয় সমস্যা : একটিমাত্র নারীকে দেখাতে হবে একজন পুরুষকে হত্যা করছে! দৃশ্যকাব্যে সেটা কীভাবে দেখানো সম্ভব? দর্শনযোগ্য ভাস্কর্য হিসাবে তা যে নিতান্ত বেমানান।



চিত্র 9.7 চন্দ্রা-কিন্নরী/ মথুরা শৈলী

হয়তো এই সমস্যা সমাধানে রোদ্যাঁ অভিদ-এর কাব্যের নামকরণটি কাজে লাগালেন : 'রূপান্তর'! অরফিউস-এর রূপান্তর ঘটালেন। অরফিউস—হোক সে পুরুষ—এখানে কীসের প্রতীক? বিরহবেদনার, কবিতার, সঙ্গীতের—যা কিছু সুকুমার, রমণীয়, পেলব, তার! তাই অরফিউস রূপান্তরিত হল ধর্ষিতা রমণীতে! আর তাই Louis Weinberg শিল্পটির নামকরণ করেছেন "Metamorphoses According to Ovid"

অভিদ 'অনুসরণে' একাধিক রূপান্তর (তাই Metamorphosis নয় Metamorphases) : ফাইডন প্রকাশনার 'অভিদের রূপান্তর' নয়)। আর তাই আমরা শিল্পে দেখছি অরফিউস একটি ভূপাতিতা ধর্ষিতা রমণী—প্রায়-কিশোরী। বিনতিতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সে প্রতিবর্তী-প্রেরণায়। উপরের গ্রেশীয় রমণী একজন প্রায়-পুরুষ 'আমেজেন' (যদিও তার বাম নয়, দক্ষিণস্তন আছে)। তার প্রকাশমান স্তন সত্ত্বেও সে মূর্তির সর্বাবয়বে একটা পুরুষোচিত কাঠিন্য।

এ ব্যাখ্যাটি মানতে পারছেন?

হয়তো এখনো আপনি মানতে রাজি নন।

বেশ, আসুন তাহলে অরফিউস-তত্ত্বের মূলে প্রবেশ করা যাক। বার্ট্রার্ড রাসেল[5] বলছেন প্রাক-হোমার যুগের গ্রীকদর্শনে ছিল দুটি ধারা—ব্যাক্কাসতত্ত্ব এবং অরফিউস-তত্ত্ব। 'ব্যাক্কাস' হচ্ছেন ইন্দ্রিয়জ কামনা ও মদিরার দেবতা—যেমন আমাদের কামদেব। অর্ফিউস-তত্ত্ব বলে, সুখ নয়, 'আনন্দ'ই আমাদের লক্ষ্য। এ তত্ত্ব আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী—'The Orphic Philosophers believed in the transmigration of souls; they taught that the soul hereafter might achieve eternal bliss or suffer eternal torment after life here on earth.' ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনার—'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' নীতির সঙ্গে তার বিরোধ। "Orpheus is said to have been a reformer who was torn to pieces by frenzied Maenads actuated by Bacchic orthodoxy." [শোনা যায়, ব্যাক্কাসের মতাবলম্বী ক্ষিপ্ত পুরোহিতরা

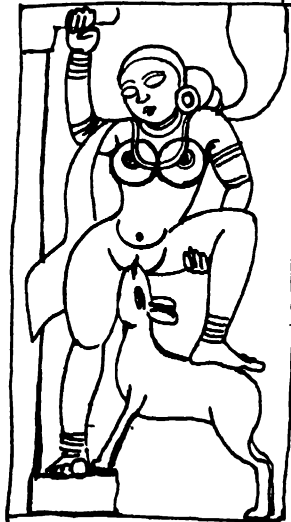
অরফিউস্‌কে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।] সুতরাং ওই আমেজনসদৃশ্য নারী ধর্মান্ধ ব্যাক্কাস মতাবলম্বী নিষ্ঠুর পুরুষ পুরোহিতদলের প্রতীক।

প্রশ্ন হতে পারে, রোদ্যাঁ কি এ তত্ত্ব জানতেন? বার্ট্রান্ড রাসেলের গবেষণাগ্রন্থ তো তখনও প্রকাশিত হয়নি? তা ঠিক! কিন্তু ঐ ব্যাক্কাস-তত্ত্ব আর আরফিউস্‌-তত্ত্ব কি শাশ্বত সত্য নয়? রোদ্যাঁর সমকালেও ফরাসি দেশে বোদলের, জোলা, মালার্মে, মোপাসাঁ ব্যাক্কাস-তত্ত্বের ধ্বজাধারী আর শাশ্বত-সৌন্দর্যের দরদী প্রবক্তা টলস্টয় রাশিয়ায় প্রায় সমকালে বসে লিখছেন What is Art? মোপাসাঁর আত্মিক অবক্ষয়ে হাহুতাশ করছেন।

প্রসঙ্গত বলি, জার্মান কবি মারিয়া রিল্‌কে রোদ্যাঁর এ ভাস্কর্য দর্শনের পর অরফিউস্‌-এর উপর রচনা করেছিলেন একগুচ্ছ অনবদ্য কবিতা। কবি রিল্‌কে এই চরম বিয়োগান্ত কাব্যেও একটি আশার বাণী শোনাতে চেয়েছেন। যেন ব্যাক্কাস-পূজারীদের নীরন্ধ্র অন্ধকারেও জ্বলছে বেথল্‌হেম-এর সেই পথপ্রদর্শক উজ্জ্বল তারকাটি। রিলকের কবি-কল্পনায় থ্রেশীয় রমণীদের প্রতিহিংসা-পরায়ণতা স্তব্ধ করতে পারেনি অরফিউস্‌-এর শাশ্বত সংগীত :

> "অবশেষে যখন তোমাকে ধ্বংস করে দিল ক্রূর প্রতিদানে
> তোমার অমরধ্বনি বিহঙ্গমে, বৃক্ষে রয়ে গেলো,
> রয়ে গেলো সিংহে ও শিলায়।
> তুমি গান গাও এখনো সেখানে।"
>
> (অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)

রোদ্যাঁর একটি শিল্পকর্মের উপর এত বিস্তারিত আলোচনা করতে হল একটি বিশেষ কারণে : দুই সমকামীর 'লেসবিয়ান' দৃশ্য অসংখ্য দেখেছি; কিন্তু এখানে ওরা তো সমকামী নয়। এ এক অতি সুদুর্লভ পরিকল্পনা। কী প্রাচ্যে, কী প্রতীচ্যে—কী চিত্রে, কী ভাস্কর্যে, বিশ্বশিল্পে এই একটিমাত্র উদাহরণ : নারী কর্তৃক নারীর ওপর বলাৎকার!



চিত্র 9.8 পোষা জন্তুর সাহায্যে যৌন পরিতৃপ্তি/কোনার্ক

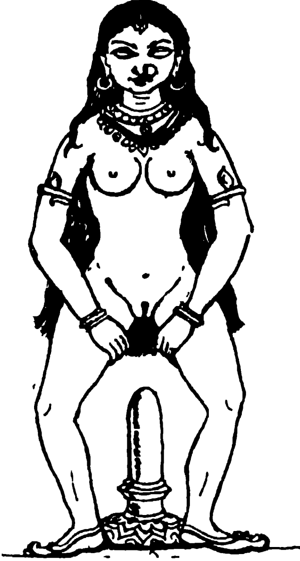
পাশ্চাত্ত্য শিল্পের 'সমকামিনী'দের বর্ণিত পটভূমিকার বিপরীতে এবার আমরা ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে সমকামী নারীর শিল্পকর্মগুলির বিচার করব। অন্যত্র না হলেও কোনার্কে বেশ কিছু লেসবিয়ান-মিথুন আমাদের নজরে পড়েছে। দর্শকেরা অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মনে করেন এগুলি মিথুন মূর্তি—নর ও নারীর। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের বর্তমান সমাজে লেসবিয়ান আচরণ কতটা গভীরে প্রবেশ করেচে এ-বিষয়ে আমরা সচরাচর অনভিজ্ঞ। একশ বছর পূর্বে হ্যাভলক এলিস লিখেছিলেন :

> আমাকে আমার এক বন্ধু বলেছেন যে, তাঁর পরিচিত একজন ঘনিষ্ঠ 'ক্যাথলিক কন্‌ফেসার' তাঁকে জানিয়েছিলেন : 'সমকামী হিসাবে যত ব্যক্তি আমার কাছে পাপস্খলনের জন্য স্বীকারোক্তি দিতে আসে তার শতকরা পঁচিশভাগ পুরুষ, আর পঁচাত্তরভাগ স্ত্রীলোক।' আমার অভিজ্ঞতা বলে সমকামী পুরুষদের সমান্তরালে লেসবিয়ান নারীদের কাণ্ডকারখানা সমানভাবে প্রচলিত। স্কুল-কলেজের ছেলেদের মতো ছাত্রীরাও সমানতালে সমকামী। কলেজের ছাত্রী-আবাসে, ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেলে, কনভেন্ট ও মহিলা কারাগারে এই সমকামিতা সমান সোচ্চার।"[6]

হ্যাভলক এলিসের কালে (1859-1939) তিনি যে ছবি এঁকেছিলেন হয়তো আজও তা সমভাবে বর্তমান। তার নানান হেতু। ইদানীং ডাক্তার এবং যৌন-তত্ত্ববিশারদেরা মেয়েদের মধ্যে লেসবিয়ান প্রবণতাকে অন্যায় বা অস্বাভাবিক বলে মনে করছেন না। তাছাড়া মেয়েদের বিবাহের গড়-বয়স বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং পূর্বতন সমাজব্যবস্থার চেয়ে বর্তমানে সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায়। কিন্তু আমরা এখানে সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে আসিনি—এসেছি মন্দির-ভাস্কর্যের একটি বিশেষ প্রবণতাকে বিশ্লেষণ করতে।

আমাদের মনে হয়েছে, মধ্যযুগের মন্দির-ভাস্কর্যে—বিশেষ করে কোনার্ক মন্দিরে—এই সমকামী নারীমূর্তির উপস্থিতির মূল হেতুটা ভিন্ন জাতির। সে

যুগে শিক্ষায়তনে মেয়েদের ছাত্রীনিবাস ছিল না। কনভেন্টও নয়। স্বীকার করি। কিন্তু কারাগার তো ছিল। 'প্রমীলা-কারাগার'! পাড়ায় পাড়ায়। যেখানে রাজাগজারা আছেন, জমিদার-জোদ্দারেরা আছেন এবং আছেন টাকার কুমিরের ঝাঁক। রাজধানী, শহরে গঞ্জে, সর্বত্র। ধনকুবেরদের ধর্মপত্নীর সংখ্যা গুনতে হত গণ্ডা-র হিসাবে, উপপত্নী ডজন নয়, কুড়ির হিসাবে। উপপত্নীদের নম্বর না থাকলেও নাম ছিল—আদরের নাম,—তাদের যেন থাক দিয়ে সাজিয়ে রাখা হত ব্যভিচার-গুদামে।



চিত্র 9.9 আত্মসমর্পিতা শক্তি/কোনার্ক

কোথাও সে গুদামের নাম : 'বাগানবাড়ি', কোথাও 'নাচঘর', কোথাও বা 'প্রমোদ-ভবন'।

সেখানে মালিক ব্যতীত কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। পুরুষভৃত্য বা খিদ্‌মৎগার পর্যন্ত নয়। নারী-কারাগারে সেবক নেই, আছে সেবিকা। সেই, প্রমোদ-ভবনে বন্দিনীদের জীবন মেয়াদ-খাটা কয়েদীর মতোই। তারা যাঁতায় গম পিষতো না বটে, তবে তাদেরই যাঁতায় ফেলে পেষা হত! অপরাধ? নারীত্ব, অসহায়ত্ব, রূপ ও যৌবন!

মালিক প্রতি সন্ধ্যারাত্রেই আসেন, কয়েকজনকে বেছে নিয়ে গান-বাজনা অথবা নাচের আসর বসান, গভীর রাত পর্যন্ত। তারপর মন-পসন্দ্‌ জনৈকা যৌবনবতীকে আটকে রেখে বাকি দশ-বিশজনকে 'ছুটি' করে দেন। সুতরাং আজকের দিনে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে যাকে বলা হয়েছে 'normal sexual intercourse' (স্বাভাবিক যৌনসঙ্গম) তার সুযোগ কোন এক যৌবনবতীর ভাগ্যে জুটতো ন-মাসে, ছ-মাসে! স্বাভাবিকভাবেই, প্রাকৃতিক প্রবণতায় মেয়েরা 'লেসবিয়ান' অন্তরঙ্গতায় পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ত।

হয়তো সেটাই একমাত্র হেতু নয়। হয়তো ধর্ষকামী রাজা এবং তাঁর পারিষদদল ওই প্যানেলগুলি দেখে এক বিচিত্র তির্যক তৃপ্তি লাভ করতেন—যাকে বলে vicarious enjoyment! সুন্দরী যৌবনবতী বন্দিনীদের সমকামী ভাস্কর্য দেখতে দেখতে অট্টহাস্যে ফেটে পড়তেন। মালিকপ্রভুর আশীর্বাদ না পেলে ওই জিয়ানো কইমাছগুলোর কী ধড়ফড়ানি! হো-হো—হা-হা।

কোনার্ক জগমোহনের এই প্যানেলটি (চিত্র 9.6) মন্দির পরিক্রমা কালে নিশ্চয় দেখেছেন, অথচ নজর করেননি। সামুদ্রিক লবণাক্ত হাওয়ায় হতভাগীদের অঙ্গ ক্ষয়ে-ক্ষয়ে গেছে, তবু তাদের ট্র্যাজেডিটা শেষ হয়নি। অনুজপ্রতিম শিল্পীবন্ধু শেখর মুখার্জিকে অনুরোধ করেছিলাম আমার বইটার জন্য ওই প্যানেলটার একটা স্কেচ করে দিতে। ও প্রথমে আপত্তি করেছিল—'এ মূর্তির সব কিছুই তো ক্ষয়ে গেছে, দাদা।'

ওকে বলেছিলাম, 'দেখ শেখর, ওই বন্দিনী মেয়েদের মালিক ওদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিল। পাঁচশ বছর আগে। প্রকৃতিও লোনা হাওয়ার দাপটে পাঁচশ বছর ধরে ওদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে চলেছে। এখন তুমিও যদি...'

'সরি দাদা! আপনারা এগিয়ে যান। আমি স্কেচখাতায় ওদের ধরে রাখি।'

ভাস্কর্যে দেখছি, তিনটি রমণীকে। দুজন শয্যাশায়ী। তৃতীয় বিবস্ত্রা রমণী কিছু দূরে অপেক্ষমাণা। ওদের শয্যা ও অলঙ্কার দর্শনে অনুমান করা যায় যে, ওরা সম্পন্নঘরের মহিলা। শিল্পী শয্যার উপর দুজনকে উৎকীর্ণ করেই থামেননি—ওদের করুণ অবস্থার বাস্তবচিত্র দেখাতে বসে তৃতীয়া এক প্রতীক্ষমাণা হতভাগিনী রত্যাতুরাকেও ছেনি-হাতুড়ির নির্মম আঘাতে সমবেদনা জানিয়েছেন!

শয্যার নিচে এক জোড়া কী-যেন। পালঙ্কের পায়া নয়। ও দুটি কি প্রদীপ দণ্ড? যার উপরে নির্বাপিত-দীপশিখা দুটি প্রতীপ? তির্যকপথে সঙ্গম-প্রত্যাশিনীদ্বয়ের যুগ্মপ্রতীক কি তারা?

পঞ্চম শ্রেণি : আত্মরত্যাতুর

আত্মরতিমগ্নকে আমরা এখানে চারভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করছি। 'আত্মরত্যাতুরের' সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলতে চাই যে ব্যক্তি যৌনতৃপ্তির জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের পঞ্চমটির আবশ্যিকতা স্বীকার করে না। অর্থাৎ প্রেমাস্পদ বা প্রেমাস্পদার দৈহিক সান্নিধ্যে স্পর্শানুভূতির প্রত্যাশী নয়।

আমাদের চারটি অনুশ্রেণি এই রকম :

5.A নার্সিসিজম (Narcissism)—নিজ দেহের প্রেমে বিভোর

5.B ম্যাস্টারবেশন (Masturbation)—হস্তমৈথুন বা স্বয়ং-মৈথুন

5.C একজিবিশনিজম্ (Exhibitionism)—প্রদর্শনবাদী

5.D ভয়্যারিজম (Voyeurism)—দর্শনকামী।

একে একে আলোচনা করা যাক :

5.A ।। নার্সিসিজম : আত্মরতিমূলক :

নার্সিসাস ফুলের সম্বন্ধে গ্রীক উপকথাটির আপনাদের সকলেরই জানা। সেই নার্সিসাস ফুলেরই এ দেশীয় নাম : নার্গিস। সে নাকি নদীর কিনারে ফোটে, আর সারাটা সংক্ষিপ্ত জীবন তাকিয়ে থাকে জলের ভিতর তার প্রতিবিম্বটির দিকে। নার্সিসাস ফুলের কাহিনি অবলম্বন করে গ্রীকযুগ থেকে ইউরোপের রেনেসাঁ অতিক্রম করে আধুনিক কাল পর্যন্ত গড়ে উঠেছে নানান শিল্পকর্ম। ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে আমরা তেমন কোন মূর্তি খুঁজে পাইনি। আত্মমগ্ন প্রতিকৃতি দেখেছি—কিন্তু তারা যে অতীত প্রেমাস্পদের চিন্তায় বিভোর নয়, এমন কথা হলফ করে বলা যায় না।

5.B ।। হস্তমৈথুন বা স্বয়ং-মৈথুন :

হস্তমৈথুনরত পুরুষমূর্তিও আমাদের নজরে পড়েনি। নিজ লিঙ্গ নিয়ে ক্রীড়ারত একটিমাত্র ব্যতিক্রমী মূর্তি অবশ্য পেয়েছি—বাগালী-মন্দিরে, কিন্তু সেটিকে আমরা 'অবাস্তব' শ্রেণিভুক্ত মনে করেছি। এখানে তাই তার আলোচনা করা হল না। পরবর্তী পরিচ্ছেদে সেটি আলোচিত হবে।

আশ্চর্যের কথা : হস্তমৈথুনরত পুরুষমূর্তি গোটা ভারতের মন্দির-ভাস্কর্যে নিতান্ত অপ্রতুল হলেও আত্মরতিমূলক স্ত্রীজাতীয়ার মূর্তি বহু মন্দিরে নজরে পড়েছে—খাজুরাহো, কোনার্ক, ভাবকা, গলতেশ্বর প্রভৃতি। কিন্তু এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? মধ্যযুগে হারেম-বন্দিনীরা কেন সমকামিতার শিকার হত তা তো পূর্ব অনুচ্ছেদেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর পুরুষদের হস্তমৈথুনরত মূর্তির অভাবটা কেন? সে-কথার জবাব খুঁজে পাবেন **'গোড়ায় গলদ'**-এ ললিতের দম্ভোক্তিতে "Girls there are enough and to spare!"



চিত্র 9.10 প্রদর্শনবাদিনী/খাজুরাহো

মধ্যযুগেও কি যৌবনবতীদের আকাল পড়েছিল যে, সমর্থ জোয়ান সোনারচাঁদেরা হস্তমৈথুনের ধাষ্টামোর পথে পা বাড়াবে?

স্ত্রীজাতীয়া স্বয়ং-মৈথুনের একাধিক উদাহরণের মধ্যে দুটি পৃথক ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমেরা নিজ যৌনাঙ্গ নিয়ে নিজেই স্পর্শানুসুখসন্ধানী। স্তনবৃন্ত নিষ্পেষণ করছে, স্তনবৃন্তে অঙ্গুলি স্পর্শ করছে, অথবা নিম্ন যৌনাঙ্গ স্পর্শ করছে। কখনো বা যষ্টিজাতীয় কোন কিছুর সাহায্যে যৌনসুখানুভূতিতে বিভোর। এরা স্বয়ং-ইন্দ্রিয়সুখ সন্ধানী। দ্বিতীয় দলের একটি বিচিত্র ভঙ্গি। পূর্ববর্তী গবেষকদের রচনায় তাঁদের বিষয়ে আমরা কোন নির্দেশ খুঁজে পাইনি; কিন্তু পুরীর এক বৃদ্ধ পাণ্ডা আমাকে এ মূর্তির শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এ মূর্তির শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা "আত্মসমর্পিতা"।

সে প্রসঙ্গে আসার পূর্ব আমরা একটি বিতর্কিত মূর্তির আলোকচিত্র আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই। এটি

বহু প্রাচীন—দু হাজার বছরের পুরানো। ঐতিহাসিক ভারতের আদিম যুগের ভাস্কর্য : ভারহুত থেকে সংগৃহীত। জীমার, আনন্দ কুমারস্বামী এবং স্টেলা ক্রামরীশ্ একে বারে বারে উল্লেখ করেছেন 'চন্দ্রা-কিন্নরী' নামে। এ নামটি কোথা থেকে এল? কোন পূর্বাচার্যই সেকথা বলে যাননি। এটি একটি 'শালভঞ্জিকা' মূর্তি—অর্থাৎ নায়কের প্রতীক্ষারতা বিরহিণী নায়িকার আলেখ্য।



চিত্র 9.11 স্নানরতা সুসান্না/তিন্তোরেত্তো

ঈশানচন্দ্র ঘোষের *জাতকার্থনামায়* 'চন্দ্রা-কিন্নরী' নামটি পেয়েছি। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করার পর পিতার আমন্ত্রণে কপিলবস্তুতে সদ্ধর্ম প্রচারে এসেছিলেন। ন্যগ্রোধারাম বিহারে অধিষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর পিতার নিমন্ত্রণ পেয়ে তিনি রাজপ্রাসাদে মধ্যাহ্ন আহারও করেছিলেন। বুদ্ধদেবের ছিল 'পূর্বনিবাসজ্ঞান'; অর্থাৎ জাতিস্মরের মতো পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করার ক্ষমতা। তাকেই বলে 'জাতক কাহিনি।' আহারান্তে প্রাসাদবাসীদের অনুরোধে তিনি একটি জাতকের কাহিনি শুনিয়েছিলেন : *'চন্দ্রা-কিন্নরী জাতক-কথা'।* প্রতি জীবনেই বুদ্ধদেব লাভ করেছিলেন রাহুলমাতার মতো পতিপ্রাণা এক সাধ্বী সহধর্মিণী। তিনি যখন মহাজনক, তখন রাহুলমাতা ছিলেন সীবলী, তিনি যখন বিশ্বান্তর, রাহুলমাতা সে জন্মে : মাদ্রী। তেমনি এক পূর্বজন্মে বুদ্ধদেবের জীবনসঙ্গিনী রাহুলমাতা ছিলেন : চন্দ্রা-কিন্নরী। সে-জীবনে বুদ্ধদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর বহু রাজা ও রাজপুত্র স্বামীত্যক্তা কিন্নরীকে শাস্ত্রসম্মতভাবে জীবনসঙ্গিনী করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের কাঁটার মতো পতিব্রতা চন্দ্রা স্বামীর প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় আমৃত্যু প্রতীক্ষা করেছিলেন। সীবলীর মতো দুর্ভাগ্যে সে জন্মে স্বামীকে পাননি।

জাতককার অবশ্য বলতে ভুলেছেন শাক্যমুনি যখন কপিলবস্তুর রাজপ্রাসাদে চন্দ্রা-কিন্নরীর এই পাতিব্রত্যের কাহিনি বিবৃত করছিলেন তখন চিকের আড়ালে সন্তানক্রোড়ে কোন স্বামীত্যক্তা হতভাগিনী অশ্রুর বন্যায় ভেসে যাচ্ছিলেন কি না।

কিন্তু ভুলতে পারেননি ভারহুত-ভাস্কর। শালভঞ্জিকামূর্তিতে প্রতীক্ষমাণা চন্দ্রা-কিন্নরীর একটি অনবদ্য প্রতিরূপ গড়েছিলেন। সর্বালঙ্কারভূষিতা চন্দ্রা-কিন্নরী দক্ষিণ হস্তে শালবৃক্ষের একটি শাখাকে করেছেন। কিন্তু তাঁর বাম হস্ত? বামহস্তে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী? এ মুদ্রার ব্যঞ্জনা কী (চিত্র 9.7)?

* * *

আমাদের একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল : 'পশুমৈথুন' বলতে আমরা কী বুঝি? আভিধানিক অর্থ যাই হোক, আমরা ধরে নিই যে, পশুমৈথুন একজাতের কামবিকার। যেখানে কোন পশ্বাচারী পুরুষ কোন একটি জানোয়ারকে কামক্রীড়ায় পীড়ন করে। জন্তুটা ঘোটকী হতে পারে, গাভী হতে পারে, গর্দভী বা ছাগীও হতে পারে। অর্থাৎ পশুমৈথুনের সঙ্গে মনুষ্যদেহধারী নারীর কোন সম্পর্ক নেই। কোন রমণীর পক্ষে পশুপীড়ন করে যৌনসুখ লাভের সম্ভাবনা না থাকায়।

ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের 377 ধারার আদালত-ইতিহাসেও সে-কথা স্পষ্ট। আদালতের ইতিহাসে কোন রমণী কখনো ওই 377 ধারা লঙ্ঘনজনিত কারণে—অর্থাৎ পশুমৈথুনের অপরাধে—অভিযুক্ত হয়নি।

সে-অর্থে চিত্র 9.8 দৃষ্ট মেয়েটিকে পশুমৈথুনের অপরাধে অভিযুক্ত করা যায় না। অথচ ও কিন্তু একটি পশুর সাহায্যে—তাকে পীড়ন না করেই—আত্মরতিমূলক যৌনতৃপ্তি লাভ করছে। এটি একটি অতি সুদুর্লভ ভাস্কর্য—কোনার্ক মন্দিরে দৃষ্ট। এর জোড়া আমরা ভূ-ভারতের অন্য কোনও মন্দিরে খুঁজে পাইনি। অর্থাৎ এই পরিকল্পনায় গড়া আত্মরতিমূলক আচরণরত কোনও স্ত্রীলোকের মূর্তি।

এই মন্দির-ভাস্কর্যে দেখছি এক প্রোষিতভর্তৃকা হতভাগিনীকে। যে তার পোষা জন্তুর সাহায্যে নির্জনে কিছু যৌন তৃপ্তিলাভের আয়োজন করেছে (চিত্র 9.8)। জন্তুটা কুকুর, হরিণ অথবা অজ—ঠিক মতো বোঝা যায় না। কিন্তু এটুকু নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে, সে মেয়েটির স্ত্রী-অঙ্গে লেপন করা মধু, ননী বা ইক্ষুরস লেহন করছে!

আপনি যদি সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে এই ভাস্কর্যটি বিচার করেন তাহলে এখানে বিন্দুমাত্র অশ্লীলতা খুঁজে পাবেন না। এই শিল্পের পশ্চাদপটে যে নিষ্ঠুর সমাজব্যবস্থা এবং বেদনাময় অনুভূতি লুক্কায়িত তা আবিষ্কার করে আপনি এটিকে রসোত্তীর্ণ শিল্প বলতে বাধ্য।

মেয়েটি—যেকোন কারণেই হোক—যৌবন প্রাপ্তির পরে স্বাভাবিক যৌনজীবনের অধিকারিণী হতে পারেনি। হয়তো সে কোন রাজার অবরোধে বন্দিনী উপপত্নী, যাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না, অথচ যাকে রাজা আর পছন্দও করেন না। হয়তো মেয়েটি যৌবনে উপনীত হবার পূর্বেই বিগতভর্তা অথবা একটি কুমারী কন্যা যাকে পাত্রস্থ করার সামর্থ্য নেই তার গরিব পিতার। কিংবা হয়তো মেয়েটি স্বয়ং শিল্পীরই সদ্যোবিবাহিতা সীমন্তিনী—যাকে কোন্ সুদূর গ্রামে ছেড়ে চলে এসেছে ভাস্কর, কোনার্ক-মন্দিরে ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে ক্রীতদাসত্ব করতে।

আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ : এই বিরল অর্ধোৎকীর্ণ (অলটোরিলিভো) ভাস্কর্যনাটকের একক কুশীলবের প্রতি আপনারা একটু সহানুভূতিশীল হোন। ওর সমস্যাটা প্রণিধান করে ওর এই আপাত-দৃষ্টিকটু আচরণকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিন। 'অশ্লীল', 'কদর্য চিন্তার নমুনা' বলে এটিকে ত্যাগ করবেন না।

* * *

আত্মরতিমূলক ভাস্কর্যের শেষ উদাহরণটিও পুরুষের নয় : রমণীর। সদ্যোবর্ণিত ভাস্কর্যের অনুরূপ শিল্প আমি দ্বিতীয় কোথাও দেখিনি। কিন্তু বর্তমানে যে মূর্তির বর্ণনা দিচ্ছি তার আট-দশটি উদাহরণ আমরা কোনার্ক জগমোহনেই খুঁজে পেয়েছি। কোনার্ক-অধ্যায়ে যে ভূমি-নকশা দেওয়া আছে সেখানে এদের অবস্থান সূচিত। নিঃসন্দেহে এটি একটি স্বীকৃত শিল্পানুভাবনা—প্রসাধনরতা, শালভঞ্জিকা, বা কণ্টকমোচনরতার মতো। না হলে তা বারে বার উৎকীর্ণ করা হতো না।

এই মূর্তিগুলিকে কোন্ শ্রেণিতে ফেলা উচিত তা ঠিকমতো স্থির করে উঠতে পারছিলাম না। এক ধারার যুক্তিতে এটি আত্মরতিমূলক প্রদর্শনবাদীর; অন্য বিচারে এগুলি অবাস্তব পর্যায়ের। চিত্র 9.9-এ এই ভাস্কর্যের একটি নমুনা দেওয়া হয়েছে। দেখছি, একটি বিবস্ত্রা রমণী



চিত্র 9.12 ভূলুণ্ঠিতা দানেদ/রোদ্যাঁ

দুই পদ দুটিকে স্থাপন করে দাঁড়িয়ে আছে। তার দুই জানুর মধ্যবর্তীস্থানে একটি শিবলিঙ্গ। এ মূর্তি অব্যতিক্রমভাবে আলুলায়িতকুন্তলা।

কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য নজর করার। শিবলিঙ্গে প্রত্যাশিত গৌরীপট্টটি অনুপস্থিত। কোনার্কের একজন বৃদ্ধ গাইড আমাকে বলেছিলেন, এই মূর্তির নাম : আত্মসমর্পিতা শক্তি।

সাধারণ দর্শক মনে করবেন এটি চূড়ান্ত প্রদর্শনবাদী এক রমণীর আলেখ্য। অথবা আত্মরতিমূলক ভাস্কর্য। কিন্তু না! নামকরণ থেকেই বোঝা যায় এই মূর্তির মূল ব্যঞ্জনা। মেয়েটি শিবের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছে—মন প্রাণ এবং তার নারীত্ব! শিল্পশাস্ত্রে এ জাতীয় মূর্তির কোন উল্লেখ কোথাও পাইনি। পূর্বাচার্যরাও আলোচনা করেননি।

আমাদের মনে হয়েছে, হয়তো কোন সুদূর অতীতে এই মূর্তির পরিকল্পনা হয়েছিল। কোনো নারীর সমানাধিকারের ধ্বজাধারী ভাস্করের কল্পনায়। তান্ত্রিক উপাসকেরা তাদের ধর্মপত্নীদের নিয়ে সাধনচক্রে আসে। তন্ত্রনির্দেশে শাক্তভক্ত নানান কৃত্যে যোগদান করে—মদ্যপান করে, মাংস-মৎস্য সহযোগে, মন্ত্রপাঠ করে, নানান মুদ্রার ব্যবহার করে। তখন তান্ত্রিকের

ধর্মপত্নীরা হয়তো একগলা ঘোমটা টেনে স্বামীর বামপার্শ্বে প্রতীক্ষা করেন। তারপর আসে পঞ্চ-মকারের শেষ আচার। তান্ত্রিক তার ধর্মপত্নীর হাতটি ধরে টানে। শেষকৃত্য সমাপ্ত হলে তান্ত্রিক তখন হুঙ্কার ছাড়ে 'ভৈরবোহম্! শিবোহম্!'

ধর্মপত্নী এতক্ষণে নিষ্কৃতি পায়।

আমরা কল্পনা করতে পারি তারপর একদিন এক বিদ্রোহিণী এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করলেন। তান্ত্রিকের ধর্মপত্নীদের একত্র করে সে গোষ্ঠীবদ্ধ হল। যৌথ প্রতিবাদ। তান্ত্রিক-ঘরণীরা নিজেরাই কেন তন্ত্রসাধনা করবে না? কেন তারাও মদ্য-মাংস-মৎস্য এবং মন্ত্রের মাধ্যমে শক্তির বদলে শিবের উপাসনা করতে পারবে না? পঞ্চমাঙ্কের শেষ দৃশ্যে তারা তাদের মরদের হাতটি ধরে



চিত্র 9.13 স্যাটির কর্তৃক নায়িকা ধর্ষণের চেষ্টা/রেনেসাঁ

টেনে নিয়ে যাবে একান্তে। বিপরীত ভঙ্গিতে মৈথুনকার্য সমাপ্ত করে সব শেষে হুঙ্কার ছাড়বে : 'ভৈরবী অহম্! শিবানী অহম্!'

স্বীকার্য, এ সবই আমাদের কপোল-কল্পনা। কিন্তু এটাও স্বীকার্য যে, এই মূর্তির পরিকল্পনায় কোন যৌনবিকৃতি নেই। মেয়েটি তার নারীত্ব সমর্পণ করতে গৌরীপট্টবিহীন শিবলিঙ্গের উপর দণ্ডায়মানা হয়েছে! সে স্বয়ং গৌরীপট্ট।

*   *   *

5.C ।। প্রদর্শনবাদী

মধ্যযুগের অনেক মন্দির-ভাস্কর্যে প্রদর্শনবাদীর উদাহরণ পাওয়া যায়

> "Such girls are seen playing with their breasts, not for any sensual self-eroticism, but for showing their proud possessions to attract the onlooker. Or they are seen wilfully exposing their lower organs...This girl from Khajuraho with her coquettish smile and the dreamy 'come-hither'-look shows her intention."

মেয়েটি তার বক্ষবন্ধনীটি স্বেচ্ছাকৃতভাবে স্বস্থানচ্যুত করেছে এবং নীবীবন্ধের গ্রন্থি উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। মধ্যযুগের শিল্পে—কী ভাস্কর্যে, কী গুহাচিত্রে—বক্ষবন্ধনীর ব্যবহার প্রায় দেখাই যায় না। সর্বদাই সুরসুন্দরীরা উন্মুক্তউরসা। বাস্তব অবস্থা কিনা জানি না, কিন্তু এটাই ছিল শিল্পরীতি। কখনো কখনো শিল্পী বক্ষাবরণীটা উৎকীর্ণ করেছেন, বা এঁকেছেন—কিছু আড়াল করতে নয়। বরং রমণীর ওই রমণীয় প্রত্যঙ্গকে 'আন্ডারলাইন' করতে। বিশেষ মূল্য দিতে। অর্থাৎ দর্শকের মনে সেই প্রশ্নটা জাগিয়ে তুলতে 'চোলিকে পিছে ক্যা হ্যয়?' (চিত্র 9.10)

5.D ।। দর্শনকামী

দর্শনবাদী বা Voyeurism-কে উপজীব্য করে ভারতীয় মন্দিরে কোন ভাস্কর্য গড়া হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অথবা বলা যায়, আদ্যোপান্ত মিথুনাচারই তো দর্শনকামীর উপজীব্য। দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যৌন সুখানুভূতি যদি Voyeurism-এর প্রতিপাদ্য হয় তাহলে তা আবার নতুন করে গড়ায় কী আছে? মিথুনবাদই তো দর্শনকামীর স্বরাজ্য!

পশ্চিমে কিন্তু 'দর্শনকাম' নিয়ে বেশ কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে। একটি নমুনা দাখিল করি : জ্যাকোপো তিন্তোরেত্তোর (1518-94) আঁকা একটি বিখ্যাত তৈলচিত্র : Susannah Bathing (চিত্র 9.11)।

কাহিনির মূল সূত্র বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'। অপূর্ব সুন্দরী সুসান্না ছিল এক প্রৌঢ় গ্রামবাসীর পতিব্রতা সুখী ঘরণী। প্রতিবেশী যুবকদের প্রলোভন, ইঙ্গিত বা কুপ্রস্তাবকে সে বারেবারে প্রত্যাখ্যান করেছে। তার পাতিব্রত্য নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু ঈশ্বরদত্ত রূপযৌবনই তার শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। অমন সুন্দরী যৌবনবতী কোন আক্কেলে প্রৌঢ় স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ থাকবে! প্রত্যাখ্যাতরা মিথ্যা

কাহিনি রচনা করে পঞ্চায়েতের বিচার চাইল। তিন-তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী নাকি সুসান্নাকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে স্বচক্ষে দেখেছে। পঞ্চায়েতের 'ডিভিশন-বেঞ্চ' এক বৃদ্ধকে নির্দেশ দিল সরেজমিন তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে। সেই বৃদ্ধের মনে হল প্রথমেই তদন্ত করে দেখা দরকার বস্ত্রান্তরালে : সুসান্না সত্যই কতটা সুন্দরী! পুরুষেরা যখন ক্ষেত-খামারে বেরিয়ে যায় তখন সুসান্না যায় নির্জন ঝরনার জলে অবগাহন স্নানে। বৃদ্ধ গোপনে তাকে অনুসরণ করল। নগ্ন স্নানরতাকে দর্শন করতে। ফিরে এসে সে যখন পঞ্চায়েত প্রধানদের তার বিস্তারিত প্রত্যক্ষদর্শীর রিপোর্ট দিল তখন বিচারকদ্বয় বিচলিত হয়ে পড়লেন। সুসান্নার কাছে গোপন প্রস্তাব পাঠালেন যে, সুসান্না যদি পর্যায়ক্রমে তিন রাত্রিতে ওঁদের তিনজনকে তৃপ্ত না করে তবে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে—ব্যভিচারিণীরূপে। তাকে 'বেশ্যা'রূপে চিহ্নিত করা হবে!

সুসান্না স্বীকৃতা হয়নি। বিচারকদ্বয় কিন্তু তাকে কঠিন শাস্তি দিতে পারেননি। কারণ শেষ পর্যায়ে ঈশ্বরেচ্ছায় স্বয়ং ড্যানিয়েল উর্ধ্বতন বিচারক হিসাবে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য পৃথক-পৃথক ভাবে পুনরায় গ্রহণ করেন। তাদের সওয়ালে এত পরস্পর-বিরোধী বর্ণনা ছিল যে, বোঝা যায় সুসান্না ব্যভিচারিণী নয়। ফলে সে মুক্তি পায়। তিন বৃদ্ধকেই পরিবর্তে শাস্তিদান করা হয়।

তিন্তোরেত্তো এই ক্যানভাসে দর্শনকামী বৃদ্ধের লালসাজর্জর দৃষ্টি নিখুত ভাবে এঁকেছেন। বর্তমান যুগের শিল্প সমালোচক ডি. রবসন এই শিল্পটির সম্বন্ধে যা বলেছেন তা খাঁটি কথা :

> "তিন্তোরিত্তো তাঁর দর্শককে এই শিল্পের মাধ্যমে মহা বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। দর্শক অনিবার্যভাবে ওই দর্শনকামী বৃদ্ধের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলে! আমাদের চোখ, ওই বৃদ্ধের কোটরগত চক্ষুর মতোই, চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে সুসন্নার বিবসনা সৌন্দর্য! বাইবেল হয়তো সতীসাধ্বী স্ত্রীর গুণের কথাই শুধু বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিন্তোরেত্তো একটি নার্গিস ফুল দর্শককে উপহার দিয়েছেন, যে-মেয়েটি দর্পণ-প্রতিবিম্বে নিজের নগ্নসৌন্দর্যে আত্মমগ্না।"[৪]

ষষ্ঠ শ্রেণি : মৈথুনরত মিথুন :

এতক্ষণে আমরা মৌল-সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে উপনীত হয়েছি; 'মিথুনবাদ' থেকে 'মৈথুনবাদ'-এ।

কারণ এই 'মৈথুনরত মিথুন' বহির্ভারতীয় শিল্পে প্রকাশ্যে অনুমোদন পায়নি। গোপন সংগ্রহের কথা বলছি না, না হলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন যুগে ধনকুবেরদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে এ জাতীয় শিল্পবস্তু ছিল এবং আছে। মধ্যযুগে ইতালির নেপলস্ শহরে ধনবানদের



চিত্র 9.14 সাবাইন রমণীদের যৌথ বলাৎকার

আগ্রহে একটি 'ইরটিকা' সংগ্রহশালাও গড়ে উঠেছিল। এ জাতীয় যৌনতা-ব্যঞ্জক শিল্প ধর্মীয় কারণে আছে নেপালে, তিব্বতের গোপন গুম্ফায়, আছে খাশ্ কলকাতাতেও পুলিসের নজর এড়িয়ে ব্যক্তিগত সংগ্রহে। 'ব্লু-ফিল্ম' নামে প্রদর্শিত এ জিনিস কলকাতা-দিল্লী-মুম্বাই কোথায় নেই? কিন্তু না, শুধু গোপন নয়, আইনের অনুমোদনসহ এ জাতীয় ফটোগ্রাফ ও কল্পিত চিত্র পশ্চিমখণ্ডের অনেক দেশে—জাপানে, হংকঙে প্রকাশ্যে কিনতে পাওয়া যায়, চলচ্চিত্রে দেখানো হয়—নরওয়ে, সুইডেন, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, আমেরিকা এবং আরও অনেক-অনেক সুসভ্য দেশেও। সে-সব দেশের চিন্তাবিদ তথা রাষ্ট্রনায়কেরা সেগুলিকে শিল্পপদবাচ্য বলে দাবী করেন না; বরং তাঁরা বলেন, এগুলি স্বাস্থ্যকর, যুব-মানসের অবদমন থেকে মুক্তির তীর্যক-পন্থা। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে কিন্তু তা হয়নি, সেখানে সামাজিক তথা শৈল্পিক অনুমোদনসহ এ জাতীয় বিষয়বস্তু মন্দিরগাত্রে প্রকাশে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল।

একেবারে আদিযুগে এ অনুভাবনাটিকে যে আপত্তিকর

মনে করা হত না. তা আমরা দেখেছি। প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে মিশর কিছুটা রক্ষণশীল ছিল। কিন্তু গ্রীস, রোম ও চীন-সংস্কৃতিতে এর যথেষ্ট উদাহরণ আছে। আছে আফ্রিকার প্রাচীন সভ্যতাতেও। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্বযুগে অর্থাৎ য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পূর্বকালে পেরুতে প্রাপ্ত একটি ভৃঙ্গারে দেখছি মৈথুনদৃশ্য উৎকীর্ণ করা। পানীয় সরবরাহের জন্য এ পাত্রটির প্রকাশ্য ব্যবহারে কোনও সঙ্কোচ বোধ করেনি কেউ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পরবর্তী যুগে, পঞ্চদশ শতাব্দির পরে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার শিল্পীরা য়ুরোপীয় রীতিনীতির প্রভাবে এ জাতীয় শিল্প নির্মাণে স্বতই সঙ্কোচবোধ করেছেন।



চিত্র 9.15 ভেনাস ও মার্সের মিলন/প্রথম পর্ব

য়ুরোপীয় সভ্যতা তথা শিল্প-সংস্কৃতির আদিগুরু গ্রীস। গ্রীক শিল্পীদের মানসিকতায় নন্দন-তত্ত্ব কীভাবে 'ন্যুড' অনুভাবনায় রূপায়িত হয়ে ওঠে সেকথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সেখানে যে কথা আলোচনা করা হয়নি তা হচ্ছে এই :

গ্রীক শিল্প-জাহ্নবীর মূল ধারটিকেই আমরা সেখানে অনুসরণ করে এসেছি, কিন্তু ওই স্রোতধারার সমান্তরালে প্রবাহিত আর একটি বিশেষ উপ-ধারার কথা সেখানে বলা হয়নি। গ্রীক শিল্পীর দল সাধারণভাবে উগ্র যৌনতাব্যঞ্জক রসকে পরিহার করলেও সেজন্য একটি বিশেষ শাখা সৃষ্টি করেছিলেন—ঠিক যেমন কলিঙ্গ-খাজুরাহোতে একটি বিশেষ সময়কালে উগ্র যৌনতাবোধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। গ্রীক ও রোমক শিল্পচিন্তায় এই বিশেষ শাখাটিকে ওঁরা বললেন 'ইরটিকা'। পম্পাই ও হারকিউলেনিয়ামে ধনবানদের অর্থানুকূল্যে ও আগ্রহে গড়ে উঠল দুটি 'ইরটিকা মিউজিয়াম'। সেখানে শুধু উগ্র-যৌনতাশ্রয়ী শিল্পবস্তুই সংগৃহীত হতো। আমরা যাকে 'মৈথুনরত-মিথুন' বলছি তার অসংখ্য নিদর্শন সেখানে ছিল। এ সংগ্রহশালা কিন্তু ধনবানদের গোপন বা ব্যক্তিগত সংগ্রহ নয়—রীতিমতো সাধারণের জন্য : পাব্লিক ইন্সটিটুশন।

ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে যখন পম্পাই ও হারকিউলেনিয়াম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন ওই দুটি সংগ্রহশালাও ভূগর্ভে চলে যায়। মধ্যযুগে সেই ধ্বংসস্তূপ খনন করে অনেকগুলি মূর্তি ও চিত্র উদ্ধার করা হয় এবং নেপল্‌স্ শহরে একটি নূতন সংগ্রহশালা নির্মাণ করে সেগুলি সংরক্ষিত হয়। এই মিউজিয়ামটি এখনও বর্তমান, যদিও বর্তমানে শুধু শিল্পী ও শিল্পরসিকদেরই তা দেখতে দেওয়া হয়, সাধারণ দর্শনার্থী নরনারীকে নয়। য়ুরোপ ভ্রমণকালে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সংগ্রহ করে সেটি আমি দেখেছি।

যাঁরা অভিযোগ করেন যে, উগ্র-যৌনতাবোধে এবং 'মৈথুনরত-মিথুন' প্রদর্শনে ভারতবর্ষ বিশ্বশিল্পে এক ব্যতিক্রম, তাঁদের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে বলব, নেপল্‌স্-এর ওই সংগ্রহশালার অধিকাংশ মিথুন-মূর্তি উগ্র যৌনতাবোধ বা তথাকথিত অশ্লীলতার মাপকাঠিতে কোনার্ক-খাজুরাহোর অশ্লীলতম প্যানেলকে অনেক অনেক পিছনে ফেলে যাবে। তার একটিই হেতু। ইরটিকা সংগ্রহশালার অধিকাংশ নায়কমূর্তির আদর্শ—অ্যাপোলো নয়, মার্কারি নয়, মার্স নয়, শুধু মাত্র 'প্রায়াপাস্'।

'প্রায়াপাস্' সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা আফ্রোদিতের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও কুৎসিত-দর্শন ও গ্রীক পৌরাণিক কল্পনায় তার জননেন্দ্রিয়টি ছিল সুবৃহৎ ও নিয়ত-উত্থিত। সেজন্য ইরটিকা-সংগ্রহশালার মৈথুনরত মিথুনে ক্ষেত্রবিশেষে নায়কের পুরুষাঙ্গটিকে দৈর্ঘ্যে তার দেহ-দৈর্ঘ্যের একতৃতীয়াংশ এবং স্থূলতায় তা মূর্তির জানুর চেয়ে বেশি করা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে—ত্রিমাত্রিক মূর্তিতে, অর্ধোৎকীর্ণ (অল্টো-রিলিভো) প্যানেলে এবং তেলরঙে

আঁকা ছবিতে। প্রায়াপাসের অনুরূপ কোন অনুভাবনা ভারতীয় পুরাণে না থাকায় বীভৎস-রসের প্রতিযোগিতায় খাজুরাহো-কোনার্ক অশ্লীলতার দৌড়ে স্বতই পিছনে পড়েছে।

দ্বিতীয়, গ্রীকশিল্পে—বিশেষ ইরটিকা শাখায় নয়—সাধারণ শিল্পচিন্তায়, আদিরসের সঙ্গে বীররস ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল। আশ্চর্যের কথা, মৈথুনদৃশ্যের সিংহভাগ সেখানে 'বলাৎকার দৃশ্য'। বলাৎকারের মধ্যে বীররসের কোনো স্থান নেই, একথা আজকের দিনে আপনি-আমি বুঝলেও তদানীন্তন গ্রীকশিল্পীরা বোধকরি তা অনুভব করতেন না। চিন্তার জগতে অন্যান্য ক্ষেত্রে এত ঔৎকর্ষ দেখিয়েও এই সহজ সত্যটা তাঁরা যে কেন উপলব্ধি করতে পারেননি ভাবতে অবাক লাগে। শুধু ভাস্কর্য নয়, ওদের সাহিত্যে, কাব্যে, নাটকে গাথায়, মহাকাব্যে সর্বত্রই একটা জোর-জবরদস্তির প্রবণতা। নায়ক-নায়িকা সেখানে প্রেমে পড়ে কদাদিৎ—পড়লেও অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয় খলনায়ক এবং বলাৎকার দৃশ্যে নাটক জমে ওঠে। Peleus পশ্চাদ্ধাবন করছে Thetis-এর; Diosuri পশ্চাদ্ধাবন করছে Leucippus-এর কন্যাদের; অ্যাপোলো তাড়া করছে ডাফনিকে। হেডস্ অপহরণ করছে পার্সিফোনকে; জিউস্ ছিনিয়ে নিচ্ছে ইউরোপা অথবা গ্যানিমিডকে। এমনকি দেখছি, গ্রীক বীর অ্যাকিলিস্ সমকামিতার তাড়নায় বালক ট্রয়লাসকে শেষ পর্যন্ত হত্যাই করে বসল!

তত্ত্বটা অপরদিক থেকেও সমানভাবে প্রযোজ্য। নায়িকারাও প্রতিশোধ নিতে যেন সদা-উদ্যত। পাইরিজিয়ার দেবী সিবিল যখন প্রায় উত্তীর্ণযৌবনা তখন তাঁর সন্দেহ হল যে তাঁর তরুণ প্রেমিক অ্যাটিস্ অন্য কোনও নারীর প্রতি অনুরক্ত। তাই তাকে বাধ্য করল অস্ত্রোপচারে খোজা করে দিতে। গ্রীক দেবী আর্টেমিস্ (রোমান কল্পনায় 'ডায়ানা') তাঁর শিকারী কুকুরদের নিয়ে বনে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়াতেন। একদিন তাঁর নজর হল, একটি বিদেশী তরুণ, অ্যাকটিয়ন, বৃক্ষান্তরাল থেকে তাঁর নগ্ন-স্নান লুকিয়ে দেখছে। এই অপরাধে দেবী আর্টেমিস ওই কৌতূহলী তরুণটিকে মন্ত্রবলে একটি মৃগে রূপান্তরিত করে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর শিকারী কুকুরের দল ওই হতভাগ্য বিদেশীটিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল। সবচেয়ে অদ্ভুত কাহিনি রাজা আরগস্-রাজকন্যাদের। আরগস্-এর রাজা দানায়ুস্-এর ছিল পঞ্চাশটি বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা এবং মিশররাজ ঈজিপ্টাস্-এর ছিল সমসংখ্যক যুবকবয়সী পুত্র। যেমন আশা করা যায়—রাজপুত্রেরা রাজকন্যাদের সঙ্গে লুকিয়ে প্রেম করতেন। এদিকে আরগস্-এর রাজার সঙ্গে মিশররাজের সম্পর্ক ছিল অহি-নকুলের। অঙ্কশাস্ত্র মতে শেক্সপিয়রের অমর নাটক রোমিও-জুলিয়েটের তুলনায় এ নাটকে রোমান্টিক প্রেম পঞ্চাশগুণ গাঢ়। ট্র্যাজেডিও! কারণ রাজা আরগস্ মিশর রাজের কাছে প্রস্তাব করলেন পঞ্চাশটি বিবাহের। মিশররাজ স্বীকৃত হলেন। আরগস্-রাজ তাঁর আত্মজাদের বললেন, বিবাহরাত্রেই যেন তারা তাদের স্বামীদের হত্যা করে। আশ্চর্যের কথা, পঞ্চাশজন নববধূর (একজন বাদে) কেউ প্রতিবাদ করল



চিত্র 9.16 ভেনাস ও মার্সের মিলন/দ্বিতীয় পর্ব

না। পিতার আদেশ পালন করল। রাতারাতি মিশররাজ নির্বংশ হয়ে গেলেন। যে মেয়েটি পিতার আদেশে ফুলশয্যা রাত্রে স্বামীকে হত্যা করেনি তার দুর্ভাগ্যে শৈল্পিক সমবেদনা জানিয়েছেন উনবিংশ শতাব্দির ফরাসী ভাস্কর রোদ্যাঁ—তাঁর অনবদ্য 'দানেদ'এ।

শিল্পের উপজীব্য যদি জোর-জবরদস্তি হয় তাহলে হয়তো নরনারীর মাংসপেশী, অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি দেখানোর সুবিধা হয়—কিন্তু আদিরসের যা নাকি মূল উপজীব্য : প্রেম, তার হয় মৃত্যু। তবু অয়দিপাউস থেকে 'রেপ অব স্যাবিনস্'-এ একই ধারায় আমরা গ্রীক যুগ থেকে রোমক সভ্যতায় চলে আসি। চিত্র 9.13-এ দেখা যাচ্ছে পুরুষ সবলে আকর্ষণ করছে হতভাগিনী নায়িকার

মধ্যদেশ—তাকে অঙ্কশায়িনী করতে, আর স্ত্রীলোকটি চেপে ধরছে নায়কের চুলের মুঠি। এ শিল্পবস্তুটি গ্রীক যুগের। আবার দেখুন, ওই গ্রীক অনুভাবনাতে মধ্যযুগেও শিল্পী যৌথ-বলাৎকারকেই শিল্পের উপজীব্য করেছেন। (চিত্র 9.14)।

সে যাই হোক, মোটামুটিভাবে দেখছি, গ্রীক যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত শিল্পীরা দুটি 'টাবু' মেনে চলেছেন—

এক ন্যুড-একক-মূর্তিতে পুরুষের জননেন্দ্রিয় প্রদর্শন করা রুচিসম্মত হলেও, যৌথ অবস্থায়—বিশেষ



চিত্র 9.17 চিরবসন্ত/রোদ্যাঁ

করে সঙ্গম দৃশ্যে তা দেখনো যাবে না। কারণ বোধহয় এই : ন্যুডে জননেন্দ্রিয় হস্তপদাদির মতো একটি অঙ্গবিশেষ, কিন্তু মিলন-দৃশ্যে তা —'অঙ্গবিশেষ' নয়, 'বিশেষ অঙ্গ'।

দুই : মৈথুনরত মিথুনে মিলন-তৃষিত নায়ক-নায়িকার আদিরসের অপেক্ষা চিত্রধর্মকে প্রাধান্য দিতে হবে।

ভারতে কিন্তু এটা হয়নি।

ইয়োরোপে অবশ্য নূতনযুগের চিন্তাধারায় নূতন শিল্পস্ফুরণ দেখা দিল। মধ্যযুগের শিল্পীরা অনুধাবন করলেন যে, বীররস বা রৌদ্ররস অপেক্ষা মিলনদৃশ্যে মাধুর্যরসই বাঞ্ছনীয়। সেখানে মৈথুনরতমিথুন দৃশ্যে শিল্পধর্ম গৌণ, যৌনতা মুখ্য।

ভারতীয় শিল্পী একটি ধারনা গ্রহণ করলেন, একটি বর্জন। মিথুন-মূর্তিতে প্রেম এল, বলাৎকারকে অপসারণ করে। নায়িকা সক্রিয় অংশীদার হল। দেহদানে শুধু সানন্দ স্বীকৃতিই নয়। দেহ-দেহলীর চতুঃসীমায় সে আনন্দলাভে তথা আনন্দদানে সফলতা লাভ করল।

কিন্তু প্রথম জাতির গ্রীক টাবুটাকে পাশ্চাত্যশিল্প কয়েক হাজার বৎসরেও অস্বীকার করতে পারল না। অর্থাৎ সঙ্গমদৃশ্যের প্রকাশ্য বিজ্ঞাপ্তি সামাজিক ছাড়পত্র পেল না। শৃঙ্গাররত মিথুনের দিগন্তেই সমাপ্তি চিহ্ন টানা হল। নিবিড় নগ্ন আলিঙ্গন পর্যন্ত স্বীকৃত হল শিল্পে। তার পরের বাস্তব অবস্থাটা—যা শত-শত ভাস্কর্যে প্রকটিত হয়েছে কোনার্কে বা খাজুরাহোতে—পাশ্চাত্যে তা অঙ্কিত বা খোদিত হয়নি।

এই সঙ্গে আরও একটি 'টাবু' পাশ্চাত্যশিল্পে স্বীকৃত : মিলনের দৃশ্যে স্ত্রীজননেন্দ্রিয় প্রকট হলেও তার দয়িতের মূল জননেন্দ্রিয়টি প্রকাশ্যে দেখানো চলবে না। একক ন্যুড গড়তে বাস্তবতা বা verisimilitude-এর খাতিরে পুরুষ মূর্তির পুং-জননেন্দ্রিয় আদিমতম যুগ থেকেই গ্রীক ভাস্করেরা গড়েছেন। রেনেসাঁ অতিক্রম করে আধুনিক কাল পর্যন্ত আমরা তা অঙ্কিত বা উৎকীর্ণ হতে দেখেছি। গ্রীক ভাস্করেরা অ্যাপোলো, জিউস বা ডায়ানিসাসের ক্ষেত্রেও তা উৎকীর্ণ করতে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি একত্র হলেই—শিল্পের উপজীব্য প্রেমলীলা হলেই—পুংজননেন্দ্রিয়টি গোপন করাই রীতি। আদিমতম যুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত। চিত্র 9.13 এবং 9.14 আমরা উদাহরণ হিসাবে দেখাতে পারি।

আরও দুটি ক্লাসিকাল উদাহরণ এখানে পেশ করা গেল। দুটি চিত্রের বিষয়বস্তু অভিন্ন—প্রেম ও প্রজননের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভেনাস-এর সঙ্গে মার্স-এর মিলন। প্রথম দৃশ্যে নায়িকা পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেনি যদিও তার দৃষ্টিতে সম্মতি লক্ষণ সুস্পষ্ট। কিন্তু দক্ষিণহস্তের তর্জনী তার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ভেনাস শিকারী, তার পদপ্রান্তে পড়ে থাকা তূণীরটিকে দেখিয়ে সে যেন বলতে চায়, আমার গাগরী যে এখনো ভরা হয়নি।

পরবর্তী উদাহরণে ভেনাস রীতিমতো রত্যাতুরা। তার দক্ষিণহস্ত ও বামজানুর উৎক্ষেপে সে কথা স্পষ্ট। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই নায়ক-নায়িকার জননেন্দ্রিয় আছে অন্তরালে। চিত্রদ্বয় রেনেসাঁযুগের শেষ পর্যায়ে আঁকা হলেও তার পরিকল্পনা গ্রীক-পরিকল্পনায়। এ দুটি চিত্রের পূর্বযুগেই লেঅনার্দো, মিকেলাঞ্জেলো, রাফায়েল, তিজিয়ানো, জর্জনে অসংখ্য ন্যুডে নর ও নারীর জননেন্দ্রিয় রূপায়িত করেছেন, যদিও মিলনদৃশ্যে পুরুষের ক্ষেত্রে তা আবশ্যিকভাবে সঙ্গোপনে রাখা হয়েছে।

আমদের বক্তব্যের সমর্থনে তিনটি ভাস্কর্য উপস্থাপিত

করা গেল। প্রথমটি বার্নিনীর ভাস্কর্য : অ্যাপোলো ও ডাফ্‌নে (চিত্র 10.1)।

নদীদেবী লাদেন-এর ছিল এক নিষ্পাপ সুন্দরী ষোড়শী আত্মজা। অরণ্যচারিণী সেই কুমারীর নাম ডাফ্‌নে। সূর্যের দেবতা অ্যাপোলো তার রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেম নিবেদন করে বসলেন। ডাফ্‌নে শিউরে উঠে বললে : ছিঃ!

ডাফ্‌নের প্রত্যাখ্যানের হেতু দ্বিবিধ। প্রথমত সে যোলোটি বসন্ত পাড়ি দিয়ে আসার পরেও মানসিকভাবে যৌবরাজ্যে পদার্পণ করেনি। সে ছিল কপালকুণ্ডলার মতো নরনারীর মিলন সম্বন্ধে অনবহিত; দ্বিতীয়ত অ্যাপোলোকে সে বড় ভাইয়ের মতো দেখতো।

দেবকুলে অ্যাপোলো ছিল সুন্দরতম। সুন্দরীর প্রত্যাখ্যান তার আত্মমর্যাদায় আঘাত করল। ডাফ্‌নের অসম্মতি বা অনিচ্ছায় কর্ণপাত না করে সে বলপূর্বক তাকে ভোগ করতে প্রবৃত্ত হল। ডাফ্‌নে ছুটে পালাতে গেল, পারল না। তখন সে বনদেবীদের কাছে প্রার্থনা করল যে-কোনভাবে তাকে রক্ষা করতে। বনদেবীরা তার কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হয়ে তাকে একটি পুষ্পভারনম্র বৃক্ষে রূপান্তরিতা করে দিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দির প্রখ্যাত ইতালিয়ান ভাস্কর লোরেঞ্জো বার্নিনী (1598-1680) এই কাহিনি অবলম্বনে একটি যুগান্তকারী মর্মর-ভাস্কর্য গড়েছিলেন (চিত্র 10.1)। ডাফ্‌নের অনবদ্য ন্যুড গড়া সত্ত্বেও শিল্পী তার লজ্জা-নিবারণ করেছেন বৃক্ষের বল্কলে। অ্যাপোলোর যৌনাঙ্গও অন্তরালে।

* * *

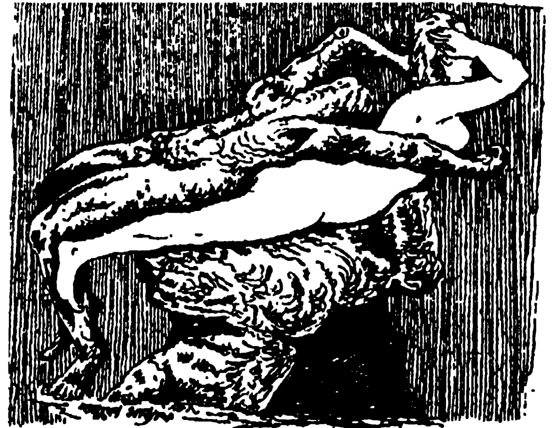
দ্বিতীয় উদাহরণটি রোদ্যাঁর প্রখ্যাত ভাস্কর্য : Eternal Spring বা চিরবসন্ত (চিত্র 9.17)। এটি শৃঙ্গাররত মিথুন থেকে মৈথুনরত মিথুনে সংক্রমণ-মুহূর্ত। যেহেতু ইউরোপীয় শিল্পকলায় শেষোক্ত মিথুনের অনুমোদন নেই, তাই রোদ্যাঁকে থামতে হয়েছে 'সপ্তম সর্গের অসমাপ্ত গানে।' তবু দুঃসাহসী ভাস্কর পুরুষের মূল যৌনাঙ্গ আড়ালে রেখেছেন। এই শালীনতা বা শিল্পরীতি তাঁর *Fujit Amore* (চিত্র 9.18) শিল্পেও প্রতিফলিত।

তৃতীয় উদাহরণটি রোদ্যাঁর একটি অনন্য সৃষ্টি : The Eternal Idol—শাশ্বত হ্লাদিনী (চিত্র 9.19)।

নায়ক ও নায়িকা উভয়েই সম্পূর্ণ দিগম্বর—দুটিই খাঁটি ন্যুড।

নায়কের দুটি হাত কিন্তু নিজদেহের পিছনে। নায়িকাও তার কোনো হাতে দয়িতকে স্পর্শ করেনি। অথচ নায়ক চুম্বনরত। কোথায়? নারীর হৃদমণ্ডলে।—'নামিতা নিম্ননাভি'র উপরে এবং 'স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং'-এর নিচে!! মেয়েটির দুটি চোখ আবেশে মুদে গেছে। এই চুম্বন দৃশ্যের লাবণ্যযোজনা আমাদের স্মরণপথে এনে দেয় আর এক লাবণ্যের কথা

> লাবণ্যের চোখ অর্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনিগলানো পান্নাগলানো, আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে যেখানে দেহ নেই, শুধু আনন্দ আছে সেই অমর্ত্যলোকের অব্যক্তধ্বনি জাগছে।



চিত্র 9.18 পলাতকা প্রেম/রোদ্যাঁ

ইতিপূর্বে দৃষ্ট মিলন দৃশ্যগুলির তুলনায় এটির আর একটি বৈপরীত্যের লক্ষণ আপনাদের নিশ্চয় নজরে পড়বে। অন্যান্য ক্ষেত্রে মনে হবে নায়ক-নায়িকা যেন পরমুহূর্তেই নড়েচড়ে উঠবে। তারা যেন গতিময় মিলনমুহূর্তের ক্ষণিক 'স্ন্যাপশট'। যেন কোন জলপ্রপাতের আলোকচিত্র—প্রতিটি জলবিন্দুতেই আছে স্থিতির মধ্যে গতির ব্যঞ্জনা। অথচ এখানে স্থিতিতে শুধু জ্যোতির বিকাশ! যেন নিস্তরঙ্গ মানস-সরোবরে প্রতিবিম্বিত একগুচ্ছ স্থাবর রোডোডেনড্রন-গুচ্ছ!

নায়িকার এই হ্লাদিনীশক্তিই যুগে যুগে বীরকে করেছে বিজয়ী, গায়ককে গীতময়, শিল্পীকে সৃষ্টিমুখর, নীরব কবিকে বাঙ্ময়!

পাঠক আমাকে মার্জনা করবেন, ভারতীয় মিথুন ভাস্কর্যে এ জাতীয় দেহাতীত প্রেমের অনন্দময় দ্যোতনা আমরা খুঁজে পাইনি।

* * *

'ইরটিকা-মিউজিয়াম'গুলিকে বাদ দিলে পাশ্চত্য শিল্পে 'মৈথুনরত মিথুন' যে অনুপস্থিত এ-কথা মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যায়। আদি গ্রীকযুগ থেকে রোমানেস্ক, রোমান, রেনেসাঁ যুগ অতিক্রমণে আধুনিক যুগেও এ ভাবনা পাশ্চাত্য ভাস্কর বা চিত্রশিল্পীকে উদ্বুদ্ধ করেনি। এই কার্যক্রমটি ইঙ্গিতেই বলা হয়েছে।



চিত্র 9.19 হ্লাদিনী শক্তি/রোদ্যাঁ

ভারতবর্ষে তা হয়নি। নবম শতাব্দির পরবর্তীকালে এই শিল্পভাবনা ভারতে ব্যাপকরূপ ধারণ করে।—তার পূর্বযুগে কিছু কিছু উদাহরণ আমরা পেয়েছি চালুক্যরাজদের আমলে বাদামি, আইহোল আর পাট্টাদকলে। তারও পূর্বে দু-একটি উদাহরণ দেখা গেছে ভুবনেশ্বরেও। কিন্তু সেগুলি যেন ব্যতিক্রমই, নিয়মের পরিচায়ক মাত্র।

শ্রীযুক্তা দেবাঙ্গনা দেশাই তাঁর গবেষণা গ্রন্থে বলছেন :

> It is surprising that *mithuna* couples of the seventh century temples of Bhubaneswara have escaped the scholarly look of K. C. Panigrahi. According to him copulating couples (or 'obscene erotic couples' as he calls them) first made their appearance on the eighth century temples of the Vaital and Sisiresvara. But as observed by us, the earliest extant temples of Bhubaneswara show copulating couples in their act. Though few in number, they indicate that a beginning had been made in representing *maithuna* in the temple art of Bhubaneswara
>
> [আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি যে, ভুবনেশ্বরে সপ্তম শতাব্দির মৈথুনরত মিথুনের অস্তিত্ব ডঃ কে. সি. পাণিগ্রাহীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। পানিগ্রাহী বলেছেন, মৈথুনরত মিথুন (তাঁর ভাষায় 'অশ্লীল যৌনতামণ্ডিত মিথুন') প্রথম উৎকীর্ণ করা হয়েছিল অষ্টম শতাব্দিতে নির্মিত বৈতাল ও শিশিরেশ্বরে। কিন্তু আমরা দেখেছি প্রাগ্বর্তী অভগ্ন মন্দিরেও তারা ছিল। সংখ্যায় হয় তো কম, তবু বলা যায়—ভুবনেশ্বর মন্দির-শিল্পে তার পূর্বেই মৈথুনরত মিথুনের উপস্থাপনা শুরু হয়েছিল।]

আমরা ড. দেশাই-এর সঙ্গে একমত। পরশুরামেশ্বর মন্দিরে (আ. 650 খ্রিস্টাব্দে) ওই শ্রেণির একটিমাত্র মিথুনমূর্তি আজও বর্তমান। ড. দেশাই এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, "শিখরদেশে সে মূর্তিটি এমন খাঁজের ভিতর আছে যাতে সাধারণ দর্শকের নজরেই পড়ে না।"

সাধারণ দর্শক কেন, পূর্বাচার্য ড. পাণিগ্রাহীরও তা নজরে পড়েনি। স্বীকার করব, আমরাও সেটি প্রথম দর্শনে দেখতে পাইনি। ডক্টর দেশাই-এর গ্রন্থপাঠের পর আমরা সে মূর্তিটি খুঁজে বার করেছি। অদ্ভুত পরিকল্পনা—মা শিশুকে স্তনদানরতা এবং স্বামী তার পশ্চাদ্দেশ থেকে তাকে উপভোগ করছে! এমন মূর্তি বহু পরবর্তীকালে কোনার্কে পুনরাগম করেছে।

এ ছাড়াও শত্রুঘ্নেশ্বর মন্দিরে (বর্তমানে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত) একটি শায়িতাবস্থায় মিথুনরত মিথুন মূর্তি ছিল।

তবু বলব, ভুবনেশ্বরে মন্দির-নির্মাণ শুরু হবার পর প্রথম দুই শতাব্দিতে অন্যান্য নানান জাতির মিথুনমূর্তি উৎকীর্ণ করা হলেও 'মৈথুনরত মিথুন' ছিল নিতান্ত ব্যতিক্রম। এবং যেকোন কারণেই হোক, সেগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ক্রমশ সারা ভারতেই এই জাতির মূর্তি মন্দির-ভাস্কর্যে আসতে শুরু করে। কোন কোন মন্দিরে অত্যন্ত প্রকট ও সোচ্চার ভাবে। যা তীব্রতম ভাবে দেখা গেল খাজুরাহো ও কোনার্কে।

ড. দেশাই তাঁর গবেষণা-গ্রন্থে বলছেন :

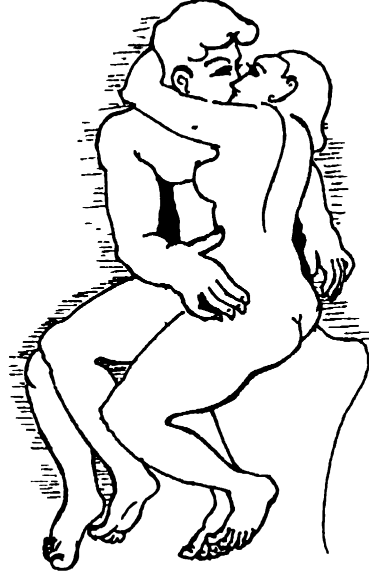
> মৈথুনমূর্তির এই প্রবল জোয়ার থেকে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এ-যুগে (গবেষকের মতে যুগটা 500-900 খ্রিস্টাব্দ) মিথুন মূর্তি গড়ার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। মৈথুনমূর্তির এই প্রাদুর্ভাবের বিষয়ে আমাদের মনে হয়েছে .
>
> (ক) মৈথুনরত মিথুন মূর্তিগুলি প্রথমযুগে সচরাচর অন্তরালে রাখা হত, যা-থেকে অনুমান করা যায় যে, মন্দির-ভাস্কর্যে তাদের অবস্থান পূর্ণসমর্থন পায়নি।
>
> (খ) এ থেকে আরও অনুমান করা যায় যে, চীন-শিল্পের 'ইন-ইয়াং' তথ্য ভারতীয় তান্ত্রিকেরা মন্দির-ভাস্কর্যে স্বীকৃতি দেয়নি। এরা পূজার্চনার কোনও উপাচার নয়।
>
> (গ) সম্ভবত ভাস্কর্যে মিথুনাচারেব অন্তরালে আছে ঐন্দ্রজালিক কোন ধর্মাচার (magico-religious factor)
>
> (ঘ) কামসূত্রানুসারী হলেও প্রথম যুগের মূর্তিতে কোন প্রকাশ্য যৌনবিজ্ঞপ্তি ছিল না।

আমরা ডক্টর দেশাই-এর সঙ্গে মোটামুটি একমত, কিন্তু যেহেতু তিনি চারশ' বছরের ব্যাপ্তিকে (500-900 খ্রিস্টাব্দ) একসঙ্গে আলোচনা করেছেন তাই আমরা বুঝতে পারি না বিবর্তনটার উৎস, স্বরূপ ও প্রেরণা। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দিতে যে কুশীলব পর্দার আড়াল থেকে সসঙ্কোচে উঁকিঝুঁকি মারছিল সে কার প্রভাবে দ্বাদশ শতাব্দিতে মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে হাঁকাড় পাড়তে শুরু করল : অয়ম্ অহং ভো?!

সামাজিক, নৈতিক, শৈল্পিক বাধাগুলি সে এই চার শতাব্দিতে কীভাবে অতিক্রম করল?

একটা কথা এখানে পরিষ্কার করা দরকার : আমরা এখানে বলতে চাইছি না যে, ভারতীয় শিল্পাঙ্গনে খাজুরাহো বা কোনার্কের ভাস্করদল এই অনুভাবনাকে প্রথম নিয়ে এসেছিল। অথবা তাদের পূর্বসূরী বাদামী, আইহোল কিংবা পাট্টাদকলের শিল্পীরা। শিল্পে এ বিষয়ে বহু পূর্ব যুগ থেকেই অনুমোদন ছিল, যদিও প্রকাশ্যে নয়—সচরাচর রাজা-মহারাজাদের প্রমোদভবনে। দুর্ভাগ্যবশত যে সব প্রাসাদের কোন চিহ্নমাত্র এখন দেখা যায় না।

প্রাচীন সাহিত্যে তার উল্লেখ আছে। ধরুন, শ্রীহর্ষ রচিত *উত্তরনিষাদচরিতের* অষ্টাদশ সর্গের বিংশতি শ্লোকে



চিত্র 9.20 চুম্বন/রোদ্যাঁ

বর্ণনা করা হয়েছে রাজা নলের প্রমোদভবনে অঙ্কিত কিছু চিত্রাবলীর। প্রাচীরে পদ্মসম্ভবের (ব্রহ্মার) একটি ব্যভিচার দৃশ্য বিচিত্রিত। বিপরীত প্রাচীরে ছিল দেবরাজ ইন্দ্র-অহল্যার একটি সঙ্গমদৃশ্য। ভাষ্যকার বলছেন, এই চিত্রগুলি 'কামোদ্দীপনার্থ'।

পাঠকের স্মরণ হবে যে, আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি ভাস্করদল কবি ও নাট্যকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেব-দেবীর মিলন উৎকীর্ণ করেননি। দেখা যাচ্ছে, চিত্রকরেরা তা করেছিলেন।

কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই দেবতাদের ব্যভিচার দৃশ্য কেন?

সম্ভবত তার হেতু : স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গমদৃশ্য ব্যভিচারদৃশ্যের মতো 'কামোদ্দীপক' নয়।

দণ্ডায়মান বনাম শায়িতবন্ধ

মৈথুনরত মিথুন মূর্তিগুলিকে যদি আমরা দুভাগে ভাগ করি— দণ্ডায়মান অথবা শায়িতবন্ধ—তাহলে দেখা যাবে শায়িত মিলন দৃশ্য অত্যন্ত অল্প। আমাদের গণনা অনুসারে

কোনার্ক-মন্দিরে বর্তমানে-দৃষ্ট মিলিত জগমোহন ও বিমানে সর্বমোট মৈথুনরত মিথুন মূর্তি আছে (রথচক্রের নেমিবাদে) 40; তার ভিতর 30টি দণ্ডায়মান এবং মাত্র 10টি শায়িতবন্ধ। এটা নিশ্চয় বাস্তবানুসারী নয়।



চিত্র 9.21 বৃক্ষাধিরূঢ়ম্ আসন/কোনার্ক

এ বিষয়ে এক-একজন পণ্ডিত এক-এক রকম মন্তব্য করেছেন : ডবলু. সি. আর্চারের মতে :

> Supine or horizontal designs and compositions would detract from the upward surge of the temple. They would be appropriate in 'feminine' buildings such as Jefferson Memorial, Washington or National Gallery, London—buildings whose flat lines support a rounded breast-like dome. Temples in medeival India were male in their own right. Their domes are like *lingams.* As sculpture, the lovers vertical positions are geared to this conception. But lay them down and make necessary mental adjustments and what is wild and fantastic is once again conventional.

[পালঙ্কে শায়িত ভূমির সমান্তরাল মিথুন গগনস্পর্শী মন্দিরের দেহাকৃতিতে ছন্দপতন ঘটাতো। শায়িতবন্ধের মিথুন যথোপযুক্ত মনে হত স্ত্রী-প্রতীকী স্থাপত্যে। যেমন ওয়াশিংটনের জেফারসন স্মৃতিসৌধ অথবা লন্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারি। সে সব স্থাপত্যে ভূমি-সমান্তরাল রেখার উপর আছে পয়োধরপ্রতিম গম্বুজ। অথচ মধ্যযুগের ভারতীয় মন্দিরগুলি ছিল পুরুষপ্রতীকী। তার মন্দিরচূড়া লিঙ্গপ্রতিম। ভাস্কর্যে তাই মিথুনের দণ্ডায়মান রূপায়ণ এই স্থাপত্য-ভাবনার সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। মূর্তিগুলিকে পালঙ্কে শুইয়ে দাও। মনে মনে ওদের শায়িতরূপে কল্পনা কর, তাহলেই দেখবে আপাতদৃষ্টিতে যাদের মনে হয়েছিল অদ্ভুত, কল্পনাশ্রয়ী, তারা পুনবায় স্বাভাবিক হয়ে যাবে।]

আমরা, দুর্ভাগ্যবশত, এই শিল্প-বিশারদের সঙ্গে আদৌ একমত হতে পারছি না। একাধিক হেতুতে

প্রথমত, মধ্যযুগে ভারতীয় মন্দিরগুলি অব্যতিক্রমভাবে পুরুষপ্রতীকী ছিল না। শুধুমাত্র *রেখ-দেউলগুলি* তাই ছিল। *পীড়-দেউল* আবশ্যিকভাবে স্ত্রীপ্রতীকী। আর্চারের আলোচ্য মন্দিরটি—কোনার্ক জগমোহন—ছিল পীড়-দেউল, অর্থাৎ স্ত্রীপ্রতীকী।

দ্বিতীয়ত, মার্কিনী শিল্পবিশারদ ডক্টর আর্চারের দৃষ্টিতে যা মনে হয়েছে wild & fantastic ভারতীয় দৃষ্টিতে সর্বক্ষেত্রে তা মনে হয় না। কারণ এই সকল মৈথুনাসনের রূপ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে বাৎস্যায়নের *কামশাস্ত্রে*, কল্যাণমল্ল প্রভৃতি যৌন-বিশারদের *রতি-রহস্য*, *অনঙ্গমঞ্জরী*, *কোকশাস্ত্র*, *কুট্টারুমতম* প্রভৃতি গ্রন্থে।

আমাদের মতে এই আপাত-অনুপপত্তির সমাধান পাওয়া যায় অন্য সূত্র থেকে সমস্যাটা বিবেচনা করলে।

নাগর-বাস্তুশাস্ত্রে এবং শিল্পশাস্ত্রে মন্দির-ভাস্কর্যের ভূমিনক্‌শা বিষয়ে অলঙ্ঘনীয় বিস্তারিত নির্দেশ আছে। মন্দির হতে পারে—ত্রিরথ, পঞ্চরথ, অথবা সপ্তরথ। তার বহিরঙ্গ শাস্ত্র নির্দেশানুসারে ক্রমাগত খাঁজ রাখা—*রাহাপাগ*, *কোণাপাগ*, *অনুরথপাগ*, *অনুরাহাপাগ* প্রভৃতির স্বল্পবিস্তারে তারা ক্রমাগত খাঁজকাটা। তার ফলে মন্দির-বহিরঙ্গ ভূমির সমান্তরালে অল্পপরিসরে বারে বারে খাঁজকাটা। স্থপতিবিদ যদি ক্রমাগত এমন স্থান ভাস্করকে প্রদান করেন যা ভূমির সমান্তরালে স্বল্পদৈর্ঘ্যের অথচ

খাড়াইয়ে যথেষ্ট উঁচু এবং তদুপরি যদি প্রধান পরিকল্পনাকার ভাস্করদলকে নির্দেশ জারি করেন যে, প্রাপ্ত স্থানে মৈথুনরত মিথুন মূর্তিই উৎকীর্ণ করতে হবে, তাহলে তাদের পক্ষে ক্রমাগত দণ্ডায়মান মিথুনমূর্তি রচনার কোনও বিকল্প থাকে? আমি বন্ধুবর প্রখ্যাত শিল্পী ইন্দ্র দুগারের অন্তত পঞ্চাশখানি গঙ্গা দৃশ্য দেখেছি। কোনটারই খাড়াই বিস্তারের চেয়ে বেশি নয়। কারণ শিল্পী দুগার জলপ্রপাত আঁকেননি—এঁকেছেন গঙ্গার দীর্ঘপ্রসারী দৃশ্যপট। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে।

স্বীকার্য যে, প্লিন্থ অংশের নিচে বিস্তীর্ণ ভূমি ছিল, যা চওড়ায় বেশি, খাড়াই-এ কম। সেখানে শায়িত মিথুন মূর্তির হাট বসানো যেত। কিন্তু তারা নেই। কেন নেই? জানি না। সেখানে ক্রমাগত হস্তিদলের মিছিল। সম্ভবত এই অংশে মিথুন উৎকীর্ণ করায় শিল্পগুরুদের আরোপিত কোনও বাধা-নিষেধ ছিল। নির্দেশ ছিল, মিথুন গড়তে হবে শুধুমাত্র *তলজঙ্ঘা* এবং *উপরজঙ্ঘা* অংশে। বাঢ় অঞ্চলে।

চিত্র 9.21 এ আমরা একটি চুম্বনদৃশ্য দাখিল করেছি। এটিকে ইতিপূর্বেই অষ্টম অধ্যায়ে দেখেছি। পুনরায় তা দাখিল করতে হল জানাতে যে, এটি আদৌ কোন চুম্বনদৃশ্য নয়—একটি মৈথুনরত মিথুনের আলেখ্য।

বাৎস্যায়ন ও কল্যাণমল্ল উভয়েই এই দণ্ডায়মান ভঙ্গির উল্লেখ করেছেন। দুজনেই বলেছেন এই কামক্রিয়ার নাম 'বৃক্ষাধিরূঢ়াসন'।

বাৎস্যায়ন বর্ণনায় :

চরণকমলমেকেনাঙ্ঘ্রিণাক্রম্য ভর্তু—
রপরপদসরোজেনাক্ষয়ন্তীং তদূরুম্।
তরুরিব ভূজবল্ল্যাপীড্য চুম্বেন্নতাঙ্গীং
কথিতমিহ মুনীন্দ্রৈস্তদ্ধি বৃক্ষাধিরূঢ়ম্।।

[পতির চরণে নিজের একটি চরণকমল স্থাপিত করে, দ্বিতীয়পদ তার উরুদেশে সংস্থাপিত করে লতা যে ভঙ্গিমায় বৃক্ষে আরোহণ করে সেভাবে যখন নায়িকা মৃণালভুজদ্বয়ে নায়ককে আলিঙ্গন করে ধরে, তখন নায়ক তাকে চুম্বন করে। এই কামক্রীড়ার নাম : 'বৃক্ষাধিরূঢ়াসন'।]

এ ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। নায়িকা দেখছি নায়কের দুই করতলে তার চরণদ্বয় স্থাপন করেছে। এভাবে নায়িকার সমস্ত দেহভার দুই হস্তে গ্রহণ করে নায়কের পক্ষে চুম্বন করা সম্ভবপর কি না আপনারা ভেবে দেখবেন। আমরা বলি এটি : অবাস্তব মিথুন।

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি রথচক্রগুলিকে বাদ দিলে মন্দিরে দণ্ডায়মান ভঙ্গি শায়িতভঙ্গির চেয়ে অনেক বেশি। প্রায় বারো-আনা : চার-আনা। তার হেতু সেখানে ভাস্কর্যের ভূমি বিস্তারে স্বল্প, উচ্চতায় বেশি।



চিত্র 9.22 উত্থানপদ নাগরবন্ধ/কোনার্ক

এবার-রথচক্রগুলি দেখি :

কোনার্কে সর্বসমেত চব্বিশটি রথচক্র। প্রতিটিতে আটটি নেমি (স্পোক) এবং কেন্দ্রীয় অ্যাকসেলপ্রান্তে একটি ধরে ভাস্কর্যের স্থান নয়টি। অর্থাৎ সর্বসমেত 24 × 9 = 216টি সম্ভাব্য স্থান। তার ভিতর 86টি মূর্তি নষ্ট হয়ে গেছে। বাকি 130টির ভিতর 49টিতে মৈথুনরত-মিথুনের ভাস্কর্য। যেহেতু এখানে বিস্তার ও উচ্চতা সমান তাই ভাস্কর ইচ্ছামতো মূর্তি গড়তে পারেন। দেখা যাচ্ছে, এখানে শায়িতবন্ধন অনেক বেশি, দণ্ডায়মান ভঙ্গির তুলনায়। চিত্র 9.22-এ একটি উদাহরণ দেওয়া হল। কল্যাণমল্লের হিসাবে এটি 'উত্তানপদ নাগরবন্ধ' :

উত্তানিতয়া স্মরমন্দিরে যঃ
স্থিতস্তদুরুদ্বয়ংগৃহীত্বা।
সংস্থাপত্য বাহ্যং কটিতোরমেত
কান্তস্তদাস্মরং কিল নাগরাখ্যম্ ।। শ্লোক 59

[মদন মন্দিরে নায়িকা যখন উরুদ্বয় বিস্তারিত করে উত্তান ভঙ্গিতে (চিৎ হয়ে) শায়িতা এবং

নায়ক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তখন তাকে বলে : 'নাগরাখ্যবন্ধ।]

ঠিক পরবর্তী রথচন্দ্রের কেন্দ্রীয় ভূমিতে (অ্যাক্‌স্‌লের প্রান্তে) কোনার্ক-ভাস্কর উৎকীর্ণ করেছেন এক বিপরীতরত্যাতুরার মর্মরমূর্তি। এই পর্যায়ে কবি ভারতচন্দ্র এক কপোলকাহিনি রচনা করেছিলেন : নায়ক সুন্দর কৌতুকরসে নায়িকার কাছে এক স্বপ্নমঙ্গলের ব্যাখ্যা প্রার্থনা করে বসেন—"গিরি অধোমুখে কাঁদে, চকোরি



চিত্র 9.23 বিপরীত রতিকর্ম/কোনার্ক

পাইয়া চাঁদে ......" ইত্যাদি। নায়িকা বিদ্যা যেন বাধ্য হয়েই সেই স্বপ্নমঙ্গলের বাস্তবব্যাখ্যা দিলেন (চিত্র 9.23)

ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম
কোথায় বসন-ভূষণ দাম।...
লাজের মাথায় হানিয়া বাজ
সাধিলা রামা বিপরীত কাজ।।

কল্যাণমল্ল কাজের লোক। কাব্যকথার কৌতুক পরিহার করে কেজো ভূমিকয় পরবর্তী শ্লোকেই লিখলেন :

জাতিশ্রমং বীক্ষ্য পতিং পুরস্ত্রী
স্বেচ্ছাস্তায় বাহ্যরতেন্বতৃপ্তা।
কন্দর্প বেগাকুলিতা নতাঙ্গী
কুর্বিত তুষ্টে পুরুষায়িতং সা।।

[নায়ককে ক্লান্ত হয়ে পড়তে দেখলে পুরস্ত্রী স্বেচ্ছায় রমণতরণীর কর্ণধারের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। কন্দর্প বেগাকুলিতা নায়িকা পুরুষের ভঙ্গিতে তাকে তৃপ্ত করতে পারেন।]

অজ্ঞাত ইংরেজ কবি 'অ্যানন্' এ প্রসঙ্গে লিখলেন :

She cast her candour and her costly array
To mount the beau-horse to gallop away.

সপ্তম শ্রেণি : আনুষঙ্গিক যৌনাচার

শব্দটা আমরা যোগরূঢ় অর্থে ব্যবহার করেছি। না হলে চুম্বন, আলিঙ্গন, মর্দন প্রভৃতি সবকিছুই তো 'আনুষঙ্গিক যৌনাচার'। এ অনুচ্ছেদে আমরা আনুষঙ্গিক যৌনাচার বলতে তিনজাতের যৌনক্রিয়ার কথা বলছি : ফেলাশিও, কানিলিঙ্গাস ও কাকালি।

আনুষঙ্গিক মিথুনাচার আবির্ভাব মিথুনভাস্কর্যের একেবারে শেষ পর্যায়ে। কোনার্কে এ জাতীয় বিশ-পঁচিশটি ভাস্কর্য দেখেছি, খাজুরাহোতেও তারা প্রচুর। কিছু কিছু দেখেছি ভাবকায়, গল্‌তেশ্বরে, এলোরা (হিন্দু পর্যায়ের গুহা), নেপালে। কিন্তু সেগুলি সবই অতি নিম্নমানের শিল্প। অথচ সমকালে নির্মিত পার্শ্ববর্তী প্যানেলেই পেয়েছি রসোত্তীর্ণ উদাহরণ। সুতনুকার নানান ভঙ্গিমা—শালভঞ্জিকা, প্রসাধনরতা, নৃতগীতরতার মূর্তি। তাই আনুষঙ্গিক যৌনাচারের ওই নিকৃষ্টমানের মূর্তিগুলিকে বলতে পারছি না যে, এগুলি সার্বিক অবক্ষয়ের শিকার। আমাদের আন্দাজ—রাজাদেশে প্রধান পরিকল্পনাকার তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এগুলি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। আর সেজন্যই কিছু নিম্নমানের ভাস্করদের দিয়েছিলেন এই দায়িত্ব। তাতে সাপও মরেছে, লাঠিও ভাঙেনি। অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন নিয়োগকারী বুঝতে পারেননি কায়দাটা—তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। অপরপক্ষে জাতশিল্পীরাও বিড়ম্বিত হননি।

কলিঙ্গমন্দিরের বিশ-পঁচিশটি উদাহরণের একটি মাত্র

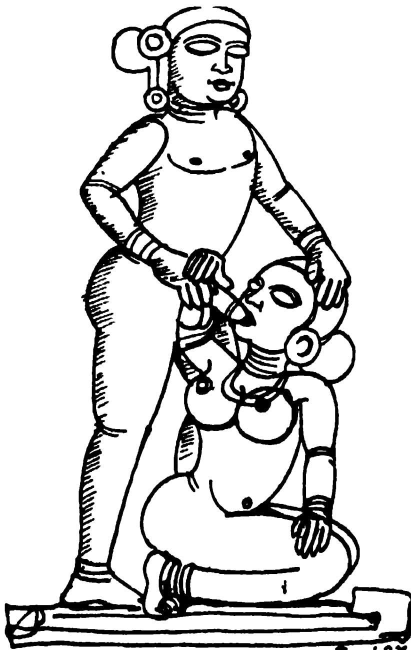
উদাহরণ (চিত্র 9.24) দিতে বাধ্য হলাম। বলা যায় . রাজাদেশে। রাজা এখানে 'ভারতব্যাপী মিথুনাচার'। রাজারা আছেন—তাঁদের একেবারে অস্বীকার করি কী করে?

তেমনি পুরী মন্দির থেকেও একটিমাত্র 'কানিলিঙ্গাস্' মূর্তির উদাহরণ (চিত্র 9.25) এখানে সন্নিবেশিত হল। দুটিই অনুজপ্রতীম শেখর মুখার্জি আমার অনুবোধে এঁকে দেয়।

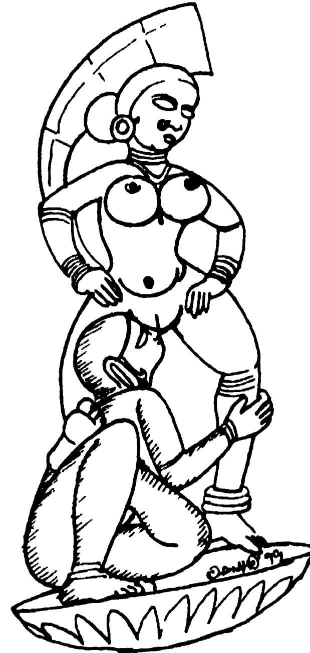
বিশ্বাস করুন, এটা কাকতালীয়ভাবে ঘটেছে। স্বয়ং না এঁকে 'রাজাদেশে' এ দুটি ছবি শেখরকে দিয়ে আঁকাইনি নিজেব বিডম্বনা এড়িয়ে যেতে। আমি জানি, শেখর আমার চেযে উন্নতমানের চিত্রকর। তবে হ্যাঁ, সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আমার অনুরোধে পড়ে ঢেঁকি গিলেছে কি না, এ কথা সে আমাকে স্পষ্টাক্ষরে বলেনি।

শেখর, আমি আর প্রসেনজিৎ পুরী মন্দির পরিক্রমাকালে গোনাগুন্‌তি চারটি এজাতীয় মূর্তি দেখেছিলাম। শতাব্দী-সংক্রমণ কালে। সেগুলি কয়েক শতাব্দী ধরে পুরী মন্দিরে ছিল। আবার কয়েক শতাব্দী তারা আত্মগোপন করেছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষমুহূর্তে হঠাৎ তারা পুনরাবির্ভূত হল। যেন "ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার, পথিকে বাঁধিতে।"

আজ্ঞে হ্যাঁ, বাঁধাই। তবে সে ব্যাসকূটের সমাধান এখানে নয়। শ্রীশ্রী জগন্নাথক্ষেত্রে। পুরীমন্দির পরিক্রমাকালে।❑



চিত্র 9.24 মুখমেহন ভাস্কর্য/ কোনার্ক



চিত্র 9.25 মুখমেহন ভাস্কর্য/পুরী মন্দির

দশম পরিচ্ছেদ

মিথুন : তৃতীয় স্তর—অস্বাভাবিক/অসামাজিক/অবাস্তব



বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা তৃতীয় স্তরের মিথুনাচারের আলোচনা করব। সেটিকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করেছি .

8. অস্বাভাবিক : বলাৎকার/পশুমৈথুন/ পায়ুমৈথুন

9. অসামাজিক : বহুবল্লভা পুরুষ/বহুবল্লভ নারী/ যৌথযৌনাচার

10. অবাস্তব : বাস্তবে অসম্ভব পরিকল্পনা—চিত্রবিন্যাসে ও আঙ্গিকে।

অস্বাভাবিক অর্থে অপ্রত্যাশিত কিন্তু অবাস্তব নয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক : একটি নববিবাহিত বধূ যদি বুঝতে পারে যে, সে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে তবে তার প্রত্যাশায় থাকে একটি সোনার চাঁদ। খোকা-খুকু, কালো-ধলো,রোগা-মোটা যাই হোক না কেন, সে বাপমায়ের অতি আদরের প্রত্যাশিত ধন। কিন্তু দীর্ঘকাল গর্ভধারণ করে বধূটি যদি একটি জড়ভরত অথবা মঙ্গোলয়েড প্রসব করে? সদ্যজননীর সব স্বপ্ন মুহূর্তে চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু এমন ঘটনাকে অবাস্তব বলা যাবে না। তা অপ্রত্যাশিত, অস্বাভাবিক মাত্র। কিন্তু কয়েক হাজার, হয়তো এক-লাখে এমন একটি ঘটনাও ঘটে থাকে।

হেতুটা জানাতে পারব না, কিন্তু মন্দির-ভাস্কর্যে বেশ কিছু মিথুন পাওয়া যায় যা সেই ব্যতিক্রমী দুর্ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত। যেমন : বলাৎকার/পশুমৈথুন/ পায়ুমৈথুন। এমন কামবিকার বাস্তবে ঘটে থাকে; কিন্তু আমাদের মতে তা শিল্পের বিষয়বস্তু হওয়া নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়।

8. অস্বাভাবিক মিথুনাচার : *বলাৎকার*

নীতিগতভাবে সঙ্গমে পুরুষ ও স্ত্রীর থাকে সর্ববিষয়ে সমান অধিকার। মিলনানন্দে ও প্রজাতিগত জীবসৃষ্টির আন্তরিক আগ্রহে। কিন্তু কোনো কোনো শিল্পী মিথুনাচারের এই মৌল নীতিটি অস্বীকার করে গেছেন।

এগুলি কামবিকৃতি : বলাৎকার, পশুমৈথুন, পায়ুমৈথুন।

বর্তমান অনুচ্ছেদে আমাদের আলোচ্য বিষয় : বলাৎকার। পাশবিক ক্ষমতায় পুরুষ যখন নারীর প্রবল আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে তার দেহ ভোগ করে। ভারতীয় পুরাণে বা মহাকাব্যে এমন বর্ণনা যথেষ্ট আছে। কিন্তু ভারতীয় ভাস্কর্যে তা প্রতিফলিত হয়েছে কদাচিৎ। আমরা সমগ্র ভারতে কয়েক সহস্র—বোধকরি লক্ষাধিক—ভাস্কর্য দেখেছি; তার ভিতর মাত্র একটিকে নিশ্চিত ভাবে এই বলাৎকার শ্রেণিভুক্ত করা যায়। কিন্তু সেকথা আলোচনার পূর্বে প্রতীচ্যের কথা কিছু বলি। পশ্চিমদেশে এই মর্মান্তিক বিষয়টি নিয়ে অপূর্ব ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি। কিন্তু তখন কোনো উদাহরণ দেওয়া হয়নি। রবি বর্মার পূর্বে কোনো ভারতীয় শিল্পী নারী অপহরণের দৃশ্য গড়েছেন কি না জানি না—সীতার অপহরণের মতো নাটকীয় বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে মধ্যযুগে কোনো চিত্রকর বা ভাস্কর শিল্প গড়েননি।



চিত্র 10.1 অ্যাপোলো ও ডাফনে/বার্নিনি

পশ্চিমে শিল্প-মহারথীরা গড়েছেন। অপহরণ দৃশ্যের বীভৎসতাকে অস্বীকার করে অসহায়া রমণীটির বেদনায় সে শিল্পী করুণরসে আপ্লুত এবং করেছেন সার্থক শিল্প সৃষ্টি। লরেঞ্জো বার্নিনির (1598-1680) একটি অনবদ্য মর্মরমূর্তি, *অ্যাপোলো ও ডাফনেকে* (চিত্র 10.1) উদাহরণ হিসাবে পেশ করা গেল। কাহিনিটি ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে।

ডাফ্‌নে নদীদেবতা লাদেন-এর এক অনূঢ়া কিশোরী কন্যা। *কপালকুণ্ডলার* মতো সে একান্তচারিণী। সূর্যদেবতা অ্যাপোলো তার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে ডাফ্‌নেকে প্রেম নিবেদন করেন। মেয়েটি সলজ্জে তা প্রত্যাখ্যান করে। প্রথমত সে ছিল কিশোরী, তরুণী নয়, দ্বিতীয়ত অ্যাপোলোকে সে বড়ভাইয়ের মতো ভালবাসতো। অ্যাপোলো এ প্রত্যাখ্যানে অপমানিত বোধ করে এবং বলপ্রয়োগে ডাফ্‌নেকে অধিকার করতে যায়। এমনটা তো হয়েই থাকে, আজও হয়। প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকায় তা ফলাও করে ছাপাও হয়। তবে সেযুগে অসহায় মেয়েদের প্রার্থনা প্রকৃতিদেবী শুনতেন। সীতার আহ্বানে ধরণী-মা দ্বিধাবিভক্ত হতেন—ইদানীং তা হতে ভুলেছেন!

নিরুপায় ডাফ্‌নে বনদেবীদের কাছে কাতর প্রার্থনা জানালো যেকোন উপায়ে অ্যাপোলোর হাত থেকে তাকে



চিত্র 10.2 প্লুটো কর্তৃক পার্সিফোন অপহরণ/বার্নিনি

রক্ষা করতে। বনদেবীরা তাকে একটি পুষ্পভারনম্রা বনতরুতে রূপান্তরিতা করে দিলেন।

এখানে রূপকথার করুণরস বলাৎকার-প্রচেষ্টার বীভৎসতাকে ছাপিয়ে উঠেছে। এটি সার্থক শিল্পসৃষ্টি।



চিত্র 10.3 অসাধু তান্ত্রিক সাধু কর্তৃক বন্দিনী নারীর উপর বলাৎকার/কোনার্ক

বার্নিনি এই জাতীয় বেশ কয়েকটি অপহরণ দৃশ্য গড়েছেন: কিন্তু কোথাও বীভৎস-রস করুণরসকে অতিক্রম করতে পারেনি। আর একটি উদাহরণ দেওয়া গেল চিত্র 10.2তে। *প্লুটো কর্তৃক পার্সিফোন অপহরণ।* কাহিনিটি ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উপকথায় বলা হয়েছিল পার্সিফোন (রোমানরা যাকে বলত 'প্রসারপিনা') কানন-বীথিকায় ছিল একাকিনী। বার্নিনী শিল্পের প্রয়োজনে দ্বিতীয় একটি ভূলুণ্ঠিতা রমণীকে গড়েছেন। হতে পাবে সে এক বনদেবী, অথবা অপহৃতার গর্ভধারিণী ডিমিটার।

* * *

এর পাশাপাশি যদি কোনার্কের বলাৎকার দৃশ্যটির (চিত্র 10.3) তুলনা করি তাহলে আমরা হতাশ হতে বাধ্য। শুধু আমরা নই, আমাদের বিশ্বাস সমকালীন দর্শকও হতাশ হতেন। সম্ভবত এটি তান্ত্রিক সাধুদের প্রতি একটি ব্যঙ্গাত্মক শিল্প। অসাধু তান্ত্রিক সাধু পঞ্চমকারের শেষ 'ম'-কারের অনুপান হিসাবে নিম্নবিত্তের রমণীদের বলপূর্বক ধর্ষণ

করত। ছলে-বলে-কৌশলে। এখানে হয়তো শিল্পী তাই দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু বন্দিনী নারীর অসহায়ত্বকে অতিক্রম করে এখানে উগ্র যৌনতা অগ্রাধিকার লাভ করেছে। সমকালীন শিল্পানুমতি থাক-না-থাক, এই শিল্পে মুখ্য ভূমিকা ছিল করুণরস। শিল্পী সে-রস পরিবেশনে ব্যর্থ। শুধু তান্ত্রিক সন্ন্যাসী একাই মেয়েটির উপর বলাৎকার করছেন না, শিল্পীর করুণরসের উপর বলাৎকার করেছে তাঁর উগ্র যৌনতা প্রবণতা!

8. অস্বাভাবিক মিথুন : পশুমৈথুন :

পশুমৈথুন-দৃশ্য খাজুরাহো এবং কোনার্কে বেশ কয়েকটি নজরে পড়ে। অন্যত্র কদাচিৎ তা দেখা যায়। তার ভিতর একটিও—ব্যতিক্রম হিসাবেও—রসোত্তীর্ণ শিল্প নয়। সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই একটি মাত্র উদাহরণ দাখিল করা গেল (চিত্র 10.4)। এটি খাজুরাহের লক্ষ্মণ-মন্দির থেকে সংগৃহীত। দক্ষিণাংশের প্লিন্থ অঞ্চল থেকে।

দেখা যাচ্ছে, রাজানুচরেরা একটি হতভাগ্য ঘোটকীকে বলপূর্বক ধরে রেখেছে এবং শ্রীমন্ মহারাজ পশ্চাদ্দেশ থেকে সেই ঘোটকীতে উপগত হচ্ছেন। সামাজিক বিধানে মহারাজের কয়েক গণ্ডা পত্নী বর্তমান, উপপত্নী কয়েক ডজন, এ ছাড়া হারেমে বন্দিনী আছে কয়েকশত। তদ্‌সত্ত্বেও মহারাজের বাসনা একটি ঘোটকীতে উপগত হতে। এই কামবিকারটিকে কেন খাজুরাহো-শিল্পী তাঁর শিল্পের উপজীব্য করলেন তা বিস্ময়কর। তার চেয়েও বড় বিস্ময় খাজুরাহো-শিল্পের ধ্বজাধারীরা কেন বলতে পারলেন না, এই জাতীয় কদর্য মূর্তিও খাজুরাহোতে বর্তমান। *মার্গ* স্কুলের শিল্প-বিশারদেরা তাঁদের সুবৃহৎ *খাজুরাহো বিশেষ সংখ্যায়* এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব! সম্পাদক মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ এ-ধরনের শিল্পের সমর্থনে কোনো উপনিষদের মন্ত্র কপচাননি। এ-জাতীয় শিল্পও কি তাঁর মতে "healthy enjoyments?"



চিত্র 10.4 পশুমৈথুন, লক্ষ্মণ দেউল/খাজুরাহো

8. অস্বাভাবিক মিথুন : পায়ুমৈথুন :

এই কামবিকারটি শুধু অস্বাভাবিক বা অশাস্ত্রীয় নয়, বে-আইনী। প্রমাণিত হলে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ধারা মোতাবেক বর্তমানে আসামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। তবু এই কামবিকারটি বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে মন্দিরগাত্রে স্থান পেয়েছে। অধিকাংশই খাজুরাহোতে। একটি উদাহরণ দেওয়া গেল (চিত্র 10.5)। বাস্তবে এটি একটি যৌথযৌনাচার-ভাস্কর্য। প্যানেলে সাতটি চরিত্র, তার ভিতর একজনমাত্র সকর্মক নয়। বাকি তিন-জোড়া মিথুন। সর্ববামে একজন দাড়িওয়ালা সাধু একটি স্ত্রীলোককে ধরেছে। মনে হয় দুজনেই স্বয়ং-মৈথুনে আত্মনিমগ্ন। তার পরের মিথুনে স্ত্রীলোকটি মুখমেহনরত এবং দক্ষিণপ্রান্তে চতুষ্পদ ভঙ্গিতে আনত রমণীর পায়ুমৈথুনে পুরুষটি ব্যাপৃত। এখানে যৌনতা-অতিরিক্ত কোন শিল্পসুষমা নজরে পড়ে না। এটি নিঃসন্দেহে একটি কদর্য ভাস্কর্য!

9. অসামাজিক : বহুপত্নিক ও বহুবল্লভা

নরনারীর যৌনজীবনের নিভৃতে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিই আধুনিক দম্পতির কাছে নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়। বস্তুত আমাদের ধারণা—অতীতকালে এবং মধ্যযুগেও তাই ছিল। যৌথবিবাহকে সভ্য মনুষ্যসমাজ সমগ্র পৃথিবীতে কোনোকালেই গ্রহণ করেনি—বর্বর যুগের 'কনস্যাঙ্গুইন' বা 'পুনালুয়ান' বিবাহপ্রথা বহু সহস্রাব্দ কালের অতীত ইতিহাস। এ তথ্যটি নিঃসংশ্রয়ে প্রমাণিত হয় ভারতীয় সাহিত্যে—পুরাণে ও কাব্যকথায়। ফলে বহু-পত্নিক পুরুষ ও বহুবল্লভা নারীর উপস্থিতি মন্দির-ভাস্কর্যে একটি অসামাজিক পরিকল্পনা। তাদের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য; ফলে তা আমরা অনালোচিত রাখতে পারি না। এ বিষয়ে—আশ্চর্যের কথা—বর্তমানকালের

শিল্পবিশারদরা একেবারে ভিন্ন মেরুর বাসিন্দার মতো সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। বিংশ শতাব্দীর আদিযুগের ভারতবিদগণের মতামত আমরা জানি না। কারণ আমরা খুঁটিয়ে দেখেছি, পূর্বাচার্য পণ্ডিতেরা—রাজেন্দ্রলাল, ফার্গুসন, হ্যাভেল, ক্যানিংহ্যাম, কুমারস্বামী, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি পণ্ডিতরা ওই জাতের যৌথযৌনাচারের ভাস্কর্যকে উল্লেখ করে তার প্রশংসা বা নিন্দা করেননি। সম্ভবত এ জাতীয় ভাস্কর্য তাঁরা দেখতেই পাননি। খাজুরাহোর মূর্তিগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁদের আলোচনার পরবর্তীকালে। কোনার্ক ছিল অতিদুর্গম শিল্পতীর্থ। অর্ধেক বালুকাস্তূপে ঢাকা।

আধুনিক কালে দেখছি *মার্গ*-পত্রিকার সম্পাদক ডক্টর মুল্‌করাজ আনন্দ্ স্পষ্টাক্ষরে এই জাতের মিথুনের উল্লেখ করে এবং ছবি ছাপিয়ে তার পূর্ণ সমর্থন করেছেন। তিনি বলছেন,

"The supra-sensual kingdom of belief in one Absolute God, Brahman, who splits



চিত্র 10.5 হস্তমৈথুন, মুখমেহন ও পায়ুমৈথুন/খাজুরাহো

Himself through desire into many....He desired...I am one, let me be many, that creation may be"[1]

[অনুভূতির-অতীত 'বিশ্বাস-জগতে বিরাজমান 'একবর্ণ' (ব্রহ্ম), যিনি বাসনার মাধ্যমে 'বহুধা' হলেন...তিনি ইচ্ছা করলেন...আমি একাকী, এক্ষণে বহুধা হব, যাতে জীবসৃষ্টি বাস্তবায়িত হয়।]

শব্দপ্রয়োগের ব্যঞ্জনা চমকপ্রদ। ডক্টর আনন্দ্-এর দাবি এ পরিকল্পনা উপনিষদ-এর মন্ত্র অনুসারী।

কিন্তু যুক্তি দিয়ে এই মত যৌথ-যৌনাচার পরিকল্পনার সমর্থনে গ্রহণ করা যায় না। একটি পুরুষ যখন একই সময়ে একাধিক রমণীর সঙ্গে কামক্রীড়ারত তখন উপনিষদের ওই মন্ত্রটি কি তার সমর্থনে প্রযুক্ত হতে পারে? এ চিন্তাধারা ভারতীয় ভাবনায় কোথাও পাওয়া যায় না—না উপনিষদে, না কাব্যে, না কৃষ্ণতত্ত্বে। একটু বিস্তারিত আলোচনা এখানে অপরিহার্য :

ডক্টর আনন্দ্ উপনিষদের যে মন্ত্রটি তাঁর যুক্তির সমর্থনে ব্যবহার করেছেন সেটি বৃহদারণ্যকের একটি সুপরিচিত মন্ত্র :

স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিস্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বৈধাপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভাবতাং 'তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি স্মাহ যাজ্ঞবল্কাস্তমাদয়মাকাশঃ স্ত্রীয়া পর্যত এব তাং সমভবত্ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত।[2]

[কিন্তু তিনি (পরমব্রহ্ম) আনন্দলাভ করিলেন না। কারণ কেহই একাকী থাকিয়া আনন্দলাভ করে না। তিনি দ্বিতীয় এক সত্তায় রূপান্তরিত হইতে ইচ্ছা করিলেন। স্ত্রী ও পুরুষ আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় যে পরিমাণ (আনন্দিত) হয়, তিনি সেই পরিমাণ (আনন্দিত) হইলেন। তিনি নিজ সত্তাকে দ্বিধাবিভক্ত করিলেন। এইরূপে পতি ও পত্নী সৃষ্ট হইল। সেই হেতু যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন, 'প্রত্যেকে শুধু স্বয়ং অসম্পূর্ণ। ওই শূন্যস্থান স্ত্রী-দ্বারা পূর্ণ হয়।' তিনি (পরমব্রহ্ম) স্বীয় স্ত্রীসত্তায় মিথুনভাবে মিলিত হইলেন। ইহা হইতে মনুষ্য জাতির উৎপত্তি হইল।]

আমাদের বর্তমান প্রতর্কের দৃষ্টিতে ওই মন্ত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ 'দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ—অর্থাৎ 'দ্বিতীয় হইতে ইচ্ছা করিলেন'। 'দ্বিতীয়' অর্থে তিন/চার নয়। ফলে ওই মন্ত্রটি যৌথযৌনাচারের সমর্থনে কীভাবে প্রযুক্ত হতে পারে?

বরং বৃহদারণ্যকের ঠিক পরবর্তী মন্ত্রটি আমাদের যুক্তিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে, ডক্টর আনন্দ্ সমর্থিত যৌথ-যৌনাচারকে নয়। ঠিক পরবর্তী মন্ত্রে ঋষি বলছেন "সদ্যোজাতা সেই স্ত্রী-সত্তা অতঃপর চিন্তা করিলেন—আপনা হইতে আমাকে সৃষ্টি করিয়া ইনি (পরমব্রহ্ম) কী প্রকারে আমাকে উপগত হইতে চাহিতেছেন? (অর্থাৎ আমি তো ওঁর কন্যাস্থানীয়া)। আমি

তিরোহিত হই' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি একটি গাভীতে রূপান্তরিতা হইলেন। অতঃপর প্রজাপতি ব্রহ্মা বৃষরূপ ধারণ করিয়া ওই গাভীতে উপগত হইলেন। এইরূপে গো-জাতির সৃষ্টি হইল। তদনন্তর একজন অশ্বা হইলেন, অপরজন অশ্বরূপ ধারণ করিলেন। ফলে অশ্ব-প্রজাতির সৃষ্টি হইল।"[3]

এইভাবে বিভিন্ন প্রজাতির জীব সৃষ্ট হল।

লক্ষণীয়—বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—ওই মন্ত্রে প্রত্যেকটি স্ত্রী-লিঙ্গ শব্দ আছে একবচনে। গৌ, বড়বা,



চিত্র 10.6 বসন্তোৎসব/কনডেন গুহা

গর্দভী, অজা, অবিঃ প্রভৃতি। কোনটি দ্বিবচন বা বহুবচন নয়। অর্থাৎ জীব সৃষ্টি-মানসে প্রজাপতি ব্রহ্মা একই কালে একাধিক স্ত্রী-সংসর্গ করলেন এমন নির্দেশ উপনিষদের আলোচ্য অংশে আদৌ নাই।

কৃষ্ণতত্ত্বের দ্বৈতবাদেও এমন ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যায় না। এক 'পুরুষ' এবং একাধিক 'প্রকৃতির' কথা আছে, এক কৃষ্ণ এবং ষোড়শ গোপিনীর প্রসঙ্গও আছে। কিন্তু ওই অর্থে নয়। রাসলীলার শত শত চিত্র-ভাস্কর্য দেখেছি—এক কৃষ্ণ বহুরূপ ধারণ করেছেন, প্রত্যেকটি গোপিনী তাঁর বাঞ্ছিত কৃষ্ণকে পেয়েছেন। প্রত্যেকটি গোপিনীর হাত ধরে তাঁর মনোময় কৃষ্ণ কায়াময় হয়ে লীলা করছেন। কিন্তু কোথাও দেখিনি এক কৃষ্ণ একাধিক গোপিনীর সঙ্গে লীলা করছেন। সর্বত্রই 'একবর্ণ' শক্তিযোগে 'বহুধা' হয়েছেন, 'বর্ণাননেকান' রূপপরিগ্রহ করে পৃথক পৃথকভাবে প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *কৃষ্ণচরিত্রে* প্রাঞ্জলভাষায় সেই তত্ত্বটির অন্তর্নিহিত অর্থটি বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মনে পড়ছে মধ্যযুগের এক মহাভক্তা গীতভারতীর প্রসঙ্গে একটি প্রচলিত উপকথা। চিতোর মহিষী মীরাবাঈ-এর জীবনের এক খণ্ডকাহিনি :

মীরাবাঈ সে সময়ে চিতোরের রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে চলে এসেছেন ব্রজধামে। বৃন্দাবনের একান্তে তাঁর নির্জন কুটির। গিরিধারীলালকে ভজনগানে নিত্যসেবা করেন। হঠাৎ সংবাদ পেলেন ষড়গোস্বামীর পরমশ্রদ্ধেয় রূপ গোস্বামী এসেছেন বৃন্দাবনধামে। আনন্দিত মীরাবাঈ তাঁর নিকট এক সংবাদবাহককে প্রেরণ করে জানালেন যে, তিনি পরম বৈষ্ণবাচার্য রূপগোস্বামীকে কিছু ভজন গান শোনাতে ইচ্ছুক। রূপগোস্বামীর কোন্‌দিন অবকাশ হবে তা জানতে পারলে মীরাবাঈ স্বয়ং সেই গোস্বামীপাদের আশ্রমে তানপুরাসহ এসে উপস্থিত হবেন । এ সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়েন মহাসন্ন্যাসী। তিনি মীরাবাঈয়ের দূতকে বললেন, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত ভাই। আমি সন্ন্যাসী। ব্রহ্মচারী। আমার আশ্রমে তো নারীর প্রবেশাধিকার নাই! মীরা-মাকে আমার অসহায় অবস্থায় কথা জানিও। তাঁর ভজন শ্রবণের সৌভাগ্য আমার হবে না।'

এই বার্তাটি যখন সংবাদবহ মীরাবাঈকে জানালেন তখন প্রাক্তন চিতোর-মহিষী ম্লান হাসলেন। সংবাদবহ নিজেও একজন বৈষ্ণব আচার্য। তিনি বললেন, 'আপনি দুঃখ করবেন না, মা। গোস্বামীপাদ শ্রীরূপ সংসার ত্যাগ করেছেন, সেই সঙ্গে বঞ্চিত হয়েছেন আপনার অনবদ্য ভক্তিমূলক ভজন থেকেও। এ ভবিতব্য!'

মীরা সহাস্যে বলেছিলেন, সেজন্য আমি দুঃখিত হইনি ভাই। আমি শুধু ভাবছি, এটা কেমন করে সম্ভব? গোস্বামীপাদ শ্রীরূপাচার্য—যিনি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ শিষ্য—তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রের এই সহজ-সরল সূত্রটি সম্বন্ধে অনবহিত!

—কী সূত্র মা-জননী?

—যে, এই ব্রজভূমের কেন্দ্রবিন্দুতে, শ্রীবৃন্দাবনধামে, মাত্র একজনই 'পুরুষ' আছেন, আর সব 'প্রকৃতি'। ষড়গোস্বামীর মধ্যমণি শ্রীরূপ-সমেত! একমাত্র পুরুষ '—মেরে গিরিধারীলাল—দুসরো ন কোই!'

মীরাবাঈয়ের এই কথাটি লোক-পরম্পরায় পরদিনই পৌঁছালো মহাচার্য শ্রীরূপের কর্ণমূলে। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি নগ্নপদে এসে উপস্থিত হলেন মীরাবাঈয়ের আশ্রমে। মীরা তখন আপনভোলা। ভজনগানে নন্দলালাকে বলছেন, 'ম্যায়নে চাকর রাখ জী!'

শ্রীরূপ গোস্বামী আশ্রমদ্বারে উপনীত হতেই সঙ্গীত শ্রোতাদের মধ্যে জাগল চাঞ্চল্য। 'মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল পতঙ্গের মতো।' মীরাবাঈ গান থামিয়ে মুদ্রিত নয়ন উন্মোচন করে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর সম্মুখে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান বৈষ্ণবাচার্য অশীতিপর বৃদ্ধ আচার্য শ্রীরূপ। মীরা তানপুরা নামিয়ে সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়াতেই বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য বলে ওঠেন, "মা রে! তোর এই বোকা *'মেয়েটাকে'* ক্ষমা করে দে! সে নিজেই চলে এসেছে তোর আশ্রমে—মায়ের ভজন শুনতে!"

এই যখন ভারতীয় সংস্কৃতির ট্র্যাডিশন, তখন মুল্‌ক্‌রাজের মতো পণ্ডিতের শাস্ত্রব্যাখ্যা আমরা মানতে পারি না। মুল্‌ক্‌রাজ-এর উপনিষদের মন্ত্র ব্যাখ্যা নয়, আমাদের মনে পড়ে যায় ডগ্‌লাস্‌ ব্যারেটের মূল্যায়ন :

> Only rulers who maintained large *harems*, as *junglees* did, could enjoy the company of so many lovely girls simultaneously in sexual orgies, and it is only in Bundelkhand (Khajuraho) and Orissa (Konark) that one will normally meet anything more than a couple in a *mithuna*.[4]

10. যৌথ যৌনাচার :

তবুও ডক্টর আনন্দ্‌ যুক্তি দেখান :

> "The ethics of the medievial period did not forbid the princes to indulge in love-making with two or more women *at the same time*.
>
> [রাজন্যবর্গের এই *একই কালে* (একসঙ্গে) দুইটি বা তদোধিক রমণীর সঙ্গে কামকেলিতে রত হওয়ার বিরুদ্ধে মধ্যযুগে কোন সামাজিক নীতিবোধের প্রতিবন্ধকতা ছিল না।]

ঔপনিষদিক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় যখন হালে পানি পাওয়া যাচ্ছে না তখন সে-কালীন সমাজনৈতিক যুক্তি আরোপ করলেন পণ্ডিতজী—'এটা এমন এক যুগের শিল্প যখন সমাজ পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ অনুমোদন করত।'

আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। আজ্ঞে হ্যাঁ, মধ্যযুগে পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ শাস্ত্রীয় ও সামাজিক অনুমোদন লাভ করেছিল। রাজা-রাজড়ার দল গণ্ডায়-গণ্ডায় কুমারী কন্যাদের পাণিপীড়ন করতেন। সেইসব বিবাহ-বিশারদ রাজন্যবর্গের অন্তরালের জীবন সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি? একই ছাদের নিচে যখন তাঁরা একাধিক সহধর্মিণীসহ বাস করতেন তখন কি রাজা একাধিক মহিষীকে নিয়ে একই শয্যায় শয়ন করতেন না? এ জাতীয় দাম্পত্যজীবন যদি সমকালীন শাস্ত্রীয় ও সামাজিক অনুমোদন লাভ করে থাকে, তাহলে আপনি-আমি তাতে



চিত্র 10.7 কাণ্ডরীয় মহাদেও দেউলে যৌথযৌনাচার প্যানেল/খাজুরাহো

আপত্তি করি কোন অধিকারে? আর একই পালঙ্কে যদি দুই-তিন রানীকে নিয়ে রাজামশাই রাত্রিযাপন করেন, তাহলে মধ্যরাত্রে যখন তিনি জনৈকা ভাগ্যবতী মহিষীকে উপভোগ করেন তখন অপরা মহিষীর দল তো বাধ্য হয়েই 'দর্শনকামিনী' হয়ে পড়তেন। যদি তাঁদের মধ্যে কেউ সে কার্যে অংশভাক্‌ হয়েও পড়েন—যাকে ডক্টর আনন্দ্‌ বলেছেন 'dramatically posed in active involvement' (নাটকীয়ভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণে যোগদান

করেন) তাতেই বা আমাদেব আপত্তি করার কী হেতু? এমনটা তো হতেই পারে।

কিন্তু না, একটা বিরাট প্রশ্নের সমাধান এখনো হয়নি। এটা যদি মধ্যযুগে বহুপত্নিকের স্বাভাবিক আচরণ হতো, তাহলে তাব বর্ণনা আমবা মধ্যযুগীয় কাব্যে পাই না কেন? অস্বীকার কবা চলে না যে, মধ্যযুগীয় কবি ও নাট্যকারেরা ছিলেন চরম স্পষ্টবক্তা—আজকেব দিনের লরেন্স, মোরাভিয়া অথবা হ্যারল্ড রবিন্সকেও তাঁরা হার মানিয়েছেন স্পষ্টভাষণে। নরনারীর মিলন-বর্ণনা কালে। কিন্তু কই কোথাও তো আমবা পাই না তার বর্ণনা—কোনো পুরুষ নাযক একই কালে একাধিক নাবী-সঙ্গমে নিবত?



চিত্র 10.8 যৌথ যৌনাচার, উগ্রতাবর্জিত/কাণ্ডারীয় মহাদেও, খাজুরাহো

বাধ্য হয়ে আমাদের শরণ নিতে হচ্ছে এ বিষয়ের 'অথরিটি'র কাছে : ঋষি বাৎস্যায়ন। *কামসূত্রে* বহুপত্নিক রাজাকে ঋষি স্পষ্টাক্ষরে বলছেন :

"বাসকপাল্যোস্তু যস্যাবাসক যস্মশ্চরিতে।"[5]

[হে রাজন! তোমার রানীদের জন্য তুমি পৃথক পৃথক রজনীর ব্যবস্থা করবে। প্রত্যেকে যেন তার প্রাপ্য বাসক (পালা) লাভ করে। তুমি সেরাত্রে শুধুমাত্র তাকে নিয়েই শয়ন করবে।]

পরবর্তী শ্লোকেই বাৎস্যায়ন নির্দেশ দিচ্ছেন "প্রতিদিন প্রাতরাশ গ্রহণ কালে তুমি নির্বাচন করবে কোন্ রানী তোমার শয্যাসঙ্গিনী হবেন। প্রাতঃকালেই অপর মহিষীদের উপস্থিতিতে তুমি সেই নির্বাচিতাকে তোমার অঙ্গুরীয়টি প্রদান করবে, যাতে সকলেই সেকথা জ্ঞাত হয় এবং নির্বাচিতা মহিষী আত্মপ্রস্তুতির জন্য সমস্তটা দিন সময় পায়।"

এই অনুচ্ছেদেব শেষাংশে ঋষি বাৎস্যায়নের প্রজ্ঞা এবং নিরপেক্ষতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য—"হে রাজন! যাতে তোমার প্রত্যেকটি রানী সমব্যবধানে তার 'বাসক' (পালা) লাভ করে সে বিষয়ে তুমি সচেতন থাকবে। তাদের রূপ, যৌবন, বয়স প্রভৃতি যেন এই নির্বাচনে পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে পড়ে।"

ঋষি বাৎস্যায়নের এই নির্দেশেই আমাদের উত্থাপিত প্রশ্নের মীমাংসা নিহিত। অর্থাৎ কেন আমরা ওজাতীয় বর্ণনা সমকালীন সাহিত্যে পাই না।

* * *

কিন্তু এখানেই তো নাটকের যবনিকাপাত ঘটছে না। পরবর্তী অঙ্কে যে আছে আরও অদ্ভুত কম্পোজিশন—একপুরুষ ও একাধিক রমণী নয়, এক নারী এবং একাধিক পুরুষ!

এমন বিচিত্র ভাস্কর্যও তো ছড়িয়ে আছে সমগ্র ভারতে। যদিও তার আধিক্য দেখা যাচ্ছে খাজুরাহোতে এবং কোনার্কে! দশম ও একাদশ শতাব্দীতে।

এ জাতীয় কম্পোজিশনের সপক্ষে *মার্গ*-সম্পাদক লিখেছেন :

"The property relations of medieval period were different and our dominantly monogamous age cannot understand the psychology of involvement of more than one female in the private life without a shock. Polygamous and *polyandrous* societies took different views.[6]

[মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থায় অধিকারভেদের ছিল ভিন্নতর আয়োজন। আমাদের সমাজে একান্তভাবে একপত্নিকের ব্যবস্থা। তাই আমরা ওদের মনস্তত্ত্বটা ঠিক মতো সমঝে নিতে পারি না। ওদের আচরণে চমকিত হয়ে পড়ি। সে-কালীন বহুপত্নিক পুরুষ এবং *বহুবল্লভা* নারী বিষয়টাকে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতো (বিশেষভাবে চিহ্নিত শব্দটি আমাদের কাজ)]

ওই একটিমাত্র শব্দের ব্যবহারে আমরা অত্যন্ত বিচলিত বোধ করি — polyandrous (বহুবল্লভা)। রাম-শ্যাম-যদু না জানতে পারে কিন্তু পদ্মভূষণ পণ্ডিত

মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্‌ কি জানতেন না যে, ভারতীয় সমাজে এক নারীর পক্ষে একই সময়ে একাধিক পুরুষের সঙ্গে রতিকার্য একটা অসম্ভব প্রস্তাব? অবাস্তব কথা! ভারতের কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে, কোন যুগে এর অনুমোদন ছিল না। না শাস্ত্রীয়, না সামাজিক! একই কালে তো দূরের কথা, 'এক জীবনেও' তার অনুমোদন নাই—নারীর পক্ষে। যতদিন না বিদ্যাসাগর-মশায়ের প্রচেষ্টায় 'বিধবা-বিবাহ' আইনত সিদ্ধ হল! সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে একমাত্র ব্যতিক্রম মহাভারতের দ্রৌপদী। সেটা কেন শাস্ত্রীয় অনুমোদন পেয়েছিল তার ব্যাখ্যা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সবিস্তারে জানিয়েছেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও দ্রৌপদী এক রাত্রে একাধিক পাণ্ডবপতির শয্যায় শয়ন করতেন না। বস্তুত দ্রৌপদী যখন একান্তে একজন ভ্রাতার সঙ্গে গৃহাভ্যন্তরে বিশ্রামরতা তখন অন্য কোন ভ্রাতার পক্ষে সেকক্ষে প্রবেশাধিকার ছিল না। নিতান্ত প্রয়োজনে অর্জুন একবার এ নিয়ম লঙ্ঘন করায় তাঁকে কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল।

এই যখন ভারতীয় সংস্কৃতির নির্দেশ তখন মুলক্‌রাজ কোন বিচারে polyandrous শব্দটি ব্যবহার করলেন?

এখানেও প্রহসনটি সমাপ্ত হচ্ছে না কিন্তু।

ডক্টর কোন বিচারে ধরে নিলেন ভাস্কর্যে দৃষ্ট পুরুষটি তাঁর বৈধ স্ত্রীদলের সঙ্গে কামকেলিতে রত? অথবা polyandrous সমাজের কোন রমণী তার একাধিক স্বামীর সঙ্গে যৌনাচারে লিপ্ত? ডক্টর আনন্দ্‌ কি এটুকুও প্রণিধান করতে পারলেন না যে, ভাস্কর্যে দৃষ্ট রমণীগণ ওই প্যানেলে খোদিত কোন পুরুষের 'স্ত্রী' নয়, এবং কোন পুরুষ ভাস্কর্যে দৃষ্ট কোন রমণীর 'স্বামী' নয়? ওরা তো সকলেই রাজার উপপত্নী!

বহুবল্লভা নারীর প্রসঙ্গও আলোচনা করেছেন বাৎস্যায়ন। বলছেন :

'গ্রাম নারীবিষয়ে স্ত্রীরাজ্যে চ বহ্লীকে বহবো যুবানস্তেঃ পুরসম্মনে একৈকস্যাঃ পরিগ্রহভূতাঃ। তেষামেবৈকশা যুগপচ্চ যথাসত্মাং যথাযোগ্যঞ্চ রঞ্জয়েয়ু।[7]

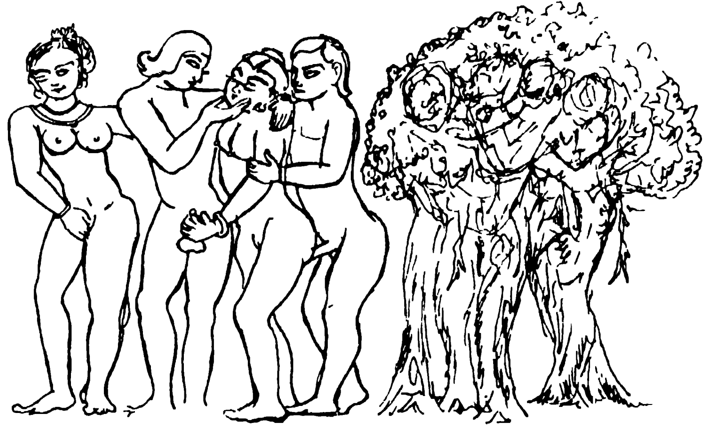
অর্থাৎ স্ত্রীরাজ্যের নিকটবর্তী গ্রামনারী দেশে, স্ত্রীরাজ্যে এবং বহ্লীকদেশে নারীগণের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। ওইসব অঞ্চলে রমণীগণ অত্যন্ত কামাতুরা। এক পুরুষের সহিত কামক্রীড়ায় ইহাদের রতিতৃপ্তি হয় না। ইহারা নিজেদের রক্ষিত পুরুষদিগের সহিত পর্যায়ক্রমে অথবা যুগপৎ কামকেলিতে রত হয়।

এই শ্লোকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'যুগপচ্চ' শব্দটি মারাত্মক। সেটি যে প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্তীকালের সংযোজন নয় তা বোঝা যায় পরবর্তী শ্লোকে :

একো ধরয়েদনামনো নিষেবত। অন্যো জঘনং মুখত্রন্যো, ইতি বারংবারেণ ব্যতিকরণ চানুতিষ্ঠযুঃ।।

অনুবাদ আর নাই করলাম।

কিন্তু সেই সীমিত ভৌগোলিক অঞ্চলের ওই ব্যতিক্রম ব্যবহারে যে বাৎস্যায়নের সাধারণ অনুমোদন নেই সে-কথা পরবর্তী শ্লোকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। পরবর্তী শ্লোকে বাৎস্যায়ন বলেছেন, "যদি কয়েকজন পুরুষ একত্র হয়ে অর্থমূল্যে কোন বারবনিতাকে একই সঙ্গে যৌথভাবে উপভোগ করে অথবা একাধিক অত্যধিক কামাতুরা নারী একই সঙ্গে একাধিক পুরুষের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তাহলে এই 'চিত্ররথ' ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।



চিত্র 10.9 উচ্চতম স্তরের চারজনের যৌথ-যৌনাচার

চিত্ররথ একটি ব্যতিক্রম যৌনাচার। একটা সাধারণ বাঙলা গালাগালে 'বেল্লিক' শব্দটি কি 'বহ্লীক' শব্দ থেকে এসেছে? অথচ ডক্টর আনন্দ্‌ তাঁর খাজুরাহো সংক্রান্ত গবেষণা প্রসঙ্গে লিখছেন :

"These erotic sculptures in medieval temples did not spring up suddenly through the perversity of some local Raja....but as discussed by Vatsyayana...."

যৌথ-যৌনাচারের বীভৎস পরিকল্পনা যে হঠাৎই

খাজুরাহো শিল্পে গজিয়ে উঠেছিল এটা ঐতিহাসিক তথ্য—অস্বীকার করার উপায় নেই। তাহলে তার সম্ভাব্য উৎসমূল যে স্থানীয় রাজার যৌন বিকৃতি এটাই বা অস্বীকার করি কী করে? রাজ-নির্দেশেই তো মন্দিরে স্থাপত্যের রূপারোপ হতো! আর ওটা কী যুক্তি : 'as discussed by Vatsyayana' (বাৎস্যায়ন যে বিষয়ে আলোচনা করেছেন)!' তাহলে তো কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীও বলতে পারে, 'ধর্মাবতার; আমি নতুনটা কী করেছি? 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড'-এ তো কর্তাব্যক্তিরা এসব কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন —'খুন, ডাকাতি, বলাৎকার'। করেননি, হুজর?

প্রশ্নটা তা নয়। ভারতীয় দণ্ডবিধি গ্রন্থে ওই সব অপরাধের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু তা কি অনুমোদিত হয়েছে? ঠিক তেমনি আমরা বলব বাৎস্যায়ন 'চিত্ররথ'-এর আলোচনা করেছেন বটে, কিন্তু তা কি অনুমোদন করেছেন?

* * *

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি মিথুনাচার কয়েক শতাব্দী ধরে সমগ্র ভারতে অতি ধীরে ধীরে যৌন উগ্রতার দিকে অগ্রসর হয়েছিল, যুগলমূর্তি থেকে উত্তেজিত, শৃঙ্গাররত মিথুনের ধাপ পাড়ি দিয়ে মৈথুনরত-মিথুনের পথে। যৌথ যৌনাচারও অতি অল্প সময়ে সেই পথে পা বাড়িয়েছিল—বিবর্তনের পথে নয়, বৈপ্লবিক বিস্ফোরণে। যোগরূঢ় অর্থে 'যৌথ-যৌনাচার'-এর এই বিস্ফোরণ ঘটে খাজুরাহোর সীমিত ভূখণ্ডে। ব্যাপক-অর্থে যৌথ-যৌনাচার—অর্থাৎ একই প্যানেলে দুই-এর অধিক পুরুষ-নারীর রতিরঙ্গাশ্রিত অবস্থান কিন্তু অতি প্রাচীন যুগ থেকেই বর্তমান; কিন্তু তাদের কোন যৌনতার বাড়াবাড়ি ছিল না। সেটা ঘটল খাজুরাহোতে।

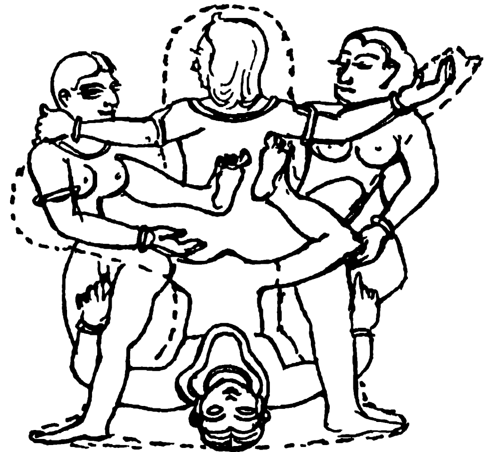
উদাহরণ হিসাবে একটি প্যানেল উপস্থাপিত করা গেল (চিত্র 10.6)। এটি কনডেন-গুহবিহার থেকে। বৌদ্ধচৈত্য। আরব সাগরের লবণাক্ত ঝড়ো হাওয়া প্রায় দুই হাজার বছর ধরে ওদের পেলবতাকে অবলুপ্ত করেছে। আমরা কল্পনার আশ্রয় নিয়ে এই তিনটি মূর্তির আদিমরূপ অঙ্কিত করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

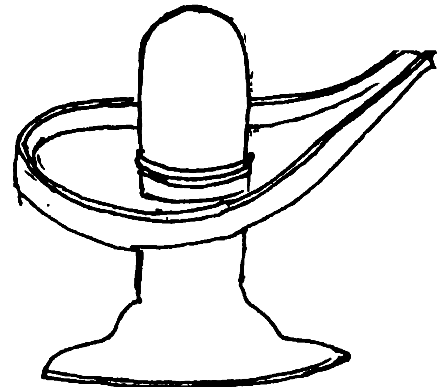
শিল্প-উদাহরণে তিনটি চরিত্র—দুটি তরুণী এবং মাঝখানে একটি ফুলধনুধারী তরুণ। তারা পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত। এটি বসন্তোৎসবের দৃশ্য। বত্তিচেলির ভাষায় Primavera. ছেলেটি একজনের গালে হাত দিয়ে আদর করছে। অপরা তরুণী যুবকের ফুলধনুটি ধরেছে। এ আনন্দ উৎসবে যৌনতার কোন স্থান নেই। তবু ব্যাপক-অর্থে এটি যৌথ-যৌনাচার শুধুমাত্র সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে।

এ জাতীয় পরিকল্পনা বহু মন্দির-ভাস্কর্যে দেখা যায়—বৌদ্ধ চৈত্য-বিহারেও। ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মন্দিরে। প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে।

তারপর বিশেষ অর্থে যে যৌথযৌনাচার তা আবির্ভূত হল মধ্য ভারতে চাণ্ডিল্যরাজ্যে—খাজুরাহোতে। কেন এমনটা হল তা আমরা খাজুরাহো পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচনা করব। এখানে বরং দেখা যাক কীরূপে, কী পরিকল্পনায় তারা আবির্ভূত হল।

খাজুরাহোতেও দেখা যাচ্ছে প্রথম যুগে তারা উগ্র-যৌনতামণ্ডিত নয়। শিল্পে একটা সুষমা, একটা





চিত্র 10.10 নিম্নতম স্তরের তিন নারী ও এক নরের যৌথ-যৌনাচার/খাজুরাহো

সৌন্দর্যবোধ আছে। প্রথম যুগে এই যৌথ-যৌনাচারের পরিকল্পনা বিচিত্রিত হয় উত্তর ও দক্ষিণের দীর্ঘ বিস্তারের কেন্দ্রস্থলে—যাকে আমরা চিত্র 11.1-এ 'A'-চিহ্নিত করে দেখিয়েছি। লক্ষ্মণ দেউলে (যশোবর্মনের আমল, আঃ 930-935) আছে তিনটি স্তর। উপরে দেবমূর্তি। মাঝে ও নিচের প্যানেলে একাধিক পুরুষরমণীর কেলি—কিন্তু যৌনতা বর্জিত। তার পরবর্তী শতাব্দীতে ধঙ্গের আমলে বিশ্বনাথ দেউলে তিনটি স্তরের মধ্যে উপরের দুইটি স্তরেই এসেছে যৌথযৌনাচার দৃশ্য আরও অধিক যৌনতামণ্ডিত হয়ে। আর তার পরবর্তী শতাব্দীতে—চিত্রগুপ্ত, দেবী জগদম্বা মন্দিরে— তা আরও উগ্র আকার ধারণ করেছে। কাণ্ডারীয় মহাদেও মন্দিরে তিনটি স্তরেই ন্যক্কারজনক যৌথযৌনাচার (চিত্র 10.7)।

কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ওই আপাত-ন্যক্কারজনক যৌথযৌনচারে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে কিছু শিল্প রসবোধ। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে রাজাদেশে শিল্পীরা



চিত্র 10.11 মিথুনরত দম্পতির উপস্থিতিতে তৃতীয় নারী

এ-জাতীয় অশ্লীল মূর্তি গড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, তবু কিন্তু তাঁরা তাঁদের শিল্পবোধকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেননি।

উদাহরণ কাণ্ডারীয় মহাদেও মন্দিরের দক্ষিণ প্রান্তের একটি প্যানেল (চিত্র 10.8)। এখানে দুটি পুরুষ এবং দুটি রমণী বর্তমান। লক্ষ্য করলে মনে হবে কেন্দ্রীয় নায়িকা ভয়ত্রস্তা—সে যেন কোন কিছু দেখে ভয় পেয়ে সবলে তার দয়িতকে জড়িয়ে ধরেছে। প্যানেলের দুইপ্রান্তে অবস্থিত নর ও নারী কিন্তু কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেনি। অথচ ওই মেয়েটির ভঙ্গিমায় যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে মেঘদূতের সেই অনবদ্য শ্লোকটি .

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংস্বিদিত্যুন্মুখীভিঃ।
দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।।[8]

বজ্রবিদ্যুতের বিক্রম দেখে সিদ্ধাঙ্গনা ভয় পেয়েছে—পবনবেগে বুঝি এবার পাহাড়কেই উরিয়ে নেবে।

কোনার্কের অর্ধশত যৌথ-যৌনাচারে কিন্তু এ জাতীয় শিল্পীমানসের স্বাক্ষর খুঁজে পাই না।

এবার পাঠকের দৃষ্টি চিত্র10.7-এর সর্বোচ্চস্তরের মূর্তি চতুষ্টয়ের দিকে আকর্ষণ করব। বামপ্রান্তের স্ত্রীলোক মনে হয় স্বয়ংমৈথুনে প্রবৃত্তা। দক্ষিণতম পুরুষটি পায়ুমৈথুনরত। তার সম্মুখস্থ রমণী তার সঙ্গীর হস্তমৈথুনরত। স্বীকার্য এই মূর্তিগুলিতে ভাস্করের দক্ষতা আছে। মূর্তিগুলি রূপভেদ ও প্রমাণে ব্যর্থ নয়। কিন্তু শিল্পী কি একটি সাদৃশ্যের রূপারোপে চেষ্টিত হয়েছেন? সমস্ত পরিকল্পনাটি কি একটি ঝুরিনামা বটবৃক্ষের প্রতীক? বটগাছের ঝুড়ি মাটিতে নেমে শিকড় গাড়ে। কালে এমন অবস্থা হয় যে, প্রণিধান করা যায় না কোন্‌টি মূলকাণ্ড! এখানেও কি চারজন নরনারী সেভাবে স্বীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে হয়ে উঠেছে মদনানন্দের এক মহাপাদপ (চিত্র 10.9)?

ওই চিত্রের (চিত্র 10.7) সর্বনিম্ন স্তরে যে যৌথ-যৌনাচারের পরিকল্পনা সেটি অবাস্তব শ্রেণিভুক্ত হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় পুরুষটি শীর্ষাসনে যুগপৎ তিনটি রমণীর সঙ্গে যৌনকর্মরত। কিন্তু এক্ষেত্রেও কি শিল্পী তির্যকভাবে একটি সাদৃশ্যের উপস্থাপনা করেছেন শিবলিঙ্গের (চিত্র 10.10)?

গৌরীপট্টবিধৃত *শিবলিঙ্গ*-কে আমরা বারে বারে পুরুষের লিঙ্গ চিহ্ন বলে উল্লেখ করেছি। সেটি সাধারণের ধারণা অনুসারে। এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। সেটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা কর্তব্য। ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরে 1900 খ্রিস্টাব্দে

'Congress of the History of Religions' নামে একটি মহতী সভা আহূত হয়েছিল। সারা বিশ্বের ধর্মপ্রচারকরা সেখানে সমবেত হয়ে বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে

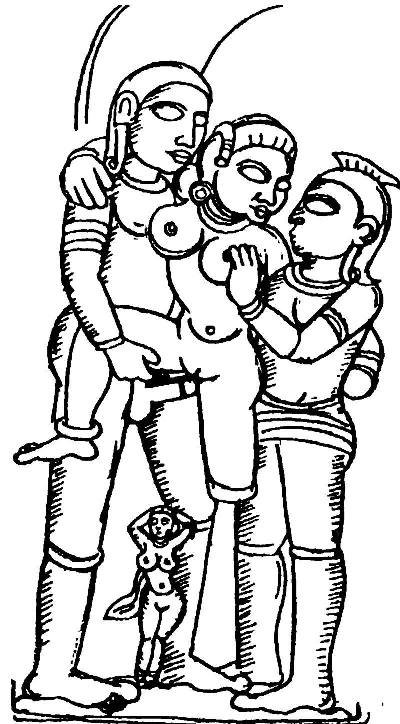


চিত্র 10.12 দুইটি রমণী ও একটি পুরুষ/কোনার্ক

তাঁদের বক্তব্য রাখেন। সেই সভার বিবরণী থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি শোনাই। অনুবাদে বর্তমান লেখকের ভ্রান্তি হয়েছে এই আশঙ্কা দূরীভূত করতে আমরা মূল উদ্ধৃতিটি প্রামাণিক বিবরণী থেকে সংযোজিত করলাম :

> At the Congress Mr. Gustav Oppert, a German Pandit, read a paper on the origin of the *Shalagram-Shila.* He traced the origin of the Shalagram worship to that of the emblem of the female generative principle. According to him, the *Shiva-Linga* is the phallic emblem of the male, and the *Shalagrama* of the female generative principle. And thus he wanted to establish that the worship of the *Shiva-Linga* and that of the *Shalagrama*—both are but the component parts of the worship of Linga and Yoni. The Swami repudiated the above two views and said that though he had heard such ridiculous explanations about the *Shiva-Linga,* the other theory of the *Shalagrama-Shila* was quite new and strange, and seemed groundless to him.[9]

[সেই মহতী সভায় মিস্টার গুস্তভ ওপার্ট নামে এক জার্মান পণ্ডিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শালগ্রাম শিলার উৎস বিষয়ে। তিনি শালগ্রামশিলা উপাসনার আদিম সূত্র আবিষ্কার করে প্রতিষ্ঠা করতে চান যে, সেটি প্রকৃতি-প্রতীক একটি ধারণা। তাঁর মতে, শিবলিঙ্গ হচ্ছে পুংজননেন্দ্রিয়ের প্রতীক এবং শালগ্রাম স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, শিবলিঙ্গ ও শালগ্রামশিলার উপাসনা বাস্তবে লিঙ্গ-যোনি পূজার উপচার মাত্র। স্বামীজি উপর্যুক্ত দুটি মতই খণ্ডন করে বলেন যে, ইতিপূর্বে তিনি শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে এমন হাস্যকর বিশ্লেষণ শুনেছেন বটে, তবে শালগ্রামশিলা সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটি সম্পূর্ণ নূতন শুনলেন। এটি অদ্ভুত ধারণা এবং তাঁর মতে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।]



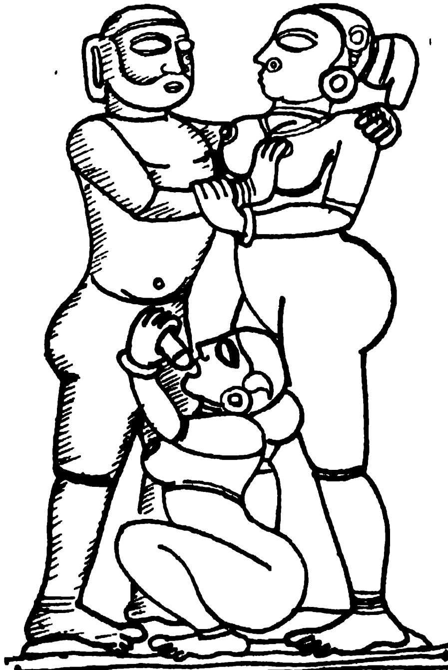
চিত্র 10.13 দুইটি পুরুষ ও এক রমণী/কোনার্ক

স্বামীজি তারপর শিবলিঙ্গ এবং শালগ্রাম শিলা পূজার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং উৎপত্তির বিষয়ে বিষদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা হয়তো আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে অপ্রাসঙ্গিক।

আমরা উপবে যে দুটি সাদৃশ্যের কথা বলেছি তা আমাদের উদ্ভট চিন্তাধারা প্রসূত বলে যদি মনে করেন তাহলে আমরা প্রতিবাদ করব না। এ আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে।

কিন্তু তাই বলে আমরা *মার্গ* পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে আদৌ একমত নই। এই শীর্ষাসনে সঙ্গমরত পুরুষটির কীর্তিকে আমরা কোনমতেই মেনে নিতে পারি না "Sexual enjoyments of healthy nature" (স্বাস্থ্যকর যৌনানন্দ গ্রহণকারী) অপরপক্ষে আমরা বিরুদ্ধ মতাবলম্বী লীসনের সঙ্গেও একমত হতে নারাজ। লীসন ওই প্যানেলটির বর্ণনায় লিখেছেন :

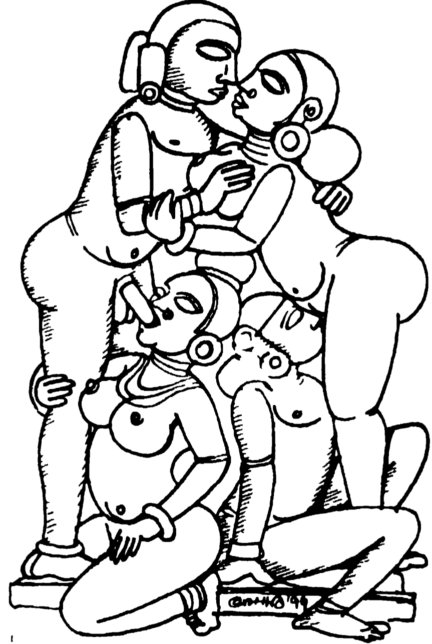
> An acrobatic sexual posture in which three women and a man are participating. A large number of such postures have been described in the *Kamasutra* and similar texts, but it is doubtful whether they were ever practiced in real life."[10]



চিত্র 10.14 দুই রমণী এক পুরুষ, মুখমেহন/কোনার্ক

লীসনের দুটি মন্তব্যেই আমাদের আপত্তি।

প্রথমত, *কামসূত্র* অথবা মধ্যযুগীয় কোন কামসূত্রীয় গ্রন্থে কোন লেখকই এমন অদ্ভুত আসনের কথা লিপিবদ্ধ



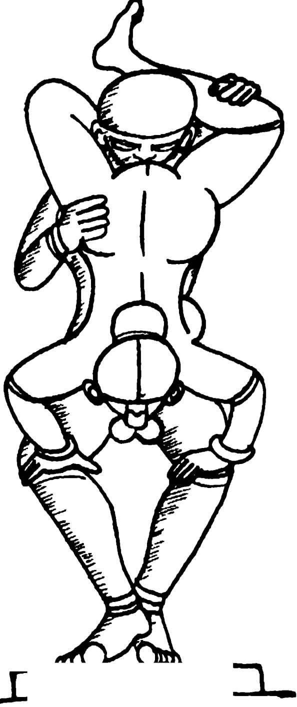
চিত্র 10.15 যৌথ যৌনাচার, দুই পুরুষ দুই রমণী/কোনার্ক

করেননি : শীর্ষাসনে জনৈক পুরুষ তিনজন রমণীর সঙ্গে কামক্রীড়ারত। বাৎস্যায়ন শীর্ষাসনে সঙ্গমের কথা বলেননি বটে তবে 'চিত্ররথ' ব্যতিক্রমের কথা বলেছেন। দ্বিতীয়ত বাস্তবে এমন শীর্ষাসন-সঙ্গম সম্ভবপর কি না এ প্রশ্ন তোলাও হাস্যকর। এ যেন একটি গণেশমূর্তির সমালোচনা করে ফুটনোট দাখিল করা . বাস্তবে মনুষ্যদেহে এমন হস্তিমুণ্ড থাকতে পারে কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। গ্রীক শৈলীর 'প্যান'কে দেখে কি লীসন-সাহেবের মনে সন্দেহ জাগে যে, অমন অর্ধমানব-অর্ধঅজ জীব বাস্তবে হয়?

এটা দুঃখের কথা পূর্বাচার্যরা এইসব যৌথযৌনাচারের মূর্তিগুলিতে শুধু তার শাস্ত্রীয় অনুমোদন এবং বাস্তবতাকে খুঁজেছেন। লীসন ভ্রমক্রমে বলেছেন বাৎস্যায়নের এ বিষয়ে অনুমোদন আছে। যদিও বাস্তবে এ জাতীয় সঙ্গম সম্ভবপর নয়। ওদিকে ডক্টর আনন্দ্ উপনিষদ হাৎড়ে সমর্থন খুঁজেছেন—না পেলে মধ্যযুগীয় polygamous

এবং polyandrous সমাজ ব্যবস্থায় খুঁজেছেন। শিল্পের মূল্যায়ন করেননি।

কোনার্ক ওই খাজুরাহো শিল্পশৈলী থেকেই যৌথযৌনাচার মূর্তিগুলি গ্রহণ করেছিল বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনার্কে তাদের একটি



চিত্র 10.16 অবাস্তব কাকালি/কোনার্ক

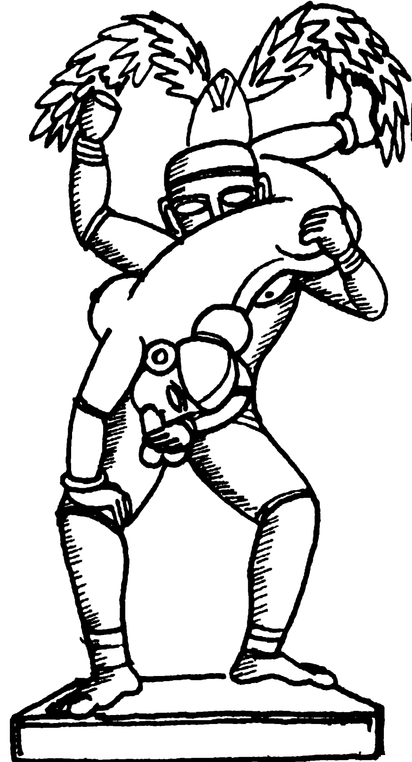
প্যানেলও রসোত্তীর্ণ হয়নি। কয়েকটি ধারার উদাহরণ এখানে পেশ করা গেল।

কোনো কোনো পরিকল্পনায় সঙ্গমরত মিথুনের সঙ্গে একটি বামনাকার নারীমূর্তি উপস্থাপিত করা হয়েছে। কেন তা বলা যাচ্ছে না। চিত্র 10.11-তে একটি মিলনরত দণ্ডায়মান দম্পতিকে দেখা যাচ্ছে। পুরুষটি তার স্ত্রীকে পশ্চাদ্দেশ থেকে উপভোগ করছে। স্ত্রীর দক্ষিণপদতলে আর একটি নারী। মনে হয় সে ওদের শিশুসন্তান। স্ত্রী তাকে হাত ধরে শয়নগৃহের বাহিরে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা— তুলনামূলকভাবে সন্তানটি বামনাকৃতি হওয়া সত্ত্বেও সে যেন পূর্ণযৌবনা। হয় রূপভেদে ভ্রান্তি হয়েছে, অথবা আমাদের অনুমান সঠিক নয়—শিল্পী অন্য কিছু বলতে চান। সঙ্গমদৃশ্যের বিপরীতমুখী বামনাকৃতি নগ্ন পূর্ণযৌবনা নারীর ব্যঞ্জনা অন্য কিছু।

চিত্র 10.12-তে সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রেও দুজন দণ্ডায়মান সঙ্গমরত পুরুষ-নারী। আর তাদের মাঝখানে বসে আছে আর একটি বামনাকার পূর্ণযৌবনা নারী। সে যদিও বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়েছে তবু তর্জনী সঙ্কেতে পুরুষের অণ্ডকোষটি নির্দেশ করছে।

পরবর্তী উদাহরণটি আরও দুর্জ্ঞেয়। এখানে দুটি পুরুষ এবং দুজন নারী। কেন্দ্রীয় নায়িকা যুগপৎ দুজন পুরুষের সঙ্গে কামক্রীড়ারত। এখানেও পায়ের কাছে গড়া হয়েছে একটি 'মিনিয়েচার' পূর্ণযৌবনাকে—যে নাটকের অংশীদার আদৌ নয়। সম্পূর্ণ নির্বিকার (চিত্র 10.13)।

তারপর যে উদাহরণটি দাখিল করা গেল (চিত্র 10.14) সেখানে বামনাকৃতি রমণী অনুপস্থিত। এখানে পুরুষ যুগপৎ দুটি রমণীর সঙ্গে কামক্রীড়ারত। অশ্লীলতা বা কদর্যতা ব্যতীত এখানে কোন শৈল্পিক সার্থকতা নজরেই পড়ে না।



চিত্র 10.17 অবাস্তব কাকালি/কোনার্ক

আরও কদর্য এবং অশ্লীল তার পরবর্তী উদাহরণটি (চিত্র 10.15)। দুটি পুরুষ এবং দুটি নারী। যৌনতা ও অশ্লীলতা ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না এই প্যানেলটি থেকে।

* * *

10. অবাস্তব মিথুন

এগুলিকেও দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম এ-জাতের মিথুন বাস্তবে সম্ভবপর নয়। যেমন গণেশমূর্তি, যেমন চিত্র 10.10-এর শীর্ষাসনে সঙ্গমরত পুরুষটি। কোনার্ক থেকে দুটি দণ্ডায়মান 'কাকালি' (যুগপৎ মুখমেহন) মূর্তি এখানে সন্নিবেশিত হল। কোনটিই বাস্তবে সম্ভবপর নয়। অনুমান করি, স্থপতিবিদ এমন প্যানেল ভাস্করকে শিল্পভূমি হিসাবে নির্দেশ করেছেন যেটি প্রস্থে স্বল্প উচ্চতায় সমধিক, এবং রাজাদেশ ছিল সেখানে যুগপৎ মুখমেহন বিচিত্রিত করা। তাই এই দুটি প্যানেল গড়তে বাধ্য হয়েছে ভাস্কর।

দ্বিতীয় জাতের অস্বাভাবিকতা হচ্ছে—যৌনাঙ্গের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। এ জাতীয় পরিকল্পনা ভারতীয় ভাস্কর্যে অতি অল্প। খাজুরাহো অথবা কলিঙ্গে আমাদের একটিও নজরে পড়েনি। বস্তুত সারা ভারতে আমরা একটি মাত্র উদাহরণ খুঁজে পেয়েছি। হয়তা অন্যত্রও তা আছে—তবু নিতান্ত ব্যতিক্রম হিসাবে।

আমরা এখানে আমাদের সেই দুর্লভ ভাস্কর্যের একটি আলোকচিত্র দিলাম (চিত্র 10.18)। আমরা অন্যত্র সামান্য কিছু পুরুষমূর্তি দেখেছি যারা সগর্বে তাদের লিঙ্গটিকে প্রদর্শন করছে। সেগুলি প্রদর্শনবাদীর প্রতীক। এখানে যে আলোকচিত্রটি সংযোজিত হল সেটি অবাস্তব পর্যায়ভুক্ত হওয়া উচিত। এই রকম অবাস্তব লিঙ্গ-সর্বস্ব পুরুষমূর্তি ভারতভূখণ্ডে আমরা দেখিনি, যদিও নেপল্স-এর ইরটিকা সংগ্রহশালায় তারা আছে যথেষ্ট পরিমাণে। সেখানে পুরুষটি গ্রীক দেবতা 'প্রায়াপাস'-এর প্রতিনিধি। জিয়ুস্-পুত্র 'প্রায়াপাসের' ছিল প্রকাণ্ড পুংলিঙ্গ এবং সদাউত্থিত।

বৃহত্তর ভারতে—বস্তুত নৈপালে (নেপালে) এমন আর একটি মিথুন মূর্তি দেখেছি। সেটি প্রস্তরনির্মিত নয়। কাঠের খোদাই করা কাজ (চিত্র 10.19)।

প্রস্তরে অথবা কাঠ-খোদাই-এর কাজে এই বিরল মূর্তিগুলি যারা নির্মাণ করেছিল হয়তো তারা অবদমিতকামের শিকার। স্বাভাবিক যৌনজীবনে অসমর্থ কিছু ব্যতিক্রম-ভাস্কর হয়তো এ জাতীয় শিল্প রচনা করে তির্যক তৃপ্তি লাভ করেছে। অথবা, কে জানে হয়তো তাদের নিয়োগকর্তারাই ছিল অবদমিত কামের শিকার (চিত্র 10.19)।

মন্দির-ভাস্কর্যে শেষপর্যায়ভুক্ত শিল্পের অনুপাত সন্ধানে ধারণা কবতে আমরা ডক্টর দেবাঙ্গনা দেশাই-এর



চিত্র 10.18 লিঙ্গসর্বস্ব নর/বাগালী

গবেষণা গ্রন্থটির সাহায্য নিতে পারি। তাঁর এই 'ডক্টরাল থিসিস' পরে Erotic Sculpture of India নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ডক্টর দেশাই ভারতভূখণ্ডের অনেক অঞ্চলে ভ্রমণ করে এই গবেষণা গ্রন্থটি রচনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ডক্টর দেশাই যৌনাচারের মূর্তিগুলিকে শ্রেণিবিভক্ত করে বিচার করেননি অথবা কোনো সংখ্যাতত্ত্ব পেশ করেননি। তবে তাঁর গ্রন্থে প্রকাশিত 155টি আলোকচিত্র পরীক্ষা করে এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শ্রেণিবিভক্ত করে আমরা যে পরিসংখ্যান পেয়েছি তার উল্লেখ করা চলে :

155টি ভাস্কর্যের মধ্যে আমরা 60খানি উদাহরণ পেয়েছি যেগুলিকে — স্বয়ংমৈথুন, মুখমেহন

যৌথযৌনাচার বা পশুমৈথুন পর্যায়ভুক্ত করা চলে। কিন্তু এটাকে পরিসংখ্যানের নির্ভুল প্রতিচ্ছবি বলা চলে না। কারণ ডক্টর দেশাই লিখেছেন যে, তিনি খাজুরাহো মন্দিরগুচ্ছে পশুমৈথুন দেখতে পাননি, অথচ আমরা তিনটি ভাস্কর্য চিহ্নিত করেছি, তার ভিতর একটার চিত্র এ গ্রন্থে সংযোজিত (চিত্র 10.4)।

তবু আমাদের মতে এই তৃতীয় স্তরের মিথুনে আমরা কদাচিৎ কোনো রসোত্তীর্ণ শিল্পের সাক্ষাৎ পেয়েছি। পুনরুক্তি দোষ সত্ত্বেও আবার বলব, এই বিচার করতে বসে আমরা বর্তমান কালের নীতিবোধের দ্বারা পরিচালিত হইনি। মধ্যযুগের ভাস্করদলের সমতলে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিচারের চেষ্টা করেছি। চিত্র 10.9 এবং চিত্র 10.10-এ আমরা যে সাদৃশ্যগুণ আরোপ করেছি, তা আমাদের কপোলকল্পনা হওয়াও বিচিত্র নয়।

কিন্তু নেপলস্ ইরটিকা সংগ্রহশালায় দেখেছি বেশ কয়েকটি উদাহরণ যা অশ্লীলতার বাধা অতিক্রম করেও রসোত্তীর্ণ। একটি উদাহরণ দিয়ে এ পরিচ্ছেদের সমাপ্তি করা যাক (চিত্র 10.20)।



চিত্র 10.19 লিঙ্গ-সর্বস্ব নরের সঙ্গমপ্রচেষ্টা/কাঠখোদাই, নেপাল

এখানে দেখা যাচ্ছে গ্রীক বনদেবতা প্যান একটি ছাগীর সঙ্গে সঙ্গমরত। গ্রীক উপকথায় 'প্যান' একটি কাল্পনিক জীব। সে তার জীবন-সঙ্গিনীকে পায়নি। অরণ্যে একাকী অন্তেবাসীর জীবন অতিবাহিত করে। কখনো জৈবিক তাড়নায় সে বনদেবীদের পশ্চাদ্ধাবন করে। বনদেবীরা ওই অর্ধমানব অর্ধছাগের আক্রমণে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অরণ্যে সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলা। হতভাগ্য প্যান আপন মনে তার বিরহের বাঁশি বাজিয়ে দিন কাটায়।

এ হেন অর্ধমানব একটি ছাগীর সঙ্গে মিলনে মেতেছে। দৃশ্যটা শুধু অপ্রাকৃত এবং অদ্ভুত নয়, অবাস্তব। তা হোক, এই অবাস্তবতাকে শিল্পের অনুরোধে যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় তাহলে ওই সঙ্গমদৃশ্যে শিল্পরসের কোন অভাব হয় না। ছাগী তার দয়িতের প্রতি করুণায়, সহানুভূতি ও প্রেমে যে ভঙ্গিতে শয়ন করেছে তা তার প্রজাতিবিরুদ্ধ সঙ্গমাসন। তবু তার আপত্তি নেই। এদিকে অতৃপ্তকাম প্যান এতদিনে তার অর্ধাঙ্গিনীকে লাভ করে সুতৃপ্ত। প্যানের মুখাবয়ব একটু বর্ধিত আকারে পুনরায় এঁকে দেখাবার প্রচেষ্টা করেছি (চিত্র 10.21)। লক্ষ্য করে দেখুন, প্যানের কুঞ্চিত নাসিকায়, মুখবিবর থেকে বহির্গত জিহ্বাপ্রান্তে, কর্ণ-দ্বয়ের সংস্থাপনে সে না-মানুষ। সে অজ। অথচ তার অর্ধনিমীলিত দুই চোখে, বিশেষ করে ওষ্ঠপ্রান্তের বঙ্কিমতায় সে যে চরম যৌনতৃপ্তি লাভ করছে তা স্পষ্ট। স্বীকার্য যে, সমস্ত পরিকল্পনাটি অবাস্তব, অপ্রাকৃত—কিন্তু সেটুকু মেনে নিয়ে যদি নিছক শিল্পবস্তু হিসাবে এ ভাস্কর্যটিকে গ্রহণ করেন তবে আপনি স্বীকার করতে বাধ্য

: এটি একটি রসোত্তীর্ণ শিল্প। নন্দলাল না বলেছিলেন যে, শিল্পের সার্থকতা রসের বিচারে, নীতির বিচারে নয়? তা রসের বিচারে ইরটিকা সংগ্রহশালার এই ভাস্কর্যটি নিশ্চয় উত্তীর্ণ।

গ্রীক-অনুভাবনার অর্ধমানব-অর্ধঅজ প্যান আজ হারিয়ে গেছে, কেউ তার কথা জানে না। কিন্তু নিঃশেষে হারায়নি। ইংরেজি ভাষার তিনটি শব্দে সে দীর্ঘকাল সজীব থাকবে। অবদমিতকাম প্যানের আক্রমণের আশঙ্কায় বনদেবীদের panic; তাদের ছোটাছুটি হুড়োহুড়ির জন্য pandemonium বা pandaemonium মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লস্ট'-বর্ণিত নরকের রাজধানী এবং একান্তচারী প্যানের দুঃখের সাথী একটি সাত 'রীডের' বাঁশি : pandeon pipes বা pan-pipe.

অবনতমস্তকে স্বীকার করতে হবে সমগ্র ভারতে সহস্রাব্দ কালের মধ্যে এমন রসোত্তীর্ণ অবাস্তব যৌনাচারের ভাস্কর্য আমাদের নজরে পড়েনি। ❑



চিত্র 10.20 প্যান ও অজার সঙ্গমদৃশ্য/ইরটিকা সংগ্রহশালা, নেপল্‌স্



চিত্র 10.21 প্যানের বর্ধিত মুখমণ্ডল

একাদশ পরিচ্ছেদ

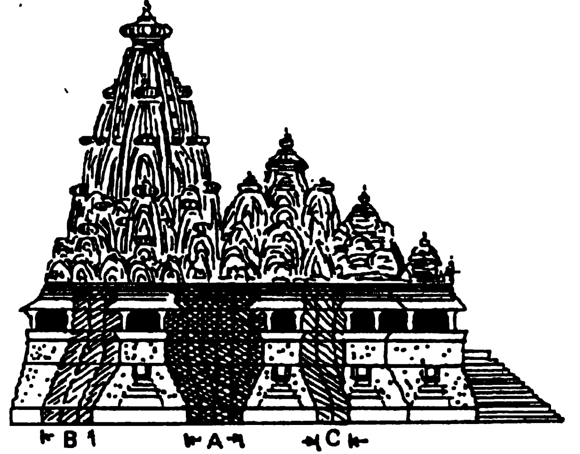
খাজুরাহো মন্দিরে মিথুনাচার

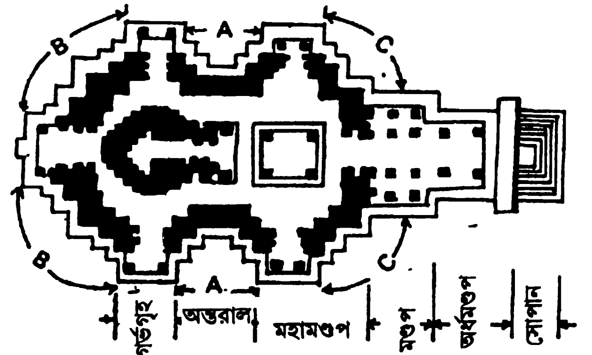


অশ্লীলতা ও যৌনাচারের বিচারে আমরা মিথুন মূর্তিগুলিকে ইতিপূর্বেই তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছি। আমাদের অনুমান তৃতীয় স্তরের উগ্রতর মিথুন মূর্তিগুলি ভাবতীয় মন্দির-ভাস্করে আমদানি করেছিল খাজুরাহো ভাস্করের দল। কলিঙ্গে—বিশেষ করে কোনার্কে —যে মৈথুনরত ও মৈথুন-আনুষঙ্গিক মূর্তিগুলি দেখতে পাই তা খুব সম্ভবত মধ্যভারতের চাণ্ডিল্য ভাস্করদের প্রভাবে। ইতিপূর্বে আমরা অনুমান করেছি, কলিঙ্গে—বস্তুত ভুবনেশ্বরে —খাজুরাহো স্থাপত্য-ভাস্কর্য রীতির প্রভাব পড়েছিল শুধুমাত্র রাজারানি মন্দিরে। রাজারানির ভূমি-নক্শা, মন্দিরচূড়ার বৈশিষ্ট্য, নায়িকা এবং সুতনুকা মূর্তি গঠনের শৈলীতে তা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের অনুমান কলিঙ্গ স্থাপত্য-ভাস্কর্যকে অস্বীকার করে মন্দিরটি চাণ্ডিল্য-শৈলী অনুসরণে নির্মিত হওয়ার কারণেই এই অপূর্ব মন্দিরটি কলিঙ্গে উপেক্ষিত। তার গর্ভগৃহ থেকে মূল বিগ্রহটি অপসারিত এবং কলিঙ্গে রচিত পুরাণে বা শাস্ত্রে তার উল্লেখমাত্র করা হয়নি। মন্দিরের নামটিও হারিয়ে গেছে।

কোনার্ক এবং খাজুরাহোর একই জাতির বদনাম এবং খ্যাতি, যৌনতা বিষয়ে তাদের বাড়াবাড়ির জন্য। দুইটি শিল্পতীর্থ খুঁটিয়ে দেখে আমাদের কিন্তু মনে হয়েছে মূল পরিকল্পনাকার অথবা নিয়োগকর্তাদের সে বিষয়ে কিছু মতপার্থক্য আছে। আমাদের মানদণ্ড হিসাবে যে 'ইরটিকা-ইন্ডেক্স' ধরা হয়েছে তার মাপে খাজুরাহোতে যৌনতা-তথা-অশ্লীলতার পরিমাণ তুলনামূলক হিসাবে কোনার্কের অপেক্ষা কম। তার একটি বিশেষ হেতুও আছে। আমরা আমাদের হিসাবে মূর্তির স্থান-নির্বাচনের বিষয়টাকে কোনো গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু সেটাও নিশ্চয় একটি 'ফ্যাকটর'। তাই সাধারণ দর্শকদের অনেকের মতে খাজুরাহোতে অশ্লীলতার পরিমাপ অধিক বলে প্রতীয়মান হয়।

কোনার্কে চূড়ান্ত পর্যায়ের মিথুনাচারী মূর্তিগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাই হয়তো তারা দর্শকমনে তীব্রভাবে প্রভাব ফেলে না। অপরপক্ষে খাজুরাহোর প্রধান মন্দিরগুলিতে অশ্লীলতর মূর্তিগুলি ঘন নিবদ্ধ এবং তাদের স্থান নির্বাচন এভাবে করা হয়েছে যাতে দর্শক প্রভাবিত না হয়ে পারে না। চিত্র 11.1-এ আমরা কাণ্ডারীয় মহাদেও মন্দিরের ভূমি-নকশা এবং পার্শ্বচিত্রটি উপস্থিত করেছি। লক্ষ্য করে দেখুন, কলিঙ্গে যে চার দেউলের পরিকল্পনা—নাটমন্দির, ভোগমণ্ডপ, জগমোহন ও





চিত্র 11.1 কাণ্ডারীয় মহাদেও মন্দির ভূমিনকশা ও পার্শ্বচিত্র

বিমান—এই রীতি খাজুরাহোতেও গৃহীত। তবে তাদের রূপারোপ এবং নাম পৃথক। পর্যায়ক্রমে তারা : অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ, মহামণ্ডপ এবং গর্ভগৃহ।

উগ্রতর বা অশ্লীলতম যৌনাচারী মূর্তিগুলি সচরাচর তিনটি স্থানে সজ্জিত। মহামণ্ডপ ও মূলমন্দিরের সংযোগস্থলে—মন্দিরের ভাষায় যাকে বলা হয় 'অন্তরাল'। আমরা সেই অংশটিকে 'A' চিহ্নিত করেছি। পার্শ্বচিত্রে সেই অংশটি উচ্চতার পরিমাপ দেখাতে চিহ্নিত করা হয়েছে। যৌনতার লক্ষণ যে মূর্তিগুলিতে কিছু কম আছে সেগুলি বিমান (মূল মন্দিরের)-এর দুই পাশে 'B' চিহ্নিত অংশে সজ্জিত। এ ছাড়াও কিছু আছে মণ্ডপ থেকে মহামণ্ডপে 'C'-চিহ্নিত অংশে। এই বিন্যাস ছন্দটি ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের প্রধান তিন-চারটি মন্দিরে অব্যতিক্রমভাবে গৃহীত—কাণ্ডারীয় মহাদেও, জগদম্বা, লক্ষ্মণ প্রভৃতি মন্দিরে। এ জাতীয় পরিকল্পনা কলিঙ্গের কোনো মন্দিরে লক্ষ্য করা যায় না।

কেন্দ্রীয় 'A' চিহ্নিত অংশে সচরাচর তিনটি স্তর। যেমন কাণ্ডারীয়, বিশ্বনাথ অথবা জগদম্বায়। লক্ষ্মণ-মন্দিরে এটি কিন্তু দ্বি-স্তর।

যৌনতা বৃদ্ধি বা যৌনতাবর্জনের একটা বিচিত্র ছন্দও এই অংশে আমাদের নজরে পড়ে। সে-কথা, কেন জানি না, ইতিপূর্বে কোনো গবেষক উল্লেখ করেননি। সেটি প্রকাশ করতে আমরা পরপর তিনটি মন্দিরের ওই A চিহ্নিত অংশের পরিকল্পনা চিত্রাকারে প্রকাশ করলাম—লক্ষ্মণ, বিশ্বনাথ ও কাণ্ডারীয় মহাদেও। লক্ষ্মণ-দেউলে A চিহ্নিত অংশের শুধু কেন্দ্রীয় বিভাগটি ত্রিস্তর। উপরে দেবমূর্তি, তার নিচে নারী ও নায়ক-নায়িকার সমাহার, তারা যৌনতা বর্জিত। সর্বনিম্ন অংশে যৌথ-যৌনাচার দৃশ্য। লক্ষণীয় দুই পাশে যে মূর্তিগুলি স্থাপন করা হয়েছে তা যেন 'দর্পণ-প্রতিবিম্বে'র বিচারে যৌনতা প্রকাশ করেছে। ডানদিকে যে যে অবস্থানে সুরসুন্দরী, ব্যাল বা দেবমূর্তি আছে বাঁ-দিকেও একই দূরত্বে তারা সেই ছন্দ মেনে অবস্থিত। মূর্তিগুলি যে একে-অপরের দর্পণ-প্রতিবিম্ব তা বলছি না কিন্তু 'ইরটিকা'র নির্দেশে আমরা তাদের যেভাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছি ঠিক সেভাবেই তারা রূপায়িত।

এবার অর্ধশতাব্দি পরে নির্মিত বিশ্বনাথ-মন্দিরে ওই A-চিহ্নিত অংশের মূর্তি-নির্মাণের বিন্যাস লক্ষ্য করা যাক। এখানে মূর্তিগুলি সর্বাংশেই তিন স্তরে সজ্জিত। এখানেও দুই পার্শ্বে সেই 'দর্পণ-প্রতিবিম্বের' ছন্দটি সুন্দরভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এবারে কিন্তু কেন্দ্রীয় অবস্থানে মূর্তিগুলি স্থান পরিবর্তন করেছে। দেব-দেবীরা নেমে এসেছেন নিচের স্তরে। যৌথ-যৌনাচার উঠে গেছে উপরের দুই স্তরে। অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি, সুরসুন্দরী এবং ব্যাল (বিরাল) মূর্তিগুলি কেন্দ্রীয় অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সমদূরত্বে। ইতিপূর্বে—লক্ষ্মণ দেউলে এই বিন্যাসছন্দ পাঁচটি প্যানেলে বিধৃত ছিল, এখন সেটি বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে আটটি প্যানেলে। আবার যৌথ-যৌনাচারমূর্তি পঞ্চাশ বছরে দ্বিগুণিত হয়েছে।

তৃতীয় উদাহরণটি দাখিল করা গেল খাজুরাহোর সর্ববিখ্যাত কাণ্ডারীয় মন্দির থেকে। এটি বিশ্বনাথ-মন্দিরের কয়েক দশক পরে নির্মিত। আমরা লক্ষ্য

5	4	3	2	1	দেবমূর্তি	1	2	3	4	5
সুরসুন্দরী	ব্যাল	সুরসুন্দরী	দেবতা	সুরসুন্দরী	নারী-পুরুষের সমাহার [যৌনতাবর্জিত]	সুরসুন্দরী	দেবতা	সুরসুন্দরী	ব্যাল	সুরসুন্দরী
সুরসুন্দরী	উত্তেজিত মিথুন	সুরসুন্দরী	দেবতা	সুরসুন্দরী	যৌথ যৌনাচার	সুরসুন্দরী	দেবতা	সুরসুন্দরী	উত্তেজিত মিথুন	সুরসুন্দরী

চিত্র 11.2 কেন্দ্রীয় A-চিহ্নিত অংশে মূর্তির বিন্যাসছন্দ/লক্ষ্মণ-দেউল

করছি যৌনতার পরিমাপে ওই 'A'-চিহ্নিত অংশের কেন্দ্রীয় প্যানেলে তিনটিই উগ্র যৌথ-যৌনাচার সমন্বিত। দেব-দেবীরা কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে দু-পাশে অপসারিত। মন্দিরের আকার বৃদ্ধি পাওয়ায় এক এক পাশে প্যানেলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে হয়েছে পনের। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, যৌনতার বিচারে তাদের অবস্থান বা বিন্যাসছন্দটি আছে অপরিবর্তিত। স্থানাভাবে কাণ্ডারীয় দেউলের 'A' চিহ্নিত অংশের রেখচিত্র দেওয়া গেল না।

এ জাতীয় বিন্যাসছন্দ চাণ্ডিল্য স্থাপত্য-ভাস্কর্যের এক বিরল বৈশিষ্ট্য। পর পর তিনটি ক্ষেত্রে বিন্যাসছন্দটি মিলে যাওয়ায় একে কাকতালীয় বলা চলে না। ভারতের অন্য কোনো অঞ্চলে এ জাতীয় বিন্যাসছন্দের পরিকল্পনা আমাদের নজরে পড়েনি।

* * *

কোনার্ক কলিঙ্গ স্থাপত্য-ভাস্কর্যের শেষ পরিণতি। ত্রয়োদশ শতাব্দিতে। মাত্র দ্বাদশ বৎসরে নির্মিত একটি মাত্র সূর্যমন্দির। অপরপক্ষে খাজুরাহোর দেবদেউলগুলি নির্মিত হয়েছে দেড়-শতাব্দি ধরে। বলা যায়: দশম থেকে একাদশ শতাব্দির মাঝামাঝি কাল।

যে ভূখণ্ডে আমরা খাজুরাহোর মন্দিরগুলি দেখতে পাই, মহাভারতের যুগে তার নাম ছিল : বৎস্যরাজ্য। পরবর্তীকালে এর নাম হয় জেজাকভুক্তি। এ অঞ্চলে নবম-দশম শতাব্দিতে গড়ে উঠতে থাকে একটি শক্তিশালী রাজ্য : চাণ্ডিল্য রাজবংশ। সম্ভবত তারা কৌলকাপালিক-মন্ত্রে গোপনে তন্ত্রসাধনা করত। খাজুরাহো কিন্তু সে রাজ্যের রাজধানী ছিল না। খাজুরাহো ছিল এক 'মন্দির-নগরী'। রাজানুগ্রহে এই মন্দির-নগরী গঠিত হয়েছিল। বস্তুত সেগুলি ছিল কোনো কোনো চাণ্ডিল্য-নৃপতি বা ধনীব্যক্তির তথাকথিত 'বাগানবাড়ি'। রাজপুরুষেরা নাকি এখানে শুধু পূজা-অর্চনা করতে সমবেত হতেন। তান্ত্রিক পদ্ধতিতে। প্রশ্ন হতে পারে সে-ক্ষেত্রে রাজধানীতেই বা কেন মন্দির-নির্মাণ করা হয়নি? উত্তরটি সহজেই অনুমেয়। রাজপুরুষদের সকলেই যে ধার্মিক ছিলেন এমন অনুমান করার হেতু নেই। ধর্মের নলচে-আড়াল দিয়ে, কৌল-কাপালিক তন্ত্রের গোপন সাধন ভজনের সুবাদে, এখানে সপ্তাহান্তে তাঁরা আসতেন। অবদমিত কামনা চরিতার্থ করতেই যে তাঁরা ধর্মের অজুহাতে মন্দিরে পূজা দিতে আসতেন একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিশেষত দেবদাসীদের আবাস যখন সেখানে। সেই ধরনের কামুক রাজপুরুষদের অতৃপ্ত কামনা-বাসনার তির্যক প্রকাশ মন্দিরগাত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।

সে যাই হোক, জেজাকভুক্তির অন্তর্গত এই ভূখণ্ডের নাম সেযুগে ছিল 'খর্জুর-বাহক'। যা-থেকে খাজুরাহো নামের উৎপত্তি।

কিংবদন্তি বলে, মর্ত্যের বালবিধবা সুন্দরী হৈমবতী ছিলেন জনৈক কলিঙ্গরাজের রাজজ্যোতিষীর আত্মজা। ভ্রমক্রমে রাজজ্যোতিষী নাকি একবার এক অমাবস্যা রাত্রিকে পূর্ণিমাতিথি বলে চিহ্নিত করেন। পিতাকে অপমান ও অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করতে হৈমবতী চন্দ্রদেবের স্তব শুরু করেন। স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ভরা অমাবস্যা রাত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হল। অলৌকিকভাবে রক্ষিত হল রাজজ্যোতিষীর সম্মান। কিন্তু তাঁর গৃহাভ্যন্তরে ঘটে গেল আর এক জাতের অপ্রত্যাশিত নাটক!

1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	7	8
দেবতা	সুরসুন্দরী	সুরসুন্দরী	দেবতা	শৃঙ্গাররত মিথুন	সুরসুন্দরী	দেবতা	সুরসুন্দরী	যৌথ যৌনাচার	সুরসুন্দরী	দেবতা	সুরসুন্দরী	শৃঙ্গাররত মিথুন	দেবতা	সুরসুন্দরী	সুরসুন্দরী	দেবতা
দেবতা	সুরসুন্দরী	সুরসুন্দরী	দেবতা	বিরাজ	সুরসুন্দরী	দেবতা	সুরসুন্দরী	যৌথ যৌনাচার	সুরসুন্দরী	দেবতা	সুরসুন্দরী	বিরাজ	দেবতা	সুরসুন্দরী	সুরসুন্দরী	দেবতা
দেবতা	সুরসুন্দরী	সুরসুন্দরী	দেবতা	উত্তেজিত মিথুন	সুরসুন্দরী	দেবতা	সুরসুন্দরী	দেবী দেবতা দেবী	সুরসুন্দরী	দেবতা	সুরসুন্দরী	উত্তেজিত মিথুন	দেবতা	সুরসুন্দরী	সুরসুন্দরী	দেবতা

চিত্র 11.3 কেন্দ্রীয় অংশে মূর্তির বিন্যাসছন্দ/বিশ্বনাথ দেউল

চন্দ্রদেব বললেন, সুন্দরী, তোমার আহ্বানে আমি নিয়মভঙ্গ করে এসেছি। আমাকে সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব তোমার।

হৈমবতী বলে, আমি সামান্যা বালবিধবা। দরিদ্র ঘরের মেয়ে। কেমন করে আপনার মতো দেবতার তৃপ্তি বিধান করতে পারি? কী আছে আমার সংসারে?

চন্দ্র সহাস্যে বললেন, চন্দ্রাননে, তোমার রন্ধনশালা শূন্য হতে পারে, কিন্তু স্বয়ং অনঙ্গদেব তোমার বরঅঙ্গ যে সম্পদে স্তবকে স্তবকে সজ্জিত করেছেন তাতে তুমি আমাকে অনায়াসে তৃপ্ত করতে পার।

কাহিনি দীর্ঘায়ত করা নিষ্প্রয়োজন। বালবিধবা হৈমবতী যে-রসে এতদিন বঞ্চিত ছিল তাই লাভ করল চন্দ্রদেবের আশীর্বাদে। কালে হৈমবতী গর্ভিণী হয়ে পড়ায় বিপদ হল। চন্দ্রদেবকেই বলে, এখন উপায়?

চন্দ্রদেব বললেন, তুমি চিন্তা কর না। তোমার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হবে। কালে সে এই খর্জুরবাহক জনপদে একশতটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করবে। তাতেই পাপস্খালন হবে তোমার।

দেবতার বরে হৈমবতীর সেই সন্তানই হলেন এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কাহিনি অনুসারে দেবদেউলগুলির নির্মাণকালে রাজমাতা তাঁর অভিজ্ঞতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়ে পাপস্খালন করেছিলেন। মন্দিরের বহির্গাত্রে সেই স্বীকৃতির প্রতিফলন।

কিংবদন্তি থাক, ইতিহাস বলছে—এই অঞ্চলে দশম শতাব্দির প্রথম পাদ থেকে একাদশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চাণ্ডিল্য রাজবংশ সগৌরবে রাজত্ব করে যান। ওই সময়কালেই খাজুরাহো মন্দিরনগরীর জন্ম, বিকাশ ও অবলুপ্তি ঘটে। এখানে আনুমানিক আশিটি মন্দিরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত, যার ভিতর বিশ-পাঁচিশটি আজও টিকে আছে।

গল্প শুনেছি, দিদিমণি ক্লাসে এসে বাচ্চাদের প্রশ্ন করেছিলেন, তোমরা একটা 'উভচর'-এর নাম বলতে পার?

একটি ছাত্র দাঁড়িয়ে উঠে বলল, দিদিমণি ব্যাঙ।

দিদিমণি বুঝলেন, প্রথম শব্দটি সম্বোধনে, অর্থাৎ বাচ্চাটা বলতে চায়নি যে, 'দিদিমনিই ব্যাঙ'। তাই তিনি রাগ করলেন না। বললেন, আর একটা উভচরের নাম কর তো কেউ।

ক্লাসের কেউ ওম, সালামান্ডার বা সেসিলিয়ান চেনে না। তারা পরস্পরের দিকে তাকায়। প্রথম বাচ্চাটিই সপ্রতিভের মতো আবার হাত তোলে। দিদিমণি বলেন, ইয়েস! বল?

—অ্যানাদার ফ্রগ, মিস্!

দিদিমনি জবাবে কী বলেছিলেন তা অবশ্য জানি না।

খাজুরাহোর স্থাপত্য বিবর্তন ওই 'অ্যানাদার ফ্রগ' সূত্রে। এক এক জন রাজা সিংহাসনে উঠে বসেই নতুন একটি দেবদেউল বানাতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু পার্শ্ববর্তী মন্দিরের অনুকরণে। ভাস্করদলও দেড়শ বছরে উল্লেখযোগ্য কোনো নতুন প্রয়োগ-কৌশল দেখাতে পারেননি। ক্রমাগত একই জাতির দেবমূর্তি, সুরসুন্দরী, ব্যাল বা বিরাল, মিথুনমূর্তি। বিবর্তন যেটুকু হয়েছে তা যৌনতার পরিমাপে। তাদের সংখ্যাধিক্যে এবং স্থানপরিবর্তনে; তাদের উগ্রতার পবিমাপে এবং যৌথযৌনাচারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে।

ব্যাল বা বিরাল মূর্তির অবতারণা হয়তো খাজুরাহোতেই প্রথম কবা হয়। কারণ তার পূর্বে এজাতীয় মূর্তি কলিঙ্গে খুব বেশি নজরে পড়ে না। ব্যাল বা বিরাল একটি কাল্পনিক প্রাণী—বীরত্বব্যঞ্জক, সিংহীর অনুকরণে। সচরাচর তারা পিছনের পদযুগলে দেহভার ন্যস্ত করে উল্লম্ফনরত।

এখানে উল্লেখ্য: ব্রাহ্মণ্য-মন্দিরের সমান্তরালে, হয়তো কিছু পরে, এখানে জৈনধর্মাবলম্বীরাও বেশ কিছু মন্দির নির্মাণ করান। সেগুলি স্থাপত্যভাস্কর্যে খাজুরাহো-শৈলীর অনুসারী—অথচ অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, সেসব দেবদেউলে মিথুনাচার প্রবেশলাভ করেনি। সেসব মন্দিরে কিছু যুগলমূর্তি, উত্তেজিত মিথুন এমন কি কদাচিৎ শৃঙ্গাররত মিথুনও নজরে পড়ে; কিন্তু মৈথুনরত মিথুন, পশুমৈথুন, পায়ুমৈথুন বা যৌথ-যৌনাচারী মূর্তি আমরা ব্যতিক্রম হিসাবেও খুঁজে পাইনি। অনুভব করা যায়, জৈন সাধুরা মিথুন গড়েছেন রসের বিচারে, ভারতীয় ভাস্কর্যের ধারা স্বীকার করে; কিন্তু কৌল-কাপালিকদের প্রভাব তাঁদের উপরে পড়েনি। এই তথ্যটি অথবা তত্ত্বটি কিন্তু আমরা খাজুরাহো-বিষয়ক কোনো গবেষকের রচনা বা প্রামাণিক গ্রন্থে পাইনি। সেটাও আশ্চর্যের কথা। প্রসঙ্গত বলি : ইলোরাতেও ঘটেছে একই জাতির ঘটনা। সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের পাশাপাশি জৈন এবং ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের গুহামন্দিরে কিছু কিছু যৌনতা বা অশ্লীলতামণ্ডিত মিথুন আছে—কিন্তু বৌদ্ধ বা জৈন গুহায় তা ব্যতিক্রম হিসাবেও

দেখা যায় না। সে তথ্যটাও কিন্তু পূর্বাচার্যরা পরিষ্কার ভাষায় বলে যাননি।

নির্মাণকালেব ক্রমপর্যায়ে সজ্জিত করলে আমরা পাই ·

সময়কাল	সমকালীন রাজাব নাম	খাজুবাহোতে নির্মিত মন্দিরের নাম	প্রায় সমকালীন কলিঙ্গ দেউল
917-925	হর্ষ	হনুমান, ব্রহ্মা	—
925-950	যশোবর্মন	লক্ষ্মণ	মুক্তেশ্বব
950-1002	ধঙ্গ	বিশ্বনাথ পার্শ্বনাথ (জৈন) বিদ্যানাথ (জৈন)	ব্রহ্মেশ্বব
1002-1017	গন্ড	দেবী জগদম্বা চিত্রগুপ্ত	গৌবী বাজাবানি
1017-1023	বিদ্যাধব	কাণ্ডাবীয় মহাদেও	কেদাবেশ্বব
1029-1050	বিভিন্ন	বামন, চতুর্ভুজ দুলাদেও, আদিনাথ (জৈন)	

বলাবাহুল্য উল্লেখিত সময়কাল আনুমানিক। পুরাতত্ত্ব বিভাগ যেভাবে নির্দেশ করেছেন এবং সাজিয়েছেন সেই ক্রমপর্যায়েই আমরা সাজিযেছি।

* * *

কলিঙ্গ-স্থাপত্য বিবর্তিত হতে সময় লেগেছিল সাতশ বছর। প্রথমে কিছুদিন একক দেউলে নির্মিত হয়েছে শিবেব লিঙ্গমূর্তি। তারপর ক্ষুদ্রায়তন একক-দেউল শত্রুঘ্নেশ্বর থেকে পরশুরামেশ্বরের পীড মন্দিরসহ দ্বৈতদেউল। তা থেকে ক্রমে চার-দেউলের পরিকল্পনা হল অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে। সময় লাগল প্রায় অর্ধ-সহস্রাব্দ। স্থাপত্য তার বিকশনের গৌরীশৃঙ্গে আরোহণ করল আরও দুই শতাব্দি পরে—কোনার্ক-দেউলে।

তুলনায় একক-দেউল থেকে চার-দেউলের পরিকল্পনায় উপনীত হতে খাজুরাহো স্থপতির সময় লেগেছিল মাত্র একশ বছর। কলিঙ্গে নামকরণ থেকে দেউলগুলির ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা অনুমান করা যায়। নাটমন্দিরে তো দেবাদাসীদের নৃত্য পরিবেশন, ভোগমণ্ডপে ভোগ নিবেদন, জগমোহনে যাত্রীদের দেবদর্শনের সুযোগ দেওয়া এবং বিমানে নির্মিত হল গর্ভগৃহ। খাজুরাহো মন্দিরের নামকরণ থেকে তেমন কোন সমাধানে উপনীত হওয়া যায় না। যদিও সেই চারটি মণ্ডপও একই কেন্দ্রীয় অক্ষরেখায় পরপর সজ্জিত : অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ, মহামণ্ডপ ও বিমান।

খাজুরাহো-স্থাপত্যের ক্রমবিবর্তন বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে নিষ্প্রয়োজন। যেটুকু বলা হল তা শুধু জানাতে যে, মন্দির-স্থাপত্যের দিক থেকে খাজুরাহো এবং কলিঙ্গের স্থপতি একই সমস্যার একই জাতের সমান্তরাল সমাধান করেছেন—চারটি দেউলকে একই অক্ষরেখায় পর পর সাজিয়ে। তবে খাজুরাহো চার-দেউলের সমাধান কবেছেন কলিঙ্গেব অনেক আগে। এ থেকে অনুমান করা যায় স্থাপত্য-চিন্তায় কলিঙ্গ চার-দেউল পরিকল্পনায় খাজুরাহো অনুসারী। ভাস্কর্য চিন্তা এবং যৌনতা-বিজ্ঞাপিত মিথুন সেভাবে খাজুরাহো থেকে কলিঙ্গে প্রভাব বিস্তার করেছে কিনা সেটাই বিচার্য।

খাজুরাহো-ভাস্কর্যকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দুইটি মূল বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে আদিরসাত্মক এবং অন্যান্য রসসঞ্জাত। বিষয়বস্তু বা পরিকল্পনার দিক থেকে সুরসুন্দরী বা একক সুতনুকাদের মূর্তি রূপায়ণে কলিঙ্গ ও খাজুরাহোতে কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও একটু অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করলে কিছু বৈপরীত্যও নজরে পড়ে। দুই দলের ভাস্করই ছেনি-হাতুড়ি চালিয়েছেন বালিপাথরে নারী দেহের সুষমাকে ফুটিয়ে তুলতে; তবু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু পার্থক্য আছে। যথা :

(ক) কলিঙ্গে (একমাত্র রাজারানি দেউল ব্যতিরেকে) সুতনুকারা ছিল স্থূলকায়া। 'স্থূলকায়া' শব্দটা হয়তো সুপ্রযুক্ত নয়। শুদ্ধভাষায় বলা যায় 'শ্রোণিভারাদলসগমনা'। তারা যেন নাটকের নায়িকা—পূর্ণযৌবনা, স্তোকনম্রা প্রভৃতি। ক্ষেত্রবিশেষে তারা সাবলীল, তন্বী এমনকি নাটকেব



চিত্র 11.4 জগদম্বা-দেউল, পার্শ্বচিত্র, খাজুরাহো

নায়িকার পরিবর্তে নৃত্যনাট্যের নটী। তুলনায় খাজুরাহোর একক সুতনুকার দল রীতিমতো অ্যাক্রোবেটিক, মেদবর্জিত। তারা তারের খেলা দেখাতে পারে। ব্যালে-নাচের বিস্ময়কর ভারহীনতা তাদের মজ্জাগত।

খাজুরাহোর সুতনুকার দল যেভাবে নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে পাক খেতে অভ্যস্ত তেমন মূর্তি শুধু কলিঙ্গ নয়, বেশর ও দ্রাবিড় ভাস্কর্যেও সহজে নজরে পড়ে না। একমাত্র ব্যতিক্রম ভুবনেশ্বরের রাজারানির মন্দির। আমরা এখানে একটি চিত্রের মাধ্যমে (চিত্র 11.6) বক্তব্যটা বোঝাতে চেষ্টা করেছি। এটাও অন্যতম কারণ যেজন্য আমাদের মনে হয়েছে যে, রাজরানি-দেউল-এর পশ্চাপটে চাণ্ডিল্য শিল্পীদের চিন্তাধারা বর্তমান।

(খ) খাজুরাহো-ভাস্কর দৃষ্টিভঙ্গির নানারকম বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। ভারতীয়-ভাস্কর্যে পশ্চাদদৃশ্য নিতান্ত বিরল। এ বিষয়ে আমরা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

(গ) খাজুরাহোতে 'সন্তান-বৎসলা'—অর্থাৎ স্তনদানরতা বা শিশুর সঙ্গে ক্রীড়ারতা সুতনুকার মূর্তি অপেক্ষাকৃতভাবে অল্প, খুবই অল্প। কলিঙ্গ-ভাস্কর এদিক থেকে অনেক পরিণত মানসের স্বাক্ষর রেখেছেন। খাজুরাহো-শিল্পী যেন মাত্র দেড়শ বছরের সাধনায় প্রণিধান করতে পারেননি যে আদিরসধারার অন্তিম গতি মাতৃত্বের মোহনায়।



চিত্র 11.5 কাণ্ডারীয় মহাদেও দেউল, খাজুরাহো

অন্যান্য রসসঞ্জাত মূর্তি :

দেবমূর্তি : গর্ভগৃহের মূল দেবতা ব্যতিরেকে মন্দিরের বাহির গাত্রে নানান দেবদেবীর মূর্তি। অধিকাংশই চতুর্ভুজ, দণ্ডায়মান, আভঙ্গ-ঠামের। দেড়-শত বৎসরে তাঁদের কোনো বিবর্তন নজরে পড়ে না—তাঁদের আয়ুধ, ভঙ্গিমা, বাহন, বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত। যেমন অগ্নিদেবের শ্মশ্রু, কুবেরের স্ফীতোদর, গণেশের লড্ডুক-প্রিয়তা প্রভৃতি।

কল্পলোক : বাস্তব জগতে নেই এমন কল্পিত-মূর্তি ভারতের সব মন্দিরেই দেখতে পাওয়া যায়—যক্ষ-নাগ-গন্ধর্ব-কিন্নর প্রভৃতি। এখানেও তারা উপস্থিত। তার ভিতর 'ব্যাল' বা 'বিরালের' কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ কল্পনাটি কলিঙ্গেও সংক্রামিত হয়েছে। কলিঙ্গে তা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে—সিংহ-বিরাল, গজ-বিরাল প্রভৃতি। খাজুরাহোতে 'ব্যাল'গুলি একই পরিকল্পনার। দাক্ষিণাত্যের 'কীর্তিমুখ' বা কলিঙ্গের 'ঝাম্পান-সিংহ' প্রভৃতি মূর্তি খাজুরাহোতে বিশেষ নজরে পড়ে না।

রাজসিক : শিকার, যুদ্ধদৃশ্য, রাজসভা ইত্যাদির দৃশ্য এখানে-ওখানে ছড়ানো।

খাজুরাহোর একটিমাত্র মন্দিরে আমরা গুনে দেখতে চেয়েছিলাম শিল্পী কী অনুপাতে আদিরস-সঞ্জাত মূর্তি গড়েছেন অন্যান্য দৃশ্যের পরিবর্তে। সব কয়টি প্রধান মন্দিরে এ গণনা করা হলে পরিসংখ্যান আরও নির্ভরযোগ্য হতো; কিন্তু সময়াভাবে তা আমরা করে উঠতে পারিনি। শুধুমাত্র বিশ্বনাথ-দেউলের পরিসংখ্যান যা পেয়েছি তা এখানে সাজিয়ে দেওয়া গেল।

আদিরসা-সঞ্জাত :			
(T) সুতনুকা (একক রমণীমূর্তি)	86	25.7%	54%
(II) অন্যান্য শ্রেণিভূক্ত মিথুনমূর্তি	88	27.6%	
আদিরস-ব্যতিরেকে অন্যান্য মূর্তি, রাজদরবার, শিকার, যুদ্ধদৃশ্য প্রভৃতি একত্রে	146	46%	46%
	320		100%

আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে, খাজুরাহো-ভাস্কর—অন্তত বিশ্বনাথ দেউলে—সব রসের মধ্যে আদিরসকে প্রভূতভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। অথবা হয়তো

নিয়োগকর্তা দেবদেউল গড়তে বসে আদিরসকেই জীবনের সার বলে মনে করেছেন। যৌনতা জীবনের একটি পর্যায়—সন্ন্যাসী ব্যতিরেকে আবশ্যিক পর্যায় বলা যেতে পারে। কিন্তু সেজন্য খাজুরাহোর নৃপতিবৃন্দ তথা ভাস্করদল যে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়। না জীবনে, না শিল্পে।

আমরা ছয়টি মন্দিরে মিথুনমূর্তিগুলি গণনা করে যে পরিসংখ্যান লাভ করেছি তা কাল-ক্রমানুসারে এখানে সাজিয়ে দেওয়া গেল। একই পদ্ধতিতে খাজুরাহোর প্রধান মন্দিরগুলির 'ইরটিকা-ইন্ডেক্স'ও নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করা গেছে .

দেখা যাচ্ছে কলিঙ্গে 'ইরটিকা ইন্ডেক্স' কালের সঙ্গে সমান্তরালে ছিল ক্রমবর্ধমান। কখনো কখনো রাজশক্তি পরিবর্তনকালে তা কিছুটা নিম্নগামী হয়েছিল। খাজুরাহোতে তা হয়নি। প্রথম যুগের মিথুনমূর্তি আমরা গণনা করার সময় পাইনি। কিন্তু লক্ষ্মণ-দেউল থেকে জগদম্বা বা কাণ্ডারীয় মহাদেও মন্দিরে তা প্রায় সমানই আছে। তারপর তা নিম্নগামী হয়ে পড়ে। মাত্র পাঁচিশ বৎসরেই তা প্রচুর পরিমাণে নেমে এসেছে। যৌনতা তথা অশ্লীলতার প্রতি খাজুরাহো ভাস্করদলের এই অনীহা—যা শেষযুগে সম্পূর্ণ অন্তর্হৃত হয়েছিল—সেকথাও কিন্তু পূর্বাচার্যরা বলে যাননি। মার্গ স্কুলের প্রকাশিত খাজুরাহো-বিশেষ সংখ্যাতেও এই মূল্যবান তথ্যটা প্রকাশ করে বলা হয়নি। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ্য-সম্প্রদায়ের সমান্তরালে ওখানে জৈনরা যে দেবদেউল গড়ে গেছেন—সর্বযুগেই—সেখানেও যৌনতা ও অশ্লীলতা অনুপস্থিত। এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটাও এতাবৎকাল কোনো গবেষক বলেছেন বলে আমাদের নজরে পড়েনি।

সুতরাং কলিঙ্গের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে মনে হয় খাজুরাহো শিল্পী ক্রমশ প্রণিধান করেছিলেন—যৌনতা বৃদ্ধিই শিল্পের পরাকাষ্ঠা নয়। শেষযুগের চতুর্ভুজ-মন্দিরে সর্বসমেত 160টি মূর্তির ভিতর মাত্র 11টি আছে যুগলমূর্তি, একটিমাত্র উত্তেজিত এবং একটি শৃঙ্গাররত মিথুন। মৈথুনরত, যৌথযৌনাচার বা অবাস্তব মিথুন আদৌ নাই!

দ্বিতীয় কথা, সর্বযুগেই জৈন মন্দিরগুলিতে একটিও উগ্র মিথুন নির্মিত হয়নি।

এছাড়া লক্ষ্য করা গেছে, কলিঙ্গে রসের বিচারে মূর্তির স্থান বিচার করা হয়নি। মন্দিরের বহির্গাত্রে নানান জাতির মূর্তির ঠাশাঠাশি ভিড়। কোথায় কোন্ জাতির মূর্তি বসবে এ নিয়ে পরিকল্পনাকার কোন নির্দেশ দেননি। খাজুরাহোতে তাদের আকার, কম্পোজিশন প্রভৃতির বিষয়ে মূল স্থপতিকার একটা সুষমছন্দ মেনে চলেছেন। প্রায় সর্বত্র। মূর্তি সংস্থাপনের এই ছন্দটি এতদিন আমরা কিন্তু লক্ষ্য করিনি। অন্তত গবেষকরা সেকথার উল্লেখ করেননি।

খাজুরাহোর মন্দিরগুলি সাধারণ যাত্রীর চোখে অশ্লীল বলে মনে হয়। তার একটিমাত্র হেতু : এখানে প্রতিটি মন্দিরে সবচেয়ে প্রকাশ্য স্থানের সবচেয়ে দৃষ্টিআকর্ষণকারী প্যানেলে আছে যৌথ-যৌনাচাররত বৃহদায়তন মূর্তিগুলি। কেন্দ্রীয় A-চিহ্নিত প্যানেলের মধ্যস্থলে। মজা হচ্ছে এই যে, ওই অবস্থানে কোথাও দুটি, কোথাও তিনটি প্যানেলে এই যৌথ-যৌনাচাররত নরনারী ছাড়া ঐ পরিকল্পনা মন্দিরের আর কোথাও নেই।

আরও লক্ষণীয়, এই যৌথ-যৌনাচার-পরিকল্পনা একমাত্র খাজুরাহো এবং কোনার্ক ব্যতিরেকে ভারতভাস্কর্যে কোথাও ব্যাপক আকারে দেখা যায় না। অথচ এতবড় তথ্যটার বিষয়ে পণ্ডিতেরা তাঁদের প্রবন্ধে স্বীকার করে যাননি।

প্রথম কথা, চাণ্ডিল্য রাজবংশের ধমনীতেই মিশ্রিত

মন্দিরের নাম ও নির্মাণ কাল	যুগল মান = 0	উত্তেজিত মান = 2.5	শৃঙ্গাররত মান = 17.5	মৈথুনরত মান = 47.5	শেষ শ্রেণিভুক্ত মান = 62.5	ইরটিকা ইন্ডেক্স
লক্ষ্মণ দেউল (925-950)	13	18	2	2	2	8
বিশ্বনাথ (950-1002)	30	42	6	6	4	7
চিত্রগুপ্ত (1002-1017)	3	39	9	2	2	9
জগদম্বা (1002-1017)	7	44	20	8	1	11
কাণ্ডারীয় (1017-1021)	37	28	2	4	4	7
চতুর্ভুজ (1029-1050)	11	1	1	0	0	2

ছিল আদিবাসী রক্ত। অন্তত ভিন্সেন্ট স্মিথ-এর গবেষণা তাই বলে।[1] আদিযুগে, সিংহাসনে আরোহণের পূর্বযুগে, হয়তো তাদের সমাজ ছিল বহুপতিক বা polyandrous। কে জানে, হয়তো যৌথ-বিবাহও প্রচলিত ছিল তাদের সমাজে। যদিও রাজ্যলাভের পরে তাদের বংশে এ-জাতীয় বিবাহের নজির নেই, তবু ধরে নেওয়া যায়, ব্যবস্থাটা তাদের চোখে হয়তো অতটা বিসদৃশ লাগত না, যেমন লাগবে কোনো বর্ণহিন্দুর চোখে।

দ্বিতীয় কথা, প্রথম যুগ থেকেই রাজন্যবর্গ কৌল-কাপালিক তন্ত্রাচারে আসক্ত ছিলেন। কাণ্ডারীয় দেউল নির্মাতা বিদ্যাধরের দেহাবসানের পরে চাণ্ডিল্যবাহিনী কলচুরীরাজ লক্ষ্মীকর্ণের কাছে পরাজিত ও নিগৃহীত হয়। পরবর্তী যুগে চাণ্ডিল্যরাজ কীর্তিবর্মণের সেনাপতি সামন্ত-গোপালের অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হলে চাণ্ডিল্য রাজসভায় একটি বিজয়োৎসবের অনুষ্ঠান হয়। ওই আনন্দ অনুষ্ঠানে কবি কৃষ্ণমিশ্র রচিত '*প্রবোধচন্দ্রোদয়*' নাটকটি অভিনীত হয়। সেই নাটকে একটি যৌথ-



চিত্র 11.6 সুতনুকা, খাজুরাহো

যৌনাচার দৃশ্যের ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ কৌল-কাপালিক তন্ত্রের এই বীভৎস আচার সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছিল।

স্বীকৃতি পেয়েছিল কিন্তু শুধুমাত্র রাজা-রাজড়ার মহলে। জনসাধারণের এবং বিদ্বজ্জনের সায় এতে ছিল না তা একই সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে যাই। একাধিক চিন্তাবিদ এই কৌল-কাপালিক তন্ত্রের ব্যভিচারের বিরুদ্ধে পুঁথি রচনা করে গেছেন। দশম শতাব্দিতে সোমদেব,[2] একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ক্ষেমেন্দ্রদেব[3] এবং ঐ শতাব্দির শেষ পাদে যমুনাচার্য[4]। কিন্তু ভোগৈশ্বর্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাজন্যকুল কর্ণপাত করেননি। হেরমান গোয়েৎস্‌ও বলছেন, এতে সাধারণ মানুষের সায় ছিল না।

"It is evident that public opinion disapproved of their (Kaula Kapalika) practice as depraved, though moral standards then were rather lax, and prostitution acknowledged as quite a reputable profession - of course only its expensive type — catering for the high society."[5]

অথচ, আশ্চর্য—'*মার্গ*' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় এই সহজ সত্যটার কোনো স্বীকৃতি নেই। অতি-যৌনাচার-কলুষিত স্থূল নিদর্শনগুলিতে যাঁরাই আপত্তি জানাতে চেয়েছেন, তাঁদেরই বলা হয়েছে—biased, Westerners, prude, diehard bourgeois ইত্যাদি। তার মানে কি '*মার্গ*' পত্রিকার মতে ক্ষেমেন্দ্রদেব, সোমবেদ, যমুনাচার্যরা Westerner? Diehard bourgeois?

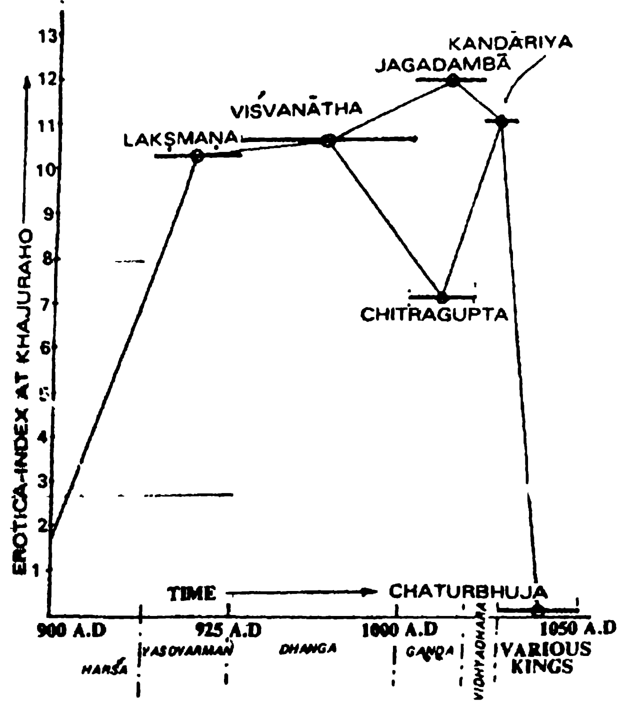
সহজ সরল সত্যটা সবিনয়ে স্বীকার করে নেওয়াই তো মঙ্গল : এই যৌথ-যৌনাচার পরিকল্পনায় ভারতীয় ঐতিহ্যের সমর্থন নেই। সেটা তদানীন্তন অবক্ষয়ী সমাজের প্রতিফলন। উপনিষদের বাণী কপ্‌চিয়ে তার নৈতিক সমর্থন অন্বেষণ করাও নিষ্প্রয়োজন।

খাজুরাহো ও কোনার্ক মন্দিরের ইরটিকা-ইন্ডেক্সের তুলনা :

সাধারণ দর্শক বা যাঁরা খাজুরাহো কোনার্ক দুটি মন্দিরই দর্শন করেছেন তাঁদের সাধারণ মত—খাজুরাহোর মন্দিরগুলি অধিকতর অশ্লীল। আমাদের বিচার পদ্ধতি যে অভ্রান্ত এমন দাবী করছি না, কিন্তু কয়েকটি পূর্বশর্ত মেনে নিয়ে আমরা যে 'ইরটিকা-ইন্ডেক্স' পাচ্ছি তাতে সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, উভয়ের মধ্যে কোনার্কই সমধিক অশ্লীলতা ও যৌনাচার মণ্ডিত। আঙ্কিক জটিলতা পরিহার

করে মোটামুটিভাবে একথা সকলেই নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, প্রথম তিন শ্রেণির মিথুনের অপেক্ষা শেষ তিন শ্রেণির মিথুন-মূর্তিতে যৌনতা ও অশ্লীলতা অনেক বেশি। আমরা একটি সারণি উপস্থাপিত করেছি, যাতে খাজুরাহের ছয়টি প্রধান মন্দিরের প্রথম তিন ও শেষের তিন শ্রেণির মিথুনের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে প্রথম তিনটি শ্রেণির মিথুন আছে 90 শতাংশ, আর শেষ তিন শ্রেণির মিথুন মাত্র 10 শতাংশ।

তুলনায় কোনার্কে প্রথম তিন শ্রেণির মিথুন শেষ তিন শ্রেণির প্রায় সমসংখ্যক। ভাষান্তরে কোনার্কে অশ্লীলতা তথা যৌনতার মান খাজুরাহো মন্দিরগুলিতে সমবেতভাবে ধরলে অনেক বেশি। তাহলে কেন সাধারণ দর্শকের মনে হয় যে, খাজুরাহো মন্দিরে মিথুনাচার কোনার্ক মন্দিরের অপেক্ষা বেশি? আমাদের ধারণা তার একটি মাত্র হেতু। খাজুরাহো মন্দিরগুলির প্রধান পাঁচটি দেবদেউল—যা ঘুরে-ফিরে দেখতে দর্শনার্থীরা প্রায় সমস্ত সময় ব্যয় করেন— তার কেন্দ্রীয় অবস্থানে ঐ বৃহদাকার যৌথযৌনাচারের অশ্লীলতম মূর্তিগুলির অবস্থান। সেই পাঁচটি মন্দিরের দুই-পাশেই কেন্দ্রীয় অবস্থানে যৌথ-যৌনাচারের নির্লজ্জ প্রদর্শন। কোনার্কে যে যৌথ-যৌনাচার মূর্তি আছে তারা এভাবে কেন্দ্রীয় স্থানে সোচ্চার নয়। তা মনে ওভাবে দাগ কাটে না। সম্ভবত এই হেতুতেই খাজুরাহো অধিকতর অশ্লীলতা-মণ্ডিত বলে সাধারণের ধারণা। ❑



চিত্র 11.7 খাজুরাহোতে ইরটিকা-গ্রাফ

তুলনামূলক সারণি : খাজুরাহো/কোনার্ক

মন্দিরের নাম	সর্বমোট মিথুন সংখ্যা	প্রথম তিন শ্রেণি		শেষ তিন শ্রেণি	
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
খাজুরাহো					
লক্ষ্মণেশ্বর	37	33	89	4	11
বিশ্বনাথ	88	78	89	10	11
চিত্রগুপ্ত	53	51	96	2	4
জগদম্বা	79	71	90	8	10
কাণ্ডারীয়	81	71	87	10	13
চতুর্ভুজ	12	12	100	—	—
সম্মিলিতভাবে	**350**	**316**	**90**	**34**	**10**
কোনার্ক রথচক্র বাদে পরিদৃশ্যমান বিমান ও জগমোহন	387	190	49	197	51

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কোনার্ক মন্দিরে মিথুনাচার



আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া'র অন্যতম আদিসূরী স্যার জন মার্শাল একবার লিখেছিলেন, 'পৃথিবী যদি আজ ভারতবর্ষকে প্রশ্ন করে 'তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-বিস্ময় কী দেখাতে পার?' তাহলে জবাবে ভারতবর্ষ তার শ্রেষ্ঠ ছয়টি শিল্পতীর্থের নাম বলতে পারে। কালানুক্রমিকভাবে সেগুলি : অজন্তা, সাঁচি, ইলোরা, খাজুরাহো, কোনার্ক এবং তাজমহল।'

মার্শাল লেখেননি, কিন্তু আমরা যদি কল্পনা করি : পৃথিবী যে কথা শুনে বলল, 'অত সময় আমার নেই বাপু, এর ভিতর যে কোনো তিনটির নাম কর বরং?'

তাহলে ভারতবর্ষ বলত, 'আমার শ্রেষ্ঠ ত্রিরত্ন হচ্ছে : অজন্তা, কোনার্ক আর তাজ।'

ওই তিনটি বিস্ময়ের মধ্যে অজন্তা গড়ে উঠেছিল দীর্ঘ নয় শতাব্দি ধরে। শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন অসংখ্য রাজা-রাজরা, ভূম্যধিকারীর দল। তাজমহল গড়তে সময় লেগেছিল বিশ বছর এবং সারা ভারতের মানুষ সেই দীর্ঘ বিশ বছর ধরে পত্নীবিরহাতুর সম্রাটকে কর জুগিয়ে গেছে, 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে'।

তুলনায় কোনার্কের সূর্যমন্দির নির্মিত হয়েছিল মাত্র দ্বাদশ বৎসরের ভিতর, একজনমাত্র স্থানীয় ভূস্বামী নরসিংহ দেবের ঈশ্বরপ্রেম এবং অগণিত ওড়িয়া স্থপতি-ভাস্কর ও মেহনতি মজুরের ঘর্মস্রোতের বিনিময়ে।

ভারতের শিল্প-ইতিহাসে অজন্তা দীর্ঘদিন অবজ্ঞাত বিস্মৃত হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ নয় শতাব্দিব শিল্পস্ফুরণের পরে অজন্তা অজ্ঞাত কারণে অজ্ঞাত অবলুপ্ত হয়ে পড়েছিল পরবর্তী দীর্ঘতর একাদশ শতাব্দিকাল। অষ্টাদশ শতাব্দিতে তা পুনরাবিষ্কৃত হয়েছিল নিতান্ত ঘটনাচক্রে। খাজুরাহোর একই ইতিহাস। দশম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দি পর্যন্ত মন্দিরগুলি জঙ্গলাকীর্ণ প্রান্তরে উপেক্ষিত কালাতিপাত করেছে।

সে হিসাবে কোনার্কের সূর্যমন্দিব কোনদিনই হারিয়ে যায়নি। ভারতীয় ও বিদেশী নাবিকের দল ত্রয়োদশ শতাব্দি থেকে কোনার্ক মন্দিরচূড়াকে চিনে রেখেছিল তটরেখায় এক দিগদর্শক চিহ্ন হিসাবে। তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে সিংহলের পথে যাত্রার সময় কোনার্ক সূর্যমন্দিবের সুউচ্চ চূড়াটি বরাবর ছিল উপকূলরেখার একটি পরিচিত চিহ্ন।

আকবরের শাসনকালের (1556-1605) ভিতর বাংলার আফগান নবাব সুলেমান করনানি কোনার্ক সূর্যমন্দির ধ্বংস ও লুঠপাট করতে যায়। কিন্তু করনানিব সৈন্যদল মন্দির এলাকায় উপনীত হবার পূর্বেই তদানীন্তন কলিঙ্গরাজ মুকুন্দদেব কোনার্ক মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে সূর্যমূর্তিটি তাঁর সুরক্ষিত রাজধানী অর্ককেন্দ্রে (পুরীতে) স্থানান্তরিত করে ফেলেন। আফগান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে মুকুন্দদেব শহিদ হয়ে যান। আফগান সেনাপতি ধর্মান্ধ কালাপাহাড় পৈশাচিক উল্লাসে এই অপূর্ব মন্দিরের বিভিন্ন শিল্প-নিদর্শনগুলি ধ্বংস করে দিয়ে যায়।

আকবরের নবরত্নের অন্যতম ইতিহাসবেত্তা মহাপণ্ডিত আবুল ফজল কোনার্ক মন্দিরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি ফার্সি ভাষায় এই মন্দিরের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে যা লিখেছিলেন তার ইংরেজি অনুবাদ : ''It is said that somewhat over 730 years ago, Raja Narsingha Deo completed this stupendous fabric and left this mighty memorial to posterity.'' [শোনা যায় প্রায় 730 বৎসর পূর্বে রাজা নরসিংহ দেব এই অতি বিশাল শিল্পকীর্তিটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে এই মহান স্মৃতিচিহ্নটি ভবিষ্যৎকালকে উপহার দিয়েছিলেন।]

কিন্তু আমরা জানি, রাজা নরসিংহ দেব কলিঙ্গ শাসন করেছিলেন আবুল ফজলের সময়কালের মাত্র দুই শো বছর পূর্বে। তাহলে ঐতিহাসিক 730 বৎসরের কথা লিখলেন কেন? ইদানীং কালের গবেষকদের মতে পণ্ডিতপ্রবর আবুল ফজলের এটা একটি হিমালয়ান্তিক কালভ্রান্তি! কেউ কেউ বলেছেন, এ ভ্রান্তির উৎস

চিত্র 12.1 রাশিচক্রে অগ্নিকোণের অবস্থান এবং অয়ন-চলন

তালপাতার পুঁথির অনুলেখকদের। সেটা মানতে মন চায় না, কারণ আবুল ফজলের মূল পুঁথিটি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে 130 নয়, 730 সংখ্যাই লেখা আছে। আমরা এখানে যে অনুবাদটি দিয়েছি সেটি করেছিলেন এ কালের আর এক মহাপণ্ডিত স্যর যদুনাথ সরকার—ফার্সি থেকে ইংরেজিতে। স্যর যদুনাথ 'মুসলিম পিরিয়ডে'র উপর একজন অথরিটি! অপরপক্ষে আবুল ফজলের যাবতীয় ঐতিহাসিক তথ্যের বর্ণনা নির্ভুল। অন্তত কোনার্ক সূর্যমন্দির প্রসঙ্গে। তাহলে এই 'অ্যানাক্রনিজম' বা কালানৌচিত্য দোষটি এল কোন সুড়ঙ্গ পথে? আধুনিক গবেষকদের অনুমান স্যর যদুনাথ মূল পুঁথি থেকেই ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং তাঁর কোনও ভুল হয়নি। ভুলটি আবুল ফজলের।

আমরা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত : আবুল ফজল বা স্যর যদুনাথ, দু'জনের কেউই ওই সংখ্যাটা লিখতে ভুল করেননি। সংখ্যাটা 730 হবে। তবে অনুবাদটা সম্ভবত একটু অন্যরকম হওয়া উচিত ছিল।

শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে চন্দ্রভাগা নদীর মোহনায় সূর্যোপাসনা শুরু হয়েছিল এক অতি পুণ্য তিথিতে। সেটি ছিল মাঘী শুক্লাসপ্তমী তিথি, যে শুভ লগ্নে সূর্য অবস্থান করছিলেন রাশিচক্রের অগ্নিকোণে। 'অগ্নিকোণ' হচ্ছে কুম্ভরাশির মধ্যবর্তী অবস্থান। মকর ও মীন রাশির সমদূরত্বে। কুম্ভরাশির 15° অবস্থানে। সেই পুণ্য তিথিতে চন্দ্রভাগার মোহনায় একটি বার্ষিক 'সূর্যমেলা'র আয়োজনও করা হয়েছিল। মেলাটি প্রায় হাজার বছর ধরে আজও বসে, তবে চন্দ্রভাগার বিজন মোহনায় নয়, কোনার্কতীর্থে; অর্থাৎ কোনার্ক সূর্যমন্দির প্রাঙ্গণে। কিন্তু এখন সে মেলাটি মাঘ (ডিসেম্বর) মাসে হয় না, হয় ফেব্রুয়ারিতে। বর্তমানে মেলাটি বসে সূর্য যখন মকর রাশির 26° অবস্থানে। অর্থাৎ 'অগ্নিকোণ' থেকে 12° উজিয়ে। তিথিটা কিন্তু সেই একই : শুক্লাসপ্তমী। কিন্তু কেমন করে এমনটা হল?

ছবিতে আমরা দেখিয়েছি (চিত্র 12.1) অগ্নিকোণের অবস্থান; অর্থাৎ মেলা শুরু হওয়ার সময় সূর্য রাশিচক্রে যেখানে ছিলেন। তাছাড়া দেখিয়েছি সূর্য ওই তিথিতে বর্তমানে কোথায় আছেন।

এই ভ্রান্তিটা হচ্ছে যে বিজ্ঞানসম্মত হেতুতে তাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে বলা হয় 'অয়ন চলন' (precession of the equinoxes)। তথ্যটা বুঝে নেওয়া কঠিন নয়।

পৃথিবী নিজের অক্ষের চারিপাশে অহ্নিকগতিতে পাক মারছে। কিন্তু সেই কেন্দ্রীয় অক্ষরেখাটিও অতি ধীর গতিতে একটা পাক মারছে। কেমন জানেন? একটা ঘূর্ণমান লাট্টুর যখন দম ফুরিয়ে আসে তখন তার 'আল'টা যেমন মাতালের মতো টলতে থাকে, নিজের চারদিকে পাক মারে। পৃথিবীর এই কেন্দ্রীয় অক্ষরেখাটি পুরো এক পাক মারতে (360° ঘুরতে) সময় নেয় প্রায় 26,800 বৎসর। তার ফলে রাশিচক্রে সূর্য অতি ধীর গতিতে সরতে থাকে। সূর্যের এই পিছু হটার পরিমাণ হচ্ছে প্রতি বছরে 1′ (এক মিনিট, অর্থাৎ এক ডিগ্রির ষাট ভাগের এক ভাগ)।

মেলার সময় থেকে সূর্য যদি 19° পেছিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে কাজ করার জন্য সূর্যের সময় লেগেছে, বছরে এক মিনিট হারে (19×60) 1,140 বছর। ভাষান্তরে মেলাটি যে পুণ্য দিনে (নির্দিষ্ট তিথিতে) শুরু হয়েছিল তা আজ থেকে 1,140 বছর পূর্বে। (অর্থাৎ প্রায় নবম শতাব্দির মাঝামাঝি)।

আবুল ফজল কোন্ বৎসর আইন-ই-আকবরীর পৃষ্ঠায় এই মেলার বর্ণনাটি রচনা করেছিলেন তা অবশ্য আমরা জানি না। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা বলেন . সময়টা সম্রাট আকবরের শাসনকালের শেষ পর্যায়ে। অর্থাৎ যোড়শ শতাব্দি থেকে সপ্তদশ শতাব্দিতে সংক্রমণকালে। দেখা যাচ্ছে, এই সময়কাল থেকে যদি 730 বছর পিছিয়ে যাওয়া যায় তাহলে (1600-730) আমরা পৌছে যাব সেই নবম শতাব্দির মাঝামাঝি কালেই।



চিত্র 12.2 জেমস ফার্গুসনের আঁকা স্কেচ—1837

আমাদের অনুমান : নির্ভুল অনুবাদটি বোধহয় এইরকম হওয়া উচিত ছিল, "It is said that Raja Narasingha Deo completed this stupendous fabirc, initiated somewhat about 730 years ago, and left this mighty memorial to posterity. [শোনা যায়, রাজা নরসিংহ দেব এই অতি বিশাল শিল্পকীর্তিটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন, যার সূচনা হয়েছিল 730 বৎসর পূর্বে, এবং এই মহান স্মৃতিচিহ্নটি ভবিষ্যৎকালকে উপহার দিয়েছিলেন।]

আমার নেই, পাঠকের যদি ফার্সি ভাষা পড়ার মতো বিদ্যে থাকে তাহলে আবুল ফজলের মূল পুঁথিটির পাঠোদ্ধার করে দেখতে পারেন, আমাদের এ অনুমান সত্য কিনা। দীর্ঘ দিনের 'কালভ্রান্তি' অপরাধ থেকে তাঁরা তাহলে মহাপণ্ডিত আবুল ফজলকে মুক্তি দিতে পারেন।

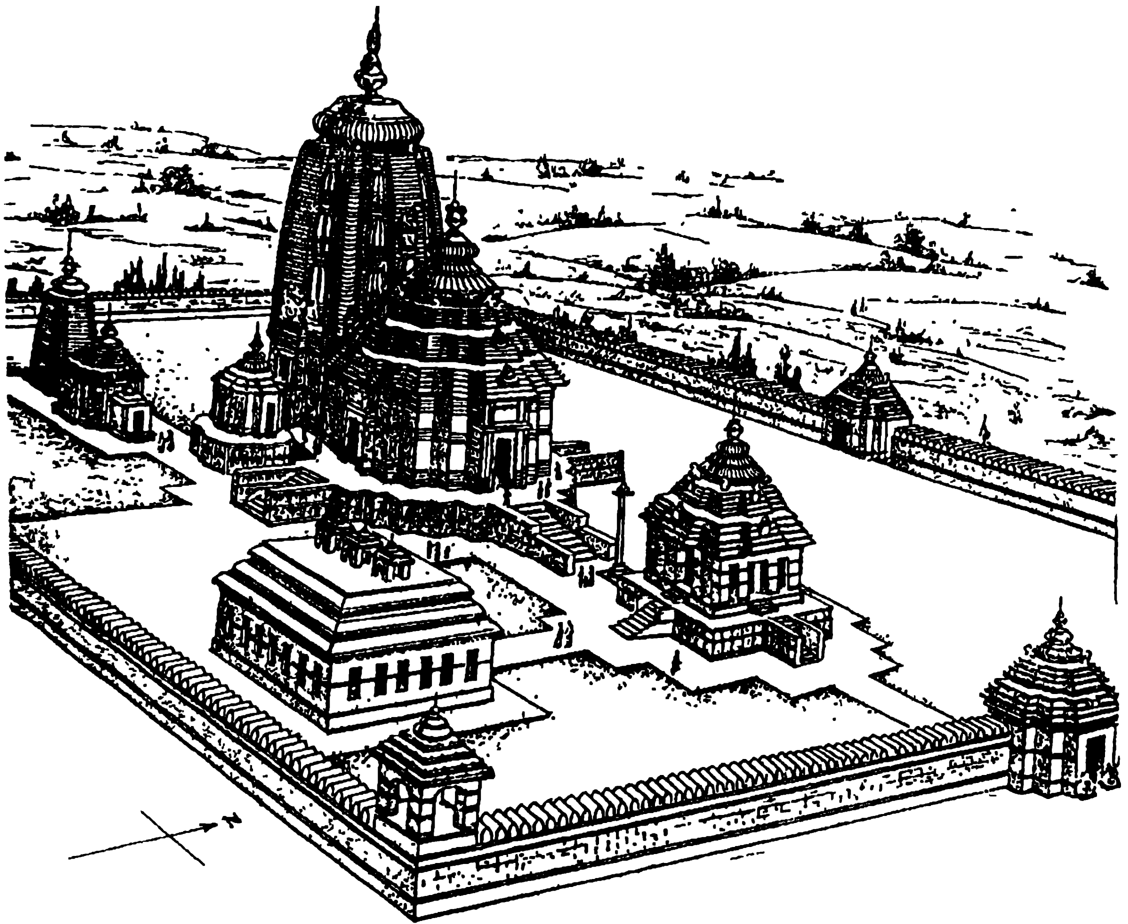
আবুল ফজলের পরে মাদলাপঞ্জিতে লেখা আছে (পুরী মন্দিরের মহাফেজখানায় সংরক্ষিত প্রাচীন হাতেলেখা পুঁথি) 1628 খ্রিস্টাব্দে খুর্দার জনৈক রাজা কোনার্ক মন্দির দর্শন করেন এবং একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যান। মাদলাপঞ্জীর বিবরণ অনুসারে তখন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজ্যপাল হিসাবে বাখর খান ছিলেন উড়িষ্যার শাসক।

এখানেও দেখছি, মাদলাপঞ্জীতে একটি 'কালানৌচিত্য-দোষ' ঘটেছে। কারণ সম্রাট জাহাঙ্গীর তার পূর্ববৎসর, 1627 সালে বেহেস্তে চলে গেছেন। খুররম্ তখন শাহজাহাঁ রূপে ভারতের একছত্র অধিপতি।

মাদলাপঞ্জী অনুসারে দেখা যাচ্ছে, খুর্দারাজ কোনার্ক মন্দিরকে অক্ষত অবস্থায় দেখেছিলেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী মন্দিরটি পরিত্যক্ত, মূল সূর্যমূর্তিটি অপসারিত (সেটাই স্বাভাবিক, কারণ রাজা মুকুন্দদেব তার পূর্বেই কালাপাহাড়ী আক্রমণের আশঙ্কায় দেবমূর্তিটি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে অপসারিত করেন)। কিন্তু মূলমন্দিরের বিমানচূড়া (গর্ভগৃহের উপর নির্মিত প্রধান মন্দিরের চূড়া) ছিল অক্ষত।

প্রায় দুই শত বৎসর অতিবাহিত হবার পর, বস্তুত 1825, এডওয়ার্ড স্টার্লিং নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন সামরিক অফিসার সূর্যমন্দিরটি দর্শন করেন। তাঁর আন্দাজে মন্দির চূড়ার উচ্চতা ছিল 125 ফুট। (31.10 মিটার)। তিনি আরও বলেছিলেন মন্দিরচূড়া তখনো খাড়া ছিল, যদিও পতনোন্মুখ। সমস্ত এলাকাটি ছিল ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ।

পরবর্তী দর্শক প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ জেমস্ ফার্গুসন। তিনি এই মন্দিরটি দর্শন করেন 1837 সালে। বারো বছর পরে। ফার্গুসন দেখেন ইতিমধ্যে মন্দিরচূড়াটি ভেঙে পড়েছে। শুধু একটি বঙ্কিম স্তম্ভসদৃশ অংশ কোনক্রমে দাঁড়িয়ে আছে [It looks like a curved column, about to be collapsed.]। ফার্গুসন ভবিষ্যৎকালের



চিত্র 12.3 সদ্যসমাপ্ত কোনার্ক মন্দিরের সম্ভাব্য চিত্র (অধ্যাপক ব্যাশাম অনুসরণে)

জন্য একটি রেখচিত্রও রেখে গেছেন।[1]

চোখ-আন্দাজে ফার্গুসন লিখেছিলেন মন্দিরচূড়ার উচ্চতা আনুমানিক 150 ফুট (45.72 মিটার) ছিল। দেখা যাচ্ছে অক্ষত মন্দিরচূড়া দেখে স্টার্লিং যে উচ্চতা অনুমান করেছিলেন, শুধুমাত্র মন্দিরের আংশিক বক্রতা দেখে ফার্গুসন তার চেয়েও ভাল অনুমান করতে পেরেছেন। কারণ অধ্যাপক ব্যাশাম মাদলাপঞ্জী ঘেঁটে পরবর্তীকালে আমাদের জানিয়েছেন, The tower was over 200 ft. (61 m) high.[2] [মন্দিরচূড়ার উচ্চতা ছিল দুইশত ফুটের (61 মিটার) উপর।] অক্টার্লোনি মনুমেন্টের ডবল।

ফার্গুসনের স্কেচটি পরে তাঁর অমূল্যগ্রন্থে [History of Architecture, London, 1865] সঙ্কলন করেন। বুঝতে অসুবিধা নেই যে, মন্দির চূড়াটি ভেঙে পড়ে 1825-1837 সালের মাঝখানে কোনও একটি দুর্যোগের দিনে। বর্তমানকালের বিভিন্ন গবেষক তার ভিন্নভিন্ন কারণ দেখিয়েছেন। সে সব কথা বিস্তারিত না জানলেও চলবে। আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি বাস্তবে কী ঘটেছিল :

হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থাপত্য-ভাস্কর্যের অসামান্যতার কোনো মূল্য নেই, যদি সে মন্দিরে দেবতা না থাকেন। সুতরাং মুকুন্দদেব সূর্যমূর্তিটি অপসারণ করার পরে এ মন্দির তার মূল্য ও আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। কলিঙ্গরাজ এর মেরামতির জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে অস্বীকার করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায় সমকালেই চন্দ্রভাগা নদীটি তার গতিপথ পরিবর্তন করে। ফলে মোহনার বন্দরটি তার আকর্ষণ হারায়। গ্রামবাসীরা অন্যত্র সরে যেতে থাকে।

হতভাগ্য চন্দ্রভাগার নাব্যতাও তখন নিম্নমুখী। নৌকা যাতায়াতও কমে গেল। বট-অশ্বত্থ-নিম গাছের চারা গজাতে শুরু করল মন্দিরের খাঁজে-খাঁজে। তাদের শিকড় মন্দিরের পাথরে ধরালো ফাটল। বৃষ্টির জল প্রবেশ করতে শুরু করল ভিতরে। মন্দিরের দৃঢ়তা অবনমিত হল ক্রমে। মনে হয়, ফার্গুসন মন্দিরচূড়ার যে বঙ্কিম অংশটি দেখেছিলেন তাও উড়িষ্যার এক বিধ্বংসী ঝড়ে ভেঙে পড়ে 1848 খ্রিস্টাব্দে।

স্টার্লিং এবং ফার্গুসন এই সূর্য মন্দিরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন বটে কিন্তু তাঁদের দু'জনের মধ্যে কেউই উপলব্ধি করতে পারেননি এই স্থাপত্য-নিদর্শনের অননুকরণীয় অনবদ্য বৈশিষ্ট্যের কথা। এর রথাকৃতি-স্থাপত্যগুণ। তাঁদের দোষ নেই, কারণ তাঁরা যখন মন্দিরটি দর্শন করেন তখন সূর্যমন্দিরের বিশাল রথচক্রগুলি ছিল বহু শতাব্দীসঞ্চিত বালুকাস্তূপে সমাধিস্থ। শুধু রথচক্র নয়, রথাশ্বগুলিও ছিল বালুকাস্তূপের তলায়।

এশিয়াটিক সোসাইটি ততদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিতান্ত অর্থাভাব সত্ত্বেও সোসাইটি এর মেরামতির একটা প্রচেষ্টা করেন 1867 সালে। পর বৎসর প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ স্যার রাজেন্দ্রলাল মিত্র অশেষ পরিশ্রমে এই মন্দিরটি দর্শন করে আসেন। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নরের কাছে একটি



চিত্র 12.4 পূষা



চিত্র 12.5 মধ্যাহ্ন সূর্য

সনির্বন্ধ অনুরোধপত্র পাঠান ওই মন্দিরটি উদ্ধার করার জন্য। ফলে তদানীন্তন গভর্নর স্যার আশলে ইডেন কোনার্ক মন্দির দর্শন করে এই মন্দিরটি মেরামতির জন্য সামান্য অর্থবরাদ্দ করেন। প্রয়োজনের তুলনায় তা যৎসামান্য। কোনও কাজই হল না তাতে।

নিতান্ত ঘটনাচক্রে ওই সময়েই মেরিন বোর্ড-এর কর্তাব্যক্তিরা ফোর্ট উইলিয়ামের বড় কর্তাদের দপ্তরে একটি আবেদনপত্র পাঠান। তাঁরা জানান যে, কোনার্ক মন্দিরে জগমোহন-চূড়াটি রক্ষিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ কলকাতা থেকে মাদ্রাজ যাবার পথে নাবিকদের কাছে ওই মন্দিরচূড়াটি তটরেখার একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিকদর্শক। কলকাতা ও মাদ্রাজ ছিল সে যুগে কোম্পানির রাজত্বের দুটি স্তম্ভ—ফলে ফোর্ট উইলিয়ামের বড়কর্তারা সম্মত হলেন সেই দিকচিহ্নটি বাঁচিয়ে রাখতে।

মেরামতির কাজ শুরু হল 1901 সালে। সার জন মার্শাল, যাঁর নাম এ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই উল্লেখ করা

হয়েছে, তখন আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার কর্ণধার। লর্ড কার্জনের আমল। শুরু হল বালুকাস্তূপ অপসারণের কাজ। স্থানীয় গ্রামবাসীরা এতদিন যে পাথর চুরি করত সেটাও বন্ধ হল।

বালির পাহাড় অপসারণের পরে সূর্যমন্দিরের অনন্য-



চিত্র 12.6 পূষা (প্রভাত সূর্য)

সাধারণ স্বরূপটি প্রকটিত হয়ে উঠল। রথমন্দির-স্থাপত্যের পরিকল্পনাটি এতদিনে বোঝা গেল।

মূল পরিকল্পনাকার কলিঙ্গ স্থাপত্যরীতিকে অস্বীকার না করেও একটি অনবদ্য মন্দির গড়ে তুললেন : 'রথমন্দির'। কলিঙ্গ-স্থাপত্যের গতানুগতিক রীতিকে তিনি বর্জন করলেন। অর্থাৎ একই কেন্দ্রীয় রেখায় পরপর চারটি অঙ্গ — ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, জগমোহন ও বিমানের পৌনঃপুনিকতাকে ত্যাগ করলেন। এই বিন্যাস কলিঙ্গ স্থাপত্য অনুকরণ করেছিল খাজুরাহোর চাণ্ডিল্য নাগর-স্থাপত্য থেকে এবং কয়েক শতাব্দি ধরে কলিঙ্গ ছিল সেই পৌনঃপুনিকতায় আবদ্ধ। প্রাথমিক যুগে কলিঙ্গের একক (রামেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর প্রভৃতি) মন্দির ক্রমে যুগল-মন্দিরে (পরশুরামেশ্বর) বিবর্তিত হয়েছিল। তার পরবর্তীকালে ওই একই কেন্দ্রীয় রেখায় চার মন্দিরের পরিকল্পনা খাজুরাহোর অনুকরণে গড়ে উঠতে থাকে। লিঙ্গরাজ, অনন্ত বাসুদেব এবং পুরীর জগন্নাথের মন্দির সেই চতুর্মাত্রিক গঠনচিন্তায়। কোনার্ক মন্দিরের ভূমিনক্‌শা ও পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায়।

অধ্যাপক ব্যাশামের বর্ণনা আক্ষরিক অনুবাদে [3] :

"এ অঞ্চলের যাবতীয় মন্দিব-পরিকল্পনার সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে কোনার্ক মন্দিরে সংযুক্ত দুটি ক্ষুদ্রতর মন্দির তৈরি করা হয়েছে, মূলমন্দিরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নরূপে। শুধুমাত্র জগমোহন ও মূলমন্দিব একটি বিরাট পাদপীঠের উপব নির্মিত। এই পাদপীঠ বা প্ল্যাটফর্মের চারিদিকে সর্বমোট চব্বিশটি বিরাটাকার রথচক্র। এক একটির ব্যাস 10 ফুট (3.05 মিটার)। প্রবেশপথে উপনীত হতে হবে প্রশস্ত সোপানাবলী অতিক্রম করে। সেই সোপানের দুদিকে উল্লম্ফনরত রথাশ্বের ভাস্কর্য। সবটা মিলিয়ে মন্দিরটিকে গড়া হয়েছে বিবাট এক রথের আদলে, যে রথে চড়ে চরৈবেতিমন্ত্রে সূর্যদেব নিরবধিকাল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের পথে চলেছেন।" (চিত্র 12.3)

সম্মুখাংশে জগমোহনে রথচালক অরুণের আসন। পশ্চাৎভাগের মূলমন্দিরে বথী, সূর্যদেব অধিষ্ঠিত। যুগ্ম-পাদপীঠের সম্মুখাংশ তো প্রবেশপথ, বাকি তিনদিকে

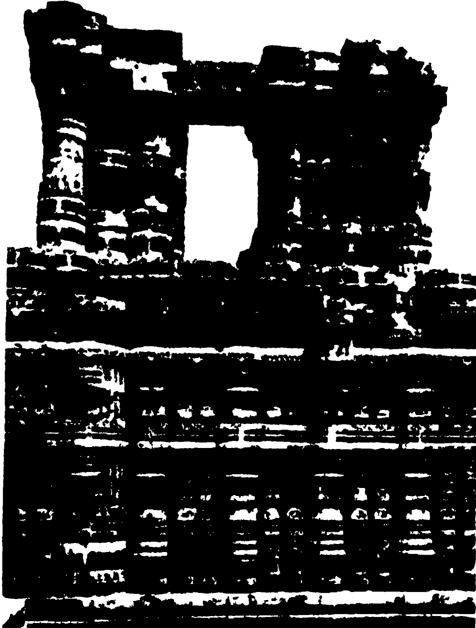


চিত্র 12.7 হরিদশ্ব (অস্তগামী সূর্য)

তিনজন পার্শ্বদেবতা। এ পরিকল্পনা মূলত কলিঙ্গরীতিতে, কিন্তু মূল স্থপতি পার্শ্বদেবতার নির্বাচনে তাঁর বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

কলিঙ্গে যাবতীয় মন্দিরের বৃকোদরভাগ হচ্ছে শিবমন্দির। সেগুলি অনিবার্যভাবে পূর্বমুখী। শিল্পশাস্ত্রানুসারে বাকি তিনদিকে শিবের সংসারের তিন দেবদেবীর আসন সুনির্দিষ্ট। ভারতীয় রীতিতে পত্নীর আসন পতির বাম দিকে। তাই শিবমন্দিরে, শিবের বামে, অর্থাৎ উত্তর-পার্শ্বদেবীর আসনটি, সুনিশ্চিতভাবে শিবানীর। গণপতির মন্দির দক্ষিণে এবং কার্তিকেয়র পশ্চিমে। এই অনুক্রম সর্বভারতের শিবমন্দিরে অপরিবর্তিত।

আমরা যতদূর জানি, সূর্যদেবের চারজন সহধর্মিণী রাজ্ঞী, নিক্ষুভা, ছায়া এবং সুবর্চলা। পরিকল্পনাকার তাঁদের কাউকেই কিন্তু উত্তর-পার্শ্বদেবী হিসাবে আমন্ত্রণ করেননি। তিন-তিনটি পার্শ্বদেবতার ক্ষুদ্রতর কুলুঙ্গি-মন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন সূর্যের তিন প্রতিরূপ। দক্ষিণে আছেন পূষা অর্থাৎ প্রভাতসূর্য। পশ্চিমে মধ্যাহ্নমার্তণ্ড এবং উত্তরদিকে হরিদ্রাভ অস্তগামী দিনমণি—অশ্বপৃষ্ঠে হরিদশ্ব।



চিত্র 12.8 নাটমন্দিরের পার্শ্বচিত্র

তিনটি মূর্তিই অসামান্য, অপরূপ। তিনটিই কষ্টিপাথরে খোদিত। নিঃসন্দেহে বহু দূরদেশ থেকে চন্দ্রভাগা নদীপথে এই কষ্টিপাথর আনীত হয়েছিল, কারণ



চিত্র 12.9 নাটমন্দির—গরুড়াবলোকনে

স্থানীয় প্রস্তর সবই বালিপাথর বা ল্যাটারাইট; গ্র্যানাইট নয়।

তিনটি মূর্তিই দ্বিভুজ। মস্তকে মণিখচিত মুকুট। পরিধানে পাটকরা ধুতি। প্রত্যেকেরই পায়ে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা 'টপবুট'। এটি সূর্যমূর্তির এক বৈশিষ্ট্য। আসুন, একে একে পার্শ্বদেবতাগুলিকে কাছে গিয়ে দেখি :

পূষা : ঈশোপনিষদ বলেছেন : "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।" [হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আবৃত। হে পূষন! তোমার ওই দৃষ্টিদহনকারী তেজ সম্বরণ কর। আমাকে সত্যস্বরূপ প্রণিধান করতে দাও।]

এ সেই প্রভাতসূর্য : পূষা! সমভঙ্গে দণ্ডায়মান। দুটি হাতই ভেঙে গেছে। স্বর্ণমেখলার এবং রত্নোপবীতের সূক্ষ্ম কারুকার্যে বিস্মিত হতে হয়। দেবমূর্তির এক-এক দিকে, কবাটবক্ষের সমতলে, সূর্যের দুই পত্নী : রাজ্ঞী ও ছায়া। সমভঙ্গ মূর্তির দু'পাশে দুই দেহরক্ষী দণ্ড ও পিঙ্গল মুক্তকৃপাণ হস্তে অতন্দ্র প্রহরায় দণ্ডায়মান। পদতলে সূর্যসারথী অরুণদেব। তাঁর নিচে সপ্তাশ্ব। স্থানীয় গাইড হয়তো আপনাকে বোঝাতে চাইবে তারা সাতজন সপ্তাহের সাত 'বারের' প্রতীক। বাস্তবে তা নয়। তারা

সাতজন বৈদিক সপ্তছন্দের প্রতীক : গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ এবং জগতী।

মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড : এঁরও হাতদুটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ইনিও সমভঙ্গে দণ্ডায়মান। মূর্তির পরিকল্পনা পূষার অনুরূপ; কিন্তু এবার সূর্যের চার পত্নীই উপস্থিত। এক-এক দিকে দুইজন। দক্ষিণ পদতলে নতজানু কলিঙ্গরাজ এবং বাম পদতলে মন্দির-পুরোহিত। মার্তণ্ডের কণ্ঠে শতনরীতে সূক্ষ্ম আলঙ্কারিক কারুকার্য। নাসিকা কালাপাহাড়ী অত্যাচারে ভগ্ন; কিন্তু হাসিটি মৃত্যুঞ্জয়।



চিত্র 12.10 কোনার্ক সূর্যমন্দির

হরিদশ্ব : দক্ষিণ পার্শ্বদেবতার বাহন অশ্বটি অস্তগামী সূর্যের প্রভায় হরিদ্রাভ। শাস্ত্রসম্মত বিরল অশ্বারোহী দেবমূর্তি। হেনরিখ্ জিমারের দুই খণ্ডে প্রকাশিত প্রামাণ্য গ্রন্থের (The Art of Indian Asia) জ্যাকেটে এঁর চিত্রটি ব্যবহৃত। এঁরও মস্তকে সুশোভিত মুকুট। হাত দুটি কালাপাহাড় ভেঙে দিয়ে গেছে।

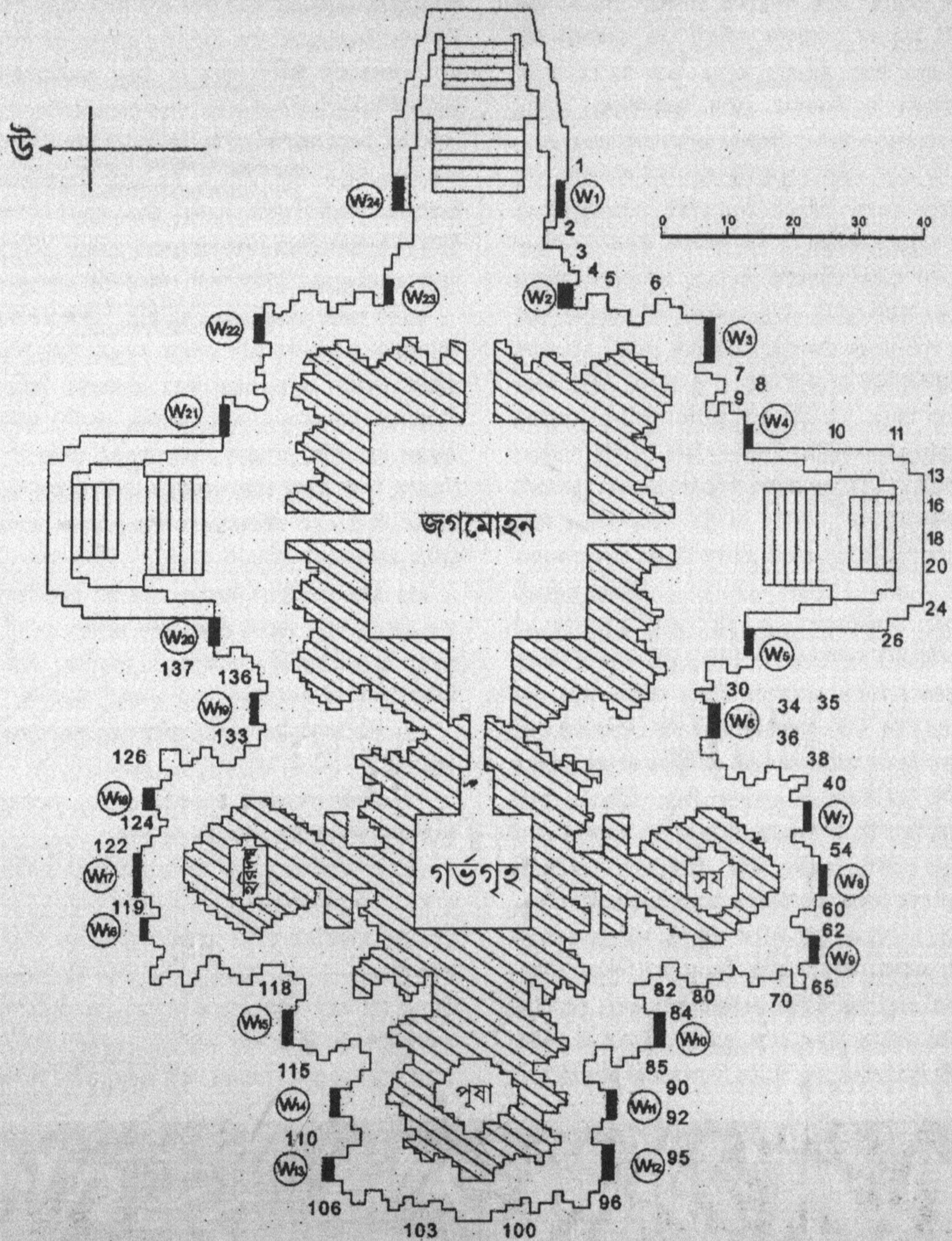
জগমোহনের সম্মুখভাগে কেন্দ্রীয় অক্ষরেখায় প্রোথিত হয়েছিল বৃহৎ এক প্রস্তরের অরুণ স্তম্ভ। পরবর্তীকালে এটিকে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সে মন্দিরের প্রবেশপথে একে নিশ্চয় দেখেছেন।

অরুণস্তম্ভের পূর্ব দিকে একই কেন্দ্রীয় রেখায় নির্মিত নাটমন্দিরের (চিত্র 12.8) উর্ধ্বাংশ বিনষ্ট হয়েছে। এ মন্দিরের সুউচ্চ পাদপীঠে অপূর্ব ভাস্কর্য। নৃত্যরতা দেবদাসীর মূর্তি। তিন দিকে প্রশস্ত সোপানাবলী। এই নাটমন্দিরের একটি গরুড়াবলোকন দৃশ্য দেওয়া গেছে। নাটমন্দিরটি ষোলোটি ভারবাহী স্তম্ভের উপর নির্মিত। চিত্র 12.8-এ এ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের আর একটি নিকটদৃশ্য দেওয়া হয়েছে। পাদপীঠে এবং উপরাংশে একের পর একটি দেবদাসীর মূর্তি। অধিকাংশই নৃত্যরতা। কোনার্ক মন্দিরের সর্বত্র মৈথুনরত মিথুনের প্রাচুর্য বিরক্তিকর; কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই নাটমন্দিরে যে অংশটি অক্ষত আছে সেখানে একটিমাত্রও মৈথুনরত মিথুন খুঁজে পাবেন না। এমনকি শৃঙ্গাররত মিথুনও নয়। নাটমন্দিরে শুধুই নৃত্যগীতরতা সুতনুকা নেচে গেয়ে বলতে চায়, 'বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে।' তারা সম্পূর্ণ যৌনতা-বর্জিত। সঙ্গীতের এক নিস্তব্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে ওই দেবদাসীর দল। মনে হয়, যাত্রী ও পর্যটকের ভিড় যদি না থাকত, যদি ওই নাটমন্দিরের চাতালে সন্ধ্যার পর নিশ্চুপ বসে থাকার অনুমতি পেতাম, তাহলে সারা রাত ধরে শুনতে পেতাম রাগ-রাগিণীর মূর্ছনা। বেহাগ-ইমন অতিক্রম করে মধ্যরাত্রের দরবারী কানাড়ায় মেতে উঠত এই নাটমন্দির। ভোর রাতের রামকেলী বা ভৈরোঁয় যবনিকা পতন হত সারারাতের নৃত্যগীতের উৎসব। চিত্র 12.9-এ গরুড়াবলোকনে নাটমন্দিরের ষোলোটি ভাঙা স্তম্ভকে দেখা যাচ্ছে। কাছে সরে এলে তাদের কী রূপ তা বোঝা যাচ্ছে চিত্র 12.8-এ।

কলিঙ্গ স্থাপত্যরীতিতে—ইতিপূর্বেই বলেছি—চারটি মন্দির-অঙ্গ একই কেন্দ্রীয় অক্ষরেখায় নির্মিত হয়। পূর্ব থেকে পশ্চিমে : ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, জগমোহন (দর্শনার্থীদের স্থান) এবং বিমান (গর্ভগৃহের উপর নির্মিত মূল মন্দির)। এই প্রচলিত রীতি অস্বীকার করলেন কোনার্ক স্থপতি, রথমন্দির-স্থাপত্যে। ভোগমণ্ডপটি কেন্দ্রীয় রেখায় নির্মিত হয়নি। বিমানের দক্ষিণপূর্ব কোণে অর্থাৎ নাটমন্দিরের দক্ষিণে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ভোগমণ্ডপটি নির্মিত হয়েছিল। তার মাথায় সম্ভবত ছিল সমতল ছাদ। পার্সি ব্রাউনের আনুমানিক চিত্রে (চিত্র 12.3) তাকে দেখা যাচ্ছে।

চিত্র 12.10 এ সামনের দিক থেকে সূর্যমন্দিরের বর্তমান অবস্থা একটি আলোকচিত্রে দেখানো হয়েছে।

জগমোহন ও বিমান যৌথভাবে একটি রথের আকার



চিত্র 12.11 কোনার্ক-মন্দিরের ভূমিনকশা

ধারণ করেছে। রথে সর্বসমেত চব্বিশটি রথচক্র। এক একটি মানুষের উচ্চতাকে ছাপিয়ে যায়, প্রায় 1.5 মি. এক-এক দিকে বারোটি করে। চিত্র 12.11 হচ্ছে জগমোহন ও বিমানের যৌথ ভূমি-নক্‌শা। অর্থাৎ প্লিন্থ-লেভেলে-কাটা সেক্‌শানাল প্ল্যান। বলাবাহুল্য, হ্যাচ-লাইনে আঁকা অংশটায় সুপারস্ট্রাকচার ছিল বা আছে। তার চতুর্দিকে খোলা রক-এর মতো। এই খোলা-চাতালের বাইরে দিয়ে আমরা মন্দির প্রদক্ষিণ করব। 'প্রদক্ষিণ' বোঝেন তো? মন্দিরকে সবসময় প্রকৃষ্টরূপে দক্ষিণে রেখে। অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার ঘূর্ণনছন্দে। আমাদের যাত্রা শুরু পূর্ব প্রান্তের সোপানের দক্ষিণাংশ থেকে। এই খোলা চাতালের প্লিন্থ বা 'পৃষ্ঠ'-তে 1, 2, 3, 4... করে নম্বর দেওয়া আছে। সেগুলি প্লিন্থ-অংশে অবস্থিত ভাস্কর্যের পরিচয়সূচক—শুধুমাত্র যৌনতাবর্জিত ভাস্কর্য। আমরা সর্বমোট 137টি ভাস্কর্যকে চিহ্নিত করেছি। চব্বিশটি রথচক্রকেও W.1 থেকে W.24 রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। মিথুনাচার-মণ্ডিত ভাস্কর্য নিদর্শন আমরা সনাক্ত করেছি—চক্র 1 থেকে চক্র 20-র ভিতর সর্বমোট 137টি। সময়াভাবে চক্র 20 থেকে চক্র 24-এর 'আদমসুমারী' করা সম্ভবপর হয়নি। ভূমি-নক্‌শায় আমরা মিথুনাচার-মণ্ডিত ভাস্কর্যগুলি চিহ্নিত করিনি। কিন্তু পরে তাদের বর্ণনা করার সময় কত নম্বর চক্র থেকে কত নম্বর চক্রের ভিতর তাদের অবস্থান তা সূচিত হয়েছে। প্রথমে আমরা যৌনতাবর্জিত (নম্বর দিয়ে চিহ্নিত) 21টি ভাস্কর্যের বর্ণনা ক্রমানুসারে করে যাচ্ছি। পুনরুক্তি দোষ সত্ত্বেও বলি, এগুলি সবই প্লিন্থ-অংশে অবস্থিত। ঊর্ধ্বাংশের বিরাট ভাস্কর্যগুলির হিসাব আমরা দিচ্ছি না।

(1) এখানে, প্রায় জমির সই-সই সমান্তরাল একটি লম্বা নক্‌শা। সবটাই হাতি শিকারের। বিভিন্ন পর্যায়। 'খেদা'-পদ্ধতিতে জীবিত অবস্থায় হাতি ধরা। পোষমানা হাতির পিঠের উপর বসে দামামা বাজিয়ে বা পটকা ফাটিয়ে হাতিদের কিছু গর্তের দিকে চালনা করা হয়। এই কৃত্রিম গর্তগুলি আগেই খনন করে তার উপর মাচা বেঁধে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। বন্য হাতিরা ওই খাদে পড়ে গেলে আর উঠতে পারে না। তারা অসহায় হয়ে পড়ে। তখন তাদের কিছুদিন অনাহারে রেখে নির্জীব করে ফেলা হয়। পরে 'কুন্‌কি'-হাতির সাহায্যে তাদের 'খেদায়' বন্দী করা হয়। পোষ মানানো হয়। এই নিষ্ঠুর খেদা শিকারের কিছুটা দেখা যাচ্ছে চিত্র 12.12-এ ও 12.13-এ। প্রথম চিত্রে দেখা যাচ্ছে বন্য হাতিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়ে তারা খেদায় বন্দি হয়েছে।

হাতির কথাই যখন উঠল তখন বলি : জমি সই-সই দীর্ঘ প্যানেলে ক্রমাগত হাতি দেখতে পাবেন। সময় নিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে বন্য হাতি আর পোষমানা হাতির জীবনযাত্রার নানান দৃশ্য দেখতে পাবেন আপনি। স্থানীয় একজন বৃদ্ধ গাইড আমাকে বলেছিল, সে গুণতি করে দেখেছে, গোটা চত্বরে হাতি আছে 1,152টি! আমরা গুণে দেখিনি, কিন্তু ওকে অবিশ্বাসও করতে পারিনি। হয়তো হাতির সংখ্যা অতই হবে।

(2) রাজ-পরিবারের সকলে এসেছেন দেবমন্দিরে পূজা দিতে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মন্দিরে যে মূর্তি আছে তা মহিষমর্দিনী, জগন্নাথ ও শিবলিঙ্গ। অর্থাৎ সূর্যমূর্তি নেই। রাজপুরোহিতের হাতে একটি বরমাল্য।

(3) দড়ি টানাটানির একটি কৌতুককর দৃশ্য। একটু বৈচিত্র্য।

(4) পঞ্চম রথচক্রের কাছাকাছি দেখছি, যুদ্ধযাত্রার পূর্বে রাজা দর্পণে তাঁর যুদ্ধসজ্জা দেখছেন।

(5) উপর-জঙ্ঘা অংশে এক সদ্যবিবাহিত দম্পতির ভাস্কর্য। এ শিল্প-নিদর্শনের সবচেয়ে বড় আবেদন দুজনের মুখে পূর্ণ পরিতৃপ্তির হাসি। আজও সদ্যবিবাহিত দম্পতি যখন স্টুডিও-তে ফটো তোলাতে যান, তখন ক্যামেরাধারী তাঁদের মুখ 'হাসি-হাসি' করতে বলেন। এক সেকেন্ডের সূক্ষ্মভগ্নাংশকাল কৃত্রিম হাসি ফোটাতে নবদম্পতি হিমসিম খেয়ে যায়। এখানে কিন্তু এই সুখী দম্পতি দীর্ঘ সাত-শ'



চিত্র 12.12 হাতি শিকার

চিত্র 12.13 হাতি শিকার

বছর ধরে তাদের অমলিন হাসিটি ধরে রেখেছে। লবণাক্ত সামুদ্রিক হাওয়ায় ওদের বালি-পাথরের অঙ্গ ক্ষয়ে গেছে—কিন্তু হাসিটি আছে অম্লান (চিত্র 12.14)।

(6) কলিঙ্গরাজের দরবারে উপস্থিত হয়েছেন আফ্রিকার কোনো রাজার প্রতিনিধি। নিয়ে এসেছেন প্রচুর উপঢৌকন। 'আফ্রিকার রাজা' বলছি কোন্ অধিকারে? কারণ প্যানেলের নিচের অংশে ডানদিকে দেখা যাচ্ছে রাজ-প্রতিনিধি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন দীর্ঘগ্রীব একটি বিরাট জন্তু। যা ভারতে অপরিচিত। সমগ্র ভারতের মন্দির-ভাস্কর্যে এই জীবটির একমাত্র প্রতিনিধি : 'জিরাফ' প্রজাতির।

(7) রাষ্ট্রবিপ্লবে পরাজিত একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। ওর স্ত্রীর কাঁকালে শিশু, মাথায় একটা প্যাঁটরায় তার যথাসর্বস্ব। শ্রান্ত যোদ্ধা বসে পড়েছে গাছের তলায়।

(8) রাজা একটি বন্যবরাহকে বধ করছেন। ষষ্ঠ রথচক্রটিকে যদি একটা ঘড়ি হিসাবে কল্পনা করেন তাহলে বেলা সাড়ে দশটার কাছাকাছি এই ভাস্কর্যটি দেখতে পারেন। ওই অংশের একটি স্কেচ করে এনেছিলাম। সেখানে রাজাকে দেখা যাচ্ছে। তাঁর দক্ষিণ হস্তে উদ্যত তরবারি, বাম হস্তে বরাহটি ঝুলছে (চিত্র 12.16)।

(9) পুনরায় একটি শিকারের দৃশ্য।

(10) একটি দুর্লভ ভাস্কর্য। এটি দেখতে ভুলবেন না।



চিত্র 12.14 সদ্য বিবাহিত দম্পতি/কোনার্ক

দেখা যাচ্ছে, চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-য়েন-ৎসাঙকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে একজন পথপ্রদর্শক। পরিব্রাজকের একহাতে ছাতা, অপর হাতে কিছু পাণ্ডুলিপি। তাঁর কান



চিত্র 12.15 আফ্রিকান অ্যাম্বাসাডার কলিঙ্গরাজকে জিরাফ উপহার দিচ্ছেন

দুটি দীর্ঘ—বুদ্ধমূর্তির কথা স্মরণে এনে দেয়। সপ্তম শতাব্দির এই বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজকের—আমি যতদূর জানি—এই একটিমাত্র আলেখ্য গড়া হয়েছে সমগ্র ভারতের মন্দির ভাস্কর্য।

(11) সপ্তম রথচক্রের কাছাকাছি পুনরায় একটি দীর্ঘগ্রীব জন্তু। কিন্তু তার পিঠ দেখে বোঝা যায় সেটি উট নয়। হয়তো এটিও একটি জিরাফের ভাস্কর্য।

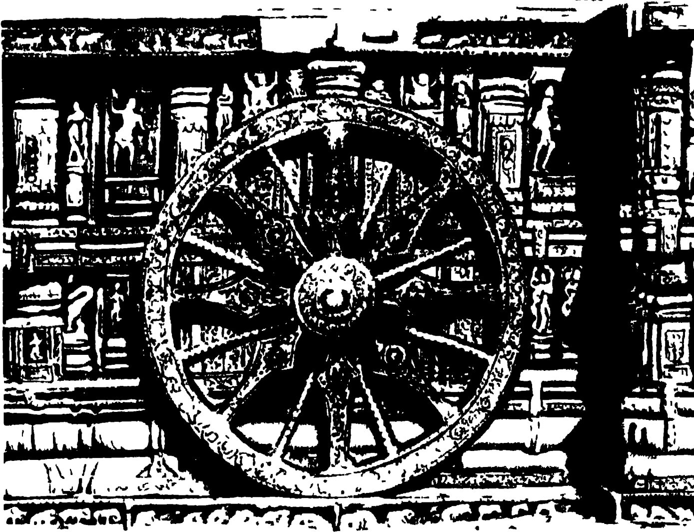
(12) দীর্ঘ এক শোভাযাত্রার দৃশ্য। মহারাজ বসেছেন সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে। পিছু পিছু রানী চলেছেন পাল্‌কিতে। সঙ্গে পদাতিক দেহরক্ষী।

(13) আবার একটি শিকারের দৃশ্য। এবার হাতি নয়, হরিণ।

(14) অশীতিপরা এক বৃদ্ধা দুর্গম তীর্থযাত্রা করতে উদ্যত। পরিবারের সকলে তাঁকে বিদায় জানাচ্ছে। পুত্রবধূ বৃদ্ধার চরণপ্রান্তে প্রণামরতা। পুত্র ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

সবচেয়ে করুণ বৃদ্ধার ছোট নাতিটির আবেদন। সে ঠাকুমার জানু জড়িয়ে ধরেছে 'যেতে নাহি দিব!'

(15) হস্তি-হস্তিনী এবং দুগ্ধপোষ্য স্তন্যপানরত শিশু হস্তী।



চিত্র 12.16 ষষ্ঠ রথচক্রের স্কেচ/কোনার্ক

(16) খেদায় হাতি ধরবার দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি।

(17) হাতিধরার অন্য একটি পদ্ধতি . 'ফাঁসি শিকার'। ফাঁস দিয়ে আমেরিকায় এককালে বাইসন ধরা হতো। এই ভারতবর্ষে ফাঁসি-শিকারে হাতি ধরার প্রচলন ছিল কি না তা আমরা জানি না। কৌতূহলী পাঠক *গজমুক্তা* বইটি পড়ে দেখতে পারেন।

(18) বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর প্রতি বক্রোক্তি করতে এটি গড়া হয়েছে। এটি একটি মিথুন। আমরা এটিকে এখানে উল্লেখ করেছি যেহেতু মিথুন হলেও যৌনতার প্রদর্শন এক্ষেত্রে হয়নি। দেখছি, জটাধারী এক শ্মশ্রুমণ্ডিত সাধু একটি স্ত্রীলোকের হস্তধারণ করেছেন।

(19) কথক কিছু কাহিনি শোনাচ্ছেন। তাঁকে ঘিরে বসেছে শ্রোতার দল। সম্ভ্রান্ত তাঁরা। কারণ কথকতার আসরের বাহিরে প্রতীক্ষা করছে সুসজ্জিত হস্তী, পল্যাঙ্কিকা, অশ্ব প্রভৃতি।

(20) পুনরায় এক শিকারের দৃশ্য।

(21) রাজান্তঃপুরের দৃশ্য।

ভাস্কর্যগুলির মাপ বোঝা যাবে চিত্র 12.17 থেকে। জগমোহনের দক্ষিণপ্রান্তে প্রায় ছয় ফুট (দুই মিটার) দীর্ঘ লেখকের অনুপাতে প্লিন্থ কতটা উঁচু তা বোঝা যাচ্ছে। এখানে উপানে (সর্বনিম্ন জমি সই-সই প্যানেলে) ক্রমাগত হাতির সারি দেখা যাচ্ছে।

কোনার্ক সূর্যমন্দিরে সামূহিক স্থাপত্য-ভাস্কর্য নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম। এবার আমরা এই মন্দিরের মিথুনাচার সম্বন্ধে বিচার করব। এখানে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড মৈথুনরত-মিথুন মূর্তিগুলি নিতান্ত বিভ্রান্তিকর—আজকের দিনের দর্শকের চোখে। মৈথুনরত মূর্তির শতকরা আশি-নব্বই ভাগ দণ্ডায়মান অবস্থায়। শায়িতবন্ধ অপেক্ষাকৃতভাবে কম। এটা সাধারণ মানুষের দাম্পত্যজীবনের বিপরীত প্রতিফলন। এবিষয়ে পূর্বাচার্যরা যা সমাধান দাখিল করে গেছেন আমরা তার সঙ্গে একমত হতে পারিনি। অধ্যাপক আর্চার বলেছেন :

Supine or horizontal designs and compositions would detract from the upward surge of the temple. They would be appropriate in 'feminine buildings' such as the Jefferson Memorial, Washington, or the National Gallery, London— buildings whose flat horizontal lines support a rounded breast-like dome. Temples in medieval India were male in their own right. There towers were like lingams. As sculpture, there the lover's vertical positions are geared to this conception. But lay them down, make the necessary mental adjustments and what is wild and fantastic is once again conventional.[4]

[শায়িত বা জমির সঙ্গে সমান্তরাল মৈথুনরত মিথুনের পরিকল্পনায় দেউলের ঊর্ধ্বানুসারী ব্যঞ্জনা ব্যাহত হত। সে-জাতীয় মিথুন ওয়াশিংটনের জেফারসন-স্মৃতিমন্দির অথবা লন্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারির পক্ষে উপযুক্ত—কারণ তারা স্ত্রী-জাতীয়া সৌধ। তাদের ছাদের গম্বুজ রমণীর স্তনসুলভ সুডৌল; সেখানে

জমির সমান্তরাল রেখারই আধিক্য।... মধ্যযুগের ভারতীয় মন্দিরগুলি স্বাধিকার মতে সবাই পুরুষ। তাদের শিখর লিঙ্গপ্রতীকী। সুতরাং প্রেমিকযুগলের দণ্ডায়মান ভঙ্গি সেই ছন্দেরই অনুবর্তন। মূর্তিগুলিকে মনে মনে শায়িত-অবস্থায় কল্পনা করুন।—তাহলে যা এতক্ষণ ছিল অবাস্তব ও অদ্ভুত তা পরিচিত রূপ নেবে।]

আমরা মানতে পারলাম না। একাধিক হেতুতে। প্রথমত লেখকের ওই ধারণাটা ভ্রান্ত : মধ্যযুগের 'ভারতীয় মন্দিরগুলি স্বাধিকারমতে সবাই পুরুষ' নয়। তারা তিন জাতের—পুরুষ, স্ত্রী, ও স্ত্রীজাতীয়ার নিকটবর্তী উভলিঙ্গের; যথাক্রমে রেখ, পীড়, ও কাখর দেউল। দ্বিতীয় কথা : মৈথুনরত মূর্তিগুলিকে বিদেশী সমালোচকের দৃষ্টিতে wild & fantastic মনে হতে পারে, ভারতীয় দর্শকের চোখে তা লাগে না। কারণ নিজ নিজ দাম্পত্যজীবনে তার ব্যবহার স্বল্প হলেও সেগুলি সবই পরিচিত সঙ্গমাসন—বাৎস্যায়ন, কল্যাণমল্ল, বা রতিরহস্যে তার নিখুঁত বর্ণনা আছে।

তবু একথাও স্বীকার্য—কী কামশাস্ত্র, কী বাস্তব অভিজ্ঞতা—দণ্ডায়মান বন্ধের সঙ্গে শায়িত বন্ধের যে অনুপাত তার তুলনায় কোনার্কে শায়িতবন্ধ অনেক-অনেক কম। আমাদের মতে তার হেতু নিম্নোক্ত প্রকার :

নদীদৃশ্য আঁকবার সময় শিল্পী সচরাচর এমন কাগজ বা ক্যানভাস বেছে নেন, যা চওড়ায় বেশি, খাড়াইয়ে কম। শিল্পী ইন্দ্র দুগারের একটি গঙ্গা-সিরিজ আছে। আমি তার খানপঞ্চাশ জলরঙের-আঁকা ছবি দেখেছি, এমন একখানা ছবির কথা মনে করতে পারছি না যেখানে কাগজটা খাড়াইয়ের দিকে বড়, প্রস্থে কম। কলিঙ্গ-খাজুরাহোর ভাস্করের যদি ইচ্ছামতো শিল্পভূমি নির্বাচনের অধিকার থাকত, তাহলে শায়িত বন্ধকাম মূর্তি আমরা যথেষ্ট সংখ্যায় দেখতে পেতাম। 'পেতাম' বলছি কেন? পেয়েছি। কোনার্কে সর্বসমেত চব্বিশটি বিরাটাকার রথচক্র আছে। তার কেন্দ্রীয় নেমিতে (central axle) চব্বিশটি শিল্প গড়ার ভূমি শিল্পীরা পেয়েছিলেন। প্রত্যেকটিই বৃত্তাকার। প্রস্থ ও উচ্চতা সেখানে সমান। যেকয়টি মিথুন-মূর্তি অভগ্ন অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি তার ভিতর একটিও দণ্ডায়মান-বন্ধ নজরে পড়েনি। প্রত্যেকটি শায়িতবন্ধ।

কিন্তু মন্দিরের বাহিরগাত্রে ভাস্করদল সে সুযোগ পাননি। ম্যুরাল পেইন্টার আজকের দিনেও কী মাপের ছবি আঁকবেন তা জেনে নেন আর্কিটেক্ট-এর কাছে। এ-ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। যে শিল্পভূমিতে মূর্তিগুলি উৎকীর্ণ করা হবে তা বাস্তুশাস্ত্রের নির্দেশে পূর্বনির্ধারিত। মন্দিরের প্ল্যান বা ভূমি-নক্‌শা কী হবে—ত্রি-রথ, পঞ্চ-রথ অথবা সপ্তরথ—তা পূর্বেই স্থিরীকৃত পৃষ্ঠ (plinth) ও বাড় অঞ্চল শাস্ত্রনির্দেশে খাঁজ-কাটা। রাহাপাগ, কোনাপাগ, অনুরাহাপাগ, অনুরথপাগ প্রভৃতি কোন্‌টি কতদূরে বসবে তা সুনির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়। অর্থাৎ বিস্তারের দিকে দেউল ক্রমাগত খণ্ডিত। অথচ তালজঙ্ঘা, উপরজঙ্ঘা প্রভৃতি শিল্পভূমির উচ্চতা অনেক বেশি। সোজা কথায় স্থপতিবিদ মন্দির নির্মাণ সম্পন্ন করে যে শিল্পভূমিগুলি ভাস্করকে অর্পণ করলেন তা চওড়ায় কম, উচ্চতায় তার তিন-চার গুণ। এক্ষেত্রে ভাস্কর যদি নির্দেশিত হন যে, ঐ শিল্পভূমিতে অর্থাৎ প্যানেলে মিথুন মূর্তিই গড়তে হবে, তখন তিনি তো অনন্যোপায় হয়ে দণ্ডায়মান মূর্তি বেছে নিতে বাধ্য।



চিত্র 12.17 জগমোহনের দক্ষিণপ্রান্তে দণ্ডায়মান লেখক/কোনার্ক

কোনার্ক মন্দিরের ভূমি-নক্‌শায় মিথুনাচারের জরীপ

আমরা শুধুমাত্র বাড়-অঞ্চলের (প্লিন্থ পর্যন্ত) যে

মিথুনমূর্তি নির্মিত হয়েছে তারই জরিপ করব। গণ্ডী (সুপারস্ট্রাকচার) অংশের সুবিশাল মূর্তিগুলিকে আমরা হিসাবে ধরিনি। প্রথমত, তাহলে আলোচনা অত্যন্ত জটিল হয়ে যাবে—মূর্তির অবস্থান বোঝাতে; দ্বিতীয়ত, সময়াভাবে আমরা সে খতিয়ান সংগ্রহও করে উঠতে পারিনি।

স্থান সঙ্কুলানের জন্য নিম্নলিখিত সংক্ষেপিতকরণ সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে :

যুগল মূর্তি...I	**ফেলাশিও**...VII ফে
উত্তেজিত মিথুন...II	**কানিলিঙ্গাস**...VII কা
শৃঙ্গাররত মিথুন...III	**অবাস্তব**...VIII
সমকামী...IV	**দণ্ডায়মান মৈথুনরত**...VI দ
স্বয়ং-মৈথুন...V	**বৃক্ষাধিরূঢ় আসন**...VI বৃ
মৈথুনরত মিথুন...VI	**নাগবন্ধ**...নাগ
পুংলিঙ্গ বোঝাতে... ♂	**আত্মসমর্পিত**...আত্ম
রথচক্র...চক্র	**স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাতে**... ♀

1. VIII

চক্র ১

2. III
3. VI
4. VIII
5. III

চক্র ২

6. VIII

চক্র ৩

7. VI
8. III
9. VI

চক্র ৪

10. III
11. III
12. VIII
13. V ♀
14. VI
15. VI
16. VI
17. VI
18. VII ফে
19. II
20. V ♀
21. III
22. VIII
23. V♀
24. VI
25. VI বৃ
26. V♀
27. VIII
28. VI নাগ

চক্র ৫

29. III
30. VI দ
31. III
32. VIII 2♀, 1♂
33. III
34. I

চক্র ৬

35. VIII 2♀, 2♂
36. V♂
37. VI দ
38. VI দ
39. VI নাগ
40. I

চক্র ৭

41. III
42. VI বৃ
43. III
44. VI
45. VI নাগ
46. III
47. VI
48. III
49. VI
50. III
51. VI বৃ
52 VII ফে
53. VII ফে
54. VI

চক্র ৮

55. III
56. VI
57. III
58. VII ফে
59. VI দ
60. III
61. VIII
62. VIII

চক্র ৯

63. VI
64. VI
65. VII
66. V
67. VI নাগ
68. III
69. III
70. VIII
71. V♀
72. VII ফে
73. V
74. VI
75. V আত্ম
76. VI নাগ
77. VIII 2♀ 1♂
78. VIII 2♀ 1♂
79. VI দ
80. VI দ
81. VIII 2♀ 2♂
82. VII ফে
83. VIII 2♀ 2♂
84. V আত্ম

চক্র ১০

85. VIII
86. VIII 3♀ 1♂
87. III
88. VII ফে
90. III

চক্র ১১

91. II
92. VI
93. VI দ
94. VI
95. II

চক্র ১২

96. V আত্ম
97. II
98. III
99. VI
100. III
101. VI
102. VI
103. II
104. III
105. VI দ
106. III

চক্র ১৩

107. VI
108. VI
109. VI
110. VII ফে

চক্র ১৪

111. IV
112. VIII

চক্র ১৫

113. V,♀
114. II
115. VII ফে

চক্র ১৬

116. VIII 2♀ 2♂
117. VIII 2♀ 2♂

118. IV
119. II

চক্র ১৭

120. V আত্ম
121. III
122. III
123. V ♀
124. VI
125. III

চক্র ১৮

126. VII ফে
127. VI
128. III
129. VIII
130. VI নাগ
131. VI
132. VII কা
133. V আত্ম

চক্র ১৯

134. VI দ
135. VIII
136. VIII
137. VIII
138. VI

চক্র ২০

139. VI
140. VI

করা সম্ভবপর হয়নি।

নাগদম্পতির যুগ্মবন্ধনকে আমরা VI শ্রেণিতে ধরেছি এবং আত্মসমর্পিতা মূর্তিগুলিকে V শ্রেণীতে। প্রথম কাজটির জন্য আমরা প্রাণীবিজ্ঞানীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, কারণ এ রূপক যৌন-মিলনের নয়; দ্বিতীয় কাজটির জন্য ধার্মিক ব্যক্তিদের কাছে আমরা মার্জনাভিক্ষা করছি। এ কাজ ব্যতীত আমাদের স্বীকৃত আটটি শ্রেণির ভিতর ওই মূর্তিগুলিকে শ্রেণিভুক্ত করা যেত না।

যাই হোক আমরা চক্র ১ থেকে চক্র ২০ পর্যন্ত যত মিথুনাচার জরীপ করেছি তার ফলাফল সংক্ষেপে নিম্নলিখিত রূপ :

মিথুনাচার	শ্রেণি	সংখ্যা	শতাংশ
যুগলমূর্তি	I	2	1.4
উত্তেজিত মিথুন	II	7	5.0
শৃঙ্গাররত মিথুন	III	30	21.5
সমকামী	IV	2	1.4
আত্মরত্যাতুর মিথুন	V	16	11.4
মৈথুনরত মিথুন	VI	47	33.5
ফেলাশিও/কানিলিঙ্গাস	VII	11	7.8
অবাস্তব পরিকল্পনা	VIII	25	18.0
মোট		**140**	**100.0**

জগমোহন ও বিমানের যৌথ বাড় অংশে সর্বসমেত 24টি রথচক্র আছে। প্রত্যেকটিতে আছে আটটি করে অর (spoke); প্রত্যেকটি অরের কেন্দ্রস্থলে আছে নানান জাতের নকশা এবং কেন্দ্রীয় নেমিতে (axle) একটি নকশা। ফলে প্রতিটি রথচক্রে আছে নয়টি নকশা গড়ার স্থান। শিল্পীর দল সেই অবস্থানে দুই জাতির নকশাই গড়েছেন—যৌন এবং অযৌন। আমরা সেগুলি গুনতি করেও দেখতে চেয়েছি। চাব্বিশটি রথচক্রের নকশার বিবরণ এবার সাজিয়ে দেওয়া গেল। আমরা অরগুলি গণনা করেছি ঘড়ির কাঁটার ঘূর্ণন ছন্দে, যাতে অষ্টম সংখ্যাটি হয় সর্বোচ্চ স্থান (ঘড়িতে যেটা বারোটা); কেন্দ্রীয় নেমিব অভিধা—নয় নম্বর।

এক্ষেত্রেও কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে স্থান সংকুলান করা হয়েছে :

নকশা ভেঙে গেছে, বা পাঠোদ্ধার করা যাচ্ছে না	?
বিভিন্ন ভঙ্গিতে একক সুতনুকা	সু
হস্তিপৃষ্ঠে রাজা, রানী	হ♂, হ♀
অনেকগুলি সুতনুকা, নানান ভঙ্গিমায় একত্রে	অ-সু
অশ্বারোহী পুরুষ	অ♂
অশ্বারোহী নারী	অ ♀
প্রসাধনরতা সুতনুকা	প্র
শালভঞ্জিকা	শা
দেবমূর্তি	দে
মাতৃমূর্তি	মা

চক্র ১

1. ?
2-8. সু
9. ?

চক্র ২

1. সু
2. সু
3. হ ♀
4. সু
5. ?
6. সু
7-8. VI
9. হ ♀

চক্র ৩

1. অ সু
2. প্র
3. VI
4. ?
5. অ♂
6. ?
7. VII কা
8. ?
9. সু

চক্র ৪

1. অ ♂
2. হস্তী
3. ?
4. হ ♀
5-9. ?

চক্র ৫

1. সু
2. হ ♀
3. ?
4-5. প্র
6-8. স
9. দে

চক্র ৬
1. সু
2. শা
3. VI
4. প্র
5. VI
6. ?
7. সু
8-9. ?

চক্র ৭
1. মা
2. ?
3. II
4. VI
5-6. II
7. I
8. VI
9. ?

চক্র ৮
1-2. ?
3-5. VI
6-9. ?

চক্র ৯
1. ?
2. II
3. ?
4. II
5. ?
6. সু
7-9. ?

চক্র ১০
1-2. ?
3. অ ♂
4-9. ?

চক্র ১১
1-9. ?

চক্র ১২
1-2. VI
3. ?
4. VI
5. ?
6-7. VI
8-9. ?

চক্র ১৩
1-2. ?
3-5. VI
6-8. ?
9. দে

চক্র ১৪
1-4. ?
5. IV
6-9. ?

চক্র ১৫
1. III
2-5. VI
6. III
7. শা
8. VI
9. শা

চক্র ১৬
1-5 VI
6. ?
7. প্র
8. VI
9. ?

চক্র ১৭
1. VII ফে
2. ?
3. VI
4-7. VI
8-9. ?

চক্র ১৮
1-2. ?
3-5. VI
6-8. সু
9. ?

চক্র ১৯
1. III
2. ?
3-4. VI
5. VIII
6. VI
7. সু
8. ?
9. গজলক্ষ্মী

চক্র ২০
1. ?
2. VI
3. II
4-6. VI
7. III
8. VI
9. ?

চক্র ২১
1. ?
2-4. VI
5. III
6-8. VI
9. ?

চক্র ২২
1-2. ?
3. দে
4-5. সু
6-9. ?

চক্র ২৩
1-2. ?
3-5. দে
6. বরাহ
7. দে
8. দে
9. অ...

চক্র ২৪
1. ?
2. প্র
3. ?
4. প্র
5. সু
6. সু
7-8. সু
9. ?

চব্বিশটি রথচক্রে সর্বসমেত (24×9) 216টি নকশা গড়ার স্থান ভাস্করদল লাভ করেছিলেন। তার ভিতর 86টি নকশা কী ছিল জানার সুযোগ নেই। বাকি 130টির ভিতর দেখা যাচ্ছে যৌনতা-বর্জিত বিষয়বস্তু চয়িত হয়েছে। 64 খানিতে। বাকি 66খানির নকশা মিথুনাচারী। বলা যায়, বর্তমানে যা দেখা যায় তার আধাআধি যৌনতা-বর্জিত, বাকি অর্ধেক মিথুনাচারী বিষয়বস্তুর। সেই 66খানি যৌনাচারী নকশায় উপস্থাপনা এই জাতের :

মিথুনাচার	শ্রেণি	সংখ্যা	শতাংশ
যুগলমূর্তি	I	1	2
উত্তেজিত মিথুন	II	2	3
শৃঙ্গাররত মিথুন	III	5	7
সমকামী	IV	6	9
আত্মরত্যাতুর মিথুন	V	নেই	0
মৈথুনরত মিথুন	VI	49	74
ফেলাশিত/কানিলিসেস	VII	2	3
অবাস্তব পরিকল্পনা	VIII	1	2
মোট		**66**	**100**

দেখা যাচ্ছে বৃকোদর-নক্শা—প্রায় তিন-চতুর্থাংশ—মৈথুনরত মিথুন। আরও লক্ষণীয়, প্রত্যকটি মৈথুনরত মিথুন গড়া হয়েছে শায়িতবন্ধে। দণ্ডায়মান মৈথুনরত মিথুন একটিও নজরে পড়েনি। ❑

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পুরীর প্রধান মন্দিরে মিথুনাচার



মাদলাপঞ্জী মতে কেশরী বংশের শেষ নৃপতি সুবর্ণ কেশরী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক-গমন করেন, এবং সেই সুযোগে দক্ষিণ দেশ থেকে ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা চোড়গঙ্গ পুরীতে এসে গঙ্গ-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজত্বকাল 1132-1152 খ্রিস্টাব্দ। মাদলাপঞ্জী বলছেন, ওই বংশের দ্বিতীয় নৃপতি গঙ্গেশ্বর (1152-1156 খ্রিঃ) তাঁর কোনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পিপ্‌লি ও খুর্দারোডের মাঝামাঝি অবস্থান দিয়ে একটি পয়ঃপ্রণালী খনন করান। তৎসহ শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির পুনর্নির্মাণ করান।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে চোড়গঙ্গ এবং গঙ্গেশ্বর অভিন্ন ব্যক্তি। তাঁর রাজত্বের শুরু 1118 খ্রিস্টাব্দে। পুরীর মন্দিরস্থলে বহু পূর্বযুগ থেকেই জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার একটি দেউল ছিল। তিনি সেই মন্দির বস্তুত পুনর্নির্মাণ করান। কিন্তু তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এই আরব্ধ কাজ শেষ করে যেতে পারেননি। সেটি সমাপ্ত করেন চোড়গঙ্গের প্রপৌত্র তৃতীয় অনঙ্গভীমদেব (1211-1238)। অর্থাৎ বর্তমানে আমরা যে মন্দির দেখতে পাই তা এই তিন নৃপতির অর্থানুকূল্যে দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দির মধ্যে নির্মিত।

নীলাচলে এই অবস্থানে একটি মন্দির যে দীর্ঘকাল পূর্বে নির্মিত হয়েছিল এবং গঙ্গ বংশ তা পুনর্নির্মাণ করেন—এ তথ্যটি ওড়িয়া ভাষায় লেখা মাদলাপঞ্জী ব্যতীত অন্যান্য সংস্কৃত পুরাণেও স্বীকৃত।

প্রাসাদং পুরুষোত্তমস্য নৃপতিঃ কো নাথ কর্তুংক্ষমঃ।
স্তস্যেতাদ্য নৃপৈরুপেক্ষিতময়ং চক্রেয় গঙ্গেশ্বরঃ।।

[পুরুষোত্তমের এই দেবদেউল, যা এতদিন পূর্ববর্তী রাজন্যবর্গ কর্তৃক উপেক্ষিত হয়ে পড়েছিল, গঙ্গেশ্বর সেটির সংস্কারকার্য করেছেন মাত্র।]

নীলাচলের মহিমার কথা মহাভারতে আছে, যা চোড়গঙ্গ দেবের রাজত্বকালের সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে লিখিত। জেমস্ ফার্গুসনের মতে নীলাচল হচ্ছে সেই বৌদ্ধশাস্ত্রসম্মত দন্তপুর, যেখানে তদানীন্তন কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দিতে বুদ্ধদেবের শ্বদন্তের উপর একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাঁর এই মতের স্বপক্ষে ফার্গুসন কয়েকটি যুক্তি পেশ করেছেন :

1) বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ নেই। শ্রীক্ষেত্র হচ্ছে সমগ্র ভারতের একমাত্র তীর্থ যেখানে প্রসাদ-অন্ন উচ্ছিষ্ট হয় না।

2) স্থবিরবাদী বৌদ্ধরা মূর্তিপূজা করতেন না—তাঁরা কখনো গৌতমবুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ করেননি। জগন্নাথদেবের মূর্তিও অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত।

3) বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্ব ত্রি-রত্নে বিধৃত—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।' পুরী মন্দিরেও ত্রিরত্ন—জগন্নাথ—সুভদ্রা— বলরাম। বৌদ্ধধর্মে ত্রি-রত্নের মধ্যে দুটি পুংলিঙ্গ শব্দের মাঝখানে একটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ— 'ধর্ম'—যা ধারণ করে। তা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, তার দুইপাশে দুটি পুংলিঙ্গ-শব্দ : বুদ্ধ ও সঙ্ঘ। পুরী মন্দিরের মূর্তিত্রয়ের পরিকল্পনাও একই রকম। মাঝখানে সুভদ্রা—দু-পাশে তাঁর দুই দাদা।

4) স্থবিরবাদী বৌদ্ধরা মারকে অস্বীকার করেছিলেন—তাই কি পুরীর ত্রিমূর্তি পরিকল্পনায় রাধা পরিত্যক্ত? শুধু ভাইবোনের সমাহার?

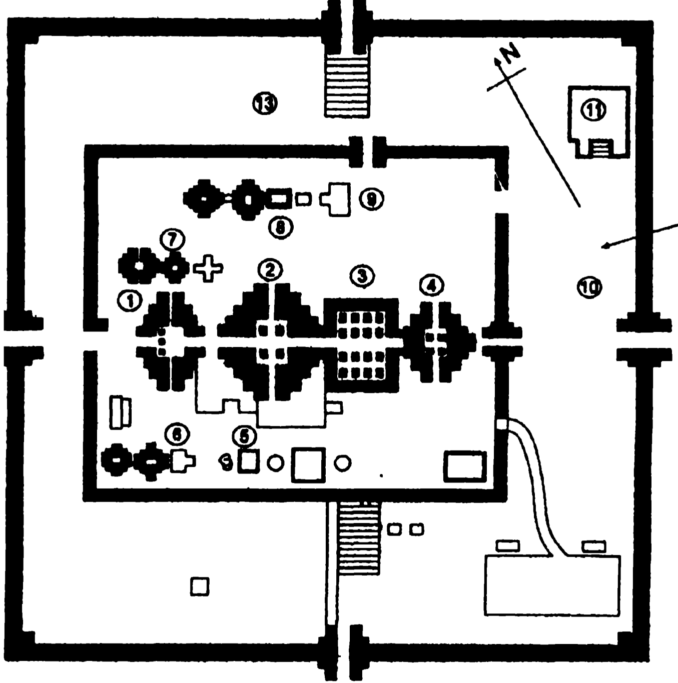
5) জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবের সঙ্গেও হয়তো বৌদ্ধধর্মের কিছু সম্পর্ক আছে। ফা-হিয়েন তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে মধ্য-এশিয়ার খোটানে এক রথযাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "শহর থেকে তিন অথবা চার 'লী' দূরে নগরবাসীরা একটা রথপ্রতিম চারচাকার গাড়ি নিয়ে এল।...মূল বিগ্রহকে কেন্দ্রস্থলে বসানো হল। আর তাঁর দুইপাশে বসানো হল দুই বোধিসত্ত্বকে। ভক্তেরা এই ত্রি-মূর্তিকে টেনে নিয়ে চলল।"

* * *

আপাতদৃষ্টিতে পুরীর মন্দির-বর্ণনায় আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয় থেকে দূরে সরে এসেছি। তা কিন্তু নয়। আমাদের বক্তব্য : কলিঙ্গের অন্যান্য মন্দিরে—ভুবনেশ্বর, কোনার্কে, খিচিঙে—আদিরস নিয়ে মিথুনাচার প্রকট হয়ে

উঠ্‌তে দেখেছি, অথচ পুরী মন্দিরে আমরা মিথুনাচারের কোনো চিহ্ন দেখতে পাই না। কেন? সেটা কি বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে?

আমি জগন্নাথদেবের মন্দির প্রথম দর্শন করি বিগত শতাব্দির পঞ্চাশের দশকে। তারপর গত শতাব্দিতে না হোক পনেরো-বিশবার পুরীর মন্দির দর্শন করেছি। সেখানে মিথুনাচারের কোন নিদর্শন না খুঁজে পেয়ে অবাক হয়েছি। কোনো 'যুগলমূর্তি'ও সেখানে গড়া হয়নি। কেন? তার কোনো অর্থ বুঝতে না পেরে গত শতাব্দির সত্তরের দশকে যখন *'ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন'* গ্রন্থটি রচনা করি তখন বাধ্য হয়ে পুরী-মন্দিরের মিথুন-ভাস্কর্যের অনুপস্থিতি নিয়ে আমরা কোনো আলোচনা করিনি। বরং আমরা অবাক হয়েছিলাম : *মানসী* পত্রিকায় গত শতাব্দির দ্বিতীয় দশকে কেন বিভিন্ন ভারতবিদ পণ্ডিত পুরী মন্দিরের অশ্লীল মূর্তির কথা বলেছেন? সে সমস্যার সমাধান সম্প্রতি হয়ে গেল নিতান্ত ঘটনাচক্রে। বিংশ শতাব্দির একেবারে শেষাশেষি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল। এক দুর্যোগরাত্রে মূল মন্দিরের উপর থেকে অতি বিশালায়তন একটি প্রস্তরখণ্ড সশব্দে নিচে ভেঙে পড়ে। সৌভাগ্যবশত তাতে কেউ নিহত বা আহত হয়নি। এতাবৎকাল মন্দির পুরোহিতদের প্রতিকূলতায় পূর্তবিভাগ বা পুরাতত্ত্ব বিভাগকে জগন্নাথ মন্দিরে মেরামতির কোনো কাজ করতে দেওয়া হয়নি। পাণ্ডারাই নিজ বুদ্ধি বিবেচনা মতো ঠিকাদার লাগিয়ে মেরামতির কাজ চালিয়ে যেত। এই মারাত্মক ঘটনার পর (সম্ভবত সরকারী হস্তক্ষেপে) পাণ্ডা-পরিষদ পুরাতত্ত্ব বিভাগকে মেরামতির অধিকার অর্পণ করে। বিগত দশকে যাঁরা জগন্নাথ মন্দির দর্শন করেছেন তাঁরা নিশ্চয় দেখেছেন লোহার ফ্রেমের ভারা বেঁধে জগন্নাথ মন্দিরের বিমান অংশ (বড় দেউল) ঘিরে ফেলে, ফ্লাড-লাইট জ্বেলে দিবারাত্র মেরামতির কাজ হচ্ছে। পুরাতত্ত্ববিদেরা লক্ষ্য করলেন, যে মন্দিরের বাহিরের দেওয়ালে স্থানে স্থানে অত্যন্ত পুরু (ছয় থেকে আট ইঞ্চি অর্থাৎ 15-20 সেমি. বেদের) চুন-সুরকির পলেস্তারা করা আছে। মন্দির সুরক্ষার প্রয়োজনে সেই অবাঞ্ছনীয় পলেস্তারা অপসারিত করা হয়। ওই পলেস্তারা অপসারণের পর মন্দিরগাত্রে একাধিক অর্ধোৎকীর্ণ (alto-relievo) মূর্তি দীর্ঘদিন পরে পুনরায় সূর্যালোকের স্পর্শ পায়। তখন দেখা যায়, জগন্নাথ মন্দিরেও ছিল ওই জাতির একাধিক তথাকথিত অশ্লীল মিথুনমূর্তি। আমাদের বিশ্বাস, বিগত শতাব্দির দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে—প্রাকস্বাধীনতা যুগে, কোন এক কলিঙ্গরাজ চুন-সুরকির পলেস্তারায় সেই মূর্তিগুলিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত করেন। এ জন্যই গত শতাব্দির প্রথমপাদে ব্রজেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রামেন্দ্র-



চিত্র 13.1. পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সামূহিক ভূমিনকশা

1. বিমান 2. জগমোহন 3. নাটমন্দির 4. ভোগমণ্ডপ 5. মুক্তিমণ্ডপ 6. বিমলামন্দির 7. লক্ষ্মীদেবীর মন্দির 8. ধর্মরাজ বা সূর্যনারায়ণ 9. পাতালেশ্বর 10. আনন্দ বাজার 11. স্নানবেদী 12. রন্ধনশালা 13. বৈকুণ্ঠ যাত্রীশালা

সুন্দর বারে বারে জগন্নাথ মন্দিরের অশ্লীলমূর্তির কথা বলেছেন, কিন্তু আজকের দিনের অশীতিপর তীর্থযাত্রী বা যাত্রিণীও তেমন কোন মূর্তির কথা স্মরণ করতে পারেন না।

1999 সালে আমি আমার দুই তরুণ সঙ্গীকে নিয়ে যখন জগন্নাথ মন্দির দর্শন করি তখন সদ্য-উদ্ঘাটিত অন্তত চারটি প্যানেলে উৎকট যৌনাচার দেখেছিলাম।

পুরী মন্দিরে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া যায় না। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্কেচ আঁকছিলাম। একজন মন্দির-পাণ্ডা এসে আমাকে বাধা দিলেন, বারণ করলেন। পুরাতত্ত্ব বিভাগের তদানীন্তন সুপারিন্টেন্ডেন্ট-সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অর্থমূল্যে তাঁদের তোলা ফটোর কপি প্রার্থনা করলাম; সেটাও নাকচ হয়ে গেল। আমাকে জানানো হল, দিল্লির কেন্দ্রীয় অফিসের নির্দেশে আলোকচিত্রগুলি কনফিডেনশিয়াল ফাইলে সুরক্ষিত। কপি দেওয়া যাবে না।

আমি হতাশ হলাম। উদ্ধার করল আমার তরুণ সঙ্গী শেখর মুখার্জি। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকর ও animator। পুরী-কোনার্ক-ভুবনেশ্বর ভ্রমণান্তে ফিরে আসার দিন শেখর তার ঝোলা-ব্যাগ থেকে চারখানি স্কেচ বার করে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল। বললে, এই নিন দাদা, প্রয়োজনে আপনার বইতে ছাপবেন।

আমি অবাক হয়ে বলি, এ কী! এ চারখানি স্কেচ কখন আঁকলে তুমি?

—ঐ, আপনি যখন পূর্ত বিভাগ আর পুরাতত্ত্ব বিভাগের বড়কর্তাদের সঙ্গে দহরম-মহরমে সময় নষ্ট করছিলেন।

আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। বলি, কিন্তু কী করে আঁকলে হে? কেউ বাধা দিল না?

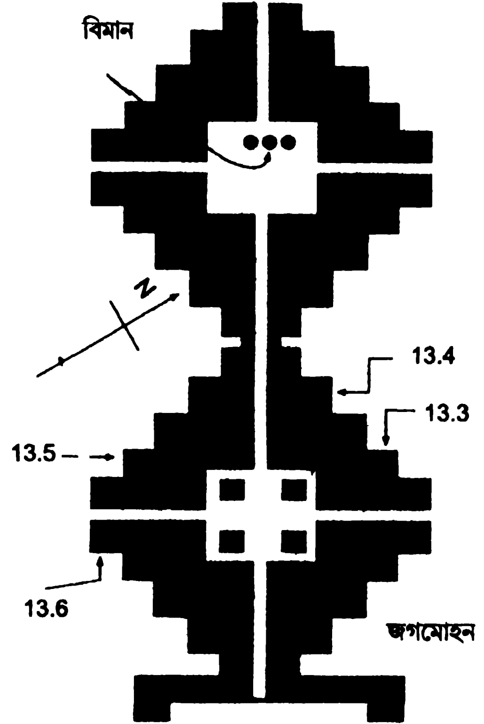
শেখর মুচকি হেসে বললে, ওখানেই তো গুরুশিষ্যের প্রভেদ। আপনার স্কেচব্যাগে থাকে শুধু খাতা, ইরেজার আর স্কেচপেন। আমার ব্যাগে তাছাড়াও থাকে আর একটি বস্তু,—আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ।

—'আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ!' মানে?

—সত্যপ্রিয় আচার্যের সহপাঠীকে তা বোঝানো শক্ত। 'R B I মিন্ট'-এ ছাপা হয় সেই আশ্চর্য প্রদীপের চাবি। তাতে সব দরজাই 'চিচিং ফাঁক' হয়ে যায়।

* * *

1999 সালে আমরা সর্বসমেত চারটি উৎকট মিথুনমূর্তি দেখেছিলাম। তাদের অবস্থানও মন্দিরের ভূমি-নক্শায় চিহ্নিত করে এনেছিলাম। তার ভিতর দুটি মৈথুনরত। বাকি একটি 'কানিলিঙ্গাস' এবং একটি 'ফেলাশিও।'



চিত্র 13.2 পুরীমন্দির—বিমান ও জগমোহন একত্রে

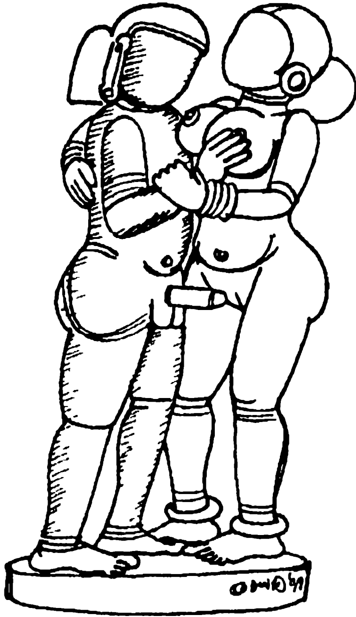
আশ্চর্যের কথা : 2000 সালে এবং 2001 সালে আমি পুরীর জগন্নাথ মন্দির আবার দর্শন করি, কিন্তু দুইবারই এই মূর্তিগুলিকে খুঁজে পাইনি। অবশ্য দুইবারই সন্ধ্যার সময় গিয়েছিলাম এবং আমার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে আসছে। আন্দাজ করেছিলাম : পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্মীরা চলে যাবার পর পাণ্ডা-পরিষদ সেই মূর্তিগুলি পুনরায় অপসারিত অথবা আবরিত করে দিয়েছেন।

চিত্র 13.1-এ পুরী-মন্দিরের একটি সামগ্রিক ভূমি-নকশা দেওয়া হয়েছে :

বিভিন্ন অংশের বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। আমাদের আলোচ্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তথাকথিত অশ্লীল মূর্তিগুলির অবস্থান চিত্র 13.2-তে সূচীত হয়েছে। এগুলি আমরা যেখানে দেখেছিলাম তার অবস্থান বোঝাতে বিমান ও জগমোহন অংশের একটি বর্ধিত চিত্র দেওয়া গেল। মিথুনমূর্তিগুলির এই অবস্থান বর্তমানে আছে কি না বলতে

পাবি না, আমরা 2001 সালে তা খুঁজে পাইনি। দেখেছিলাম 1999 সালে।

সাধারণভাবে বলা যায়, যেকয়টি শেষ পর্যায়ের মিথুনমূর্তি আমরা পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে দেখেছিলাম



চিত্র 13.3 পরীর মন্দিরে জগমোহনে দণ্ডায়মান মৈথুনরত মিথুন

সেগুলির শিল্পগত মান ছিল কলিঙ্গের অন্যান্য মন্দিরের ওই জাতীয় মন্দিরভাস্কর্যের সমান। অর্থাৎ ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন মন্দিরে বা কোনার্কে উগ্র-পর্যায়ের মিথুনমূর্তিগুলির তুলনায় এদের গঠন পারিপাট্য বা শৈল্পিক আবেদন ছিল সমপর্যায়ের। এখানে আমরা যে কয়টি উগ্র-স্তরের মিথুন মূর্তি দেখেছি তার রেখচিত্র এবং বর্ণনা এবার দাখিল করা যাক :

চিত্র 13.3—জগমোহনের উত্তর প্রান্তে উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানো একটি মিথুনমূর্তি ছিল। দণ্ডায়মান মৈথুনরত মিথুন। পুরুষ-স্ত্রী দুটি মূর্তির মুখ-চোখ সম্পূর্ণ ক্ষয়ে গেছে।

চিত্র 13.4—জগমোহনের একই প্রান্তে, উত্তর দিকে মুখ-ফেরানো এই দণ্ডায়মান মৈথুনরত মিথুনের পুরুষমূর্তির মুখচোখ দেখা যাচ্ছিল। মাথায় মুকুট, কানে দীর্ঘ প্রলম্বিত কুণ্ডল এবং স্টাইলাইজড় গোঁফ-দাড়ি। অনুমান করা যায় যে, এ মূর্তিটি কোনো সাধু-সন্ন্যাসীর। সম্ভবত তান্ত্রিক। স্ত্রী-মূর্তির চোখ-নাক নষ্ট হয়ে গেছে।

চিত্র 13.5—তৃতীয় যে মিথুনমূর্তি পেয়েছিলাম তা জগমোহনের দক্ষিণ প্রান্তে। দক্ষিণ পশ্চিমমুখী। এটি একটি মুখমেহনের (কানিলিঙ্গাস) আলেখ্য। এখানে পুরুষ-স্ত্রী দুজনেরই মুখ-চোখ অক্ষত। ওরা একটি পদ্মপ্রতিম পুষ্পের উপর অবস্থিত। স্ত্রীলোকটি দণ্ডায়মানা এবং পুরুষটি উৎকট ভঙ্গিতে উপবিষ্ট।

চিত্র 13.6—চতুর্থ মিথুন জগমোহনের পশ্চিমপ্রান্তে। দক্ষিণ পশ্চিমমুখী। এটি বস্তুত পূর্ববর্ণিত মিথুনমূর্তির পরিপূরক। ভাবানুসারী দর্পণ প্রতিবিম্ব। কারণ এখানে পুরুষটি দণ্ডায়মান। স্ত্রীলোকটি উপবিষ্টা। এটিও মুখমেহন, তবে 'ফেলাশিও'। এক্ষেত্রেও মূর্তির চোখমুখ ইত্যাদি খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় আমাদের দেখা চারটি মিথুনমূর্তিই জগমোহনে স্থান পেয়েছে। বিমানে বা মূল মন্দিরে নয়।

যৌনতা-অতিরিক্ত এই চারখানি মিথুন-মূর্তির ভাস্কর্যে কোনো শিল্পমাধুর্য খুঁজে পাইনি। জানি না, এজাতীয় মিথুন মূর্তি অন্যত্র আরও ছিল কি না। যেটুকু স্বচক্ষে দেখেছি, যা আমার সহযাত্রী স্কেচ করে এনেছে—শুধু সেটুকুই আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম।

আমি কোনো কারণ খুঁজে পাইনি। কোনো যুক্তিগ্রাহ্য হেতুর সন্ধান পাইনি, অথচ প্রত্যক্ষ করা সত্যকে অস্বীকারও করতে পারিনি।

এই একই মন্দিরের ভোগমণ্ডপের পশ্চিমপ্রান্তে—অর্থাৎ দীর্ঘ সোপানাবলী অতিক্রমণে যখন ভক্তের দল মন্দির চত্বরে প্রবেশ করে, তখন তারা সম্মুখের প্রাচীরে দেখতে পায় কিছু অপূর্ব ভাস্কর্য। কী সুন্দর! কী মহিমা—নৃসিংহদেবের অর্ধোৎকীর্ণ মূর্তি, রাজসভা, ময়ূরপঙ্খী নৌকা, গণেশমূর্তি ইত্যাদি। প্রতিটি কালো কষ্টিপাথরে অর্ধোৎকীর্ণ। প্রত্যেকটি অতি উৎকৃষ্ট। প্রত্যেকটি শিল্প হিসাবে রসোত্তীর্ণ। অসাধারণ! কোন্ বিশ্রুতকীর্তি ভাস্কর সেগুলি নির্মাণ করেছিলেন তার কোনো নির্দেশ ইতিহাসে নাই, কিন্তু এটা তো অবিসংবাদিত সত্য যে, কোনো একজন শিল্পানুরাগী কলিঙ্গরাজের নির্দেশেই এবং অর্থানুকূল্যে সেগুলি নির্মিত হয়েছিল। তাহলে সেই মহান-ঐতিহ্যের ধ্বজাধারী কলিঙ্গরাজ—ওই চারখানি অতি নিকৃষ্টমানের

বালিপাথরের মূর্তি গড়ে এই পবিত্র দেউলকে কেন এভাবে কলুষিত করেছিলেন? রাজানুমতি ব্যতিরেকে কোনো ভাস্কর যে এ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পারে না—এটাও তো অবধারিত সত্য।

আমরা যা প্রত্যক্ষ করেছি, স্কেচ করেছি এবং এ-গ্রন্থে মুদ্রিত করেছি তা নিশ্চয় অনেক-অনেক লেখক বা গবেষকও দেখেছেন—কারণ পূর্তবিভাগ ওখানে কাজ করেছেন দীর্ঘ কয়েক বৎসরকাল—অন্তত চার-পাঁচ বছর ধরে। কিন্তু সেকথা কেউ উল্লেখ করেননি। হয়তো তাঁরা সঙ্কোচ বোধ করেছেন। হয়তো ভেবেছেন, এই অবাঞ্ছিত সত্যটা প্রকাশ হয়ে পড়লে মন্দিরের মহিমায় কলঙ্কচিহ্ন লাগবে, ভক্তদল বিবক্ত হবেন। পাণ্ডাদল হবেন রুষ্ট। আমাদের সমাজেব ক্লেদ, শাসকদলের ব্যর্থতা এবং স্বার্থপরতার কথা যে কারণে আমরা—লেখকদল—অনুল্লেখিত রেখে গ্রন্থরচনা করে থাকি।

কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন—জনৈক উড়িষ্যারাজের ন্যক্কারজনক ব্যবহারের জন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা কখনো ক্ষুণ্ণ হতে পারে? আসমুদ্রহিমাচলের তীর্থযাত্রীর দল 'জয় জগন্নাথ' পুকার দিতে দিতে এই দেবদেউলে ছুটে আসে, অন্ন যেখানে উচ্ছিষ্ট হয় না, অব্রাহ্মণ—এমনকি জল-অচল জাতির—স্পর্শিত অন্ন যে তীর্থভূমিতে সাদরে ভক্ষ্য, এমনকি নিষ্ঠাবান বিগতভর্তা যেখানে একাদশীর নিরম্বু-উপবাসের কথা অগ্রাহ্য করে সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন—সেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহিমায় কি এই সত্য প্রকাশে কলঙ্ক লাগতে পারে?

সে-কারণেই স্বচক্ষে দেখা ভাস্কর্যকে আমরা চুন-সুরকির পলেস্তারায় লুক্কায়িত রাখতে পারলাম না।

* * *

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির পরিক্রমা সমাপ্ত করে উপসংহার রচনা করার সময় একটি বেদনাময় স্মৃতির কথা মনে পড়ছে—ভুবনেশ্বরের জনৈক পাণ্ডার একটি মর্মান্তিক অভিশাপ— 'তেমে অনন্ত নরকে পচি মরিবে!'

সেবার পুরী থেকে বাসে করে ভুবনেশ্বরে যাচ্ছিলাম সস্ত্রীক। বাসের মধ্যেই আলাপ হল একটি সদ্যোবিবাহিত মার্কিন দম্পতির সঙ্গে। তারা ভারত দর্শনে এসেছে মধুচন্দ্রিমায়। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম—কেন ভারতবর্ষ? কেন নয় সুইৎজারল্যান্ড, ইতালি, হনলুলু অথবা ইন্দোনেশিয়া? জন হেরাল্ড জানালো তার স্ত্রী ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট গবেষণা করছে। সেজনাই ভারতের প্রধান মন্দিরগুলি স্বচক্ষে দেখতে এসেছে, যাচাই করতে এসেছে। ওরা ইতিপূর্বে বদ্রীনারায়ণ, কেদারনাথ দর্শন করে এসেছে। দাক্ষিণাত্যের কিছু মন্দিরও। ওদের সবচেয়ে ভালো



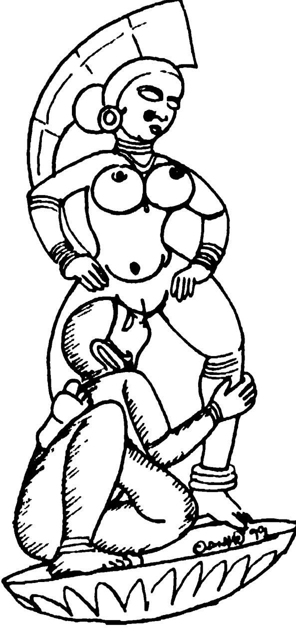
চিত্র 13.4 পুরীর মন্দিরে দণ্ডায়মান মৈথুনরত মিথুন

লেগেছে স্বামীজির পদরজধন্য আলমোরা, শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদধন্য পণ্ডিচেরী এবং গঙ্গাতীরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তবৃন্দের বেলুডমঠ। তাদের ভালো লেগেছে সন্ন্যাসী-মহারাজদের আন্তরিকতা। সৌজন্যমূলক ব্যবহার। এবার এসেছে কলিঙ্গ পরিক্রমায়। ভুবনেশ্বর আর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুরীধাম।

মুগ্ধ হলাম ওর দৃষ্টিভঙ্গিতে। জন হেরাল্ড কম্পুটার এঞ্জিনিয়ার, আর তার সদ্যোপরিণীতা জীবনসঙ্গিনী এখনো ছাত্রীজীবন সমাপ্ত করেনি। রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়ে গবেষণা করে। ওরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মধুচন্দ্রিমায় ছুটে এসেছে ভারতে—মন্টিকার্লো, মূলারুজ, লাস ভেগাসের আকর্ষণকে উপেক্ষা করে। মনমতো শ্রোতা পেয়ে আমি এক নাগাড়ে মিসেস হেরাল্ডকে পাণ্ডিত্য জাহির করতে থাকি। ভারতের শাশ্বত মন্ত্র : সেকুলারিজম্, ক্যাথলিসিটি—'দিবে আর নিবে; মিলাবে-মিলিবে...'।

বাসটা এসে দাঁড়লো লিঙ্গরাজ-মন্দিরের বহির্দ্বারে বটগাছটার তলায়। নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা : আমাদের

রুখে দিল পাণ্ডার দল। আমাকে সস্ত্রীক মন্দিরে প্রবেশে অনুমতি দিল, কিন্তু বাধা দিল ওই সদ্যোবিবাহিত মার্কিন দম্পতিকে। হেতু, তারা ম্লেচ্ছ, তারা যবন, তারা বিধর্মী! আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে ওরা কর্ণপাত করল না।



চিত্র 13.5 পুরী জগমোহন/মুখমেহন (কানিলিঙ্গাস)

সাত-আট জন পাণ্ডা আর ছড়িদার ওদের ঘিরে ধরেছে। প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। মাথা হেঁট হয়ে গেল আমার!

ইয়োরোপ-আমেরিকায় আমরা একাধিক গির্জায় প্রবেশ করেছি। কোথাও কেউ বিধর্মী হিন্দু বলে আপত্তি করেনি। সানফ্রান্সিস্কোতে একটি সিনাগগে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল আমার নাতনীর সহপাঠী বন্ধু বরিস্। ইহুদিদের সমবেত প্রার্থনা কীভাবে হয় দেখাতে। আমরা দুজন—আমি আর আমার নাতনী নীনা—বিধর্মী হওয়া সত্ত্বেও ওঁরা কোনো আপত্তি করেননি, আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। শুধু আমাকে মাথায় পরিধান করতে হয়েছিল একটি 'কীপা'—স্কাল-ক্যাপ।

হেরাল্ড ওদের বোঝাবার চেষ্টা করল—দোভাষী হিসাবে আমিই তাদের হিন্দিতে বুঝিয়ে দিলাম যে, ওরা মন্দিরে প্রবেশ করবে না, শুধু বাইরের দিক দিয়ে মন্দির-চত্বরে পরিক্রমা করবে এবং ফটো তুলবে। পাণ্ডাদের তাতেও ঘোর আপত্তি! দশ-বারোজন ঘিরে ধরেছে ওদের :

'ক্যানন টু রাইট অফ দেম, ক্যানন টু লেফ্‌ট্‌ অব দেম ভলিড অ্যান্ড থান্ডার্ড!'

কিন্তু মিসেস্ হেরাল্ডের ঝুলিতেও ছিল একটি 'ক্যানন'। মন্দির চত্বরে প্রবেশ না করেও সে 'জুম-লেন্স' লাগিয়ে তার ক্যানন-ক্যামেরায় বন্দি করে রাখল মন্দির শীর্ষের কিছু ভাস্কর্য। দূর থেকে যতটুকু সম্ভব।

পাণ্ডাজি ইতিমধ্যে আমাদের দুজনকে নিয়ে পড়েছে। কোন্ দোকান থেকে পুষ্পার্ঘ্যের ডালি খরিদ করলে আর্থিক সুবিধা হবে বোঝাতে থাকে।

আমি তাকে বললাম, 'আমার কোন পাণ্ডার প্রয়োজন হবে না। আমি পূজা দেব না। সরুন—আমাকে যেতে দিন।'

—পূজা দিবে না? কিঁয়? আপুনি হিন্দু বটেন তো? কী নাম বটে?

গেঞ্জির ভিতর থেকে উপবীতগাছটি বার করে দেখাই। বালি : নারায়ণ দাস দেবশর্মনঃ, বাৎস্য গোত্রস্য!

পাণ্ডাজী অবাক হয়ে বলে, 'পূজা না দিবে তো কোঁও আসিলে?'

বলেছিলাম, 'মন্দিরচত্বরে ঘুরে মূর্তিগুলি দেখতে। ছবি আঁকতে।

ঝোলা থেকে স্কেচবুক বার করতেই পাণ্ডাজী অগ্নিশর্মা : 'বুঝিল! বদ্ধকাম মূর্তি দেখিবারে আসিছ! বুড়া হই গেলে, পরন্তু 'কাম' রহি গেল অন্তরে। তেমে অনন্তকাল নরকে পচি মরিবে!'

এ অভিশাপের জবাব দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

তার আগেই একজন বাঙালি যাত্রী আমাকে বলে ওঠে, 'ওর সঙ্গে তর্ক করবেন না, দাদু, আপনাকে আমি চিনি। তর্কাতর্কি করলে ও আপনাকে স্কেচ করতেও দেবে না। ওরা দলে ভারি।'

তাই তর্ক করিনি। অভিশাপটা মাথা পেতে নিয়েছিলাম।

* * *

পুরীর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির পরিক্রমা শেষ করে এই পরিচ্ছেদটার উপসংহারে বরং একটা কথা বলে যাই :

জগন্নাথদেবের মহিমার কথা কিছু বলা হল না। এ যেন ক্যাথলিন মেয়োর 'ভারতদর্শন'—শুধুই ক্লেদাক্ত আবর্জনা, ফুল-বেলপাতার স্তূপ, আর অর্থগৃধ্নুতার আয়োজন : এখানে প্রণাম কর, প্রণামী দাও, ওখানে জলদান কর,

পয়সা দাও, সেইখানে দণ্ডবৎ হও, প্রণামী দাও!

সকল কৃত্যের একই মূল-ধরতাই : পয়সা দাও!

আমি নাস্তিক নই। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মর্মমূলে অবাঙমানসগোচর য়ে দুর্জ্ঞেয় সত্তাটি বর্তমান—সেই যিনি 'শক্তিযোগাৎ' 'একবর্ণা' থেকে 'বহুধা' হয়েছেন—তাঁকে আপনাদের মতো আমিও সারাটি জীবন খুঁজে বেরিয়েছি। এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় জগতে। অর্থমূল্যে কি তাঁকে প্রণামী দেওয়া সম্ভব?

রত্নকরে চ শয়নং গৃহিণী চ লক্ষ্মীঃ।
কিম্ দেয়মস্তি ভবতে জগদীশ্বরায়?
আভীরবামনয়নাহৃত মানসায়।
দত্তং মনো যদুপতে কৃপয়া গৃহাণ।।

[রত্নাকরে তুমি শয়ন করেছ, স্বয়ং লক্ষ্মী তোমার গৃহিণী। হে জগদীশ্বর! আমি তোমাকে কী দিতে পারি? (তবে শুনেছি) গোপবালাদের দৃকপাতে তোমার মনটা নাকি চুরি গেছে। তাই আমার হৃদয়খানি অর্ঘ্য দিতে নিয়ে এসেছি। কৃপা করে গ্রহণ কর।]

এটাই প্রণামের মন্ত্র। এটাই প্রণামী। কিন্তু সে যে বড় শক্ত কাজ!!

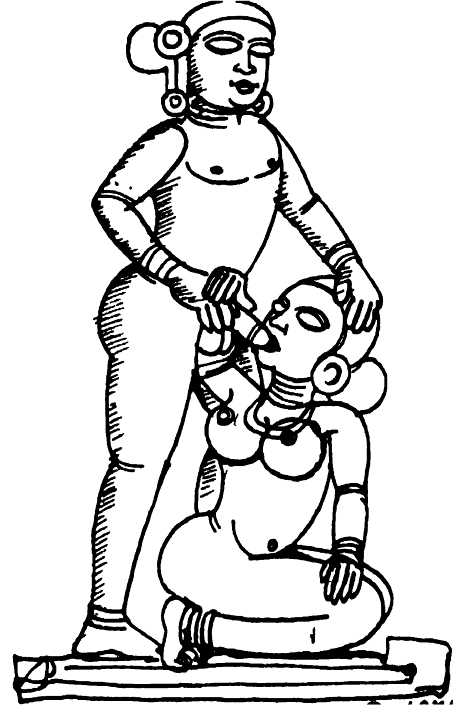
সবিনয়ে, সলজ্জে স্বীকার করি : গর্ভগৃহের ঘনান্ধকারে কোনোবারই একাগ্রচিত্তে ও-কথা বলা হয়নি। সেখানে জোড়হস্তও হতে পারিনি। একটা হাত বরাবর রেখেছি পকেটে। রেলটিকিট আর রাহাখরচের পুঁজিটাকে সমালাতে। মনটাকে কিছুতেই একাগ্র করতে পারিনি। সেখানে আমি ব্যর্থ!

তাহলে কেন বারবার ছুটে গেছি জগন্নাথধামে?

কারণ তাঁর আভাস পাই মহোদধিতে। বিক্ষুব্ধ বীচিভঙ্গের ওপারে—সেই যেখানে নীলাম্বুরাশি চুম্বন করছে অসীম আকাশের দিগন্তরেখা—সেখানে আভাসে-ইঙ্গিতে পেয়েছি তাঁর দেখা। পুরী-হোটেলের নেপালী দারোয়ানজির বিস্মিত দৃষ্টিতে ভ্রুক্ষেপ না-করে যখন মধ্যরাত্রে সঙ্গিনীর হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছি নির্জন বেলাভূমিতে। মাথার উপর যখন সপ্তর্ষি!

জগন্নাথদেবের মন্দিরে বারে বারে ছুটে গেছি—জানতে চেয়েছি কোন্ মহিমায় এই সংস্কারাচ্ছন্ন উপমহাদেশ থেকে জাতিভেদ দূর করেছিলেন ওই দেবতা! কেন অন্ন এই সীমিত ভূখণ্ডে উচ্ছিষ্ট হতে পারে না। জল-অচল জাতের হাত থেকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এখানে মহাপ্রসাদ নিয়ে আহার করেন কেমন করে?

তবে আজ আমার ভূমিকা একটু অন্যজাতের। একটু ভিন্ন প্রকারের। আজ আমি দেখতে এসেছি ভারত সংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যের পয়ঃপ্রণালীতে এত আবর্জনা,



চিত্র 13.5 পুরীর জগমোহন/মুখমেহন (ফেলাশিও)

এত ক্লেদ, এত পুরীষ কীভাবে পুঞ্জীভূত হল? ঈজিয়ান-স্টেব্‌ল্ কীভাবে পরিষ্কার করা যায় তাই খুঁজতে।

পাঠক-পাঠিকা আমাকে মার্জনা করবেন। ৺শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহিমার বর্ণনা আপনারা অনেক ভক্ত লেখকের গ্রন্থে সহজেই পেয়ে যাবেন। অনেক অনেক অলৌকিক কাহিনি তাতে পাবেন।

কী করব বলুন?

স্বেচ্ছায় যে বেছে নিয়েছি ম্যাথরের কৃত্য। এ রচনায় কিছু ক্লেদ, কিছু পুরীষ লেগে থাকলে আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন।

আমার আজকের ভূমিকাটা যে স্যানিটারি এঞ্জিনিয়ারের! ❑

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ভারত সংস্কৃতির অনবদ্যতা ও মিথুনাচার



সাধারণ মানুষের ধারণায় ভারতবর্ষ একটি চরম বৈচিত্র্যময় উপমহাদেশ। এখানে দেশের এক প্রান্তের সঙ্গে অপর প্রান্তের বৈপরীত্যের চরম বিকাশ। ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, দেশবাসীর জীবনযাত্রার মানে প্রচণ্ড পার্থক্য। মানুষের চিন্তাধারাতেও এই বৈপরীত্য। এদেশে এমন অঞ্চল আছে যা মধ্যসাহারার মতো অগ্নিকুণ্ড; আবার এমন এলাকাও আছে যেখানে মেরুবলয়ের মতো শীতাধিক্য। এমন গ্রামের সাক্ষাৎ পাবেন যেখানে প্রাপ্তবয়স্করা বিশ্বাস করতেই চাইবে না যে আকাশ অঝোর-ধারায় কাঁদতে পারে; তারা সারাজীবনে বৃষ্টিপাত দেখেনি। আবার এখানেই আছে চেরাপুঞ্জি বা মৌসিনরাম—যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিশ্ব-রেকর্ডধারী। এদেশে কিছু কুবেরীর্ষ্যিত শেঠজীর সঙ্গে আপনার মুলাকাৎ হতে পারে যাঁরা ফাটকাবাজারে ভূতৈলধন্য আরব শেঠদের সঙ্গে টক্কর দেবার হিম্মৎ রাখেন, আবার আমলাশোলের মতো প্রত্যন্ত গ্রামও নজরে পড়বে যেখানে দরিদ্রতম মানুষের বাস।

তাই বিদেশী পর্যটক যখন অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন—'এটা কেমন করে হল? মন্দিরের ভিতরে জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর গৌরব, আর বাহিরে মন্দির-ভাস্কর্যে রিরংসার ন্যক্কারজনক রৌরব?'

আমরা তখন বলি, 'এটাই তো প্রত্যাশিত। এ যে বৈপরীত্যের দেশ!'

* * *

হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় পণ্ডিতরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করে গেছেন, নৈর্ব্যক্তিক নিষ্ঠায়। শুধু ধর্ম নয়, মুমুক্ষা নয়—যাবতীয় জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখায়। তাঁদের সেই সহস্রমুখী জ্ঞানান্বেষণের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে—জীবের মঙ্গলবিধানের এষণা; আছে : মানুষ! ভবযন্ত্রণায় জর্জরিত মানুষের আনন্দবিধানের প্রচেষ্টা। তাদের যাবতীয় সাংসারিক সমস্যার সমাধানের ইচ্ছা। সহস্র বছর ধরে তাঁরা জপ করে গেছেন :

'দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর—তার পরে ছুটি নিব।'

ধরুন আলফ্রেড নোব্‌ল্‌-এর (1833-96) কথা। মনুষ্যসমাজের উন্নতিকল্পে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি পুরস্কারের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তার ভিতর অর্থনীতির কোনো স্থান হল না। প্রতীচ্য অর্থনীতির বিষয়ে গবেষণা শুরু করল নিতান্ত হাল-আমলে—বলা যায় অষ্টাদশ শতাব্দি থেকে। কিন্তু দেখা গেল, দশকের পর দশক তা চক্রাবর্তন করে চলেছে সীমিত পরিমণ্ডলে : মূলধন, শ্রম, উৎপাদন, বিপণন এবং "শুভলাভ ঔর নুকসান। মানুষ নয়।

মাত্র বিগত দশকে—তাও একজন ভারতীয় অর্থনীতিবিদের প্রভাবেই—প্রতীচ্য স্বীকার করে নিল : জনগণকে বাদ দিয়ে অর্থনীতির তত্ত্বগত তাৎপর্য অর্থহীন!

তুলনা করে দেখুন : এই ভারত ভূখণ্ডে অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল প্রায় 2,300 বৎসর পূর্বে। সেটা অঙ্কুরিত হয়েছিল, মৌর্য সম্রাটের এক মহামাত্যের মস্তিষ্কে। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*। দেবদেউল প্রদক্ষিণরত ভক্তের মতো সে শাস্ত্র ক্রমাগত পরিক্রমা করে গেছে : মানুষকে। নানান জাতির মানুষ, নানান শ্রেণির মানুষ—রাজা, রাজ-অমাত্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, কামার, কুমোর, সূত্রধর, শিল্পী—এমনকি রূপোপজীবিনী! কৌটিল্যের মতে শেষোক্তরাও শ্রমজীবী—যৌনকর্মরত দৈহিক শ্রমদানে নিরতা। সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় প্রাচীন সভ্যতার ভিতর কৌটিল্যই প্রথম বুধাগ্রগণ্য যিনি বলতে পেরেছিলেন, "মানবসভ্যতায় গণিকার অবদান একটি অপরিহার্য উপদ্রব। তাদের স্বীকৃতি অপরিহার্য, কিন্তু তার জন্য সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা আবশ্যিক।"

কৌটিল্য তাঁর *অর্থশাস্ত্রে* সমাজে বারাঙ্গনাদের স্থান সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করে দিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই 'নেসেসারি ঈভ্‌ল'দের রাষ্ট্রায়ত্ত করে না নিলে সমাজের তথা রাজতন্ত্রের সমূহ ক্ষতি। গণিকাদের বাদ দেওয়া যাচ্ছে না; অথচ দেখা যাচ্ছে যে, তারা উচ্চকোটির অর্থসংগ্রহ করে ক্রমশ অসীম

ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে। বৈভবে ও প্রতিপত্তিতে। ক্ষেত্রবিশেষে তারা রাজতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হয়ে উঠছে। আম্রপালীর প্রাসাদ রাজপ্রাসাদের সমতুল্য হয়েছিল। আম্রপালী তাঁর আজীবনের সঞ্চয় দান করে গিয়েছিলেন বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে—যে অর্থ—মহামাত্যের মতে—ধনিক সম্প্রদায়ের, রাজতন্ত্রের। কৌটিল্য তাই তাঁর *অর্থশাস্ত্রে* এই জলস্রোতে একটা বাঁধ খাড়া করে তুললেন। সমস্ত ব্যবস্থাটা এনে ফেললেন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে। গণিকা-বৃত্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। তাকে দ্বিধাবিভক্ত করা হল। দ্বিধা নয়, বস্তুত ত্রিধা।

প্রথম ভাগ : দেবদাসী। তাদের বিষয়ে *অর্থশাস্ত্র* নীরব। পুরোহিততন্ত্রের সঙ্গে রাজতন্ত্রের সংঘাত এড়াতে কূটনৈতিক ব্রাহ্মণটি দেবদাসীদের সম্বন্ধে আদৌ কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। মন্দির-পুরোহিতেরা তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করেন। হয়তো এই একটিমাত্র 'বড়ে'-র চালে পুরোহিততন্ত্রকে মাৎ করে দিলেন। তারা রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল না। ভারতেতিহাসে টমাস বেকেট আসতেই পারলেন না।

দ্বিতীয় ভাগ : ভূয়িশ্য। তারা 'সহজিয়া'—থাকবে নগর চতুঃসীমার বাহিরে। কিন্তু আইনের আওতার বাহিরে নয়। সাধারণ পণ্যা নারী। সেবা করবে সাধারণ খদ্দেরকে। কিন্তু তাদের মাসিক উপার্জনের ভিতর থেকে দুই দিনের রোজগার (প্রায় 7%) রাজ্য সরকারকে কর হিসাবে প্রদান করতে হবে। পরিবর্তে রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। ন্যূনতম সুখসাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবে।

তৃতীয় ভাগ : অবরুদ্ধা। তারা আবার দুই জাতির। প্রথম দল : বিশেষ-বিশেষ পরিবারভুক্ত রক্ষিতা। রাজা-শ্রেষ্ঠী-ধনকুবেরদের মধ্যে একজন তাকে রক্ষিতা হিসাবে নিযুক্ত করেন। তার ভরণ-পোষণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। তারা কখনো থাকে মনিবের প্রাসাদে, কখনো বা তাঁর 'বাগানবাড়ি'তে। 'পরিবারগত-সতীত্ব' মেনে চলতে তারা বাধ্য। অর্থাৎ পরিবারের যেকোনো যুবক—মালিকের সম্মতিসাপেক্ষে—তার সঙ্গে রাত্রিবাস করতে পারে। দ্বিতীয় দল : সর্বজনভোগ্যা গণিকা বা বারাঙ্গনা। তারা সর্বতোভাবে 'সরকারী চাকুরে'। প্রভেদ এই যে, তাদের 'রিজাইন' দেবার অধিকার নেই। আজীবন—বরং বলা উচিত 'আযৌবন'—তারা জনগণের সেবা করবে। রূপ ও যৌবনের বিচারে গণিকাদের তিনটি শ্রেণি। নিম্নতমদের বার্ষিক উপার্জন—শব্দটা ছিল 'ভোগ'—একহাজার কার্ষাপণ।

দেবদাসী ব্যতিরেকে অন্যান্য জাতির রূপোপজীবিনীদের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত হলেন একজন 'গণিকাধ্যক্ষ'। প্রতিটি গণিকালয়ের নিরাপত্তা, আয়-ব্যয় ও দায়ের জন্য গণিকাধ্যক্ষ দায়ী। সরকারে তিনি হিসাব দাখিল করেন। কোন্ জাতের গণিকা তার খদ্দেরের কাজ থেকে কী পরিমাণ পারিশ্রমিক দাবি করবে তা অধ্যক্ষই স্থির করে দিতেন—গণিকাটির রূপ-যৌবন, নৃত্যগীত ইত্যাদির পারদর্শিতার বিচারে। নিশান্তে প্রত্যেকটি গণিকা তার দেয় অংশ গণিকাধ্যক্ষের প্রতিনিধিকে হস্তান্তর করত—ঠিক যেমন এখন স্টেট-বাসের কন্ডাকটার তার দৈনিক উপার্জন বুঝিয়ে দেয় ডিপোয় ফিরে এসে। কিন্তু নাগর যদি অর্থের অতিরিক্ত কোনো প্রণয়োপহার দেয়—স্বর্ণালঙ্কার হলেও—তা গণিকার নিজস্ব প্রাপ্য। 'বাড়িউলি' ছাড়, স্বয়ং রাজাও সেটা বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন না।

কৌটিল্য সুবিবেচকের মতো এই পরিকল্পনা রূপায়িত করেছিলেন। সকলের স্বার্থই তিনি দেখেছেন। *অর্থশাস্ত্র* গণিকা ও তার নাগরদের স্বার্থরক্ষার জন্য চুলচেরা আইন লিপিবদ্ধ করে গেছে। কিন্তু লেখকের দৃষ্টি ছিল গোটা সমাজের প্রতি—বিশেষ করে রাজতন্ত্রের। দু-একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া গেল :

1. গণিকার সন্তান জন্মালে তার দায়ভার রাষ্ট্রের। কন্যা হলে সে হতো ভবিষ্যৎ-গণিকা। তার ভরণপোষণ আকৈশোর রাষ্ট্রের। পুত্র জন্মালে সে হবে কুশীলব—অর্থাৎ সরকারের নিজস্ব রঙ্গশালার নট অথবা কর্মী। নিদেন—ভৃত্য।

2. গণিকাদের 'পেনশন'-এর ব্যবস্থা ছিল। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন। এমন আইন বোধকরি প্রগতিশীল কোনো রাষ্ট্রে—যেখানে গণিকাবৃত্তি আইনসিদ্ধ—আজও নাই! যৌবন গেলেও জীবন থাকে—রূপোপজীবিনীদের সেই শেষজীবন সর্বত্রই দুর্বিসহ—অথচ 2,300 বছর আগে পূর্ব কৌটিল্য সেজন্য ব্যবস্থা করেছিলেন!

3. যদি কোনো নাগর বিশেষ কোনো গণিকাকে নিজ প্রাসাদে নিয়ে যেতে চায়—'রখেল' বা 'রক্ষিতা' হিসাবে—তাতে আপত্তি নেই। সেক্ষেত্রে নাগরকে সেই গণিকার মাসিক উপার্জনের সওয়া গুণ অর্থ প্রতি মাসে সরকারে জমা দিতে হবে।

4. গণিকা যদি তার এই বন্দীজীবন থেকে মুক্তি চায় তাহলে তাকে চব্বিশ হাজার কার্ষাপণ মুক্তি-মূল্য দিতে হবে। বলাবাহুল্য, এটা তার পক্ষে স্বপ্নকথা!

5. গণিকালয়ে মত্তাবস্থায় বা অন্য হেতুতে যদি কোনো নাগর কোনো রূপোপজীবিনীকে হত্যা করে বসে তবে তার জরিমানা হবে বাহাত্তর হাজার কার্ষাপণ—অর্থাৎ মুক্তিপণের তিনগুণ।

6. জীবনের দামে ফারাক হলেও গণিকার রূপযৌবনের দায় কৌটিল্য কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়েছেন। যথা—শর্তানুযায়ী অর্থমূল্য গ্রহণের পরে গণিকা যদি চরমমুহূর্তে অনুভব করে যে, তার খদ্দের (রতিজ—?) ব্যাধিগ্রস্ত তাহলে সে নাগরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। সেক্ষেত্রে সে অর্থমূল্য বা উপহার প্রত্যর্পণে বাধ্য থাকবে না। দ্বিতীয়ত, নাগর যদি কামতৃপ্তির পর প্রতিশ্রুত অর্থদানে অস্বীকৃত হয় তাহলে বিচারে তাকে আটগুণ অর্থ জরিমানা দিতে বাধ্য করা হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কানুন : গণিকা অর্থমূল্যে শুধুমাত্র সাধারণ রতিক্রিয়াতেই বাধ্য থাকবে। নাগর যদি নিভৃতে কোনো প্রকার বিকৃতকামের বাসনা জ্ঞাপন করে তাহলে গণিকা তাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে এবং অর্থমূল্য প্রত্যর্পণে বাধ্য থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা—কোন্‌টি স্বাভাবিক যৌনকর্ম, কোনটি বিকৃতকাম, তা নির্ধারণ করার অধিকার নাগরের নয়—গণিকার।

এত বিস্তারিতভাবে আলোচনার প্রয়োজন হল মন্দিরভাস্কার্যে মিথুনাচারের পটভূমিকাটি পরিস্ফুট করতে। মৌর্যযুগে যে ব্যবস্থা ছিল পরবর্তী জমানায় তা অবশ্য ছিল না। কিন্তু যৌনকর্মকে কোনো যুগেই ভারত 'আদিপাপ' রূপে স্বীকার করেনি। এই ধারনার আদি ভগীরথ : মহামাত্য কৌটিল্য!

* * *

অর্থনীতির মতো ধর্ম সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। জীবনের সঙ্গে হিন্দুধর্ম ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তেতাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' [যে আমাকে যেভাবে ভজনা করবে তার কাছে আমি সেইরূপেই পূজা গ্রহণ করব।] তাই হিন্দুধর্ম প্রকৃতির মধ্যেই দেবতাকে নানারূপে দেখতে অভ্যস্ত। মাতৃস্তন্য ত্যাগ করার পর সে গোদুগ্ধপানে পুষ্টিলাভ করে—তাই সে গাভীকে করেছে গোমাতা। গাঙ্গেয় উপত্যকায় তার সমৃদ্ধি, তার সভ্যতার বিকাশ গঙ্গার আশীর্বাদে—তাই গঙ্গা তার কাছে জননী-স্বরূপা। হিন্দুধর্ম একেশ্বরবাদী, বহুতর বিগ্রহের পূজারী, অজ্ঞাবাদী, আস্তিক্যবাদী এমনকি নিরীশ্বরবাদীকেও তার ধর্মে ঠাঁই দিয়েছে। সারা পৃথিবীতে বোধকরি আর কোনো ধর্মমত নেই যে, নিরীশ্বরবাদীকেও স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত। রোম্যান ক্যাথলিক এবং প্রটেস্টান্ট, সিয়া এবং সুন্নির মতপার্থক্য যতই থাক তারা প্রত্যেকে এক ঈশ্বর বা আল্লা—একই ধর্মপ্রচারককে স্বীকার করে। হিন্দুধর্ম এ বিষয়ে এক বিচিত্র ব্যতিক্রম। বুদ্ধদেব ছিলেন ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব, তবু তিনি হিন্দুধর্মে স্বীকৃত নবম অবতার। প্রাকবুদ্ধযুগে চার্বাক অথবা জাবালি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন। তবু তাঁরা হিন্দুধর্মে শ্রদ্ধেয় দার্শনিক। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের—শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্যের মধ্যে লড়াই-কাজিয়া হয়নি—যেমন হয়েছে শিয়া-সুন্নি বা রোমান ক্যাথলিক আর প্রটেস্টান্টদের মধ্যে।

* * *

একই কথা কামশাস্ত্র বিষয়ে। আসিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া, ইরান, চীন, গ্রীস বা রোমএ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে—কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের ভোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। কামশাস্ত্র যে বিজ্ঞানসম্মত একটা গবেষণার বিষয় এ বোধই ছিল না তাদের। বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায়, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, যৌনাচারকে বিচার করার প্রয়োজনই বোধ করেনি কেউ। সেসব সভ্যতায় পণ্ডিতদের ভাবখানা যেন এই রকম, "এ নিয়ে গবেষণার কী আছে? জীবজন্তু-পাখি-পতঙ্গ সবাই ওটা জানে। প্রজাতিকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। গবেষণা না করেই যখন লক্ষ লক্ষ প্রাণী কোটি কোটি বছর ধরে এই দুনিয়ায় টিকেছে বা আছে তখন মানুষের ক্ষেত্রেই বা এ নিয়ে পৃথকভাবে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে কেন?"

বিজ্ঞানসম্মতভাবে কামশাস্ত্রের চর্চা প্রতীচ্যে শুরু হল সাম্প্রতিককালে—বস্তুত উনবিংশতি শতাব্দি থেকে। হ্যাভলক এলিস্ (1859-1939) অথবা মেরী কারমাইকেল স্টোপস্-এর (1880-1958) আমল থেকে। এ ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষে গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে দু-হাজার বছরেরও পূর্বে। বাৎস্যায়ন ঋষি তাঁর গ্রন্থে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, তিনি সংকলকমাত্র। পূর্বাচার্যদের নানা মত তিনি তাঁর *কামসূত্রে* সুসংবদ্ধ করেছেন শুধু।

গ্রন্থারম্ভে মহামুনি বলছেন :

ইন্দ্রিয়জ কামার্তদের সন্তুষ্টির জন্য *কামশাস্ত্র* রচিত হয়নি। ধর্ম ও অর্থ সঞ্চয়ের বিষয়ে পাঠক যেমন নানা

আচার্যের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে, সেই নিষ্ঠাভরে সে যদি কামশাস্ত্র অধ্যায়ন করে, তাহলে সে ইন্দ্রিয়জয়ে সফলকাম হবে। অন্তিমে সে মোক্ষলাভ করবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, *কামশাস্ত্র* অধ্যয়নের পরেও যদি কোনো পাঠক ইন্দ্রিয়ের দাস হিসাবে যৌন জীবনযাপন করে তবে তার এই শাস্ত্রালোচনা ব্যর্থ।

ডক্টর মণি নাগ তাঁর গবেষণায় লিখেছেন :

Thus it seems that there has always been a strain of belief in the virtue of controlling sexual passions in Hindu culture despite expressions of eroticism—sometimes quite explicitly in its literature, arts and rituals. The available evidence suggests that such expressions began to appear around the second and third century B.C. and continued for about 1,500 years, perhaps reaching the culmination around the tenth or twelveth century A.D. when the Khajuraho and Konark temples were built.[1]

আমরা অধ্যাপক নাগের সঙ্গে একমত; কিন্তু কতকগুলি প্রশ্ন তা সত্ত্বেও সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা হল না। প্রথম কথা, প্রথম সহস্র বৎসরে কেন মন্দির-ভাস্কর্য আদৌ যৌনতা-মণ্ডিত হয়নি? তারা মূলত যুগলমূর্তিরূপেই রূপায়িত। প্রাচীন যুগের মাতৃপূজার বিভিন্ন প্রতীক বা 'মূর্তিমান-যোনি'-জাতীয় মূর্তি কোনমতেই মন্দির-ভাস্কর্য নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : অত্যুগ্র যৌনতা-বিজ্ঞাপিত শেষ কয়েক শ্রেণির মিথুন-ভাস্কর্য—যা আলোচ্য সময়ের শেষ পর্যায়ে বন্যাস্রোতের মতো ভিড় করে এল—খাজুরহো, কোনার্ক বা অন্যত্র—তা কি ভারতীয় শিল্প সাধারণভাবে গ্রহণ করেছিল? নাকি অনিবার্য নিয়তির বিড়ম্বনায় তাকে সহ্য করতে হয়েছিল? সমান্তরাল অনুভাবনা হিসাবে আমরা কি প্রশ্ন করতে পারি না : নাৎসি-শাসনের যুগে জার্মানির সাধারণ অধিবাসী কি নাৎসিবাদকে অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিল? গোটা জার্মানি কি সাধারণভাবে মেনে নিয়েছিল যে, নর্ডিক-আর্য রক্তের বিশুদ্ধতা-রক্ষায় লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে গ্যাসচেম্বারে পুড়িয়ে মেরে তাদের সম্পত্তি গ্রাস করার কাজটা নৈতিক সমর্থনযোগ্য? তালিবান-সরকার যেভাবে বামিহানের বুদ্ধমূর্তিগুলি ধ্বংস করল তাতে কি গোটা আফগানিস্তানের সমর্থন ছিল? ইতালিয়ানরা কি মাফিয়া-কালচারকে অন্তর থেকে গ্রহণ করেছে? অথবা গোটা আমেরিকা? তাদের 'কু-ক্লাক্স-ক্ল্যান'কে?

এমন কি হতে পারে না যে, ভারতবর্ষ ওই রাজা-রাজড়াদের ব্যভিচার বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে? যমুনাচর্য বা ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঝাণ্ডা-ঘাড়ে পথে নামেননি মানেই প্রমাণ হয় না যে, ভারতবর্ষ এটাকে সমর্থন করেছে! হয়তো মেনে না নিয়ে উপায় ছিল না বলেই তা সহ্য করেছে!

এ থেকেই উঠে পড়ে ওই প্রশ্নটা : আজ আমরা যে মূর্তিগুলিকে 'অশ্লীল' বলছি, সেগুলি কি সমকালীন সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতেও অশ্লীল বলে মনে হতো? আর সেই প্রতর্কটাই আমাদের সামনে নিয়ে আসছে . শেষ প্রশ্নটি। : শিল্পে অশ্লীলতার সংজ্ঞা কী?

শিল্পে অশ্লীলতা কাকে বলে?

A piece of art is to be judged with the yard-sticks of *rasa* and not with that of morality[2]

[কোনো শিল্পবস্তুর মূল্যায়ন শুধু 'রস'-এর বিচারে, নীতিশাস্ত্রের তুলাদণ্ডে নয়।]

বলেছেন আচার্য নন্দলাল।

স্বীকার করি। কিন্তু শিল্পবস্তুটি যদি প্রকাশ্যস্থানে সর্বসমক্ষে প্রদর্শিত হয় এবং নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচারের উপাদানটি যদি প্রকটভাবে 'আন্ডারলাইন' করা থাকে? তাহলে শিল্পরসবোদ্ধা নয়, সামাজিক জীব হিসাবেও তো আমাদের সেটি তৌল করে দেখতে হবে? শিল্পই তো সমাজের শেষ কথা নয়?

কিন্তু শিল্পে অশ্লীলতার অবস্থান-নিরূপণের আগে বুঝে নেওয়া উচিত 'অশ্লীল' কাকে বলি?

অশ্লীলতার সংজ্ঞা :

ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বলছেন :

Obscene means that to the average person, applying contemporary standards, the predominant appeal of the matter, taken as a whole, is that of prurient interest in a shameful or immoral interest in nudity, sex or excretion, which goes substantially beyond the customary limits of candour in description or representations of such matters which are utterly without any readeeming social importance.[3]

[সমসাময়িক ধ্যানধারণায় পুষ্ট একজন সাধারণ মানুষ যদি কোনো বস্তুর সামগ্রিক বিচারে মনে করে যে, সেটা অসৎ বা কুৎসিত চিন্তার উদ্রেক করছে, তাহলে

সেই বস্তুকে 'অশ্লীল' বলে চিহ্নিত করতে হবে। অসৎ বা কুৎসিত চিন্তা বলতে নগ্নতা, যৌনক্রিয়া, অথবা মলমূত্রাদি ত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে ন্যক্কারজনক শিল্প যদি এমনভাবে প্রদর্শিত বা উপস্থাপিত হয়, যাতে শালীনতার সীমা লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে অনুভূত হয়, তাহলেই সেটা অশ্লীল—বিশেষ, সেই শিল্পবস্তুতে যদি সমাজের ভালো করার উপাদান না থাকে।]

সেই সংজ্ঞা অনুসারে কোনো মন্দির-ভাস্কর্যকে যদি আজকের সাধারণ দর্শকের কাছে ন্যক্কারজনক মনে হয়, তবে তাকে 'অশ্লীল' বলা যাবে না—কারণ মধ্যযুগের ভাস্করদল তো ছিলেন তাঁদের 'সমসাময়িক ধ্যানধারণায় পুষ্ট'। সেকালীন দর্শকেরাও তাই ছিলেন।

নীতিবোধ বা অশ্লীলতার স্বরূপ যে কী দ্রুতছন্দে পরিবর্তিত হয়ে যায় তা আমরা বারে বারে দেখেছি। লরেন্সের *'লেডি-চ্যাটার্লিজ লাভার'* বা জেমস্ জয়েস-এর *ইউলিসিস্* যে-অপরাধে নিম্ন-আদালতে অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল তার শতগুণ প্রকটভাবে যৌনদৃশ্য আজ ইংরেজি সাহিত্যে বর্ণিত হচ্ছে। ভিক্টোরিয়ান যুগে কোনো মহিলা সর্বসমক্ষে পায়ের মোজা খুলতেন না। টেবিলের পায়া 'পা'-হওয়ার অপরাধে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হতো। অথচ আজ 'টপলেস্' বিকিনি-শোভিতা যুবতীর দল সর্বসমক্ষে সমুদ্রস্নান করে থাকেন।

ভ্রান্তিটা ওইখানেই। অশ্লীলতা কোনো শিল্পে বস্তুগতভাবে থাকে না। তার অবস্থান দর্শকের অনুভূতিতে। তার মূল্যায়ন শিল্পের উপলব্ধিতে। পাঠক-দর্শক-শ্রোতা অর্থাৎ গ্রহীতা-নিরপেক্ষ ললিতকলার কোনো কিছুই অশ্লীল হয় না। হতে পারে না। চোখ বুঁজলে আমাকে কেমন লাগবে তা দেখানোর ক্ষমতা নেই কোনো দর্পণের। শুধু আমার চৈতন্যেই চুনি হয় লাল, পান্না সবুজ। মধ্যযুগের মৈথুনবাদকে তাই বিচার করতে হবে মধ্যযুগীয় দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গিতে।

মলমূত্র ত্যাগের কথা পরিহার করে মোটামুটি বলা যায়—অশ্লীলতা নির্ভরশীল নগ্নতা এবং যৌনতার উপর। মানবসভ্যতায় এই দুটি ধারণার সূচনা হয়েছিল অযুত-নিযুত বৎসর পূর্বে—বর্বর কল্পের অবসানে। যখন 'মানুষ',—হোমো-স্যাপিয়ান্স' প্রজাতির জন্তু—যৌথবিবাহ প্রথা ত্যাগ করে ঐকান্তিক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে শুরু করল। কী হেতুতে তা করেছিল তা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। সেই মহাঅতীতকালে—'বর্বরকল্প' থেকে 'আধুনিককল্পে'র সংক্রমণ-মুহূর্তেই মানুষের মনে 'নগ্নতা' বোধ জাগল। সম্ভবত তা প্রথম জেগেছিল নারীর অন্তরে—স্বামী ব্যতীত অন্যান্য পুরুষের কামদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার্থে। হয়তো গোষ্ঠীপতির নির্দেশে পুরুষও অভ্যস্ত হল তার নগ্নতা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে। বিবাহপ্রথা প্রচলিত হবার পর—অর্থাৎ 'নর-নারী' যখন রূপান্তরিত হল 'স্বামীস্ত্রী'তে তখন থেকেই যৌনক্রিয়াকর্ম লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার আয়োজন হল। 'না-মানুষ'দের মধ্যে বিবাহপ্রথা নেই—ফলে তাদের নগ্নতা বা যৌনতা সম্বন্ধে কোনো ধারণাও নেই। তারই অনুসিদ্ধান্ত : মানুষ ব্যতীত অন্যান্য জীবের ধারণায় 'অশ্লীলতা'র কোন বোধও নেই।

পরের যুগে দেশ-কাল-ভেদে বিভিন্ন সভ্যতায় নগ্নতা যৌনতা এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট 'অশ্লীলতা'র বিষয়ে ধারণা ভিন্ন-ভিন্ন রূপে বিকশিত হয়ে ওঠে।

পশ্চিমখণ্ডে গ্রীক যুগে অবস্থাটা ছিল অনেকটা প্রাচীন ভারতের মতো। ডায়োনিসাস-উৎসবে নির্বিচারে যোগ দিত গ্রীক নরনারী। বিবাহপ্রথার সামাজিক বন্ধন অন্তত একদিনের জন্য শিথিল করা হতো। পরে, বস্তুত 186 খ্রিস্টপূর্বাব্দে, এই উৎসব সেনেটের নির্দেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়। খ্রিস্টধর্ম আগমনের পর অবস্থাটা কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল—নগ্নতা ও যৌনতা বিষয়ে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি—তা আমরা 'ন্যুড' পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কারণ বাইবেল মতে যৌনতা হচ্ছে 'আদিপাপ'! আদম-ঈভ নরনারীর মিলনের কথা জানার পরেই বিতাড়িত হয়েছিল স্বর্গরাজ্য থেকে।

ভারতবর্ষ 'যৌনতা'কে সে দৃষ্টিতে দেখেনি। যৌনক্রিয়া-কাণ্ড তার চোখে কোনো 'পাপকর্ম' নয়। তাই চতুরাশ্রমের ভিতর একটি আশ্রম গার্হস্থ্যাশ্রম—প্রজাতির প্রবহমানতার প্রয়োজনে। কারণ প্রাচীন ভারত স্বীকার করেছিল : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বলেছে, জীবজগতের প্রাণময়তার মূলে কোনো 'পাপ' নেই, আছে 'আনন্দ'। প্রেমের আনন্দ, ভালবাসার আনন্দ, জীবসৃষ্টির আনন্দ। কিন্তু এটা তো একেবারে আদিযুগের মন্ত্র। বৈদিক যুগের অবসানে উপনিষদিক যুগের প্রাগুষা লগ্নে। তারপর কী হল?

তার খণ্ডচিত্রই শুধু পেয়েছি। বৃহৎ-অরণ্যের অভ্যন্তরে কিছু মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি স্রষ্টা ও সৃষ্টির পারম্পর্য সন্ধানে প্রবিষ্ট হলেন। কখনো হতাশ হয়ে বলেছেন—সৃষ্টির সেই আদিভূত সত্তাকে জানা যায় না, বোঝা যায় না, ধরা যায়

না—'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাগ্‌গচ্ছতি, ন মনঃ।' আবার কখনো বা উল্লাসে চীৎকার করে ওঠেন—আমি তাঁকে জেনেছি, তমসার ওপারে সেই হিরণ্ময় সত্তাকে প্রণিধান করেছি। হে অমৃতের পুত্রগণ, শোন—আমার উপলব্ধির সেই আনন্দবার্তা শ্রবণ কর!

কিন্তু এ তো সমগ্র ভারতের এক অতি ক্ষুদ্র খণ্ডিত চিত্র। সমাজ-সংসারের বাহিরের একান্তচিত্ত একদল তত্ত্বদর্শীর উপলব্ধি। সে উপলব্ধির বার্তা যদি তাঁরা শুধু ভূর্জপত্রে সাজিয়ে যেতেন তাহলে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের জ্ঞানভাণ্ডারের মতো তা চলে যেত ইতিহাসের নেপথ্যে, বিস্মৃতির অন্তরালে। তাই তাঁরা তা সঞ্চয় করে গেছেন শিষ্যপরম্পরার 'শ্রুতি'তে। সামগানে তা সহস্রাব্দের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গভঙ্গ পাড়ি দিয়ে আজও সজীব। তা হারিয়ে যায়নি।

কিন্তু সেই সীমিত তপোবনের বাহিরে বৃহত্তর ভারত তখন কী ভাবত? ওই যারা দাঁড় টানে, নৌকা বায়, তাঁত চালায়, মাঠে ফসল ফলায়? তাদের লোকায়ত দর্শনও একটা ধারাবাহিকতা স্বীকার করে এসে পৌঁচেছে বর্তমানের খেয়াঘাটে। নগ্নতা সম্বন্ধে, যৌনতা সম্বন্ধে, অশ্লীলতার বিষয়ে তারা কী ভাবত তা শুধু জানতে পারি আভাসে-ইঙ্গিতে। লোকগাথায়, চারণ কণ্ঠে, যাত্রায়, কথকতায়। সে ধারণা অস্পষ্ট। তা নিয়ে গবেষণা হয়নি। বোধকরি উপাদানের অভাবে।

ভারতীয় সংস্কৃতির পরবর্তী অধ্যায় : ষড়দর্শন।

ভারতের ধর্মজগতে তখন ক্ষীয়মাণ হয়ে এসেছে বৌদ্ধধর্মের প্রসারতা, পুনরায় জাগরিত হচ্ছে হিন্দু বৈদিক কর্মকাণ্ড—পূর্বমীমাংসা-দর্শন। তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী সার্বভৌম অদ্বৈতবাদ। মীমাংসা-দর্শনের মতে মানবজীবনে চতুরাশ্রম আবশ্যিক—ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। অদ্বৈতবাদীদের মতে এ চতুরাশ্রম ব্যবস্থা আবশ্যিক নয়।

উত্তরমিমাংসা-দার্শনিক বৈদান্তিকের মতে : "যদহরে বিরজ্যেত তদহরে প্রব্রজ্যেত"

[যখনই অন্তরে বৈরাগ্য জাগবে তখনই সন্ন্যাসগ্রহণ করা যাবে।]

অথচ পূর্বমীমাংসা-দর্শনের নির্দেশ চতুরাশ্রমের পথেই মানবাত্মার প্রকৃষ্ট মুক্তির শেষ তীর্থ। অর্থাৎ মীমাংসক-পণ্ডিতেরা গার্হস্থ্যাশ্রমকে অস্বীকার করেন না। নরনারীর বিবাহিত জীবনকে একটি আবশ্যিক পর্যায় বলে স্বীকার করেন।

এই দুই বিপরীত চিন্তাধারার একটি ঐতিহাসিক সংঘাত উপস্থিত হয়েছিল অষ্টম শতাব্দিতে। সে সময়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ পূর্বমীমাংসক ছিলেন আচার্য কুমারিল ভট্ট—গৌড়বঙ্গের মহাচার্য। তাঁর শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে ভারতবিজয়ী অদ্বৈতাচার্য আদি শঙ্করের এ বিষয়ে একটি প্রতর্ক হয়। সে বিচারে মধ্যস্থ বা বিচারক হয়েছিলেন আচার্য মণ্ডন মিশ্রের ধর্মপত্নী উভয়ভারতী। পরম্পরাগত উপকথায় জানা যায় যে, উভয়ভারতী তর্কশেষে আদি শঙ্করাচার্যকেই জয়ী হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং এক নিশ্বাসে বলেন, 'আচার্যদেব! আপনি আশ্রমপিতা মণ্ডন মিশ্রকে অর্ধাংশে পরাজিত করেছেন মাত্র। তাঁর অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে আমাকে পরাজিত না করা পর্যন্ত স্বীকার করা যাবে না যে, পূর্বমীমাংসাদর্শন অপেক্ষা অদ্বৈত-বেদান্তদর্শন শ্রেষ্ঠ পন্থা!'

আদি শঙ্করাচার্য তার পূর্বেই সমগ্র দক্ষিণ, উত্তর ও মধ্যভারত বিজয় সম্পন্ন করেছেন। পূর্বভারতের শ্রেষ্ঠ পূর্বমীমাংসক কুমারিল ভট্টের শিষ্যকেও পরাস্ত করেছেন। তাই সহজাত দার্ঢ্যে উভয়ভারতীকে জানালেন, 'আমি স্বীকৃত। বলুন মা, কোন্ শাস্ত্র বিষয়ে আমাদের প্রতর্ক হবে?'

উভয়ভারতী প্রতিপ্রশ্ন করেন, 'শাস্ত্রের বিষয় নির্বাচনের অধিকার আপনি কি আমাকেই দিচ্ছেন?'

—হ্যাঁ, মা। নির্ব্যূঢ় শর্তে!

উভয়ভারতী বলেন, সে ক্ষেত্রে আমার নির্বাচন ঋষি বাৎস্যায়ন প্রণীত কামশাস্ত্র!

আদি শঙ্কর প্রমাদ গণলেন। তিনি নিতান্ত বাল্যকালে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন, গার্হস্থ্য-জীবনের কথা বস্তুত কিছুই জানেন না। সলজ্জে সে-কথা স্বীকার করলেন উভয়ভারতীর নিকট।

আচার্যা বললেন, 'মহাভাগ! এখন আপনার সম্মুখে তিনটি পথ উন্মুক্ত। হয় প্রমাণ করুন ঋষি বাৎস্যায়ন প্রণীত কামশাস্ত্র ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিতে অগ্রাহ্য, প্রক্ষিপ্ত। অথবা, প্রত্যাহার করে নিন আপনার প্রতিশ্রুতি—বিচারের বিষয় নির্বাচনে আমার নির্ব্যূঢ় অধিকার। তৃতীয়ত, আপনি স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করে নিতে পারেন।'

শঙ্করাচার্য অবনত মস্তকে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন।

* * *

এ পর্যন্ত স্বীকৃত ইতিহাস। এর পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। একদল পণ্ডিত বলেন, তখন আদি শঙ্করাচার্য উভয়ভারতীর নিকট কিছু সময়

প্রার্থনা করে বিচার অসমাপ্ত রেখে চলে যান। এক সদ্যোমৃত রাজার দেহে সূক্ষ্ম শরীরে প্রবেশ করে তাঁকে পুনর্জীবিত করেন। পুনরায় জীবিত হয়ে রাজার শরীর-মধ্যে অবস্থিত আচার্য শঙ্কর তাঁর প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করেন। মহিষীদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে সহবাস করে কামশাস্ত্রবিশারদ হয়ে ওঠেন। তারপর উভয়ভারতীর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে তাঁকে পরাজিত করেন এবং ভারত-বিজয় সম্পূর্ণ করেন।

আমাদের আশঙ্কা—কাহিনির এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত ও অর্বাচীন। পরবর্তী কোনো শঙ্করাচার্যের নির্দেশে রচিত। প্রথমত আদি শঙ্করাচার্য যুগাবতার হওয়া সত্ত্বেও নরদেহধারী ধর্মপ্রচারক। মৃতদেহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মতো অলৌকিক ঘটনা কোন নরদেহধারীর পক্ষে সম্ভবপর নয়। মনোজগতে তাঁরা হয়তো নানান বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন—কিন্তু বিশ্বপ্রপঞ্চের যে সুনির্দিষ্ট নিয়ম—'ঋতম্' (Cosmic-Law)-তা অতিক্রম করতে পারেন না। বুদ্ধদেব মৃতসন্তান-ক্রোড়ে জননীকে বলেছিলেন একমুষ্টি শস্য সংগ্রহ করে আনতে। মৃতপুত্রকে প্রাণদান করতে পারেননি। পদব্রজে তাঁর নিরঞ্জনা নদী অতিক্রমণ পরবর্তী শিষ্যদের প্রক্ষিপ্ত রচনা। আমাদের বিশ্বাস : 'নিরঞ্জন' শব্দের অর্থ যখন ঈশ্বর, তখন বুদ্ধদেবের জীবনীতে ওই ঘটনার তাৎপর্য শাক্যসিংহ 'ঈশ্বর'-নদী অতিক্রম করে বৌদ্ধত্ব লাভ করেন। যীশুখ্রিস্ট মানবকল্যাণে ক্রুশকাষ্ঠে শহিদ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবনীতে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাগুলি পরবর্তী শিষ্যদলের সংযোজন।

দ্বিতীয় কথা : আদি শঙ্করাচার্য আজীবন ছিলেন উর্ধ্বরেতা সন্ন্যাসী। এটা অবিসংবাদিত সত্য। ফলে ওভাবে তাঁর কামশাস্ত্রবিশারদ হওয়ার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তাই আমরা কাহিনির দ্বিতীয় ধারাটিকেই গ্রহণ করি : উভয়সঙ্কটে শঙ্করাচার্যকে অধোবদনে চিন্তা করতে দেখে উভয়ভারতী বললেন, 'আচার্যদেব! আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে এই সমস্যা থেকে উত্তরণের একটি প্রস্তাব আপনার নিকট নিবেদন করতে পারি।'

আচার্য বললেন, 'বলুন, মা!'

—বৈদান্তিক জ্ঞানকাণ্ডে আপনার অদ্বৈতবেদান্ত দর্শন পূর্বমীমাংসা-দর্শনের অপেক্ষা শ্রেয় পন্থা এটি এই প্রতর্কসভায় প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কর্মকাণ্ডে পূর্বমীমাংসাদর্শন অগ্রাহ্য হতে পারে না। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ-মিথ্যা' আপনার এই মহাবাক্য স্বীকার্য হলেও প্রশ্ন থাকে : কে সেই 'মিথ্যা'কে সৃষ্টি করেছিলেন? সেই পরমব্রহ্মই তো? বিবেচনা করে দেখুন : সমগ্র ভারত যদি অপনার ওই ধর্মমত গ্রহণ করে, তাহলে শতাব্দিকালের ভিতরেই মনুষ্যপ্রজাতি এই বিশ্ব থেকে অবলুপ্ত হতে বাধ্য। আপনার চতুরাশ্রম তখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে—কারণ আপনার আশ্রমে ভবিষ্যৎ-শঙ্করাচার্যদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। তাঁদের ধারাবাহিকতা শুধুমাত্র প্রজনন পথেই সম্ভব। পৃথিবী তখন মনুষ্যেতর জীবের আবাসস্থল হয়ে যাবে—কারণ বেদান্তদর্শন তারা প্রণিধান করতে অসমর্থ! পৃথিবীতে তখন কোনো প্রাণী থাকবে না যে বলতে পারে : 'ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা!'

আচার্য বললেন, 'আপনি তাহলে কী সমাধানের প্রস্তাব রাখছেন?'

—আপনি ভারতভূখণ্ডের চতুষ্প্রান্তে চারটি অদ্বৈতবেদান্তের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করুন—কিন্তু মধ্যভারতে নয়। শিবপার্বতীর আশীর্বাদধন্য কাশীধামে নয়। রাধাকৃষ্ণের পদরেণুধন্য বৃন্দাবনধামে নয়! আপনার অনুজ্ঞা সীমিত থাকবে শুধুমাত্র দশনামী সম্প্রদায়ের ভিতরেই—গার্হস্থ্য আশ্রমে নয়!

হয়তো—এ আমাদের অনুমান—শঙ্করাচার্য তাই করেছিলেন।

এত বিস্তারিতভাবে বলতে হল, ওই কথাটা বোঝাতে—সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য জীবনের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে ভারত সংস্কৃতি। কোনো গর্ভগৃহে দেবতার



চিত্র 14.1 স্বামী বিবেকানন্দ

অধিষ্ঠান ও মন্দিরের বাহির প্রাচীরে মিথুনাচারের সহাবস্থান একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভব।

অষ্টম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দি। সহস্রাব্দের ব্যবধান।

ঈস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির আদিযুগে যেসব খ্রিস্টান ধর্মযাজকেরা এসেছিলেন তাঁরা 'আদিপাপ' ধ্যান-ধারণার বাহক। তাঁরা মন্দিরের বহির্গাত্রে মিথুনাচারের ভর্ৎসনা করেছিলেন। সেগুলি ধ্বংস করার সুপারিশও করেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে একই সময়ে এসেছিলেন স্যর উইলিয়াম জোনস্-এর মতো পণ্ডিত। প্রতিষ্ঠা করা হল এশিয়াটিক সোসাইটি। খ্রিস্টান পাদরীদের কালাপাহাড়ি মনোবৃত্তি শাসকদলের স্বীকৃতি পেল না; কিন্তু ফল্গুধারার মতো তা একটি সমান্তরাল ধারায় চিরকালই প্রবাহিত হয়েছিল। কিছু কিছু বিদেশী পণ্ডিত মন্দির-ভাস্কর্য বিষয়ে কঠোব ভাষায় সমালোচনাও করেছিলেন।

এভাবেই কেটে গেল প্রায় একশ বছর।

তারপর ভারত সংস্কৃতির ইতিহাসে ঘটল এক যুগান্তকারী ঘটনা :

1893 খ্রিস্টাব্দে শিকাগো শহরে স্বামীজির বক্তৃতা।

ভারত-সংস্কৃতির মূল তত্ত্বটা ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে। একদিকে প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দুধর্মের সর্বংসহ উদার নীতি, অপর দিকে সেবাব্রতের মধ্যমে 'জীবে-শিব' দর্শন। স্বামীজি, প্রণবানন্দজি প্রভৃতি ডাক দিলেন ভারতের যুবসমাজকে—জাতপাত-কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে তাদের মুক্ত করে নিয়ে এলেন সেবাধর্মের মালভূমিতে। সারদা-মা, নিবেদিতা প্রভৃতি সঙ্ঘবদ্ধ করলেন ভারতীয় রমণীকূলকে। স্বামীজির প্রয়াণের পরে রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি* আবার তুলে ধরল বিশ্বের দরবারে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ।



চিত্র 14.2 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হয়তো এইসব হেতুতেই মন্দিরগাত্রে তথাকথিত অশ্লীল মূর্তিগুলি অপসারণ বা চূর্ণ করার প্রচ্ছন্ন আন্দোলনটি স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু তারপরেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করে। দ্বিধারায়। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত সশস্ত্র বিপ্লবীরা। এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, খাজুরাহো মন্দিরের ভাস্কর্যগুলি তখনো অনাবিষ্কৃত।

বিংশ শতাব্দির চল্লিশের দশকে ভাবতবিদ্ আচার্য বিনোবা ভাবে একবার প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে মত প্রকাশ করেন যে, বিভিন্ন মন্দির থেকে ওইসব মিথুনমূর্তিগুলি অপসারিত করা উচিত। তাঁর কিছু ঘনিষ্ঠ ভক্ত এ বিষয়ে অচিরেই সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তবে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে অবতীর্ণ হবার পূর্বে আচার্য ভাবের নির্দেশে তাঁরা মহাত্মাজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। মহাত্মাজী ছিলেন বিচক্ষণ রাজনীতিক। যেহেতু বিষয়টি শিল্প-সংশ্লিষ্ট, তাই এ বিষয়ে গুরুদেবের শান্তিনিকেতনের মতামত জানতে চান। রবীন্দ্রনাথ ততদিনে প্রয়াত। আচার্য অবনীন্দ্রনাথ গুরুতর অসুস্থ। ফলে আচার্য নন্দলাল তাঁর মতামত জানান। মহাত্মাজীকে তিনি কোনো পত্রোত্তর করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। সেটি পরবর্তীকালে তাঁর *শিল্পকথা* [4] গ্রন্থে সংকলিত হয়। নন্দলাল বলেন :

> কিছুকাল পূর্বে পুরী ও কোনারক মন্দিরের বহির্ভিত্তিস্থিত বদ্ধকাম (সেগুলিকে 'দুর্নীতিপূর্ণ না বলিয়া 'আদিরসাত্মক' বলা উচিত। কারণ শিল্পবস্তুর শ্রেণিবিভাগ নীতির বিচারে সম্ভব নয়। হয় রসের বিচারে। রসের ব্যভিচার ঘটলেই শিল্পের পক্ষে তা 'দুর্নীতি'। রসের ব্যভিচার ঘটিয়ে শিল্পকে সামাজিক সুনীতি প্রচারের কাজেও লাগানো যায়। যথার্থ তা নয়।) মূর্তিগুলি নষ্ট করবার কথা

হয়েছিল। সাংঘাতিক প্রস্তাব! এগুলি গেলে শিল্পসৃষ্টির কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শনই চলে যায়। নিশ্চয় করে বলতে পারি না, পুরী-কোনারকের ভাস্করশিল্পী কেন এমন বিষয় নির্বাচন করেছিলেন। বিভিন্ন মনীষী



চিত্র 14.3 মহাত্মা গান্ধী

বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। মানুষের জীবনে যে নবরসের লীলা, এটি তার অন্যতম রস : আদি রস। এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, রসসৃষ্টি হিসাবে মূর্তিগুলি খুবই উচ্চমানের।

অসুস্থ হলেও অবনীন্দ্রনাথ তখনো শান্তিনিকেতন আশ্রমে। আশা করা যায়, নন্দলাল আচার্য অবনীন্দ্রনাথের সম্মতিক্রমে এই মতামত প্রকাশ করেন। বলাবাহুল্য মহাত্মাজী অনুমোদন করলেন না। বিনোবাজীর শিষ্যদল হতাশ হলেন। সে আমলে দেশনেতারাও ছিলেন সুবিবেচক আর 'করসেবকেরা'ও ছিল সুশৃঙ্খল। ফলে ভারতীয় মন্দিরগাত্রে মিথুনাচারের মূর্তিগুলি আর অপসারিত বা বিচূর্ণিত করা হয়নি। যে যেখানে ছিল, সে সেখানেই আছে।

বোধকরি একমাত্র ব্যতিক্রম পুরীর প্রধান মন্দিরে সেই চারখানি ভাস্কর্য। তারা মোটা চুনসুরকির প্রলেপে আত্মগোপন করেছিল। তবে আমাদের বিশ্বাস, সে-কথা সমকালীন ভারতবিদেরা জেনে যাননি—রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, কুমারস্বামী বা অবনীন্দ্রনাথ।

বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত মিথুনে অশ্লীলতার পুনর্মূল্যায়ন :

এতাবৎকাল আমরা গণভোটের নির্দেশে মিথুনাচারে অশ্লীলতার মান সম্বন্ধে আলোচনা করে এসেছি। নিতান্ত নিরুপায়ভাবে। এবার অধ্যাপক নীহাররঞ্জনের নির্দেশটা মেনে নিয়ে তার পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করি। অধ্যাপক-মশাই বলেছিলেন—'কোন শিল্পবস্তুর মূল্যায়ন গণভোটে নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। প্রতিটি দর্শকের নিজ নিজ ধারণাই স্বীকার্য।' এবার তাই গ্রন্থকারের নিজস্ব মতামত দাখিল করার সময় এসেছে :

প্রথম স্তর : শ্রেণি I—যুগল/শ্রেণি II—উত্তেজিত/শ্রেণি III—শৃঙ্গাররত

প্রথম দুইটি শ্রেণি সম্বন্ধে অশ্লীলতার প্রশ্নই ওঠে না। কোনো দর্শকই তাদের অশ্লীলতা দোষদুষ্ট মনে করেননি। আমরাও করি না।

তৃতীয় শ্রেণির শৃঙ্গাররত মিথুনমূর্তিগুলির বিষয়ে প্রায় পঁচিশ শতাংশ দর্শকের মত : সেগুলি অশ্লীল। আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। এগুলি আমাদের মতে রসোত্তীর্ণ, উৎকৃষ্ট শিল্পনিদর্শন।

দ্বিতীয় স্তর : শ্রেণি IV—সমকামী/শ্রেণি V—আত্মরত্যাতুর/শ্রেণি VI—মৈথুনরত/শ্রেণি VII—আনুষঙ্গিক যৌনাচার।

আমরা যাঁদের মতামত সংগ্রহ করেছিলাম তাঁদের মধ্যে অনেকেই সমকামী ও আত্মরত্যাতুর মিথুনমূর্তিগুলিকে অশ্লীল, এমনকি কদর্য মনে করেছেন। আমরা এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করি :

সমকামী (পুরুষমূর্তির মধ্যে 'হোমোসেক্শুয়াল' আমরা খুঁজেই পাইনি—শুধু 'লেস্‌বিয়ান' মূর্তির কথাই হচ্ছে) মূর্তিগুলি আমাদের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রসোত্তীর্ণ ও উৎকৃষ্ট মনে হয়েছে। যেমন চিত্র 9.7, 9.8। আমরা ইতিপূর্বে সেগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেছি। এখানে আচার্য নন্দলালের নির্দেশই শিরোধার্য করছি : 'A piece of art is to be judged with the yardsticks of *rasa* and not with that of morality.'

বাস্তবজীবনে সর্বকালেই মেয়েরা তাদের 'লেস্‌বিয়ান' প্রবণতা একান্ত সঙ্গোপনে রাখতে চায়। কিন্তু সে গোপনতা মলমূত্র ত্যাগের গোপনীয়তার সমপর্যায়ের নয়, এমনকি সঙ্গমক্রিয়ারও সমপর্যায়ী নয়। কারণ শেষোক্ত দুটি ক্রিয়ার প্রথমটি নরনারীর জীবনে আবশ্যিক, দ্বিতীয়টি প্রত্যাশিত। যদিও সামাজিক নির্দেশে তা গোপন রাখার নির্দেশ। 'লেস্‌বিয়ান' প্রবৃত্তি তা নয়। সেটি 'আবশ্যিক' বা 'প্রত্যাশিত' নয়। মেয়েমহলে সেটা বহুল-ব্যবহৃত হলেও তা অত্যন্ত সঙ্গোপনে রাখা হয়। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে।

কিন্তু মন্দির-ভাস্কর্যে যাদের আলেখ্য দেখছি তারা যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে বঞ্চিত। হারেমজাত উপপত্নী বা রক্ষিতার দল এবং দেবদাসীরা যে অস্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ছিল শৃঙ্খলিত। ফলে তাদের বেদনার ইতিকথা শিল্পের উপজীব্য নিশ্চয় হতে পারে। হয়েছেও। করুণ রসের বিচারে তারা সার্থক। অশ্লীল নয়।

আপনারা যদি না মানতে চান তাহলে তর্ক করব না। বরং একটি কাহিনি শোনাব। এ কাহিনি আমার রচনা নয়।

গল্পটি আমি পড়েছিলাম পাঁচ-ছয় দশক আগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে। যুদ্ধকালেরই গল্প—ইংরেজি নভেল। দুর্ভাগ্যবশত বইয়ের নাম এবং লেখকের পরিচয় আজ আর মনে নেই। কিন্তু সেই আপাত-অশ্লীল খণ্ডকাহিনির বেদনা এই দীর্ঘ সময়েও ভুলতে পারিনি :

কাহিনি শুরু হয়েছে একটি 'টিন-এজার' অস্ট্রিয়ান কিশোরীকে ঘিরে। মেয়েটি সুন্দরী, ব্লন্ড এবং ধর্মে ইহুদি। হিটলারের অভ্যুত্থানের প্রাগ্বর্তী যুগে সে পড়ত একটি 'কো-এজুকেশন' স্কুলে। অস্ট্রিয়ার একটি ছোট শহরে। ওদের স্কুলে ইহুদি ও খ্রিস্টান দুই ধর্মের ছেলেমেয়েই সেকালে একসঙ্গে পড়ত। ওর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল এক সহপাঠী, জন—ডাকনাম 'জো'। সেও ইহুদি।

ওরা যখন কৈশোর অতিক্রমণে যৌবনের সিংহদ্বারে উপনীত হল তখনই অভ্যুত্থান হল ফ্যুরারের : অ্যাডলফ্ হিটলারের। অস্ট্রিয়া থেকে বিতারণ শুরু হল ইহুদিদের। কোনরকমে গেস্টাপোর নৃশংসতা এড়িয়ে মেয়েটি পালিয়ে যায়। ধরা পড়ে ওর বাবা-মা-ভাইবোন এবং জো। বনে জঙ্গলে কিশোরী মেয়েটি পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াতো—গাছের ফল আর ঝরনার জলে কোনক্রমে জীবন ধারণ করে। তারপর যুদ্ধের মোড় গেল ঘুরে। শুরু হল মিত্রশক্তির কার্পেট বম্বিঙ। নিতান্ত ঘটনাচক্রে মেয়েটি ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করল তার এক জার্মান সহপাঠিনীর মৃতদেহ। ঘটনাচক্রেই সে মেয়েটি ছিল ব্লন্ড ও তার সমবয়সী।

ইহুদি তরুণীটি তার বান্ধবীর আইডেন্টিটি-কার্ড সম্বল করে নতুন পরিচয়ে ফিরে আসে লোকালয়ে। কাহিনির



চিত্র 14.4 অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। নতুন পরিচয়ে মেয়েটি আশ্রয় পায় এক নাৎসি কর্নেলের আবাসে। তাঁর পক্ষাঘাতগ্রস্ত সহধর্মিণীর 'কম্পানিয়ন' হিসাবে। বছর দেড়েক পরে গৃহস্বামিনী পরলোকগমন করেন এবং কর্নেল ওই অনাথাটিকে দত্তক নিতে চাইলেন। যুদ্ধ তখনো চলছে। নাৎসিশাসনের দোর্দণ্ড প্রতাপ। কর্নেলের ওই প্রস্তাব পেয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানালেন প্রথমে অজ্ঞাত মেয়েটিকে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ওর দেহের রক্তকণিকায় 'সেমেটিক' ছিটেফোঁটা আছে কি না। ফলে মেয়েটিকে পাঠানো হল নাৎসি-গেস্টাপো হেড-কোয়ার্টার্সে।

অনাথ মেয়েটির গ্রাম মিত্রপক্ষের দখলে। তাই সব কিছু খুঁটিয়ে যাচাই করা গেল না। ওর জার্মান সহপাঠিনীর আইডেন্টিটি-কার্ড বেশ কয়েক বছরের পুরানো—ওজন, উচ্চতা মেলার কথা নয়। তবে শনাক্তিকরণ-কার্ডে যে বর্ণনা আছে তা মিলে যাচ্ছে : দেখা গেল মেয়েটি ব্লন্ড,

চুল লাল, চোখের তারা নীল! গেস্টাপো মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিল মেডিকাল বোর্ডের কাছে। যাচাই করাতে যে, মেয়েটা নির্ভেজাল নর্ডিক-আর্য কি না।

মেডিকাল বোর্ডের বড়কর্তার আদেশে ওকে একটি 'শাওয়ার বাথে' গরমজলে নগ্নস্নান করানো হল। তারপর আদিষ্ট হয়ে নগ্নাবস্থাতেই তাকে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হল অপারেশন-টেবিলে। ঘরে সাত-আটজন নাৎসি ডাক্তার নানান কাজে ব্যস্ত। সিনিয়র একজন প্রৌঢ় ডাক্তার এগিয়ে এসে ওর পায়ের দিকে একটি ফ্লাড-লাইট জ্বালিয়ে দিলেন। 'বিবৃতজঘনা' হতভাগিনীর গোপনাঙ্গ পরীক্ষা করতে।

The elderly senior doctor, while examining her private parts, suddenly called out to his juniors, 'Hi! You come one and all! I'll show you the Eighth Wonder of the world!'

Rushed in the young doctors to enjoy the fun. The senior doctor opened up the two *labia majora* with the help of a pair of tongs to expose the inner *labia minora* and to reveal the hooded tiny rose-bud, the clitoris—more pink than her lips or nipples. The doctor jeered derisively, ''Look there! This girl is of two and twenty years and is yet a virgin!''

The young doctors collided their heads for a closer view of the wonder—a beautiful blond who couldn't had the fortune to get her hymen pierced in her long years of school and college days.

The Allied bombers had shattered her hearth and home and now these Nazi 'bombers' smashed to smithereens her dream! Yes, she had cherished a sweat dream for over a decade! She knew for certain that one night her innermost privacy, covered by golden pubic hairs, would be opened up—in both senses—by male fingers. But the venue, in her dreams, was different—a dim-lit, perfumed honeymoon cove. And the hand would be that of 'Joe'—her boy-friend of calf-love days.

But alas! Joe had been goaded to the gas-chamber.

The girl squirmed!

কাহিনি এই পর্যন্তই।

এবার বলুন : কাহিনির ভিতর নারীদেহের যে **পুঙ্খানুপুঙ্খ** বর্ণনা লেখক দিয়েছেন সেটা কি আপনার কাছে অশ্লীল বা কদর্য মনে হল? এটা 'গ্রে'-র অ্যানাটমি নয়, উপন্যাস। সচরাচর এ জাতীয় বর্ণনা কথাসাহিত্যিকেরা এড়িয়ে চলেন। আমরাও যেমন এ অংশটির বঙ্গানুবাদে বিরত হয়েছি. স্বয়ং সাহিত্যসম্রাটের অনুকরণে। মনে আছে নিশ্চয়, *কৃষ্ণচরিত্রে* বস্ত্রহরণ অনুচ্ছেদে ভাগবত থেকে কিছুটা সংস্কৃত উদ্ধৃতি দিয়ে বঙ্কিম লিখেছিলেন, 'বঙ্গানুবাদ আর নাই করিলাম।'

প্রশ্ন সেটা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এই বর্ণনায় কি আপনার বিবমিষার উদ্রেক হল? শালীনতার সীমারেখা কি লঙ্ঘিত হয়েছে? রচনাটি অশ্লীল মনে হয়েছে? তাহলে কোনার্কের ওই দুটি ভাস্কর্য—চিত্র 9.6 এবং চিত্র 9.8—আপনি অশ্লীল ও কদর্য বলে চিহ্নিত করতেই পারেন।

আমরা সেক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। দুঃখিত।

* * *

মৈথুনরত মিথুন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য :

রসসৃষ্টি হিসাবে সবগুলি ভাস্কর্যকে একদলে ফেলা যায় না। চিত্র 9.22 অথবা চিত্র 9.23-এ কোনার্কে যে সঙ্গমদৃশ্য দুটি দেখেছি, তা আমাদের কাছে অশ্লীল বা কদর্য বলে মনে হয়নি। অপরপক্ষে কোনার্ক জগমোহনের উপরাংশে অতি বৃহৎ মৈথুনরত মিথুন ভাস্কর্যগুলি আমাদের বরদাস্ত হয়নি। সেগুলির চিত্র আমরা সংযোজন করিনি। একটিমাত্র উদাহরণ আছে চিত্র 9.21-এর 'বৃক্ষাধিরূঢ়ম' আসনে। এগুলি আমাদের দৃষ্টিতে রসোত্তীর্ণ শিল্প হয়ে ওঠেনি।

এই ভালো-লাগা ও মন্দ-লাগার হেতুটা কী বলা কঠিন। হয়তো তাদের আকার ও সংস্থাপনা অন্যতম হেতু। চিত্র 9.22 অথবা চিত্র 9.23 আকারে অনেক ছোট—যেন জীবনের একটি বিশেষ পর্যায়ের ক্ষুদ্র আলেখ্য। তুলনায় চিত্র 9.21 যেন বিরাটাকার 'হোর্ডিং'-বিজ্ঞাপন। দ্বিতীয়ত রথচক্র-নেমির সঙ্গম-দৃশ্যগুলিতে পুংজননেন্দ্রিয় প্রকটভাবে উৎকীর্ণ করা হয়নি—আমরা বিদেশী চলচ্চিত্রে 'বেডরুম' দৃশ্যে এ জাতীয় সঙ্গমচিত্র দেখেছি। 'হল' ছেড়ে উঠে আসিনি। বিদেশী চলচ্চিত্রের সেইসব এপিসোডের সঙ্গে ব্লু-ফিলম্-কে একাসনে বসানো যায় না। যদিও দুটিই সঙ্গমদৃশ্য। এইসব হেতুতেই সম্ভবত স্ফীতকায়

পুংজননেন্দ্রিয় উৎকীর্ণিত মৈথুনরত মিথুনগুলিকে আমাদের দৃষ্টিতে অশ্লীল মনে হয়েছে। তাবলে আমরা তা ভেঙে ফেলা বা অপসারণ করার সুপারিশ করছি না।

আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলব :

মৈথুনরত মিথুন ভাস্কর্যে সঙ্গমাসনের বৈচিত্র্য আছে— কিছু দণ্ডায়মান, কিছু শায়িতবন্ধ, কিছু 'বৃক্ষাধিরূঢ়' আসন—কিন্তু 'রসে'র ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য নজরে পড়ে না। সবই যেন সেই প্রাইমারি-ক্লাসের ছাত্রটির : 'অ্যানাদার ফ্রগ'!

শৃঙ্গাররত মিথুনপর্যায়ে আমরা ভাবরাজ্যে যে বৈচিত্র্য দেখেছি—ধরুন চিত্র 8.23, চিত্র 8.26, 8.27, 8.30-এ, অথবা উত্তেজিত মিথুন পর্যায়ে, চিত্র 8.12, 8.13, 8.14, 8.15-এ। তেমন সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় পরিকল্পনা আমরা পাই না মৈথুনরত মিথুন শ্রেণিতে। কিন্তু তা হলেও হতে পারত। শিল্পীর মননে তেমন পরিকল্পনাও ধরা দিলেও দিতে পারত।

একটি উদাহরণ দাখিল করলে হয়তো বক্তব্যটা স্পষ্ট হবে। এই ভাস্কর্যের চিত্ররূপ আমরা ইতিপূর্বেই দাখিল করেছি, কিন্তু তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করিনি। তাই সেটি পুনরায় মুদ্রিত করা গেল (চিত্র 14.5)।

রোদ্যাঁ এই বিচিত্র ভাস্কর্যটির নাম দিয়েছিলেন : *Fugit Amor*



চিত্র 14.5 পলাতকা প্রেম/রোদ্যাঁ

বঙ্গানুবাদে যা : পলাতকা প্রেম।

মৈথুনরত মিথুনেরই এক আশ্চর্য রূপান্তর। বিচিত্র ব্যঞ্জনা।

নায়িকা উবুড় হয়ে পড়ে আছে নিচে। নায়ক তার পিঠের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে হাত বাড়িয়ে কিছু খুঁজছে। সঙ্গমদৃশ্য নয়, বিড়ম্বিত দাম্পত্যজীবনের এক করুণ পর্যায়ের দ্যোতনা। কোনা কোনো হতভাগিনীর দাম্পত্যজীবনে এমন পর্যায় আসে যখন তাকে বলতে হয় 'কেন কাঁদি বুঝিতে পার না? তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি—এ শুধু চোখের জল, নহে ভর্ৎসনা।'

পুরুষ যখন নায়িকার অন্তরের কথা জানতে চায় না, দেহের সীমান্তে তাকে পেতে চায়; ফাঁকা বুলিতে, মৌখিক 'কম্‌প্লিমেন্টস্‌'-এ তার হৃদয় জয় করতে চায়। মেয়েটি তাই দু-হাতে তার কান চেপে ধরেছে। ফাঁকা বুলি সে শুনতে চায় না।

এ জাতীয় প্রেমের করুণ দৃশ্য ভারতীয় ভাস্কর গড়তে পারেননি।

আবার এর বিপরীত মেরুর বাসিন্দা—Eternal Idolও (চিত্র 9.19) আমরা ভারতীয়-মন্দির ভাস্কর্যে পাইনি।

* * *

আনুষঙ্গিক যৌনাচার : কানিলিঙ্গাস/ফেলাশিও/ কাকালি প্রভৃতি আনুষঙ্গিক যৌনাচারের ভাস্কর্যগুলি অব্যতিক্রমভাবে ব্যর্থ। অধিকাংশই কদর্য। কোনো শিল্পসুষমা অথবা রসসৃষ্টির আয়োজনই হয়নি। মনে হয়, এগুলি খেয়ালি নিয়োগকর্তার কামবিকারের প্রতিফলন।

* * *

তৃতীয়স্তর : অস্বাভাবিক/অসামাজিক/অবাস্তব

পুরুষের পাশব মনোবৃত্তির প্রকাশ প্রতীচ্যে যত সার্থক ভাবে রূপায়িত হয়েছে (চিত্র 10.1, 10.2) ভারতীয় মন্দির ভাস্কর্যে (চিত্র 10.3) তা হয়নি।

পশুমৈথুন ও পায়ুমৈথুনের ভাস্কর্য অল্পই নজরে পড়ে। এগুলি অধিকাংশই স্থানীয় নৃপতির কামবিকারের ফসল। প্রধান-ভাস্কর হয় তো রাজাদেশে এগুলি উৎকীর্ণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর সেকাজের জন্য নিয়োগ করেছিলেন নিম্নমানের ভাস্কর। ফলে এগুলি শিল্পালোচনার এক্তিয়ারেই আসে না। বাস্তবে : পর্নোগ্রাফিক।

যৌথ-যৌনাচার ভাস্কর্যগুলি—শুধু খাজুরাহোতে— মনে হয় জাত শিল্পীর হাতে গড়া। শিল্পের বিষয়বস্তুতে যতই আপত্তি থাক, রূপায়ণ যাঁরা করেছেন তাঁরা আনাড়ি

নন। 'ডেভিল'-এর যেটুকু প্রাপ্য যেটুকু তাকে মিটিয়ে দিতে হবে বৈকি। কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা 'সাদৃশ্য' অলঙ্কারের আভাসও পেয়েছি। সেগুলি যদি আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম না হয় তাহলে সেজন্য শিল্পীর কিছু প্রশংসা প্রাপ্য।

অবাস্তব ভাস্কর্যগুলিও অব্যতিক্রমরূপে ব্যর্থ।

উপসংহার :

আমাদের দুর্ভাগ্য : ভারত-শিল্প-সংস্কৃতির যাঁরা আদিসূরী তাঁরা কেউই এই শেষ কয়েকটি শ্রেণির মিথুনাচার-ভাস্কর্য দেখে যাননি। একমাত্র রাজেন্দ্রলাল মিত্র কিছুটা দেখেছিলেন। কোনার্কে। দেখেছিলেন ফাগুর্সনও। তাঁরা কিন্তু তৃতীয়স্তরের মিথুনাচার বিষয়ে কিছু বলে গিয়েছিলেন বলে জানি না। আমরা সন্ধান পাইনি।

রবীন্দ্রনাথ, ক্র্যামরিশ, কুমারস্বামী বা অবনীন্দ্রনাথ সেগুলি দর্শন করেছেন বলে জানা নেই। খাজুরাহো সে-আমলে প্রায় অনাবিষ্কৃত এবং কোনার্ক তখনো অতি দুর্গম। তাঁরা ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্য সম্বন্ধে সেসব সামগ্রিক মতামত দিয়ে গেছেন তার ভিতর এইসব শেষ কয়েকটি শ্রেণির শিল্প অনুল্লেখিত। আমাদের আশঙ্কা এগুলি তাঁদের আমলে জানা ছিল না। তাঁরা তা দেখেননি।

পরবর্তী যুগে — 1960-1970 থেকে — শিল্প-সমালোচকরা এগুলি দেখেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, তাঁদের অধিকাংশই নৈর্ব্যক্তিক শিল্প সমালোচকদের ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা দ্বিধারায় বিভক্ত। একদল বলেছেন এগুলি অশ্লীল, কদর্য, অপসারণযোগ্য। আচার্য বিনোবা ভাবের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। তিনি ছিলেন মূলত সমাজসেবী—স্বীকৃত শিল্পবিশারদ নন। কয়েকজন শিল্প-সমালোচক হিসাবে স্বীকৃতও ছিলেন—তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এগুলি কদর্য ও অপসারণযোগ্য।

দ্বিতীয় দল—যে কোনো কারণেই হোক—তথাকথিত তৃতীয়স্তরের মূর্তিগুলিকে দৃঢ় সমর্থন করেছেন। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক ন্যায়াধীশের ভূমিকায় নয়। আদালতের উকিলের মতো প্রাণপণে এই উগ্র মিথুনাচারকে সমর্থন করে গেছেন। এই দলের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় *মার্গ*-শৈলীর কথা। তাঁদের মুখপাত্র ছিলেন মুলক্‌রাজ আনন্দ। তিনি যে ভাবে ও যে ভাষায় খাজুরাহো-কোনার্কের এইসব সঙ্গমরত মিথুন ও যৌথযৌনাচারের সমর্থন করে গেছেন তাতে আমরা শুধু বিস্মিত নই, মর্মাহত হয়েছি!

বিভিন্ন মূর্তির সমালোচনাকালে এইজাতীয় একদেশদর্শিতার নিদর্শন আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি। উপসংহারেও দু-একটি উদ্ধৃতি দিয়ে সে কথার বিস্তার করি। মুলক্‌রাজ কোনার্কের স্থাপত্য সম্পর্কে লিখেছেন :

No classical sculpture anywhere in the world has surpassed the Indian workmanship in some of the delineations of the flavour of love, as at Konark. But we have to look at them from within the orbit of a philosophy of salvation through pleasure, and not from the superior standpoint of a Christian or latter-day Hindu puritinasm.[5]

[সারা বিশ্বে কোনো ক্লাসিকাল ভাস্কর্য-নিদর্শন কোনার্কের কয়েকটি প্রেমদৃশ্যের রূপায়ণকে অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু তাদের নিরীক্ষণ করতে হবে একটি বিশেষ দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে—আনন্দের মাধ্যমে মুক্তিলাভের দিক থেকে। অর্থাৎ খ্রিস্টানদের আত্মম্ভর মূল্যায়ন থেকে নয়। অথবা ইদানীংকালের হিন্দু গোঁড়ামির দৃষ্টিকোণ থেকেও নয়।]

মার্গ-শৈলীর অধ্যক্ষ কোনার্কের কোন্ কোন্ মিথুন ভাস্কর্য দেখে মুক্তকচ্ছ হয়ে লিখেছেন যে, সারা বিশ্বে কোনো কালে তার সমকক্ষ ভাস্কর্য গড়া হয়নি—তা নির্দেশ করে যাননি। কিন্তু তাঁর সমালোচনার ভাষায় মনে হয় তিনি শিল্প-সমালোচক নন, কোনার্ক-ভাস্করের পক্ষে সওয়াল করতে শিল্প-আদালতে উঠে 'মি-লর্ড'কে কিছু বলছেন।

প্রবন্ধটি পাঠ করে মনে হয় এঁদের মতে যা কিছু ভারতীয় তাই মহান, যা কিছু দেবনাগরী হরফে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে তাই অভ্রান্ত, বেদবাক্য!

Some of the delineations-এর পাশেই যেসব পশুমৈথুন, পায়ুমৈথুন, যৌথযৌনাচার দৃশ্য রয়েছে তা কি মুলক্‌রাজের নজরে পড়ল না?

অন্যত্র মার্গস্কুলের এই মহাপণ্ডিত লিখেছেন :

A hundred Michelangelos may have spent themselves for two generations to achieve a structure like this.[6]

[এমন একটি ভাস্কর্য গড়তে শতখানেক মিকেলাঞ্জেলোকে দুই প্রজন্মকাল অতিবাহিত করতে হবে।]

এ রচনাটি মুদ্রিত করার পরবর্তী যুগেই আমাদের ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। সরকারি খরচে ওই মহান সমালোচক প্রতীচ্যে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও কি তিনি স্বচক্ষে দেখে আসেননি মিকেলাঞ্জেলোর কীর্তি? ডেভিড, পিয়েতা, মোজেস, মেদিচি চ্যাপেলের সিলিং এবং শেষ বিচার—Last Judgement?

সারা বিশ্বে মানব সভ্যতার ইতিহাসে একাহাতে আর কোন ভাস্কর সাফল্যের এমন গৌরীশৃঙ্গে আহরণ করতে পেরেছেন?

উন্নাসিক খ্রিস্টান সমালোচক বা আধুনিক গোঁড়া হিন্দুর দৃষ্টিতে নয়, সাধারণ শিল্পরসিক হিসাবেই আমরা বলব ওইসব পায়ুমৈথুন, পশুমৈথুন, যৌথযৌনাচার বা অবাস্তব ভাস্কর্যগুলি শিল্পপদবাচ্য হয়নি। নীতির বিচারে নয়। 'রস'-এর বিচারেই। উপনিষদের বিকৃত উদ্ধৃতি শুনিয়ে অথবা দার্শনিক ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে সেগুলি সমর্থনের প্রচেষ্টা বাতুলতা। আমাদের আপত্তি সেখানেই। ভাস্কর্যগুলি শিল্পরস সৃষ্টি করেনি, যৌনতাকে মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়েছে।

আমাদের বক্তব্যটা বোধহয় সবচেয়ে সংক্ষেপে এবং সবচেয়ে দৃঢ় ভাষায় বলেছেন বার্ট্রান্ড রাসেল :

> "Joy of life depends upon a certain spontaneity in regard to sex...But, I wish to repeat, as emphatically as I can, that I regard an undue preoccupation with this (sexual indulgence) as an evil.[7]
>
> [স্বীকার করি, জীবনে আনন্দলাভের একটি অংশ স্বতঃস্ফূর্ত যৌনতৃপ্তির ওপর নির্ভরশীল...কিন্তু একই সঙ্গে বলব, যতটা জোর দিয়ে বলতে পারি ততটা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলব : আমার মতে যৌনতার প্রতি অহৈতুকী পক্ষপাতিত্ব একটি অপকর্ষ ছাড়া আর কিছু নয়।]

এইটাই বোধহয় এ প্রতর্কে শেষ কথা। ❑



চিত্র 14.6 বার্ট্রান্ড রাসেল

গ্রন্থপঞ্জি

1. Acharya, P. K. : *Indian Architecture According to Manasara*, O.U.P., 1921
2. Agarwal, U. : *Khajuraho Sculpture & Their Significance*, Bombay
3. Anand, M. R. : *Khajuraho, Marg, Spt.* Vol. X, No. 3
4. —*Kamakala*, Geneva, 1958
5. —*The Tender Moment, Marg*,'68
6. —*The Hindu Visions of Art*, London, 1933.
7. Auboyer, J. : *Arts et Styles de l'Inde*, Paris, 1951
8. Archar, W. C. : *Kamashastra*, Tandam
9. Arthur, A. : *Shakti & Shakta*, Madras, 1924
10. Augustine, St. : *The City of God, BK IV.*
11. Bachhofer, L. : *Early Indian Sculpture*, 2 Vols, Paris, 1929
12. Banerjea, B. : *Introduction to Buddhist Eroticism*, Oxford
13. Banerji, J. N. : *Development of Hindu Iconography*, Cal, 1946
14. Banerji, R. D. : *History of Orissa*
15. Baraschi, C. : *Sculpture of the Nude*,'70
16. Basham, A. L. : *The Wonder that was India*, Sidguich & Jackson, London, 1954
17. Bergson, B. : *Italian Paintings of the Renaissance*, Putnum, N. Y., 1905
18. Bhattacharj, H. & Bhattacharji, A. : *Tantradipika*, Calcutta
19. Binyon, L. : *Paintings in the Far East*, London, 1934
20. Biswas, S : *Terracotta Art in Bengal*, Agama Publ., Delhi
21. Bose, N. : *Shilpakatha*, Visva-bharati
22. Bose, Nirmal : *Konaraker Bibaran*
23. Brown, F. Y. : *Bengal Lancers*, London, 1930
24. Brown, P. : *Indian Architecture*, Hindu Periodd.
25. Calcutta Sanskrit Society : *Kaula Jnananirmaya*, 1934
26. Chakladar, H. C. : *Studies of Kamasutra of Vatsyayana*, Cal., 1929
27. Chakravarty C. : *Sexlife of Ancient India*
28. Cichy, K. : *The Nude in Art*, London, 1959
29. Clarke, K. : *The Nude*, London
30. Coomaraswamy, A. : *History of India and Indian Art*, 1927
31. —*The Dances of Shiva*
32. Cowell, E. B. : *The Jataka*, 6 Vols.
33. Danielue, M. : An article in *Marg*, Vol X, 1948
34. *Dasamahavidya*, Matri Ashram, Gorakpur
35. De, S, K. : *Ancient Indian Erotics & Erotic Literature*, Firma K. L., Cal.
36. Desai, D. : *Erotic Sculpture of India*, TataMcgraw Hill, 1976
37. Duncan, I. : *My Life*, New York
38. *Eccleciastical History*, Bk. XVIII
39. *Encyclopedia Britannica*
40. *Encyclopedia of World Art*
41. Engels, F : *The Origin of Family, Private Property & the State*, Moscow, 1948
42. Ferdinand de Walton : *India & the Hindus*, 1850
43. Fusobal : *The Jataka Stories*

44. Gangooly, O. C. : *The Mithuna in Indian Art, Rupam*, 1925
45. Ganguly M. M. : *Orissa & Her Remains*, 1912
46. Gardener, H. : *Art Through the Ages*, 1936
47. Ghosh, A. : (Ed) : *Ajanta Murals*
49. —*Historical Background of Khajuraho, Ruparekha*, Dec. 1961
50. *Golden Lotus*, Vol. II, translated from Chinese by Edgerton
51. Gordon, H. : *The Prehistoric Background of Indian Culture*
52. Greppe, G. : *Rodin*, Phaidon Press, 1939
53. Graves, R. : *The Greek Myths*, Vol. I
54. *Great Paintings of the World*
55. Gupta, R. S. & Mahajan, B. D. : *Ajanta, Ellora & Aurangabad Caves* Taraporevalla, Bombay, 1962

56. Havell E. B. : *Ideas of Indian Art*, London, 1911
57. —*Ancient & Medieval Architecture of India*, N. Y., 1915
58. Henrique : *The Stews & the Strumpets*
59. *Herodotus*. : Bk. I

60. Iyenger, K. R. : *The Kamasutra*, 1921
61. Kanwarlal : *Erotic Sculpture of Khajuraho*, Asia Press, Delhi, 1970
62. Kar, C. : *Classical Indian Sculpture* 1950
63. Kramrisch, S. : *Indian Sculpture*, 1933
64. —*The Hindu Temples*, 2 Vols., 1946

65. Leeson, F. : *Kama Shilpa*, Bombay, 1962
66. Levi, Sylvan : *Nepal*

67. *Manasi* (Bengali monthly magazine)
68. Marco Polis : *Peaks & Lamas*
69. Mayar J. : *Sexlife in Ancient India* 1930
70. Mitra, D. : *Bhubaneswar*, 1961
71. Nagarjuna, S. : *Rati Rahasyam*, 1902
72. Needham, T. : *Science & Civilisation of China*, 1954

73. Okakura : *Ideals of the East*

74. Panigrahi, K. C. : *Archaeological Remains of Bhubaneswara*
75. Pannikar, W. H. : *India & China*, 1956
76. Patil, R. D. : *Monuments of Udaigiri Hills*.
77. Peterson, P. : *Vatsyayana on the Duties of Hindu Wife*, Anthropological Survey Journal, 1852
78. —*Courtship in Ancient India* as in *Kamasastra of Vatsyayana*
79. Pragnanananda, S. : *Tantra-tatva Probeshika*, Cal., 1988

80. Roy, Dilip. K. : *Among the Great*, 1950
81. Roy, Niharranjan : *History & Culture of Indian People*, Bharatiya V. B., 2 Vols.
82. Rosenfield. J. : *The Dynastic Art of Khajuraho — Buddhist, Hindu & Jain*, 1953
83. Rowland, B. : *The Art & Architecture of India—Buddhist, Hindu & Jain*, 1953
84. Royal Asiatic Soc. *Journal*, Vol. XII, 1844
85. Russell, B. : *Marriage & Morals*
86. Rhys Davis, : *Buddhism, Its History & Literature*, 1926
87. —*Buddhism in India*, London, 1955

88. Sankalia, H. D. : *Illustrated London News*, Aug. 1971
89. Sanyal, N. : *Ajanta*, New Central Book Agency
90. —*Chin-Bharat Long March*, Dey's Publishing, Cal.
91. —*Karutirtha Kalinga*, Ashoka Pustakalaya, Cal.
92. Schmidt, R. : *Beitruze, Zur Indochen Erotic*, Berlin, 1911

93. *Sculpture of the Nude.*
94. Shastri, H. : *Preface to the Notes of Sanskrit Manuscripts*, 2nd series, Baptist Mission Church, 1900
95. Shastri M. K. : *Deshopadesha & Harmamala of Kshemendra*
96. Singh, M. : *Paintings of the Ajanta Caves*
97. Smith, V. : *History of the Fine Arts in India & Ceylon*, Oxford, 1930
98. —*The History of Coinage in Chandilya Dynasty*
99. Solomon : *Ecclesiastical History*
100. Strabbo : *Geography*, Vol. II
101. Stone, I. : *The Agony & the Ecstasy*
102. Tagore, A. : *Bageswari Shilpa Prabandhabali*, Visva-Bharati
103. —*Shipe Sadanga*, Visva-Bharati
104. Tagore Rabindranath, *Religion of Man*, Unwin, London
105. Tandique, K. : *Yasantikam & Indian Culture*, Solapur, 1943
106. Tapp. S. : *The Sexology of the Bible*
107. Tauber, F. : *Pictorial Anatomy of Human Figures*, London.
108. Thomas, P. : *Kamakalpa*, Bombay. 1959
109. Tolstoy. Leo : *What is Art*
110. Vangullic : *Erotic Colour Prints of the Ming Pd. China*, Vol. III
111. Vatsyayana : *Kamasutra*
112. Venkakesubbah A. & Muller, E. : *Sixtyfour Forms of Shilpakala of Vatsyayana*
113. Vivekananda, Swami : *Rajayoga*, Advaita Ashrama, Kolkata, 2003
114. Woodroffe, J. : *Shakit & Shakta*
115. Yazdani, G. : *Ajanta*, 8 Vols., London, 1930-34
116. Zimmer, H. : *The Art of Indian Asia*, Bollinger Series, New York, 1960

তথ্যসূত্র

[লেখকের উপাধির পরের নম্বরটি গ্রন্থপঞ্জির ক্রমানুসারে]

প্রথম পরিচ্ছেদ

মিথুনাচারের উৎস সন্ধানে

1. (পৃ: 10)—Desai, 36, P. 1
2. (পৃ: 11)— ঐ 36, P. 1
3. (পৃ: 11)—Anand, 3.
4. (পৃ: 14)—Basham, 16, P. 172
5. (পৃ: 21)—Vatsyayana, 111
6. (পৃ: 22)—Gordon, 51
7. (পৃ: 23)—Ferdinand, 42
8. (পৃ: 23)—Tapp, 106
9. (পৃ: 23)—Herodotus, 59, P. 1
10. (পৃ: 25)— Do, 59, P. 2
11. (পৃ: 25)—Ecclesiastic, 38, P. 14
12. (পৃ: 25)—Strabbo, 100, P. 16
13. (পৃ: 26)—Augustine, 10, P. 10
14. (পৃ: 29)—Encyclopedia, 39
15. (পৃ: 30)—Reinach Salmon
16. (পৃ: 31)—Selingman. *The Malayasians of British Guiana,* C.U.P. 1910
17. (পৃ: 31)—Henrique 55
18. (পৃ: 32)—Engels, 41, P. 49
19. (পৃ: 32)—Ibid, P. 51
20. (পৃ: 35)—Graves, 53, P. 109
21. (পৃ: 36)—Basham, 16, P. 6
22. (পৃ: 37)—Basham, 16, P. 8
23. (পৃ: 40)—Ronald, 83, P. 115
24. (পৃ: 40)—Basham, 16, P. 24
25. (পৃ: 41)—Sankhalia, 88, P. 42
26. (পৃ: 42)—Desai, 36, P. 10
27. (পৃ: 46)—Roy, 81, P. 528
28. (পৃ: 46)—Anand, 30, P. 36

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পোড়ামাটির আদিম শিল্পে মিথুনাচার

1. (পৃ: 48)—Desai, 36, P. 14
2. (পৃ: 48)—Anand, 3
3. (পৃ: 49)—Biswas, 20, P. 14
4. (পৃ: 50)—Desai, 36, P. 15
5. (পৃ: 50)—Desai, 36, P. 16
6. (পৃ: 50)—Biswas, 20
7. (পৃ: 50)—Biswas, 20
8. (পৃ: 52)—Desai, 36, P. 16
9. (পৃ: 52)—Desai, 36, P. 20
10. (পৃ: 52)—Vatsyayana, 111
11. (পৃ: 53)—Rosenfield, 82

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কেন মিথুন?

1. (পৃ: 55)—Desai, 36, P. 1
2. (পৃ: 55)—Ganguly, 45
3. (পৃ: 56)—Banerji, 14, P. 40
4. (পৃ: 59)—Fergusson, James
5. (পৃ: 60)—Sanyal, ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন, 1980
6. (পৃ: 60)—Leeson, 65, Preface
7. (পৃ: 60)—Havell, 55
8. (পৃ: 61)—Danielue, 33
9. (পৃ: 62)—Brown, 24
10. (পৃ: 62)—Leeson, 65
11. (পৃ: 63)—Morris Desmond, The Human Zoo, P. 113
12. (পৃ: 64)—Agarwal, 2
13. (পৃ: 64)—Danielue, 33
14. (পৃ: 64)—Anand, 4, P 26
15. (পৃ: 65)—Brown, 24
16. (পৃ: 66)—Bose, 22, P. 78

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মন্দির ভাস্কর্যে 'সুতনুকা'

1. (পৃ: 113)—Acharkar, 1
2. (পৃ: 114)— Do, Preface
3. (পৃ: 120)— Do
4. (পৃ: 120)—Tagore, 102
5. (পৃ: 123)—Tagore, 102
6. (পৃ: 124)—Tagore, 102

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শাক্তঅন্ত্র, বজ্রযান, চীনাচার ও মিথুনাচার

1. (পৃ: 138)—Woodroffe, 114
2. (পৃ: 139)— Do
3. (পৃ: 140)— Do

4. (পৃ: 140)—Shastri, 94.
5. (পৃ: 140)—Levi, 66
6. (পৃ: 140)—Bhattacharya, D. *Introduction to Buddist Eroticism*, O.U.P.
7. (পৃ: 142)—*Golden Lotus*, 50
8. (পৃ: 143)—Van Gullick, 110
9. (পৃ: 143)—Needham, 72
10. (পৃ: 144)—Prajnananada, 79
11. (পৃ: 147)—Woodroffe, 114
12. (পৃ: 148)—Desai, 36
13. (পৃ: 149)—*Tantrayana Art*— An Album, UNESO, Preface.
14. (পৃ: 150)—Needham, 72
15. (পৃ: 158)—Marco Polis, 68
16. (পৃ: 159)—Marco Polis, 68
17. (পৃ: 160)—Kalidasa, *Raghuvansam*

অষ্টম পরিচ্ছেদ
মিথুন : প্রথম স্তর

1. (পৃ: 166)—Mitra, 70
2. (পৃ: 169)—Desai, 36
3. (পৃ: 176)—Desai, 36
4. (পৃ: 177)—Kalidasa, *Meghadutam*
5. (পৃ: 177)—Kalidasa, *Kumarasambhavam*
6. (পৃ: 179)—Desai, 36
7. (পৃ: 180)—রবীন্দ্রনাথ, *শেষের কবিতা*
8. (পৃ: 180)—রবীন্দ্রনাথ, *'চুম্বন'*
9. (পৃ: 181)— ঐ, ঐ

নবম পরিচ্ছেদ
মিথুন : দ্বিতীয় স্তর

1. (পৃ: 183)—Ellis, Havelock, *Psychology of Sex*
2. (পৃ: 183)—*Indian Penal Code*, Chapter XVII
3. (পৃ: 185)—Robson, Deirdre, *The Nude*
4. (পৃ: 186)—Ibid
5. (পৃ: 188)—Russell, 85
6. (পৃ: 189)—Ibid
7. (পৃ: 194)—Kanwarlal, 61
8. (পৃ: 185)—Robson, D, *The Nude*
9. (পৃ: 200)—Desai, 36
10. (পৃ: 202)—Archar, 8

দশম পরিচ্ছেদ
মিথুন : তৃতীয় স্তর

1. (পৃ· 209)—Anand, 3
2. (পৃ: 209)—*বৃহদারণ্যক উপনিষদ*
3. (পৃ: 210)— ঐ ঐ
4. (পৃ: 211)—Barat, Douglus
5. (পৃ: 212)—Vatsyayana, 111
6. (পৃ: 212)—Anand, 4
7. (পৃ: 213)—Vatsyayana, 111
8. (পৃ: 215)—Kalidasa, *Meghadutam*
9. (পৃ: 216)—Vivekananda, *Complete Works*, Vol. IV, Pp. 423-4
10. (পৃ. 217)—Leeson

একাদশ পরিচ্ছেদ
খাজুরাহো মন্দিরে মিথুনাচার

1. (পৃ: 229)—Smith, V., 97
2. (পৃ: 229)—Tandique, K., 105
3. (পৃ: 229)—Shastri, 95
4. (পৃ: 229)—Ibid
5. (পৃ: 229)—Ibid

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
কোনারক মন্দিরে মিথুনাচার

1. (পৃ: 234)—Fergussan, J., *History of Architecture, London, 1865*
2. (পৃ: 234)—Basham, A. L., 16, 361
3. (পৃ: 236)—Ibid.
4. (পৃ: 242)—Archar, 8

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
ভারত সংস্কৃতির অনবদ্যতা ও মিথুনাচার

1. (পৃ: 257)—Nag, Moni, *A Paper on Sex & Religion of the Hindus*
2. (পৃ: 257)—Bose, N., 21
3. (পৃ: 257)—*Indian Penal Code*
4. (পৃ: 261)—Bose, Nandalal, 71
5. (পৃ: 266)—Anand, 3
6. (পৃ: 266)—Anand, 4
7. (পৃ: 267)—Russell, B., 85